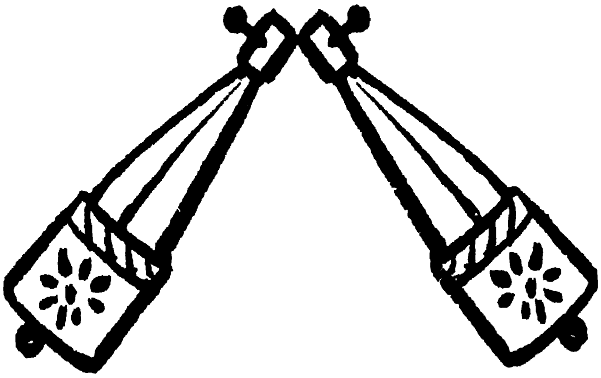
ভারতের লোককথা

সম্পাদনা

জগত লাহা

১এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯



BHARATER LOKEKATHA

Edited by
Jagat Lahiri

প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ
বইমেলা, ১৯৭৭

প্রচ্ছদ শান্তনু দে
অলংকরণ শঙ্কর বসাক

ISBN 81 7332 418 3

পুনশ্চ, ১১৪ এন ডা. এস সি ব্যানার্জী রোড, কলকাতা ৭০০০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস ১১৪ এন
ডা. এস সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত

সম্পাদকের নিবেদন

বাংলা ভাষায় শিশু ও কিশোরদের উপযোগী বইয়ের অভাব নেই। গল্পকাহিনী ছড়া রূপকথা — নানারকম সাহিত্যের সম্ভারে বাংলা ভাষার ভাণ্ডার পূর্ণ। কিন্তু এক মলাটের মধ্যে গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল বা প্রদেশের লোককথা দিয়ে সাজানো গোছানো বাংলা বই বড়ো একটা নেই, থাকলেও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এই অভাবটি অভিভাবক হিসেবে অনেকের মতো আমিও উপলব্ধি করি এবং একটি সর্বভারতীয় লোককথার সঙ্কলনের পরিকল্পনা নিই। সম্প্রতি পশ্চিমবাংলার সুখ্যাত প্রকাশন সংস্থা 'পুনশ্চ' সাগ্রহে আমার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং ভারতের লোককথা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। তারই ফল ভারতের লোককথার প্রকাশ।

এই সঙ্কলনে ভারতের প্রায় সব অঞ্চলের লোককথা সঙ্কলিত হয়েছে। সঙ্কলনের দুরূহ কাজটি আমিই পালন করেছি। সঙ্কলনের অনেক কাহিনীও আমি লিখেছি। কিন্তু এত বৃহৎ কর্মকাণ্ড একার পক্ষে সম্পন্ন করা অসম্ভব ব্যাপার, সুতরাং আমি এ কাজে অনেকের সাহায্য নিয়েছি। তাঁরা অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালনও করেছেন। প্রত্যেকটি রচনার শেষে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আমি তাঁদের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

শুধু কাহিনী সঙ্কলন নয়, গ্রন্থসজ্জা ও অলঙ্করণের ব্যাপারেও 'পুনশ্চ' প্রকাশন সংস্থা অত্যন্ত যত্ন নিয়েছেন যা আমার মতো সর্বসাধারণকেও বিস্মিত করবে। আমার পরম স্নেহভাজন দুই শিল্পী শান্তনু দে ও শঙ্কর বসাক অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে গ্রন্থের অঙ্গসজ্জা, অলঙ্করণ ও প্রচ্ছদ রচনা করে আমাকে মুগ্ধ করেছেন। 'পুনশ্চ' প্রকাশন সংস্থার সুযোগ্য সেনাপতি সন্দীপ নায়ক এই ব্যয়বহুল পৃথুলকলেবর গ্রন্থ প্রকাশের জন্য যত্ন, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের এক আশ্চর্য নজির রেখেছেন। তাঁকে আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা জানাই। সব শেষে জানাই, যাদের জন্য ভারতের লোককথা প্রকাশ, সেই সারা বাংলার শিশু ও কিশোর যদি এই বই পড়ে আনন্দ পায়, তাদের মানসিক ও কাল্পনিক শক্তির বিকাশ হয় তাহলে আমি আমার সমস্ত প্রয়াস সার্থক হয়েছে মনে করব।

জগত লাহা

বিষয়সূচি



অন্ধ্রপ্রদেশ

বুদ্ধিমতী



এক ব্রাহ্মণী। তার নাম কী ছিল কে জানে! উপস্থিত বুদ্ধির জন্যে তাকে গ্রামের সবাই ডাকত বুদ্ধিমতী বলে।

একবার বুদ্ধিমতী স্বামী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে গোরুর গাড়ি করে বাপের বাড়ি যাচ্ছিল। বাপের বাড়ির পথে পড়ে একটা ভীষণ ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গাড়িটা ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ বিপদের গন্ধ পেয়ে বলদ দুটো ভয়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে পড়ল। কী ব্যাপার! কিছু আঁচ করার আগেই বলদ দুটো দড়ি ছিঁড়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যেদিকে পারল--লাগাল দৌড়। বাধ্য হয়ে ব্রাহ্মণ এবং গাড়োয়ানটাকে গাড়ি থেকে নেমে বলদ দুটোর পেছন ধাওয়া করতে হল,— ধরে বেঁধে গাড়িতে জুড়ে অন্তত এই ভয়ংকর বনটা তো আগে পার হতে হবে!

বুদ্ধিমতী আর কী করবে! সে ছেলেমেয়েদের নামিয়ে গাছের নীচে বসে স্বামী আর গাড়োয়ানের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

ঠিক এমনি সময় একটা বাঘ ঝোপের আড়াল থেকে ব্রাহ্মণী আর তার ছেলেমেয়েদের দেখতে পেয়ে গেল। একসঙ্গে এতগুলো খাবার দেখে বাঘ তো আহ্লাদে আটখানা! আহা, কতদিন সে নরমাংস খায়নি! হাবিজাবি খেয়ে খেয়ে জিভটা একেবারে তেতো হয়ে গেছে। কতদিন পর আজ ভগবান তার উপর সদয় হয়েছেন! সে কি হেলাফেলা করে এমন সুবর্ণ সুযোগের অপব্যবহার করতে পারে! লোভে বাঘের জিব থেকে জল ঝরতে লাগল।

কিন্তু ব্রাহ্মণীর দশাসই চেহারা দেখে বাঘ বেশ খানিকটা দমেও গেল। মনে মনে ভাবতে লাগল : বামনিকে দেখে তো খাণ্ডারনি বলেই মনে হচ্ছে। শিকার ধরতে গিয়ে শেষমেশ বেঘোরে নিজের পৈতৃক প্রাণটাই দিতে হবে না তো! নাহ, দুম করে ঘাড়ে চেপে বসে কাজ নেই। তার আগে অন্তত বার কয়েক ভেবে-চিন্তে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। হায় রে, এই সময় যদি আমার মন্ত্রী শিয়ালপণ্ডিতটা কাছে থাকত,--তার কাছ থেকে একটা সুযুক্তি পাওয়া যেত ঠিকই। তার খোঁজেই যাব নাকি? তার কাছ থেকে পরামর্শ না নিয়ে এতটা ঝুঁকি নেওয়া বোধহয় ঠিক হবে না।

পরমুহূর্তেই বাঘ সাহস ভরে ভাবতে লাগল : আমি যখন এতই ক্ষুধার্ত, তখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কাজ কি? যারা বুদ্ধিমান, তারা কখনো সময়ের অপচয় করে না। কী আর হবে! বামনির গায়ে জোর আর কত? প্রথমে ওকেই ধরে গিলে নেব, তাহলে আর কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না।

বুদ্ধিমতীও বাঘকে দেখল। ভয়ে তার হাত-পায়ে খিল ধরে যাওয়ার জোগাড়। কিন্তু বিপদে ধৈর্য হারালে তো চলবে না! সাহসে বুক বাঁধতে হবে। নচেৎ বুদ্ধিসুদ্ধি সব গুলিয়ে যাবে।

হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের গায়ে সজোরে চিমটি কেটে তাদের জাগিয়ে তুলল। চিমটির জ্বালায় ছেলেমেয়েগুলো তারস্বরে কাঁদতে শুরু করে দিল।



তখন বুদ্ধিমতী তাদের গায়ে থাবড়ে থাবড়ে আদর করার ভান করে বাঘকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল ঃ বাছারা, কাঁদিস কেন? আমি কী করব? কোত্থেকে এখন তোদের বাঘের মাংস এনে দেব? আমি তো এইজন্যেই বনে এসেছি। কিন্তু একটু সবুর কর। এখনো পর্যন্ত একটা বাঘেরও তো টিকি দেখতে পেলাম না। যদি একটা বাঘও পাই, মেরে—তার মাংসই ভাগ করে তোদের খেতে দেব। আর যদি একটার বেশি পাই, তাহলে তো তোদের গোটা-গোটাই খেতে দিতে পারি। সোনার বাছারা, যতক্ষণ একটা বাঘকেও ধরতে না পারি, ততক্ষণ তোরা ঘুম যা। ছেলেমেয়েদের এই ভাবে প্রবোধ দিয়ে বুদ্ধিমতী একটা ছেলে-ভোলানো ছড়া সুর করে টেনে টেনে আবৃত্তি করতে লাগল।

এদিকে বুদ্ধিমতীর কথা শুনে বাঘের তো হৃৎকম্প শুরু হয়ে গেছে। তার হাত-পা কাঁপছে। পায়ের তলার মাটিই যেন সরে যেতে বসেছে।

প্রথমে সে কোনোরকমে গুড়ি মেরে ধীরে ধীরে ঝোপের ভেতরে গিয়ে সেঁধোল, তারপরে এক লাফে পগার-পার। ছুটতে ছুটতে সে কয়েক মাইল পেরিয়ে এসে একটা টিবির উপর বসে বেদম হাঁপাতে লাগল, আর ভয়ে ভয়ে চারদিকে জুলজুল করে চেয়ে দেখতে লাগল—বামনি তার পেছনে পেছনে এখানেও এসে হাজির হয়েছে কিনা!



ঠিক সেই সময় তার মন্ত্রী শিয়ালপণ্ডিত হঠাৎ সেখানে এসে হাজির। বাঘমশাইকে হাপরের মতো হাঁপাতে দেখে খানিকটা অবাক হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল ঃ পশুরাজ, ব্যাপার কী? আপনি একেবারে একা-একা এত দূরে চলে এসেছেন,—কাছেই গ্রাম,—লোকজন লাঠি-সোটা নিয়ে ছুটে আসতে পারে!— আপনার পরিচারকেরা সব কোথায়? এরকম প্রাণের ঝুঁকি নেওয়া আপনার বোধহয় উচিত হচ্ছে না। আমাদের এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয়। চলুন, আমরা আমাদের নিরাপদ জায়গায় ফিরে যাই।

মন্ত্রী-শিয়ালের কথা শুনে বাঘ বলল ঃ বৎস শৃগাল, আমি পুনর্জন্ম পেয়েছি। গত জন্মে খুব পুণ্যি করেছিলাম, তাই আজ এখনো বেঁচে আছি, এবং তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারছি। সেই নিদারুণ ঘটনা বর্ণনা করতে আমার লজ্জা হচ্ছে, দ্যাখো তো, আশেপাশে কেউ আছে কিনা! যদি কেউ শুনে ফেলে তাহলে লজ্জার আর শেষ থাকবে না।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাঘ সমুদয় কাহিনী বিবৃত করে শোনাল মন্ত্রীমশাইকে।

গল্পটা শুনে শিয়ালের হাসি পেল। সে বলল ঃ আপনার মুখে যে-সব কথা শুনলাম, তাতে আমি খুব অবাক হচ্ছি, পশুরাজ। মনে রাখবেন, আপনি ব্যাঘ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, যে বংশ সিংহবংশের চেয়ে গৌরবে ও মর্যাদায় কিছুমাত্র গৌণ নয়। অথচ আপনি কাপুরুষের মতো কথা বলছেন। যদি একথা সত্যি হয় যে আপনি তুচ্ছ এক বামনির ভয়ে পালিয়ে এসেছেন, তাহলে সমগ্র ব্যাঘ্র সমাজকেই আপনি হেয় করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার মতো যে-সব ভৃত্য আপনার উপর ভরসা করে বেঁচে আছে, দেখছি—এখন থেকে তাদের অনাহারেই মরতে হবে। কী লজ্জা! একটা মেয়েছেলে বলল তার ছেলেমেয়েদের বাঘের মাংস খাওয়াবে বলে বাঘের খোঁজ করছে,—আর আপনি তা-ই শুনে পড়ি-কী-মরি করে ছুটে পালিয়ে এলেন! আমার সঙ্গে চলুন,

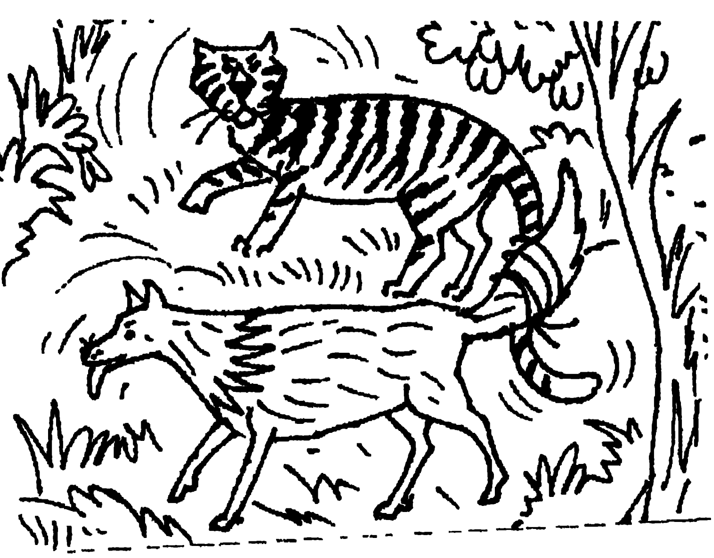
সেই মহিলাকে দেখান। আমিই আপনাকে সেই মহিলা আর তার ছেলেমেয়েদের উপহার দেব। আপনি তাদের রক্তপান করে আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিবৃত্ত করবেন।

বাঘ উত্তর দিল ঃ তোমার সাহসিকতা এবং বুদ্ধির সঙ্গে আমার ভালোমতোই পরিচয় আছে। তুমি এখানে অনেক আগডুম-বাগডুম বলছ বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তোমার মুখ দিয়ে রা-ও সরবে না, আমি তা জানি। এখন আমি এক পা-ও নড়ছি না। যদি ইচ্ছে হয়, তুমি একাই যাও। ওই ভয়ংকর মহিলা চলে যাওয়ার পর তবেই আমি সেখানে যাব।

শিয়াল ওকালতি করে বলল ঃ হে নির্ভীক পশুরাজ, এইভাবে লুকিয়ে কতক্ষণ আপনি থাকতে পারবেন? আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি ওই মহিলাটির চালে ভুলব না। উঠুন! যদি আমার কথা আপনার বিশ্বাস না হয়, আপনি লতা দিয়ে আমাকে আপনার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলুন।

এই কথা বলে শিয়াল বাঘের দেহের সঙ্গে নিজেকে নিজেই লতা দিয়ে কষে বাঁধল, এবং যেখানে বুদ্ধিমতী বসে আছে সেই জায়গার দিকে বাঘকে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

বুদ্ধিমতী দুই মূর্তিমানকেই দেখল এবং ভীষণ ভয় পেল। হঠাৎ তার মাথায় আর একটা বুদ্ধি খেলে গেল সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল ঃ ও, শেয়ালপণ্ডিত! কী ঠকানোটাই না আমাকে ঠকালে। দুনিয়ায় শিয়ালদের মতো শঠ আর প্রতারক আর কে আছে! আমার কাছে ঘুষ খেয়ে প্রতিজ্ঞা করে গেলে যে তুমি দু-দুটো বাঘকে একসঙ্গে ধরে আনবে; কিন্তু এখনো পর্যন্ত টালবাহানা করছ বলি, আর একটা বাঘ কই? একটাকে আনলে কেন? আমার ছেলেমেয়েরা খিদেয় মরে যাচ্ছে,—একটা বাঘে কি তাদের খিদে মিটবে? ঠিক আছে, তুমিই এসো, আমি তোমাকেও মারব, এবং তোমার মাংসও ওদের খাওয়াব।



এই কথা কানে যেতেই বাঘমশাই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল এবং শেয়ালকে বলল ঃ তোকে বিশ্বাস করেছিলাম, এই তার প্রতিফল! ঠিক আছে, এখন তো প্রাণে বাঁচি। পরে তোকে কী রকম উচিত শিক্ষা দিতে হয়,— তা আমার জানা আছে।

এই বলে বাঘমশাই লম্ফঝম্প দিয়ে দুদ্দাড় বেগে ছুটতে লাগল। শিয়াল পণ্ডিতের গলাটা তখনো তার দেহের সঙ্গে বাঁধা আছে। বাঘ ছুটছে, ছুটছে। লাফ মেরে মেরে ঝোপঝাড় চড়াই-উতরাই পাথুরে জমি টপকে ডিঙিয়ে কেবলই ছুটছে। শিয়ালের সর্বাঙ্গ থেঁতলে ছেঁচে রক্তাক্ত হয়ে গেল; কিন্তু বাঘমশায়ের কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। অনেকক্ষণ ছোটার পর একেবারে ক্লান্ত নাজেহাল হয়ে বাঘমশাই থামল, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে এসেছে, জিব বেরিয়ে পড়েছে। একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে হাঁফ নিতে নিতে রাগে গজগজ করতে করতে বাঘ বলল ঃ ব্যাটা হাড়বজ্জাত শেয়াল! আমি দাঁত দিয়ে পেট চিরে তোর সব নাড়িভুঁড়ি বের করে তবে ছাড়ব, তোর সব রক্ত পান করব। বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার সেই হবে তোর যোগ্য পুরস্কার।

শিয়াল বলল ঃ প্রভু, আপনি যদি আরো কিছুক্ষণ এখানে থাকেন, তাহলে সেই ভয়ংকর মহিলা রক্তের দাগ দেখে দেখে আবার এখানে এসে পড়তে পারে। কাজেই চলুন, এখান থেকে এখনই পালিয়ে যাই। পরে আপনি আমাকে যেবকম খুশি শাস্তি দেবেন. এখন তো প্রাণে বাঁচি!

শিয়ালেব কথাটা বাঘমশায়েব খুব মনে ধবল। আর না, সেই ভয়ংকর মহিলা এবার হাতে পেলে আর রক্ষে রাখবে না। বাঘমশাই নিজেই স্বতঃপ্রণোদিত হযে শেয়ালের বাঁধন খুলে দিয়ে নিমেষে লম্বা দিল। শেয়ালও প্রাণের ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। যেতে যেতে সে মনে মনে বলতে লাগল ঃ যে হিংস্র, সত্য কথা বলেও তাব কাছে পাব পাওয়া দুষ্কব।



অপদেবতা



ভিন্নকোটা গাঁয়ে এক ব্রাহ্মণ বাস করত। তার নাম সানুভূতি।

সানুভূতি ছিল খুবই দরিদ্র। সারাদিন ভিক্ষে করে যা পেত, তাই দিয়ে কোনোমতে তার জীবিকা নির্বাহ হত।

সানুভূতির ব্রাহ্মণী ছিল ভয়ংকর রণচণ্ডী। স্বামী ভিক্ষে করে যে চাল নিয়ে আসত, সেই চাল রেঁধে যেটুকু ভাত হত, সে সবটা একাই গিলত; স্বামীকে এক মুঠোও দিত না। পাতে ভুক্তাবশিষ্ট যেটুকু পড়ে থাকত, সেইটুকুই কেবল জুটত তার স্বামীর কপালে। ওই পাত-কুড়োনো একমুঠো ভাতের বিনিময়ে সানুভূতিকে সমস্ত এঁটো থালা-বাসন ধুতে ও মুছতে হত।

এর ওপর, বামনি রোজ একগাছা করে দড়ি বানাত, আর রোজ রাত্রে সেই দড়িগাছা দিয়ে স্বামীকে উত্তম মধ্যম ধোলাই দিত। এইভাবে সে তার হাতের চুলকানি আর সুড়সুড়ানির উপশম করত। বলতে কী, বেচারা সানুভূতির খুব দুঃখকষ্টের মধ্যেই দিন কাটত।

একদিন এক ধনী ব্যবসায়ী দূর গ্রামে এক আত্মীয়ের কাছে একটা চিঠি পাঠানোর জন্যে সানুভূতিকে তার পত্রবাহক নিযুক্ত করল। অনেক দূরের গ্রাম। যেতে আসতে দিন দশেক লাগে। তাতে কী? কিছু পয়সা তো মিলবে। তাই আনন্দে রাজি হয়ে গেল সে।

সানুভূতি দশদিন ঘরছাড়া। ইতিমধ্যে তার বউ দশগাছা দড়ি বানিয়ে রেখেছে, সানুভূতি ফিরলেই সে সেই দশগাছা দড়ি তার স্বামীর পিঠে প্রয়োগ করবে। এই দশদিনে তার হাতের চুলকানি বেড়ে একেবারে দগদগে হয়ে উঠেছিল। চুলকানির যন্ত্রণা এতই অসহ্য হয়ে পড়ল যে বামনি একদিন রাত্রে আর ঘরে থাকতে না পেরে সেই দশগাছা দড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছল গাঁয়ের শেষ সীমানায়। সেখানে একটা বড়োসড়ো ডুমুর গাছ ছিল। স্বামীকে হাতের কাছে না পেয়ে অগত্যা বামনি একের পর এক সেই দশ দশগাছা দড়ি দিয়ে ওই ডুমুরগাছটাকেই আগাপাশতলা পিটিয়ে যেতে লাগল। যতক্ষণ হাতের সুখ না হয়, জ্বালা যন্ত্রণার উপশম না হয়—ততক্ষণ সে প্রাণপণে পিটতে থাকে। একসময় জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হল। বামনিও শান্ত হল।

ওই ডুমুরগাছটায় বাস করত এক ব্রহ্মরাক্ষস। অনেককাল ধরে সে ওই গাছটায় বাস করে আসছে। বামনি ডুমুরগাছটাকে পিটিয়েছে, কিন্তু মার পড়েছে সেই ব্রহ্মরাক্ষসটার পিঠে। মারের চোটে তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে, জায়গায় জায়গায় কালসিটে পড়ে গিয়েছে। শেষমেশ আর সহ্য করতে না পেরে ব্রহ্মরাক্ষসটা প্রাণের ভয়ে ডুমুরগাছ ছেড়ে 'বাপরে' 'মারে' করতে করতে পালিয়ে বাঁচল।

যেতে যেতে ব্রহ্মরাক্ষস দেখতে পেল—সানুভূতি বাড়ি ফিরছে, তাঁর কাঁধে একটা ঝোলা, তাতে চাল আর কিছু তরিতরকারি আছে।



ব্রহ্মরাক্ষস সানুভূতির কাছে এগিয়ে গেল, তাকে তার নাম এবং ঠিকানা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করল। সানুভূতি তাকে নাম ও গ্রামের নাম বলল।

ব্রহ্মরাক্ষস সানুভূতিকে বলল যে, সানুভূতি যে গ্রামের নাম বলল, সেই গ্রামে একটা ভয়ংকর মেয়েছেলে থাকে—তার মারের চোটে কাহিল হয়েই সে সেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। সে বিস্মিত হয়ে বলল, যে গ্রামে ওই উগ্রচণ্ডা মহিলা বাস করে, সেই গ্রামে সানুভূতির মতো গোবেচারা, ঠাণ্ডা গোছের লোক বাস করে কী করে?

সানুভূতি ব্রহ্মরাক্ষসকে চিনতে পারল, তখন সে ভয়ে ভয়ে তাকে বলে বসল ঃ প্রভু, যে ডুমুর গাছটায় আপনি বাস করতেন, সেই ডুমুর গাছটাকে দড়ি দিয়ে যে মেয়েমানুষটা পিটুনি দিয়েছে, সে-ই আমার স্ত্রী। ওই মহিলা প্রতি রাত্রেই আমাকে দড়ি দিয়ে পেটায়। আমার পিঠটা দেখুন; কী রকম কালসিটে পড়ে গেছে!

এই বলে সানুভূতি ব্রহ্মরাক্ষসকে তার পিঠটা দেখাল। সারা পিঠে কালসিটে আর দড়ির দাগ দেখে ব্রহ্মরাক্ষস ভয়ে শিউরে উঠল।

ব্রাহ্মণের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে ব্রহ্মরাক্ষস বলল ঃ বামনির হাতে রোজ এভাবে পিটুনি খাও, তবু ওর সঙ্গে বাস কর কেন? কেন ওকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাও না? ওর কাছে থেকে কী সুখ পাও? আমি মাত্র একটা দিন ওর মার খেয়ে নাজেহাল হয়ে পড়েছি, আর তুমি দিনের পর দিন ওর মার সহ্য করে যাচ্ছ? বলিহারি তোমার সহ্যগুণ।



সানুভূতি বলল ঃ মশাই, আমি কি সাধ করে ওর মার সহ্য করি? ও না হলে আমায় রেঁধে দেবে কে? আমি দরিদ্র হতভাগ্য ব্রাহ্মণ। তিনকুলে আমার কে আছে? এই বলে সে কাঁদতে লাগল।

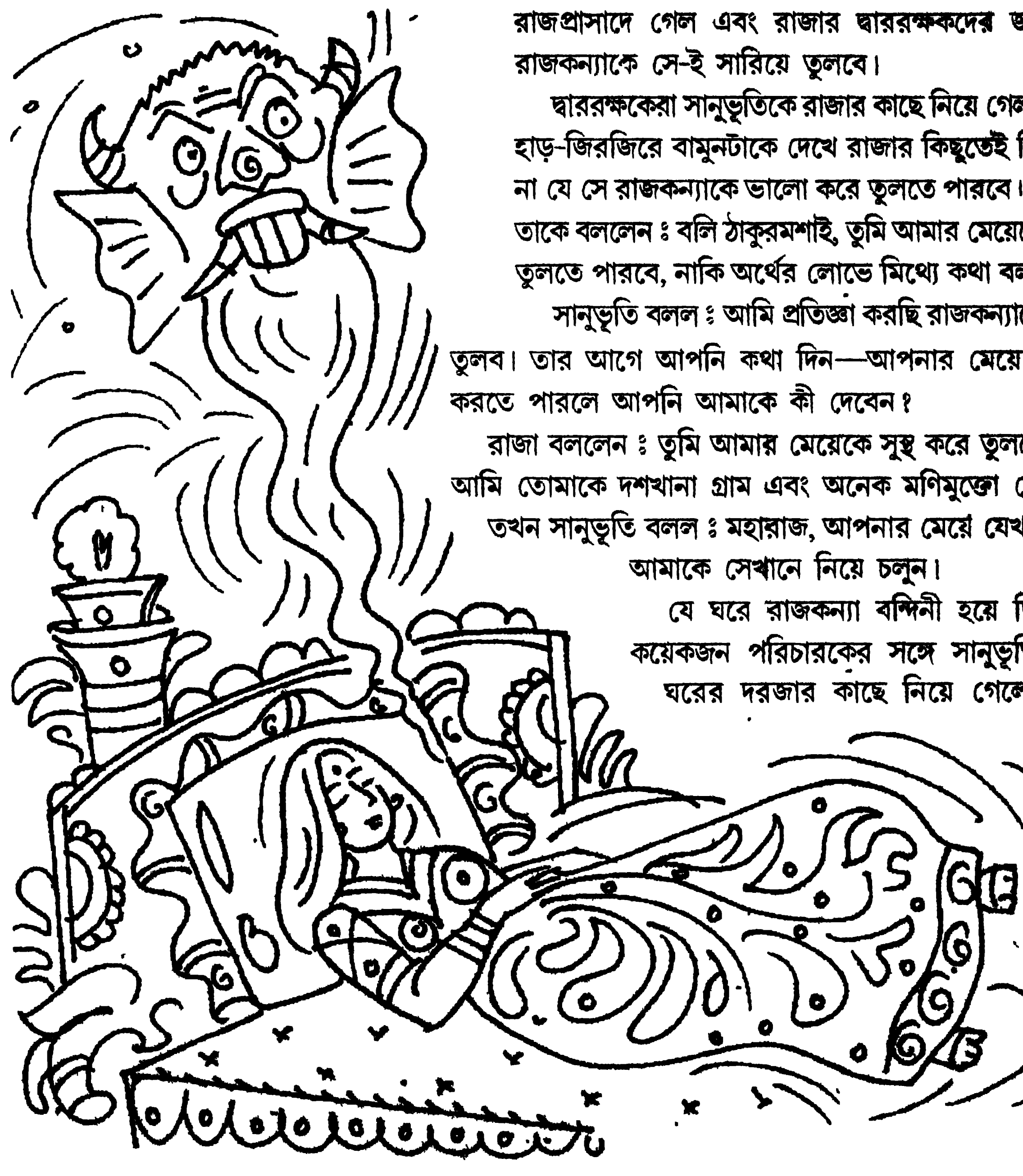
ব্রহ্মরাক্ষস বলল ঃ বেচারা! যাক্, আমার কথা শোন। কেঁদো না। তোমাকে আর বাড়ি যেতে হবে না। যা বলছি, মন দিয়ে শোন। কাছেই বনদুর্গা বলে একটা শহর আছে। সেখানে দুর্গাদত্ত নামে এক রাজা আছে, তার একটিমাত্র মেয়ে। আমি তাকে 'ভর' করব। তার রক্ত চুষে কঙ্কালে পরিণত করব। তুমি কদিন পরে সেখানে আসবে। বলবে—আমি ভূত ছাড়াতে জানি। রাজাকে বলবে—যদি আমাকে কিছু ভূ-সম্পত্তি দান করেন, তাহলে আমি আপনার মেয়েকে ভালো করে দেব। রাজা প্রতিশ্রুতি দিলে তুমি রাজকন্যার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার কানে কানে বলবে—আমি সেই ব্রাহ্মণ, যার বউ রোজ তাকে দড়ি দিয়ে পেটায়। তৎক্ষণাৎ আমি রাজকন্যাকে ছেড়ে চলে যাব। তুমি ধনী হবে, তারপর একটা ভালো শান্ত প্রকৃতির মেয়েকে বিয়ে করে সুখে বসবাস করবে।

এই বলে ব্রহ্মরাক্ষস হঠাৎ অন্তর্ধান করল; আর বাড়ি না গিয়ে সানুভূতিও অন্য গাঁয়ের পথ ধরল।

সেই রাত্রেই ব্রহ্মরাক্ষস রাজকন্যাকে 'ভর' করল। রাজকন্যা প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার করে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নীচে পড়ল। স্ত্রীর চিৎকারে তার স্বামীও জেগে গেল। হঠাৎ কী হল, স্বামী-বেচারা ভাবতে লাগল ঃ রাজকন্যা অমন করে চেঁচিয়ে উঠল কেন? শুধু তাই নয়, যেই সে রাজকন্যার কাছে এগিয়ে গেল, অমনি সে তাকে কামড়ে-খামচে দেওয়ার ভাব করে তার দিকে ছুটে এল। সে বেচারা কোনো-রকমে তো পালিয়ে বাঁচল, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যার বাবা-মাকে গিয়ে সবকিছু খুলে বলল।

বাবা-মা মেয়ের ঘরে ঢুকতেই মেয়ে তাঁদের দিকে ছুটে গেল, জোরে জোরে গোঙাতে এবং দাঁতে কড়মড় শব্দ করতে লাগল। তাঁরা বুঝতে পারলেন মেয়েকে অপদেবতায় পেয়েছে। তখন ঘরে তালাচাবি মেরে তাকে বন্দী করে রাখা হল। অনেক বদ্যি এল, কোবরেজ এল। তারা ওষুধ-পত্তর দিল। কোনো কাজ হল না। অনেক ওঝা এল। তারাও অনেক ঝাড়-ফুঁক করল; কিন্তু ভালো করতে পারল না। দিনের পর দিন মেয়ে শীর্ণ, বিবর্ণ এবং কঙ্কালসার হয়ে পড়তে লাগল। ক্রমে ক্রমে খাওয়া-দাওয়াও ছেড়ে দিল। রাজা-রানি ধরে নিলেন মেয়ে আর বাঁচবে না। রাজকন্যার আত্মীয়-স্বজন, স্বামী এবং সখীরাও সকলে খুব দুঃখিত ও শোকাহত হয়ে পড়ল।

এই সময় সেই সানুভূতি ওই শহরে এসে হাজির হল। সে রাজপ্রাসাদে গেল এবং রাজার দ্বাররক্ষকদের জানাল যে রাজকন্যাকে সে-ই সারিয়ে তুলবে।



দ্বাররক্ষকেরা সানুভূতিকে রাজার কাছে নিয়ে গেল। কুৎসিত হাড়-জিরজিরে বামুনটাকে দেখে রাজার কিছুতেই বিশ্বাস হল না যে সে রাজকন্যাকে ভালো করে তুলতে পারবে। তবু রাজা তাকে বললেন ঃ বলি ঠাকুরমশাই, তুমি আমার মেয়েকে সারিয়ে তুলতে পারবে, নাকি অর্থের লোভে মিথ্যে কথা বলছ ?

সানুভূতি বলল ঃ আমি প্রতিজ্ঞা করছি রাজকন্যাকে সারিয়ে তুলব। তার আগে আপনি কথা দিন—আপনার মেয়েকে ভালো করতে পারলে আপনি আমাকে কী দেবেন ?

রাজা বললেন ঃ তুমি আমার মেয়েকে সুস্থ করে তুলতে পারলে আমি তোমাকে দশখানা গ্রাম এবং অনেক মণিমুক্তো দেব।

তখন সানুভূতি বলল ঃ মহারাজ, আপনার মেয়ে যেখানে আছে, আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন।

যে ঘরে রাজকন্যা বন্দিনী হয়ে ছিল, রাজা কয়েকজন পরিচারকের সঙ্গে সানুভূতিকে সেই ঘরের দরজার কাছে নিয়ে গেলেন। রাজা

সানুভূতিকে বললেন ঃ আগে মন্ত্রতন্ত্র পড়ে অপদেবতাকে শান্ত করে তবে ভেতরে ঢোকো,—নতুবা তোমার বিপদ হতে পারে।

সানুভূতি মনে মনে হেসে রাজাকে আশ্বস্ত করে —যে ঘরে রাজকন্যা ছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করল।

রাজকন্যা সানুভূতিকে দেখেই শনৈঃ শনৈঃ তার দিকে এগিয়ে এল, তারপর ভীষণ চিৎকার করতে লাগল। মনে হল ঃ এই বুঝি সে ব্রাহ্মণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—তাকে কামড়ে-খামচে একসা করে তুলবে।

তখন প্রচণ্ড উদ্বেগে ভয়ে ভয়ে হাত দুটো জোড় করে কাঁপা-কাঁপা গলায় সানুভূতি বলল ঃ প্রভু, আমি সেই ব্রাহ্মণ, যাকে তার স্ত্রী রোজ দড়ি দিয়ে পেটাত। আপনি আমাকে এখানে আসতে আদেশ করেছিলেন, তাই এসেছি। রাজা আমাকে দশখানা গ্রাম এবং অনেক মণিমুক্তো দিতে সম্মত হয়েছেন। এখন আপনি কৃপা করলে আমার দারিদ্র্য ঘুচে যায়, আমি নতুন করে বিয়ে করে সুখে ঘব সংসার করতে পারি।

সানুভূতির কথা শুনে ব্রহ্মরাক্ষস রাজকন্যাব কণ্ঠস্বরে বলল ঃ আমি এ-সমস্ত করেছি শুধু তোমার মুখ চেয়ে, তোমাকে ধনী করব বলে। আমি খুশি যে তুমি ধনী হতে চলেছ। এখন তুমি অন্য মেয়েকে বিয়ে করে সুখে জীবনযাপন করো। আমি এখনই রাজকন্যাকে ছেড়ে যাব। কিন্তু মন দিয়ে শোন। ব্রহ্মরাক্ষসেরা যুবতি রাজকন্যাদেব বেশি পছন্দ করে। আমি এখান থেকে গিয়ে আর একজন রাজকন্যাকে ধরব। যদি তাকে সাবানোর জন্যে তোমাকে ডাকে, তুমি কখনো তাতে রাজি হয়ো না। যদি আমার আদেশ লঙ্ঘন কবো, তাহলে আমি গলা টিপে তোমাকে হত্যা করব। কাজেই সাবধান। এরকম কাজ ভুলেও করো না।

এই বলে ব্রহ্মরাক্ষস রাজপ্রাসাদের ছাদটা উড়িয়ে নিয়ে রাজকন্যাকে ছেড়ে হঠাৎ অন্তর্ধান কবল।

ব্রহ্মরাক্ষস ছেড়ে যেতেই বাজকন্যা পালঙ্কের উপর নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে বইল। সানুভূতি দরজা খুলে হাসিমুখে বেরিয়ে এল।

রাজা বাইরে দরজার সামনে অপেক্ষা কবছিলেন। তিনি সানুভূতিকে জিজ্ঞাসা কবলেন—অপদেবতা রাজকুমারীকে ছেড়ে গেছে কিনা। সানুভূতি বাজাকে বলল, মহারাজ, আপনি ভেতরে গিয়ে নিজের চোখেই দেখে আসুন। রাজা এবং তাঁর অনুচরেরা ভেতবে ঢুকলেন। রাজকুমাবী ধীবে ধীরে চোখ মেলে চাইল এবং ক্ষীণস্বরে রাজাকে বলল, তাব খুব খিদে পেয়েছে, তাকে কিছু খেতে দেওয়া হোক।

রানি এলেন। তিনি রাজকন্যাকে খাইয়ে দিলেন। তারপর উত্তম সেবাযত্নে অল্পদিনের মধ্যেই রাজকন্যা সম্পূর্ণ সেরে উঠল।

রাজা, তাঁর আত্মীয়স্বজন ও সচিবেরা সানুভূতিকে দেবতা বলে মেনে নিলেন, তাকে প্রচুর উপহার ও উপঢৌকন দিলেন। অনেক ভূ-সম্পত্তি এবং একটি প্রাসাদও বানিয়ে দেওয়া হল। শেষে রাজা একটি সুন্দরী ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে সানুভূতির বিয়েও দিলেন। সানুভূতি পরমসুখে ঘর-সংসার করতে লাগল।

মাস ছয়েক পবে প্রতিবেশী রাজ্যের এক রাজা দুর্গাদত্তকে একটা চিঠি লিখে জানালেন, তাঁর মেয়েকে অপদেবতা 'ভর' করেছে, অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেও, গুনিন-ওঝা দেখিয়েও তাকে সারিয়ে তোলা যাচ্ছে না। মেয়েটা ক্রমশই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। তিনি দুর্গাদত্তকে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন সানুভূতিকে একবার পাঠিয়ে দেন—সানুভূতি যা চাইবে, তাকে তিনি তা-ই দেবেন। সানুভূতিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তিনি একটা পালকিও পাঠিয়ে দিয়েছেন।

দুর্গাদত্ত সানুভূতিকে ডাকিয়ে আনলেন, এবং প্রতিবেশী রাজ্যের রাজার চিঠিটা আগাগোড়া পড়ে শোনালেন। সানুভূতিকে বললেন, সে যদি আরো একজন রাজকন্যাকে সারিয়ে তুলতে পারে, তাহলে দুনিয়া তার খুব নামডাক হবে।

ব্রহ্মরাক্ষসের হুঁশিয়ারি স্মরণ হওয়া মাত্র সানুভূতি ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে কাতর কণ্ঠে বলল : মহারাজ, ভূত-তাড়ানো খুব সহজ কাজ নয়। আপনার মেয়েকে ভালো করে তুলতে গিয়ে আমাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে, আমার সমস্ত বিদ্যেবুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয়েছে। আর আমি আপনার আদেশ পালন করতে পারছি না বলে দয়া করে আমাকে মাপ করুন।

কিন্তু দুর্গাদত্ত কিছুতেই ছাড়বেন না, প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা তাঁর নিকট-আত্মীয়। কাজেই মাত্র আর একবারের জন্য তাকে দায়িত্ব নিতেই হবে। তবে ভবিষ্যতে তিনি আর কখনো এরকম অনুরোধ তাকে করবেন না।

সানুভূতিকে রাজি হতেই হল। শুভদিন দেখে সে রাজার পাঠানো পালকি চড়ে রত্নপুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। যাত্রাকালে সে মনে মনে ভাবতে লাগল : হায়, আমার কী সাধ্যি যে আমি ব্রহ্মরাক্ষসকে তাড়াব! সে আগেই আমাকে সাবধান করে দিয়েছে এরকম চেষ্টা আমি যেন আর দ্বিতীয়বার না করি। কপালে যে কী দুর্ভোগ আছে, ঈশ্বরই জানেন। হয়তো ব্রহ্মরাক্ষসের হাতেই আমার মরণ লেখা আছে! অষ্টাক্ষরী মন্ত্র ছাড়া আমি কিছুই জানি না। কাজেই বাঁচালে ঈশ্বরই বাঁচাবেন, মারলে তিনিই মারবেন।



সানুভূতি রাজপুরী গিয়ে পৌঁছতেই খুব সাড়ম্বরে এবং জাঁকজমক সহকারে তাকে অভ্যর্থনা করা হল, অতিশয় সম্মানিত অতিথির মর্যাদায় রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হল।

রাজা স্বয়ং এসে সানুভূতিকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। সানুভূতি মনে মনে বলল : কপালে যা আছে তা হবে। এখন কিছুতেই ঘাবড়ে গেলে চলবে না! বিপদের সময় ধৈর্য ধরতে হয়।

সানুভূতিকে নিয়ে রাজা রাজকন্যার ঘরে ঢুকতেই রাজকন্যা ভয়ানক চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিল, লাফ দিয়ে সানুভূতিকে ধরতে এগিয়ে এল—যেন বাগে পেলে এখনই তার ঘাড়টা মটকে দেবে!

সানুভূতি করজোড়ে বলল : প্রভু আমি সেই ব্রাহ্মণ যার বউ তাকে রোজ দড়ি দিয়ে পেটাত। আমি যথাবিধি আপনাকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছি।

তখন ব্রহ্মরাক্ষস রাজকন্যার কণ্ঠে বলল ঃ বিটকেল বামুন। তুই আমার আদেশ একেবারে ভুলে বসে আছিস। তোকে এসব ব্যাপারে আর কখনো নাক গলাতে আমি বারণ করে এসেছিলাম না? লোভে লোভে তুই আবার এখানে এসেছিস? দাঁড়া, আজ তোর একদিন কী আমার একদিন!

সানুভূতি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল ঃ প্রভু, আপনার আদেশ অগ্রাহ্য করি আমার সাধ্যি কী? আমি নেহাত দায়ে পড়েই-না আপনার কাছে উপদেশ নিতে এসেছি। আপনার দয়ার কথা আমি জীবনে কখনো ভুলব না। এ-ছটা মাস আমি খুব সুখেই কাটিয়েছি। কিন্তু চিরদিন কারো কপালে সুখ সয় কি? কীভাবে আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী জানতে পেরে গেছে যে আপনার দয়াতে আর রাজা দুর্গাদত্তের সাহায্যে আমি ধনী হয়েছি, সুন্দরী তরুণী বউ পেয়েছি। সেই খবর পেয়ে সেই রণচণ্ডী মেয়েছেলেটা একশো আশি-গাছা দড়ি নিয়ে আমাকে আর আপনাকে আতিপাঁতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আপনি আমাকে তার হাত থেকে উদ্ধার করেছেন; তাই আমারও কর্তব্য তার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করা। সেইজন্যেই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আমি আপনার ভৃত্য। প্রভু, কৃপা করে এখন আমাকে রক্ষা করুন। আপনি নিজেও রক্ষা পান। এই বলে সানুভূতি ব্রহ্মরাক্ষসের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল।

সানুভূতির গল্প শুনে ব্রহ্মরাক্ষস ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারপর সে বলল ঃ সানুভূতি, তোমার খাণ্ডারনি বউয়ের সেই বেদম প্রহার আজও আমি ভুলতে পারিনি। তা আমি আর কী করব, বাছা? তোমার কপালে যা আছে তা খণ্ডাবে আর কে? তুমি তাকে বিয়ে করেছিলে, সুতরাং তোমাকে তো ভুগতেই হবে। কিন্তু আমাকে আগে নিজের পিঠটা বাঁচাতে হবে, তারপর অন্য কিছু। তুমি কীভাবে নিজেকে বাঁচাবে চিন্তা করো। আমি চললাম। এখান থেকে দূরে এমন একটা দ্বীপে আমি চলে যাব, যেখানে তোমার খাণ্ডারনি বউ কখনো যেতে পারবে না।

এই বলে ব্রহ্মরাক্ষসটা রাজকন্যাকে ছেড়ে রাজপ্রাসাদের ছাদটা উড়িয়ে নিয়ে নিঃশব্দে উড়ে পালিয়ে গেল।

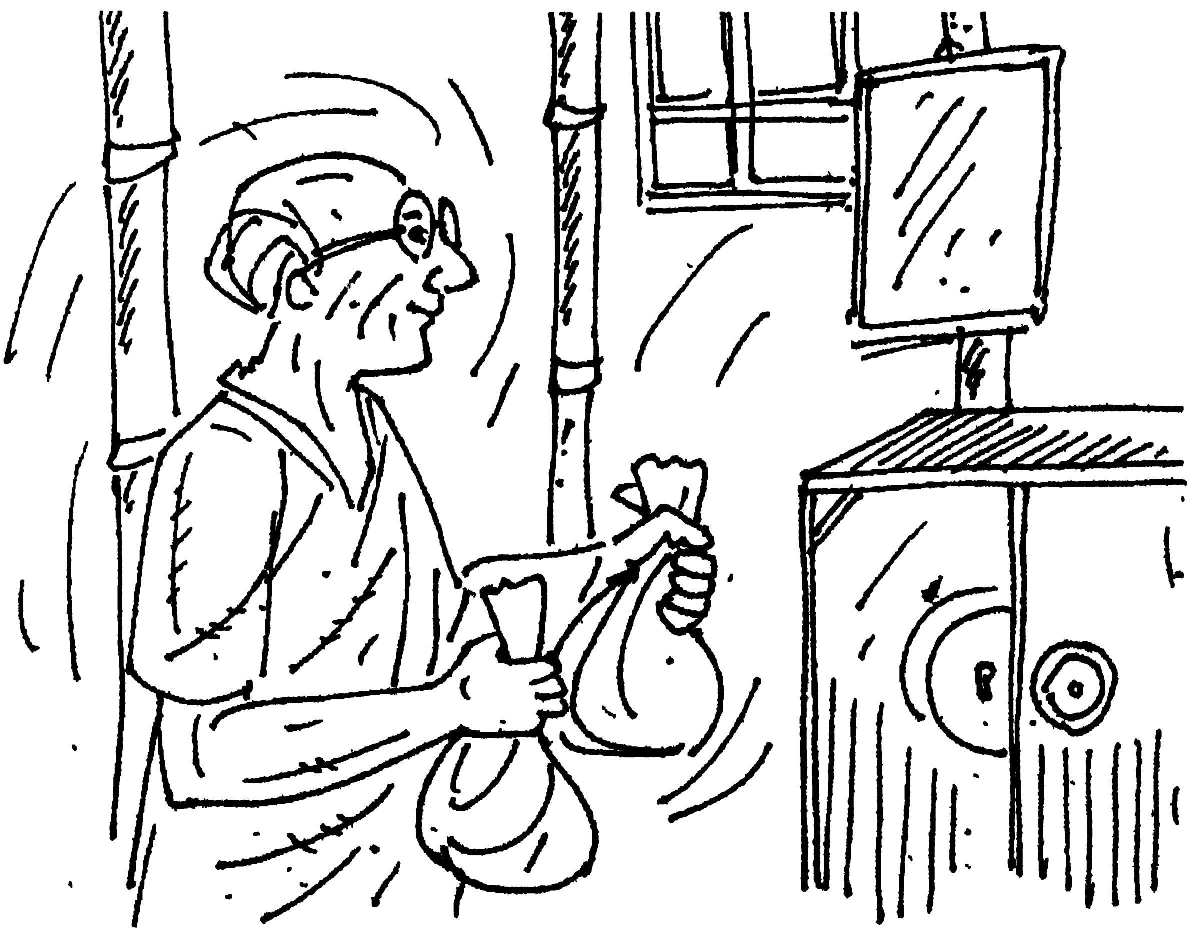


এক কৃপণ আর একটি ছুঁচ



এক হাড়-কেপ্পন লোক ছিল। তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল সঞ্চয়।

সে পয়সা খরচ করে তেল কিনে কখনো আলো জ্বালাত না। নিজের বাড়িতে দেয়ালে এমনভাবে একটা আয়না ফিট করে রেখেছিল যে, পাশের বাড়ির ল্যাম্পের আলো তার উপরে এসে যেন ঠিকরে পড়ে, সেই আলোয় তার ঘর আলোয় ভরে যায়। পয়সা খরচ করে তেল কিনে দেবে, ছেলেরা সেই তেল মেখে স্নান করবে, ওই কেপ্পন লোকটা একথা ভাবতেও পারত না। সে করত কী—স্নানের আগে বাড়ির ছেলেদের পাড়াব ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে পাঠিয়ে দিত। পাড়ার ছেলেরা তেল মেখে তেল-চুকচুক হয়ে তাদের সঙ্গে খেলা করত। খেলার সময়ে সেই তেলের কিছুটা তো তাদের গায়ে লাগত। তারা তাতেই খুশি। সুতবাং স্নান কবাব জন্য নতুন করে তাদের আর তেল মাখতে হত না।



কৃপণ লোকটা ছেলেদের নুন আর তেঁতুল কিনতে বাজারে পাঠাত। ছেলেরা সে-সব কিনে বাড়ি ফিরে এলে, সে আবার তাদের বাজারে পাঠাত, তাদের শিখিয়ে দিত — তারা গিয়ে দোকানদারকে যেন বলে ঃ জিনিসগুলোর দাম বড্ড চড়া, বা জিনিসগুলো খুবই খেলো। দোকানদার জিনিসগুলো ফেরত নিত। কিন্তু কিছুটা করে নুন বা তেঁতুল তো ঝুড়িতে লেগে থাকত — সেইটুকুই উপরি পাওনা। ছেলেরা তা-ই বাড়ি নিয়ে আসত। ওইসব টুকরো-টাকরা দিয়েই তাদের কাজ চলে যেত।



কৃপণের কৃপণতা ক্রমেই বেড়ে চলল। কৃপণ লোকটাও পাড়াপড়শির চক্ষুশূল হয়ে উঠল।

একদিন সে যখন পথ দিয়ে যাচ্ছিল, এক বৃদ্ধের সঙ্গে তার দেখা। বৃদ্ধ কৃপণকে বলল ঃ তোমার বাপ ঠাকুরদারা কাল রাতে স্বপ্নে আমাকে দেখা দিয়ে তোমাকে এই খবর দিতে বললেন যে, তাঁদের কাপড়-চোপড় সব ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেছে। তুমি যখন স্বর্গে যাবে, যেন তাঁদের জন্যে একটা ছুঁচ নিয়ে যেয়ো। এই বলে সেই বৃদ্ধ কৃপণের হাতে একটা ছুঁচ দিয়ে যে পথে এসেছিল— সেই পথে চলে গেল।

বাড়ি ফিরে কৃপণ লোকটা মনে মনে ভাবতে লাগল ঃ আমি যখন মারা যাব, কেউই আমার সঙ্গে যাবে না—তাহলে এই ছুঁচটাই বা আমি নিয়ে যাব কী করে? তাহলে, আমি কী জন্য সমস্ত কিছু সঞ্চয় করে মরছি? লাভ কী? আমি যখন মরব, কিছুই তো সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না।

শেষমেশ ছুঁচটাই ওই কৃপণ লোকটাকে একটা বড়ো শিক্ষা দিল। লোকটার কৃপণতাও দূর হল।

রাজযোটক



লোকটার এক পা খোঁড়া। তার সাধ হল : বিয়ে করবে। কিন্তু মেয়ে দেবে কে?

লোকটা এক ঘটককে পাকড়াল। তাকে লোভ দেখাল : সে যদি একটি সুপাত্রীর সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারে, তাহলে সে তাকে মোটা টাকা দেবে।

ঘটকের হাতে একটা কানি পাত্রী ছিল। সে সেই কানির বাবা-মাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। কানির বাপ-মাও মেয়ের জন্যে একটা ভালো পাত্রের খোঁজ করছিল।

ঘটক বলল : আমার হাতে একটা ভালো ছেলে আছে। পাত্রের সবই ভালো, তবে একটা পায়ে একটু খুঁত আছে। তা ব্যাটা ছেলে, সোনার ছেলে। যদি রাজি থাকো তো বলো, তোমার মেয়ের একটা সুরাহা করে দিই।

কানির বাপ মা যেন হাতে স্বর্গ পেল। ছেলে খোঁড়া? তাতে কী যায়-আসে? কানা ছেলের নামও তো পদ্মলোচন হয়? ছেলে—ছেলে, তার আবার ভালো-মন্দ কানা-খোঁড়া কী?



ঘটক খোঁড়া পাত্রের কাছে ফিরে এসে বলল : আমি তোমার জন্যে একটা ভালো পাত্রী ঠিক করেছি। খুবই সুন্দরী, গায়ের রঙ ফর্সা, টিকলো নাক, পটলচেরা চোখ—তবে একটা চোখ একটু ইয়ে—মানে দেখতে পায় না।

পাত্র রাজি হয়ে গেল।

ধুমধামের সঙ্গে বিয়েও হয়ে গেল।

বাসরঘরে বর কনের সঙ্গে কথা কয়ে বুঝতে পারল : কনে শুধু কানা নয়, বোবাও। কনে বরের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারল : বর শুধু খোঁড়া নয়, কালাও বটে। একেবারে রাজযোটক আর কী! কিন্তু বর কনেকে দুষতে পারে না, কনেও বরকে দুষতে পারে না।

কথায় বলে : বোবা-কালার শত্রু নেই।

অবিশ্যি কানা-খোঁড়া স্বামী-স্ত্রী দুজনে খুব সুখেই জীবন কাটাতে লাগল।

অকৃতজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ প্রাণী



একদিন রাজা মন্ত্রীকে ডেকে আদেশ দিয়ে বসলেন ঃ কাল সকালে আমার কাছে দুটি প্রাণী এনে হাজির করো—একজন অকৃতজ্ঞ, অন্যজন কৃতজ্ঞ।

মন্ত্রী চিন্তা করতে লাগল ঃ এমন প্রাণী কি আছে যা সম্পূর্ণ অকৃতজ্ঞ—আবার সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ? দুশ্চিন্তায় সে রাত্রে মন্ত্রীর ঘুম হল না।

মন্ত্রীর এক মেয়ে ছিল। সে বাবাকে দুশ্চিন্তিত দেখে জিজ্ঞেস করল ঃ বাবা, তোমার কী হয়েছে? এত দুর্ভাবনা করছ কেন?

মন্ত্রী মেয়েকে সব খুলে বললেন। আরো বললেন ঃ যদি কাল সকালের মধ্যে আমি রাজার আদেশ কার্যকর না করতে পারি, তাহলে নিশ্চয় আমার গর্দান যাবে।

মন্ত্রীকন্যা ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসল, বলল ঃ এর জন্যে ভাবনার কী আছে? আমি তোমার সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছি। তুমি কাল সকালে রাজসভায় তোমার জামাই (মন্ত্রীকন্যার বর) আর আমাদের পোষা কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো। তারপর কী করবে?—বলছি শোনো। বলে মন্ত্রীকন্যা বাবার মাথাটা মুখের কাছে টেনে এনে কানে কানে বিড়বিড় করে কী সব যেন বলল।



পরদিন রাজা মন্ত্রীকে তার জামাইকে আর একটা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে রাজসভায় হাজির হতে দেখে রেগেমেগে টং। খনখনে গলায় রাগে কাঁপতে কাঁপতে রাজা বললেন ঃ মন্ত্রী, মশকরা করতে এসেছ, না? তোমায় আমি বলেছিলাম—

মন্ত্রী রাজাকে কথা শেষ না করতে দিয়ে তাঁর কথার মাঝখানে করজোড়ে বলে উঠল ঃ মহারাজ, আমি আপনার আদেশই পালন করেছি। আপনি ধৈর্য ধরুন, বুঝিয়ে বলছি। প্রভু, এই জামাই-জাতটা এমনই এক অদ্ভুত জীব যে তাদের ভালোমন্দ যতই উপহার-সামগ্রীই দিন না কেন, কিছুতেই তাদের তুষ্ট করা যায় না। আমি তো এদের মতো অকৃতজ্ঞ প্রাণী আর দ্বিতীয় দেখি না। প্রভু, আপনি একজন জামাই, আমিও একজন জামাই। কিন্তু ভেবে দেখুন, আমরা শ্বশুরবাড়ি থেকে



যত উপহার—-ধনরত্ন মণিমুক্তাদিই পেয়ে থাকি না কেন, তাতে আমরা কি কখনো সন্তুষ্ট হয়েছি? তাই বলছিলাম জামাইদের মতো অকৃতজ্ঞ প্রাণী—। অথচ এই কুকুরটা কত অল্পেই না তুষ্ট, প্রভুভক্ত!— যা পায়, তাতেই খুশি—

রাজা মন্ত্রীর কথা শুনে খুব সন্তুষ্ট হলেন, বললেন ঃ মন্ত্রী, তুমি ঠিকই বলেছ। আমার জামাইকেও আমি বহু ধনরত্ন মণিমুক্তা দিয়েছি, কিন্তু তবু তার মন পেলাম না। ব্যাটা ভারি অকৃতজ্ঞ; অথচ আমার পোষা কুকুরগুলো কীরকম বাধ্য আর প্রভুভক্ত!

এরপর রাজা কোষাধ্যক্ষকে আদেশ দিলেন ঃ মন্ত্রীকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দাও।

ঘোড়ার ডিম



একদিন গুরু পরমানন্দের শিষ্যেরা প্রভুর জন্যে একটা ঘোড়া কিনবে বলে ঠিক করল। তাদের মধ্যে চারজন শিষ্য ঘোড়ার অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ল চারদিকে। কিন্তু তারা অল্প দামে কোথাও একটা ঘোড়া পেল না।

এরপর পাঁচ-নম্বর শিষ্য বেরিয়ে পড়ল ওই একই উদ্দেশ্যে। কিছুদূর গিয়ে সে একপাল ঘোড়া আর তাদের বাচ্চাদের চরতে দেখতে পেল। কাছেই মাঠে অনেকগুলো চালকুমড়ো ফলেছিল। চালকুমড়োগুলো পেকে সাদা হয়ে এসেছে। শিষ্য ভাবল— ওগুলো নিশ্চয়ই ঘোড়ার ডিম। ডিমগুলো বেশ সস্তায় পাওয়া যাবে ভেবে শিষ্য খুব খুশি! সে ওই জমির মালিকের কাছে গিয়ে বলল ঃ আমি একটা ঘোড়ার ডিম কিনতে চাই। তোমাব তো অনেক আছে! তা, একটা আমাকে বিক্রি করো না।





জমির মালিক বলল, বেশ, তুমি একটা বেছে নাও, কিন্তু চার রৌপ্যমুদ্রা দাম পড়বে।

শিষ্য গুরুর কাছে ছুটে গেল এবং তাঁকে তার আবিষ্কারের কথা জানাল। গুরু তাকে চারটি রৌপ্যমুদ্রা দিলেন এবং তার সঙ্গে আর একজন শিষ্যকেও পাঠিয়ে দিলেন।

তারা জমির মালিকের কাছে গেল এবং চারটি রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে বেশ ভারি আর বড়ো-সড়ো দেখে একটা চালকুমড়ো কিনে নিয়ে ফিরে আসতে লাগল।

দুজনের একজন চালকুমড়োটা মাথায় নিয়ে অন্যজনের পেছন পেছন হাঁটছিল। কুমড়োটা বেশ ভারি। হঠাৎ একটা গাছের ডালে লেগে গিয়ে লোকটার মাথা থেকে চালকুমড়োটা মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল। চালকুমড়ো-পতনের শব্দে একটা খরগোশ ভয় পেয়ে ছুটে লাফিয়ে পাশে একটা ঝোপের মধ্যে পালিয়ে গেল। দুই চেলাই ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করল। ভাঙা চালকুমড়োটা থেকে বেরিয়ে একটা অশ্ব-শাবকই বুঝি পালিয়ে যাচ্ছে ভেবে তারা দুজনেই তার পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল, কিন্তু তাকে ধরতে পারল না। মুখ চুন করে গুরুর কাছে ফিরে এসে তারা বলল, প্রভু, ডিমটা ফেটে ঘোড়ার বাচ্চা বেরিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে ছুটে বনের মধ্যে পালিয়ে গেল, আমরা কিছুতেই তাকে ধরতে পারলাম না।

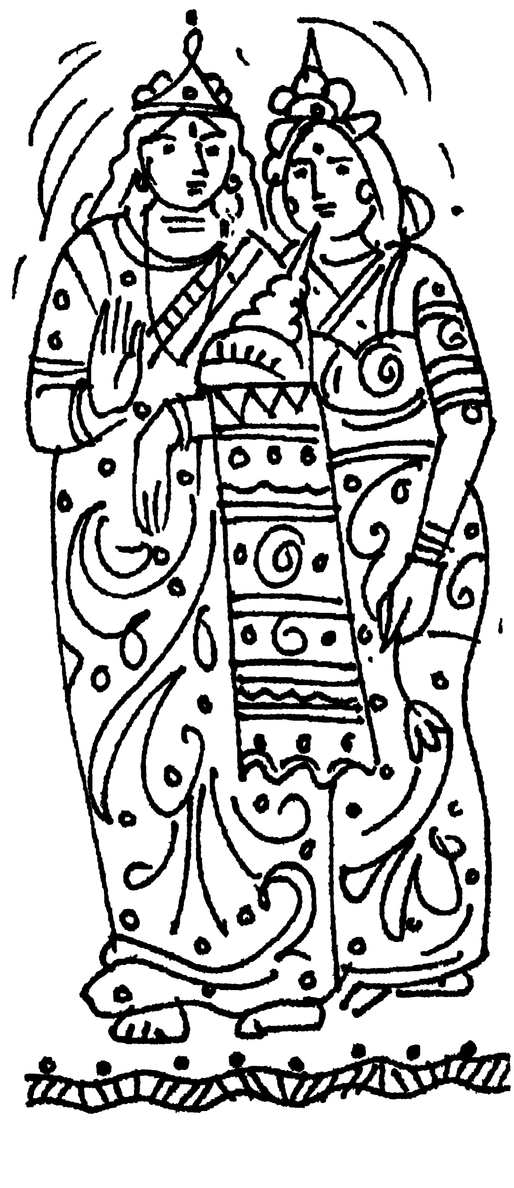
কোমাতির বুদ্ধি



একদা, 'কে বেশি সুন্দরী'— এই নিয়ে জ্যেষ্ঠাদেবী আর লক্ষ্মীদেবী দুই বোনের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া হল।

ঝগড়া আর কিছুতেই মেটে না। তখন দুজনে এক 'কোমাতি'র (ধনী ব্যবসায়ী) বাড়ি গিয়ে তাকে বলল ঃ আমাদের মধ্যে সুন্দরী কে? —তোমাকেই বিচার করে তা বলতে হবে।

কোমাতি দেখল ভারি বিড়ম্বনা! একে সুন্দরী বললে ও রেগে যাবে; ওকে সুন্দরী বললে এ রেগে যাবে। যা-ই হোক, তাতে ফ্যাসাদে পড়বে সে-ই।



বলতে কী, লক্ষ্মীই জ্যেষ্ঠার চেয়ে বেশি সুন্দরী। কিন্তু সে-কথা যদি সে বলে, তাহলে জ্যেষ্ঠা তাকে অভিশাপ দেবে। তার ফলে তাকে দারিদ্য বরণ করতে হবে। আবার জ্যেষ্ঠাকে খুশি করতে গিয়ে সে যদি বলে জ্যেষ্ঠাই বেশি সুন্দরী, তাহলে হয়তো লক্ষ্মীদেবী চটে যাবে এবং তার ঘর ছেড়েও চলে যাবে। তারও ফল—চরম দারিদ্র্য।

কাজে কাজেই সে স্থির করল, কাউকেই চটাবে না। এমন কথা বলবে যাতে দুজনেরই মন-রাখা যায়।

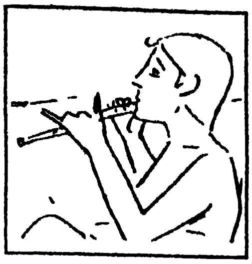
দুজনকেই খুব মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করার ভান করে কোমাতি একসময় বলল ঃ ও জ্যেষ্ঠাদেবী, সত্যি বলতে কী, আপনি যখন পেছন ফিরে থাকেন, তখন আপনাকেই বেশি সুন্দরী বলে মনে হয়। আর লক্ষ্মীদেবী, আপনি যখন সামনের দিকে মুখ করে থাকেন, তখন আপনাকেই বেশি সুন্দরী বলে মনে হয়। যদি আপনারা দুজনেই একটু হেঁটে বেড়ান, তাহলে— আমি কী বলতে চাই— সহজেই বুঝতে পারবেন।

কোমাতির কথা শুনে জ্যেষ্ঠা ও লক্ষ্মী দুজনেই খুবই সন্তুষ্ট হল। দুজনেই ভাবল, কোমাতি কেবল তার সৌন্দর্যেরই প্রশংসা করছে।

তারপর জ্যেষ্ঠা আর লক্ষ্মী দুজনেই কোমাতিকে আশীর্বাদ করল। ফলে কোমাতি আগের চেয়ে আরো ধনী হয়ে গেল।

কর্ণাটক

পুণ্যকোটির সত্যরক্ষা



সুন্দর মালনাদ গ্রামে কলিঙ্গ নামে একটি রাখাল ছেলে ছিল। একদিন সে একপাল গোরু-বাছুর সঙ্গে নিয়ে গ্রামের বাইরের এক মাঠে ঘাস খাওয়াতে গেল। গোরু-বাছুরগুলো যখন মাঠের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ঘাস খেতে ব্যস্ত, তখন সে একটা কাঁঠাল গাছের ছায়ায় বসে নিজের মনে বাঁশি বাজাতে লাগল।

মাঠের শেষ প্রান্ত থেকে এক বিরাট বনের শুরু। সেই বনে শুধু চন্দন আর সেগুনের গাছ। সকলের অলক্ষে পুণ্যকোটি নামের একটি গোরু সেই গভীর বনের মধ্যে ঢুকে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলল। আর কিছুতেই বেরুবার রাস্তা খুঁজে পায় না। ঘুরতে ঘুরতে গোরুটি যখন হয়রান হয়ে পড়েছে, তখন তার কানে এল বাঘের গর্জন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার সামনে এসে দাঁড়াল এক ভীষণদর্শন বাঘ। সেই বাঘকে দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগল পুণ্যকোটি। বাঘটা যখন পুণ্যকোটিকে ধরবার জন্য লাফ দিতে যাবে, তখন পুণ্যকোটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মিনতিমাখা স্বরে বাঘকে বলল---

---বাঘমশাই, দয়া করে আমাকে এখন মারবেন না। আমার ছোটো বাচ্চাটা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, তাকে খাইয়ে আমি আপনার কাছে ঠিক ফিরে আসব।



পুণ্যকোটির কথা শুনে সেই ভয়ঙ্কর বাঘটা হা-হা করে হেসে উঠল। তার সেই বিকট হাসি সারা বনে প্রতিধ্বনি তুলল। বাঘ বলল—আমাকে তুই বোকা পেয়েছিস? তুই তোর বাচ্চাকে খাইয়ে আবার এই বনে ফিরে আসবি—এই কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

বাঘের কথায় পুণ্যকোটি আহত হল। তবু সে দৃঢ় অথচ বিনীত স্বরে বলল,

—আমি কখনও মিথ্যা বলি না। আমার সন্তান খিদের জ্বালায় এখন নিশ্চয় খুব কষ্ট পাচ্ছে। আমি তাকে খাইয়েই আপনার কাছে ফিরে আসব—কথা দিচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি :



সত্য আমার পিতামাতা, সত্য ছাড়া আর কিছু না মানি,
সত্যচ্যুত যে হয় ঈশ্বর যে ছাড়েন তাকে জানি।

পুণ্যকোটির কথায় বাঘ বিশ্বাস করল। সে বলল, —ঠিক আছে, এখন তুই যা। বাচ্চাকে খাইয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি। সাবধান, যদি প্রতিজ্ঞা ভাঙিস, তাহলে আমি গ্রামে ঢুকে সব গোরুকে মেরে ফেলব।

পুণ্যকোটি ছুটতে ছুটতে গ্রামে ফিরল। রাখাল-ছেলে কলিঙ্গ ভেবেছিল পুণ্যকোটি বুঝি বনের মধ্যে হারিয়েই গেছে। এখন সে তাকে পেয়ে খুব খুশি হল। অন্যান্য গোরুগুলোও তাদের হারানো সাথীকে ফিরে পেয়ে মহা আনন্দে হাম্বা হাম্বা রব তুলল।

পুণ্যকোটি পরম স্নেহে তার বাচ্চাটাকে খাওয়াল। তার পরে অশ্রুসজল চোখে সে তাকে বলল,

—বাছা, বনের বাঘকে আমি কথা দিয়েছি। এখনই আমাকে বনে ফিরে যেতে হবে। আমার স্নেহ আর আদর রইল তোর জন্যে। ভালো হয়ে থাকিস। আমার যে-সব বোনেরা আছে তাদের তুই মায়ের মতো মনে করবি। তারা যা বলবে, লক্ষ্মী হয়ে তাদের সে-সব কথা শুনবি।

তারপর অন্যান্য গোরুদের সে বলল,

—মা-বোনেরা—আমি চললাম। আমার বাচ্চাটাকে দেখো—তোমাদের স্নেহ আর ভালোবাসা দিও ওকে।

অন্য গোরুরা পুণ্যকোটিকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করল। তারা বলল,

—কেন বোকামি করছ? তুমি তো এখন গ্রামের মধ্যে ফিরে এসেছ। বাঘ আর তোমার কি ক্ষতি করতে পারবে? এখন বরং চুপচাপ গ্রামের মধ্যেই থাক। বাঘের কাছে যেতে হবে না।

তাদের এই সব কথা শুনে পুণ্যকোটি মৃদু হেসে বলল,

—মা-বোনেরা—আমি জীবনে মিথ্যা বলিনি। আমি যদি সত্যভঙ্গ করি, তাহলে ঈশ্বর আমায় কখনও ক্ষমা করবেন না।

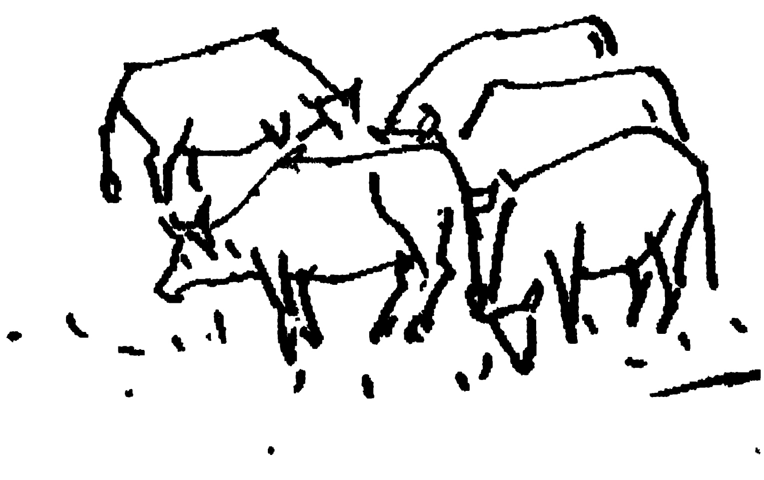
এরপর তার সন্তানকে আদর করে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বনের মধ্যে ফিরে গেল পুণ্যকোটি। যেখানে সেই বাঘের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেখানে গিয়ে সে বাঘের মুখোমুখি দাঁড়াল। অবিচলিত স্বরে বাঘকে বলল,

—আমি কথা রেখেছি। এখন আমায় গ্রহণ করুন। আমাকে হত্যা করে আমার মাংস খেয়ে, আমার উষ্ণ রক্ত পান করে আপনি তৃপ্ত হন।

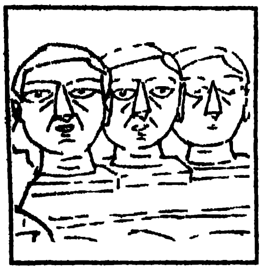
সত্যবাদিতার পুণ্যজ্যোতি যেন পুণ্যকোটির সারা অঙ্গ ঘিরে জ্বলজ্বল করছে। সত্যের সেই জ্যোতিতে ধাঁধিয়ে গেল বাঘের দৃষ্টি। দারুণ ক্ষোভে ও লজ্জায় তার মাথা নিচু হয়ে এল। তার শক্তির দর্প নিমেষেই যেন চূর্ণ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ভারি গলায় সে বলল,

—তুমি গ্রামে ফিরে যাও, পুণ্যকোটি। সেখানে তোমার সন্তানের কাছে তুমি এক স্নেহময়ী জননী হয়েই থাকো।

এই বলে সেই লজ্জিত এবং অনুতপ্ত বাঘ এক গভীর খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করল।



তিনমূর্তির রহস্য ও আপ্পাজি



চিঠিটা পড়েই হা হা করে হেসে উঠলেন বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়। রাজসভায় উপস্থিত সভাসদরা এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। কেউই কিছু বুঝতে পারছেন না। কিছুক্ষণ পরে রাজা প্রায় নিজের মনেই বলে উঠলেন,

'মূর্খ ছাড়া এমন কথা কেউ লিখতে পারে?'

চিঠিটা এসেছিল কলিঙ্গরাজের কাছ থেকে। সুরসিক এবং মহাপণ্ডিত ছিলেন কলিঙ্গরাজ। তাঁর সম্পর্কে এমন উক্তি শুনে সভাসদরা অবাক। তবু রাজা নিজে যতক্ষণ না বলছেন, ততক্ষণ কিছু বলা উচিত হবে না ভেবে সবাই চুপ করে রইলেন।

এই সময় সভায় প্রবেশ করলেন আপ্পাজি। আপ্পাজি প্রবীণ এবং বিচক্ষণ মন্ত্রী। তাঁর বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার উপর রাজারও অগাধ আস্থা। উপস্থিত-বুদ্ধি দিয়ে আপ্পাজি তাঁর বহু সমস্যার সমাধান করেছেন। আপ্পাজির এই উপস্থিত-বুদ্ধি ও চাতুর্যের খ্যাতি দাক্ষিণাত্য ছাড়িয়ে উত্তরাপথের রাজ্যগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ও আপ্পাজিকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁকে দেখেই রাজা বলে উঠলেন,

'এই যে আসুন, আপ্পাজি। দেখুন কলিঙ্গরাজের কী অদ্ভুত বায়না!'

মৃদু হেসে আপ্পাজি প্রশ্ন করলেন,

'বায়নাটা কী?'

'আরে একেবারে ছেলেমানুষি ব্যাপার। এই ছেলেমানুষি বুদ্ধি নিয়ে কী করে যে উনি রাজত্ব চালাচ্ছেন বুঝি না। ওনার শরীরটা নাকি খুবই খারাপ যাচ্ছে, তাই রাজবৈদ্য ব্যবস্থা দিয়েছেন টাটকা বাঁধাকপি আর মুলোর রস খেতে। আমাকে অনুরোধ করেছেন কিছু টাটকা বাঁধাকপি আর মুলো পাঠিয়ে দিতে। টাটকা না হলে চলবেই না। বুঝুন অবস্থা! এখান থেকে তিন মাসের পথ কলিঙ্গ। সেখানে যখন ওগুলো পৌঁছবে, তখন পচে যাবে না?'

রাজার কথা শুনে আপ্পাজি একটু হাসলেন। তারপর একটু চিন্তা করে বললেন,

'আসলে কলিঙ্গরাজ দেখতে চেয়েছেন আমরা টাটকা অবস্থায় বাঁধাকপি আর মুলোগুলো পাঠাতে পারি কিনা। আমাদের চেষ্টা করতে হবে উনি যেমনটি চেয়েছেন সেইভাবে পাঠাতে। এ আমাদের সম্মানের প্রশ্ন।'

অধীর হয়ে রাজা কৃষ্ণদেব রায় বলে উঠলেন,

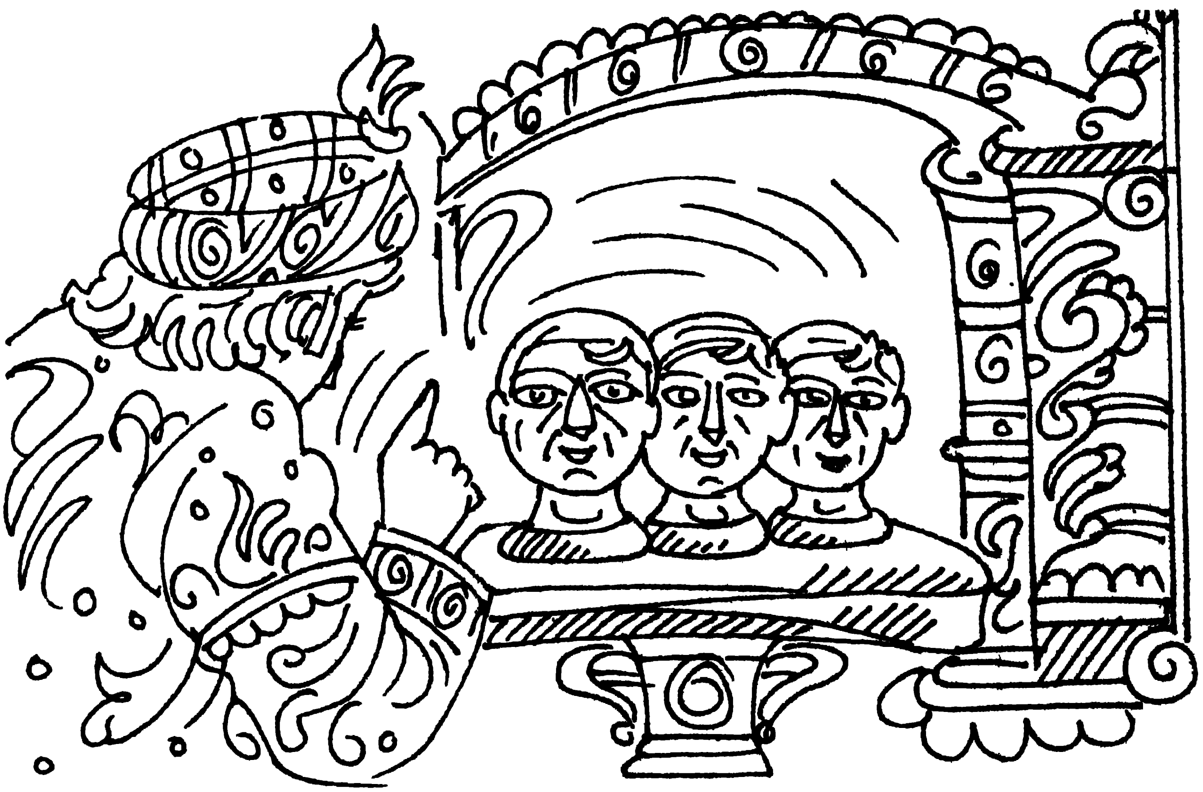
'কিন্তু তা কী করে সম্ভব?'

'বুদ্ধি থাকলে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়, মহারাজ। আপনি আমার উপর ভরসা রাখুন। আমি এমন ব্যবস্থা করব যাতে প্রত্যেকটি তরকারি কলিঙ্গরাজের কাছে সদ্য-ক্ষেত-থেকে-তোলা অবস্থায় পৌঁছে যাবে।'

প্রায় মাস তিনেক বাদে কলিঙ্গ-রাজপ্রাসাদের কাছে সুদূর দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর থেকে কয়েকটি গোরুর গাড়ি এসে পৌঁছাল। গোরুর গাড়ি তো নয়, যেন এক একটি চলমান বাঁধাকপি কিংবা মুলোর বাগান। আপ্পাজির

বুদ্ধিতে সেই গোরুর গাড়িগুলোর উপর কাঠের তক্তা বিছিয়ে এবং চারধার ঘিরে মাটি বোঝাই করা হয়েছিল। কলিঙ্গযাত্রার আগে তাতে বপন করা হয়েছিল বাঁধাকপি আর মুলোর ছোটো ছোটো চারা। সেই সব চারাগাছ যত্ন ও পরিচর্যার জন্য সঙ্গে ছিল অভিজ্ঞ লোক। কলিঙ্গ পৌছাতে পৌছাতে সেই সব চারাগাছ বড়ো হয়ে গেল এবং যথাসময়ে তাতে ফলও ধরল।

বলাই বাহুল্য, এই অভিনব চলমান বাগান স্বচক্ষে দেখে এবং আপ্পাজির উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে কলিঙ্গরাজ খুবই খুশি হয়েছিলেন। শুধু খুশিই নয়, এই কাজের স্বীকৃতি হিসাবে তিনি উপহার-স্বরূপ বিজয়নগরের রাজার কাছে তিনটি মূর্তি পাঠালেন। মূর্তিগুলি মানুষের এবং তিনটি মূর্তি হুবহু একই রকমের। আকারে, আয়তনে এবং ওজনে প্রত্যেকেই এক। একজনের সঙ্গে আর একজনের কোনো তফাত নেই। রসিক কলিঙ্গ রাজ এই মূর্তিগুলোর সঙ্গে একটি চিঠি লিখে জানালেন যে — এদের মধ্যে একজন সর্বোত্তম, দ্বিতীয়টি মধ্যম প্রকৃতির এবং তৃতীয়টি নিকৃষ্টতম।



মূর্তি তিনটিকে দেখে রাজা কৃষ্ণদেব রায় কোনো তফাতই বুঝতে পারেন না। সবই একই রকম। একই রঙ, একই উচ্চতা, একই ওজন এবং একই ভঙ্গি। কলিঙ্গরাজের পাঠানো এই ধাঁধার রহস্যভেদ করতে শেষ পর্যন্ত আপ্পাজির ডাক পড়ল।

আপ্পাজি এসে বহুক্ষণ ধরে মূর্তিগুলোকে গভীর এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলেন। ভালো করে দেখার পর তাঁর মুখে একটুকরো রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল। তিনি একটি সূক্ষ্ম লোহার তার জোগাড় করে এনে একটি মূর্তির কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। তারটি মাঝপথে গিয়ে বাধা পেতেই সেটা বার করে এনে অপর মূর্তির কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। এবারে তারটি এককানে ঢুকে অপর কানের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে এল।

আপ্পাজি হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে তারটি বের করে এনে শেষ মূর্তিটির কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। এবার অবাক কাণ্ড! তারটি কানের মধ্যে দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে এল মূর্তিটির মুখের মধ্যে দিয়ে। হো-হো করে হেসে উঠে আপ্পাজি বললেন,

'মূর্তিরহস্য এবারে বোঝা গেল।'

রাজা কৃষ্ণদেব রায় এবং অন্যান্য সভাসদরা এতক্ষণ ধরে আপ্পাজির কাণ্ড লক্ষ করছিলেন। রাজা বললেন,

'কিন্তু আপ্পাজি, আমাদের কাছে তো কিছুই পরিষ্কার হল না।'

আপ্পাজি প্রথম মূর্তিটাব দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন,

'দেখুন মহারাজ, এই মূর্তিটিই তিনটির মধ্যে উত্তম। এর কানের মধ্যে তারটি ঢোকে কিন্তু কোথাও দিয়ে আর বার হয় না। এর অর্থ— আমরা যদি কারও সম্পর্কে কোনো কুৎসা কিংবা গুজব শুনি, বিনা প্রমাণে তা অপর কাউকে একেবারেই বলা উচিত নয়।'

এইবার তিনি দ্বিতীয় মূর্তিটির দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললেন,

'এই মূর্তিটি হল মধ্য মানের। উৎকৃষ্টও নয়, আবার নিকৃষ্টও নয়। এর কানে তার ঢোকাতে সেটা অপর কান দিয়ে বেরিয়ে এল। এর অর্থ— গুজব এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দেওয়া উচিত এবং যে গুজব ছড়ায়, তাকে শ্রেষ্ঠ মানুষও বলা যায় না, আবার নিকৃষ্টও বলা যায় না।

সবশেষে আপ্পাজি তৃতীয় মূর্তিটির কাছে গিয়ে বললেন,

'এই যে মূর্তিটি, এটি একটি নিকৃষ্টতম মানুষের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আপনারা সকলেই দেখেছেন—আমি যখন এর কানে তার ঢুকিয়ে দিই, তখন তাবের অপর প্রান্তটি বেরিয়ে এসেছিল এর মুখ দিয়ে। এর অর্থ— যে সব মানুষ গুজব শুনে তা সঙ্গে সঙ্গে অপরেব কাছে বলে দেয়, তাদের আমরা 'গুজব রটনাকারী' বলি। এরা নিঃসন্দেহে মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট শ্রেণীব।'

আপ্পাজির সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিন মূর্তির বহস্য পরিষ্কার হল। সবাই তাঁকে ধন্য ধন্য কবতে লাগল। কলিঙ্গ-রাজকে পত্রোত্তরে বিজয়নগবরাজ আপ্পাজির সমাধানের কথা সবিস্তাবে জানালেন। আপ্পাজির সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও অসামান্য গুণের পরিচয় পেয়ে কলিঙ্গবাজও তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধের অন্যতম হয়ে উঠলেন।



রাজা যখন ভিক্ষা মাগে



অনেক অনেক দিন আগেকার কথা। কনকপুর রাজ্যে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল নরসীমা রাও। ধন-জন-ঐশ্বর্য কিছুর অভাব ছিল না রাজার। কনকপুরের রাজপ্রাসাদ ছিল যেমনই বিরাট, তেমনই জাঁকজমকে ভরা। রাজপ্রাসাদের মতো রাজার রাজ্যটিও ছিল বিরাট। আর সেই বিরাট রাজ্য দাপটের সঙ্গেই শাসন করতেন রাজা নরসীমা রাও।

সেকালের অনেক রাজার মতো রাজা নরসীমাও ভীষণ ভালোবাসতেন শিকার করতে। রাজ্যশাসনের ফাঁকে যখনই একটু অবসর মিলত, তখনই সঙ্গী সাথী নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বনে-জঙ্গলে পাড়ি জমাতেন মৃগয়ার জন্য।

এমনই একদিন রাজা নরসীমা রাও মৃগয়ার উদ্দেশ্যে অনেক সাথী নিয়ে কনককোটির জঙ্গলে যাত্রা করলেন। কনককোটির জঙ্গল রাজপ্রাসাদ থেকে বহু যোজন দূরে ছিল। সেই জঙ্গলের আয়তন ছিল যেমন বিরাট, তেমনই গভীর। শিকারের খোঁজে সারাদিন ধরে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় রাজা সেই গভীর জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেললেন। সঙ্গী সাথী আর চাকর-বাকরেরা কে যে কোথায় গেল বোঝাই গেল না। একা একা ঘুরতে ঘুরতে রাজা খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন। এমন সময় আকাশটাও ছেয়ে গেল দারুণ মেঘে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঝমঝমিয়ে নামল তুমুল বৃষ্টি। অনেক কষ্টে কোনোরকমে শেষ পর্যন্ত রাজা জঙ্গল থেকে বাইরে বেরুনোর একটা পথ খুঁজে পেলেন। ততক্ষণে পৃথিবীর বুকে রাত নেমে এসেছে। রাজা বুঝলেন এই দুর্যোগের রাতে রাজপ্রাসাদে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। বৃষ্টির জলে রাজার পোশাক একেবারে ভিজে জবজবে। খিদে-তেষ্টাতেও শরীর বেশ কাহিল। তবু রাজা তো! একটুও না ঘাবড়ে সেই অন্ধকার পথ ধরে একাকীই ঘোড়া চালিয়ে চলতে লাগলেন।

এইরকম অনেকক্ষণ চলার পর একটা আলোর ক্ষীণ রেখা দেখতে পাওয়া গেল অনেক দূরে। রাজা আলোর রেখা লক্ষ করে তাঁর ঘোড়াকে সেইদিকে ছুটিয়ে দিলেন। ক্রমে রাজা সেই আলোর কাছাকাছি পৌঁছে দেখলেন সেটা একটি গরিব কৃষকের কুটির। কুটিরের কাছে ঘোড়া থামিয়ে রাজা নামলেন। তারপর দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন— কে আছ? সেই কুটিরের মালিক কৃষক দরজা খুলে দিতেই রাজা নিজের পরিচয় গোপন করে বললেন,

'আমি পথিক। এই দুর্যোগে পথ হারিয়েছি। আজকের রাতটুকুর মতো আপনার কুটিরে আশ্রয় চাই।'

গরিব হলেও সেই কৃষক খুবই অতিথিপরায়ণ ছিল। কৃষক রাজার কথা শুনে সাগ্রহে বলল,

'আসুন। অতিথি নারায়ণ। হে আগন্তুক, আপনি আমার এ কুটির আপনার নিজের বলেই মনে করতে পারেন।'

সাদরে রাজাকে নিজের ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে কিছু শুকনো পোশাক এনে তাঁকে পরতে দিল কৃষক। বলল,

'পথশ্রমে আপনি বড়োই ক্লান্ত। এখন বিশ্রাম করুন। আমার স্ত্রী আপনার জন্য খাবার তৈরি করছে, ততক্ষণ আমি আপনার ঘোড়াটার থাকার আর খাবার ব্যবস্থা করে আসি।'

রাজা এই সামান্য কৃষকের আতিথেয়তায় আর মধুর ব্যবহারে ভীষণ মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

গরিব কৃষকের স্ত্রীর রান্না-করা খাদ্যের আয়োজন ছিল খুবই সাধারণ এবং সাদামাটা। রাজভোগ আর পোলাও-কালিয়ায় অভ্যস্ত রাজার কাছে সেই সামান্য খাদ্যই সেদিন যেন অমৃতের স্বাদ এনে দিল। ক্ষুধার্ত রাজা পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া শেষ করে কৃষকের ঘরের সামান্য শয্যায় শুয়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন।



সকাল বেলায় পাখিদের বিচিত্র কলকাকলিতে রাজার ঘুম ভাঙল। আগের দিনের সমস্ত ক্লান্তি শরীর থেকে উধাও। খুশি-খুশি মুখ নিয়ে রাজা শয্যা ছেড়ে উঠে বসতেই কৃষক আর তার স্ত্রী তাঁর জন্য একপাত্র দুধ আর কিছু ফলমূল নিয়ে এল।

রাজা অবাক হয়ে সেই কৃষক-দম্পতির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে ভাবলেন— এরা তাঁর পরিচয় জেনে ফেলেছে নাকি? তাই এত খাতির করছে? তথাপি তিনি নিজের পরিচয় গোপন রেখে বললেন,

'আমি একজন সামান্য মানুষ—। আমি কনকপুরের রাজার পত্রবাহক। আমার প্রতি তোমাদের এই সদাশয় ব্যবহারের কথা আমি রাজার কাছে জানাব। তিনি তোমাদের নিশ্চয় পুরস্কৃত করবেন।'

সেই গরিব কৃষক পরম নির্লিপ্ত স্বরে বলল,

'আপনি আমাদের অতিথি। শাস্ত্রেও বলে এবং আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি— অতিথি নারায়ণ। তাই আমরা অতিথি-নারায়ণের সেবা করে তৃপ্তি পেতে চেয়েছি। দয়া করে পুরস্কারের কথা বলে আমাদের লজ্জা দেবেন না। আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি মাত্র।'

রাজা কৃষকের এই নির্লোভ উক্তি শুনে সত্যিই মুগ্ধ হলেন। তিনি তাঁর পোশাকের মধ্য থেকে একটুকরো কাগজ বের করে তাতে কিছু লিখে সেই কৃষকের হাতে দিয়ে বললেন,

'বন্ধু, এই কাগজটি তোমরা রেখে দাও। যদি কোনো দিন তোমাদের কোনো বিপদ আসে, কিংবা কোনো কারণে কখনও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে কনকপুরের রাজপ্রাসাদের প্রহরীকে এই পত্রখানি অবশ্যই দেখিও, তখন প্রয়োজনীয় সবরকম সাহায্যই তোমরা পাবে— আমি এই কথা দিয়ে যাচ্ছি।'

এই কথা বলে রাজা সেই কৃষক-দম্পতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

কৃষক-দম্পতি তাদের অতিথির কথার মর্যাদা রাখতে সেই কাগজের চিরকুটখানা পরম যত্ন করে একটি তোরঙ্গের মধ্যে রেখে দিল।

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। সেবার ওই অঞ্চলে দারুণ খরায় ক্ষেতের ফসল সবই নষ্ট হয়ে গেল। এক ফোঁটা জলের জন্য চারিদিকে ভীষণ হাহাকার। গৃহপালিত পশুরা জলাভাবে এবং খাদ্যাভাবে মরতে লাগল। খরাপীড়িত দরিদ্র প্রতিবেশীদের জন্য সেই কৃষকের মনটা দুঃখে ভরে গেল। নিজেও সে ভীষণ দরিদ্র, তবুও প্রতিবেশীদের দুরবস্থা দূর করবার জন্য সে সব সময় চিন্তা করতে লাগল। তার স্ত্রী একদিন তাকে সেই অতিথির দেওয়া চিরকুটটির কথা মনে করিয়ে দিল। কৃষক তখন ভাবল— দেখাই যাক না কী হয়। এই ভেবে সেই চিরকুটটি সঙ্গে নিয়ে সে কনকপুরের রাজবাড়ির দিকে রওনা হল।



রাজপ্রাসাদের প্রহরীর কাছে চিরকুটটি মেলে ধরতেই প্রহরী সেই কৃষককে প্রচুর সম্মান দেখাল। প্রহরী বলল,

'হে মহামান্য রাজার অতিথি, রাজার নিজের হাতে-লেখা এই চিরকুটে আদেশ দেওয়া আছে আপনাকে সসম্মানে রাজার কাছে নিয়ে যেতে। আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন।'

কৃষক তার অতিথির প্রকৃত পরিচয় বুঝতে পেরে পরম পুলকিত অন্তরে প্রহরীর সঙ্গে রাজপ্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করল। প্রহরী তাকে রাজপ্রাসাদের মধ্যেই একটি সুন্দর দেবমন্দিরের একেবারে ভিতরে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। সেই মন্দিরের মধ্যে দেবমূর্তির পদতলে বসে রাজা নরসীমা রাও তখন দেবতার উদ্দেশে হাতজোড় করে প্রার্থনা করছিলেন। কৃষক একান্তে দাঁড়িয়ে রাজার সেই প্রার্থনা শুনতে লাগল।

রাজা তখন দেবতার উদ্দেশে বলছেন,

'ভগবান, আমার যা-কিছু ক্ষমতা, যত কিছু ঐশ্বর্য সবই তোমার দয়ায় পেয়েছি, প্রভু। তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। প্রভু, তুমি আমাকে আরও—আরও দান কর। এই পৃথিবীর যেখানে যত ঐশ্বর্য আছে তুমি আমাকে দান করে ধন্য কর। আমাকে—আমার বংশধরদের তুমি আরও আরও সম্পদশালী কর।'

[illegible] শুনতে কৃষকের মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হল। সেখানে অপেক্ষা করবার কোনো প্রবৃত্তিই তার হল না। সে দ্রুত পায়ে সেই স্থান ছেড়ে চলে গেল। যাবার সময় পরম অবহেলাভরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল রাজার দেওয়া সেই চিরকুটখানি।

রাজার প্রাসাদের প্রহরী সেই চিরকুটখানি কুড়িয়ে নিয়ে রাজার কাছে দিতেই ব্যস্ত হয়ে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন,

'কই, কোথায় সে?'

কিন্তু সেই কৃষক তখন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলেছে অনেক দূরেব পথে।



কোনো রকমেই যখন আর সেই কৃষকের সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন রাজা ঠিক করলেন— তিনি নিজেই যাবেন সেই কৃষকের কুটিবে। জানতে চাইবেন কেনইবা সে এসেছিল, আবাব কিছু না বলে ফিরে চলে গেলই বা কেন?

অবশেষে একদিন ঘোড়ায় চেপে রাজা সেই কৃষকের কুটিরে হাজির হলেন। কৃষক রাজাকে দেখে দু-হাত জোড় করে অভ্যর্থনা জানাল। বাজা তাকে প্রশ্ন করলেন,

'বন্ধু, তুমি আমার প্রাসাদে গিয়েছিলে। কিন্তু কিছু না বলেই ফিরে এলে কেন?'

কৃষক রাজার প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল,

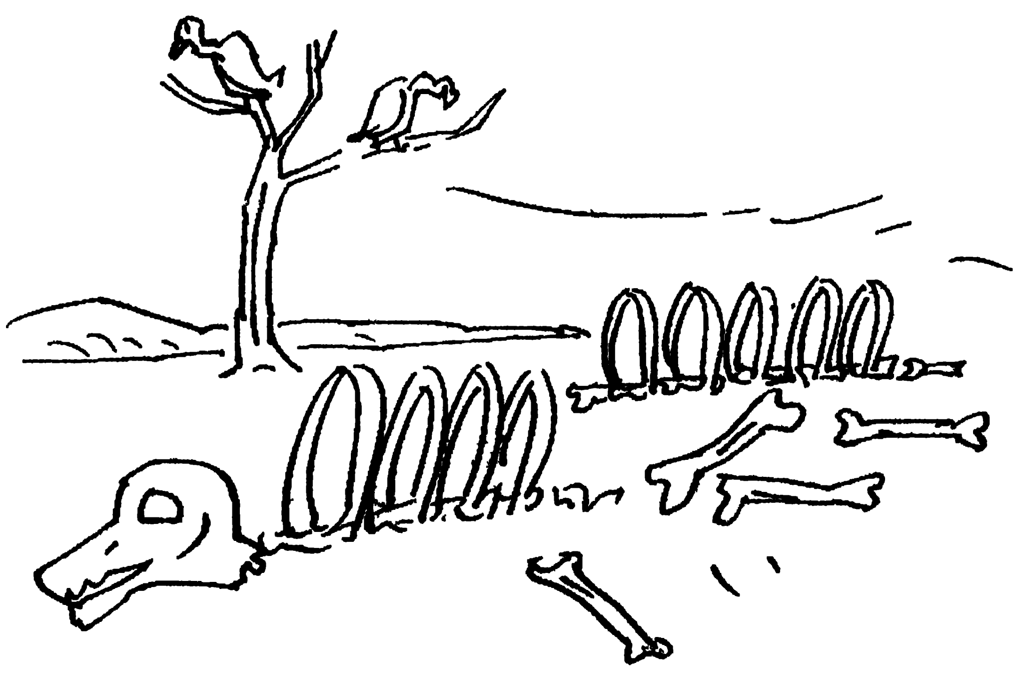
'মহারাজ, মন্দিরের দেবতার কাছে আপনার আকুল প্রার্থনা আমিও শুনেছি। আপনি রাজা। ভগবানের আশীর্বাদে পৃথিবীর অনেক ঐশ্বর্য আব অমূল্য সম্পদের অধিকারী আপনি। তবুও আপনি আরও আরও সম্পদের জন্য দেবতার কাছে জোড়হাতে ভিক্ষা মাগছেন। আমিও আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতেই গিয়েছিলাম। খরাপীড়িত

প্রতিবেশীদের জন্য চাইতে গিয়েছিলাম সাহায্য। কিন্তু আমি দেখলাম আপনিও এক ভিখারি। আমি সামান্য ভিখারি, আর আপনি মহামান্য ভিখারি। তবুও তো ভিখারি! তাই ভাবলাম ভিখারির কাছে ভিক্ষা জানিয়ে কী লাভ? তাই আমি ফিরে এসেছিলাম।'

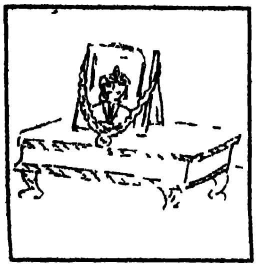
রাজা ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কৃষকের কথা শুনে। তারপর দারুণ লজ্জায় তাঁর উঁচু মাথাটা হেঁট হয়ে গেল সেই কৃষকের সামনে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে প্রচণ্ড অনুশোচনায় তার হৃদয় দগ্ধ হয়ে যেতে লাগল। কম্পিতকণ্ঠে তিন বললেন সেই কৃষককে,

'হে বন্ধু, তুমি আজ আমায় প্রকৃত শিক্ষা দিয়েছ। আমাব এই সর্বগ্রাসী লোভেব জন্য আমি লজ্জিত—ক্ষমাপ্রার্থী।'

বাজাব সঙ্গে তাঁব পারিষদেরাও এসেছিলেন। তিনি তাঁদের আদেশ দিলেন—খবা-পীড়িত গ্রামবাসীদেব জন্য প্রয়োজনীয সবরকম সাহায্য করতে। তাবপর বাজ্যেব প্রজাদের মঙ্গলেব জন্য তাঁব অর্জিত সম্পদের সদ্ব্যয় কবাব সংকল্প নিযে বাজা নরসীমা বাও বাজধানীতে ফিবে গেলেন।



ঈশ্বরের কৃপা



সে অনেক দিন আগের কথা। কনকপুর নামে একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল সে সময়। কনকপুরের রাজার সুশাসক হিসাবে খুব নাম ছিল। তিনি সব সময় কীসে তাঁর প্রজাদের মঙ্গল হবে সেই চিন্তাই করতেন। তাঁব রাজত্বে প্রজারা বেশ সুখেই বাস করত। মাঝে মাঝে রাজা নিজের পরিচয় গোপন করে ছদ্মবেশে রাজ্যের নানা দিকে ঘুরে বেড়াতেন। এইভাবে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ানোর একটাই উদ্দেশ্য ছিল— প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখা।

এইরকম একদিন রাজা এক বিদেশি বণিকের ছদ্মবেশে নগরীর পথে ঘুরতে ঘুরতে একটি কুটিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। পথে ঘুরতে ঘুরতে রাজার খুব জলতেষ্টা পেয়েছিল। তিনি ভাবলেন— কুটিরের মালিককে ডেকে একটু জল চাইবেন। কুটিরটি ছিল শ্রীনিবাস নামে তাঁরই রাজ্যের এক দরিদ্র প্রজার। শ্রীনিবাস তৃষ্ণার্ত রাজাকে পরম সমাদরে তার কুটিরের মধ্যে নিয়ে গেল। রাজাকে বসবার আসন দিয়ে সে ভেতরে গেল জল আনতে। রাজা দেখলেন সেই ঘরের মধ্যে তাঁরই একটি ছবি পরম যত্নে চৌকির উপর সাজিয়ে রাখা রয়েছে। যেমন করে ঠাকুর-দেবতার পট সাজিয়ে রাখা হয়, তেমনি ভাবে। এই দেখে রাজা বেশ কৌতূহলী হলেন। জল নিয়ে শ্রীনিবাস ফিরে আসতে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'এ ছবি কার?'

'এ ছবি আমাদের পরম দয়ালু সর্বশক্তিমান রাজার।' শ্রীনিবাসের কথায় শ্রদ্ধা ও ভক্তির ছোঁয়া লক্ষ করে রাজা তাকে রহস্য করে জিজ্ঞাসা করলেন,



'আরে ভাই, তোমাদের দেশে রাজাকে বুঝি ঠাকুরের মতো পুজো করতে হয়?'

'তাই করা কি উচিত নয়?' শ্রীনিবাস জোরের সঙ্গে কথাটা বলে দু-হাত তুলে রাজার সেই পটের প্রতি নমস্কার জানাল। তারপর ভক্তি-গদগদ স্বরে বলতে লাগল,

'দেখ ভাই, রাজাই হচ্ছেন আমাদের রক্ষক। তিনি সর্বদাই আমাদের ভালোমন্দ দেখছেন। তিনি যদি তা না করতেন, আমরা কি আর বাঁচতে পারতাম?'

অপরের মুখে নিজের প্রশংসা শুনলে কে না খুশি হয়? রাজাও এই কথা শুনে ভীষণ খুশি হয়ে উঠলেন মনে মনে। বাইরে বললেন,

'বাঃ, তোমার তো দেখছি রাজার প্রতি খুব শ্রদ্ধা! এ কথা জানতে পারলে রাজা নিশ্চয় তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।'

তার পর রাজা আরও কিছুক্ষণ শ্রীনিবাসের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করলেন। সেই আলাপের ফাঁকে রাজা জানতে পারলেন লোকটি ভীষণ গরিব। রাজা মনে মনে ঠিক করলেন, এই লোকটিকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য দিয়ে এর অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবেন।

শ্রীনিবাসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার নগরীর পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে অন্য এক জায়গায় একটি কুটিরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাজার কানে এল— কে যেন কাকে উদ্দেশ করে বলছে, 'হে প্রভু, তুমিই আমাদের রক্ষক। আমাদের ভালোমন্দ যা-কিছু সবই তোমার হাতে। তুমি যদি আমাদের না দেখতে, তা হলে আমাদের জীবনধারণ করাই অসাধ্য হত।'



এ কথা শুনে রাজার খুবই কৌতূহল হল। তিনি সেই কুটিরের খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি মেরে দেখলেন একটি ছোটো চৌকির উপর দেবতার পট সাজিয়ে তার সামনে জোড়হাতে বসে একজন ওই কথা বলছে।

কুটিরটি ছিল চিন্তামণি নামে এক প্রজার। চিন্তামণিও খুব গরিব। প্রায়দিনই তার সংসারে হাঁড়ি চড়ে না। কিন্তু এত অভাবের মধ্যেও ঈশ্বরের প্রতি তার অটুট বিশ্বাস। কনকপুরের রাজা সুশাসক তো ছিলেনই, আবার বেশ আমুদে এবং রহস্যপ্রিয়ও ছিলেন। তিনি চিন্তামণিকে ডাকলেন এবং ছদ্ম-পরিচয় দিয়ে বললেন,

'ভাই, আমি একজন বিদেশি বণিক। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলাম তুমি কার কাছে যেন প্রার্থনা জানাচ্ছ। আমার ভারি কৌতূহল হতে উঁকি দিয়ে দেখলাম —তুমি দেবতার পটের সামনে প্রার্থনা জানাচ্ছ। কেন ভাই, তোমাদের দেশে কি রাজা নেই? তিনি কি তোমাদের রক্ষা করেন না? তোমাদের ভালোমন্দ দেখেন না?'

চিন্তামণি ছদ্মবেশী রাজার কথা শুনে মৃদু হেসে বলল,

'যদি ঈশ্বর তাঁর সহায় না হন, তাহলে রাজার কি সাধ্য যে আমাদের রক্ষা করেন? ঈশ্বর হলেন রাজার রাজা। রাজার মধ্যে দিয়ে আসলে ঈশ্বরই আমাদের রক্ষা করেন, ভালোমন্দ দেখাশোনা করেন।'

রাজা চিন্তামণির কথা শুনে তাকে বললেন,

'তোমার কুটিরের জীর্ণ অবস্থা দেখে বুঝতে পারছি তুমি খুবই অভাবের মধ্যে রয়েছ। তা তুমি রাজার কাছে যাও না কেন?'

ছদ্মবেশী রাজার কথা শুনে চিন্তামণি দু'হাত জোড় করে বলল,

'সবই মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা হলে রাজাই আমাকে ডাকবেন।'

চিন্তামণির কথায় রাজা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও তার অবিচল ঈশ্বর-বিশ্বাস তাঁকে মুগ্ধ করল। তার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় রাজা মনে মনে ঠিক করলেন একেও সাহায্য করবেন। রাজপ্রাসাদে ফেরার পথে রাজার রহস্যপ্রিয় স্বভাব একটা মজাদার মতলব এঁটে ফেলল।

পরদিন সকালবেলাতেই শ্রীনিবাস আর চিন্তামণি দুজনকেই ডেকে পাঠালেন রাজা। শ্রীনিবাস ডাক পেয়েই ছুটতে ছুটতে এল, রাজার সামনে জোড়হাত করে দাঁড়াল। রাজা তাঁকে বললেন, 'দেখ শ্রীনিবাস, আমি খবর পেয়েছি তোমার খুবই অভাবে দিন কাটছে। আমার প্রজা আমার রাজত্বে বাস করে কষ্ট পাবে এ আমি চাই না।'



রাজার কথা শুনে শ্রীনিবাসের বুকটা আনন্দে ভরে উঠল। তাহলে তার এতদিনের রাজভক্তি বিফলে যায়নি! সে বলল,'মহারাজের জয় হোক। আমার মতো এক দীন-দরিদ্র প্রজার প্রতিও মহারাজের দৃষ্টি কত সজাগ!'

রাজা এইবার শ্রীনিবাসকে একটা বিরাট কুমড়ো দিলেন। কুমড়োটা তার হাতে দিয়ে বললেন,

'দেখ বাপু, ইদানিং আমারও সময়টা বিশেষ ভালো যাচ্ছে না। এই কুমড়োটা নিয়ে যাও। এতে তোমার কয়েকটা দিন মনে হয় ভালোভাবেই চলে যাবে।'

শ্রীনিবাস আর কী করে! রাজার দেওয়া সেই কুমড়োটা ঘাড়ে নিয়ে 'মহারাজের জয় হোক' বলে সে বিদায় নিল। যাবার সময় মুখটায় একটা হতাশার ছাপ ফুটে উঠেছিল। তাই লক্ষ করে রাজা অলক্ষ্যে মৃদু হাসলেন। আসলে রাজামশাই একটু চালাকি করেছিলেন। সেই কুমড়োর ভেতরটা ছিল ফাঁপা এবং ভেতরটা তিনি অনেক মোহর দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। অথচ বাইরে থেকে তা বোঝবার কোনো উপায়ই ছিল না।

এবার চিন্তামণি এসে হাজির হল রাজার কাছে। সে রাজাকে নমস্কার করে বলল,

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।'

রাজা চিন্তামণিকে বললেন, 'দ্যাখ চিন্তামণি, আমি খবর পেয়েছি, তুমি নাকি খুবই ঈশ্বরভক্ত মানুষ। তুমি এত ভক্ত, অথচ শুনি তোমার নাকি খুব অভাবেই দিন কাটে?'

চিন্তামণি রাজার কথায় মৃদু হেসে বলল,

'সবই ঈশ্বরের কৃপা।'

রাজা বললেন,

'এতো ভারি আশ্চর্য কথা! এত অভাব আর দারিদ্র্যের মধ্যেও তুমি ঈশ্বরের কৃপা দেখতে পাচ্ছ? আচ্ছা বলতো বাপু, আমি যদি তোমায় কিছু টাকাকড়ি দিয়ে তোমার অভাব ঘুচিয়ে দিই, তাহলে সেটা কার কৃপা হবে?'



'ঈশ্বরেরই কৃপা।' চিন্তামণি একটুও দ্বিধা না করেই কথাটা বলে ফেলল। রাজা তাঁর এই দরিদ্র প্রজাটির সবল ঈশ্বর-বিশ্বাস দেখে ভীষণ মুগ্ধ হলেন। তবু তিনি মনে মনে যে একটা মজাদার মতলব ভেঁজেছিলেন, সেই অনুযায়ী চিন্তামণিকে বললেন,

'দ্যাখ চিন্তামণি, আমি ভেবেছিলাম তোমায় আমি কিছু দান করব— যাতে অভাব আর দারিদ্র্যের হাত থেকে তুমি চিরকালের জন্য রক্ষা পেতে পার। কিন্তু এখন দেখলাম, দাতা হিসাবে আমাকে তুমি স্বীকারই করবে না। তাই সে ইচ্ছা আমি ত্যাগ করেছি। তবে আমার কাছে এসেছ, তোমাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে আমার মন চাইছে না। এই নাও আট আনা পয়সা, এইটাই আমার দান হিসাবে গ্রহণ কর।'

চিন্তামণি খুশিমুখে হাত বাড়িয়ে রাজার কাছ থেকে আট আনা পয়সা নিয়ে বলল, 'মহারাজ, আপনার হাত দিয়ে ঈশ্বরই এই দান করলেন। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া এ জগতে কোনো কিছুই সম্ভব হয় না। আপনার ইচ্ছা থাকলেও আপনার কিছু করবার উপায় নেই— যতক্ষণ না দয়াময় ঈশ্বর তা ইচ্ছা করছেন।'

ঈশ্বরভক্ত চিন্তামণি খুশিমনে রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

গুনগুন করে নিজের মনে ভগবানের নামগান করতে করতে পথ চলেছে চিন্তামণি। এক জায়গায় পথের ধারে শ্রীনিবাস রাজার দেওয়া সেই বিরাট কুমড়োটা নিয়ে বসে আছে। কুমড়োটা যেমনই প্রকাণ্ড, তেমনই ভারি। শ্রীনিবাস কুমড়োটার ভারে পরিশ্রান্ত হয়ে পথের ধারে বসে পড়েছিল। চিন্তামণিকে পথ দিয়ে যেতে দেখে সে ডেকে বলল,



'ভাই, আমার এই কুমড়োটা কিনবে?'

চিন্তামণি বলল, 'আমার কাছে মাত্র আট আনা পয়সা আছে, তাতে যদি তোমার লোকসান না হয়, তাহলে আমায় দিতে পার।'

শ্রীনিবাস চিন্তামণির কাছে আট আনায় কুমড়োটা বেচে দিল। চিন্তামণি বাড়ি ফিরে কুমড়োটা কাটতে গিয়ে তার ভেতরে পেয়ে গেল রাশিরাশি মোহর। চিন্তামণি বুঝল—এসবই ঈশ্বরের কৃপা। মোহরগুলো পেয়ে তার অভাব একেবারে ঘুচে গেল

কয়েকদিন পর রাজা তাঁর কর্মচারিদের পাঠালেন শ্রীনিবাস আর চিন্তামণির খবর নিতে। তারা ফিরে এসে যা খবর দিল, তাতে রাজা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। চিন্তামণির সকল অভাব ঘুচে গেছে। সে এখন মহা আনন্দে ঈশ্বরের নামগান করে দিন কাটাচ্ছে। আর শ্রীনিবাসের অবস্থা যেমন ছিল তেমনই আছে।

রাজা আবার দুজনকেই ডেকে পাঠালেন।

রাজবাড়ির দিকে আসতে আসতে শ্রীনিবাসের সঙ্গে পথের মাঝখানে দেখা হয়ে গেল চিন্তামণির। সোৎসাহে শ্রীনিবাসকে জড়িয়ে ধরে সে বলল, 'আরে ভাই, তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম।'

শ্রীনিবাস চিন্তামণিকে চিনতে পারেনি। তাই সে অবাক হয়ে বলল,

'আমায় খুঁজছ? কিন্তু তোমাকে তো আমি চিনতে পারছি না।'

চিন্তামণি বলল, 'সে কি? আমায় সেদিন আট আনায় একটা কুমড়ো বেচেছিলে, মনে নেই?'

এইবার শ্রীনিবাসের মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার ভারি ভয় হল। সে ভাবল— কে জানে লোকটা তাকে কেন খুঁজছে? তবে কি কুমড়োটা পচা ছিল? এই ভেবে সে আমতা আমতা করে বলল, 'কেন ভাই, কুমড়োটা কি খারাপ ছিল?'

'আরে না, না, খারাপ হতে যাবে কেন? আমি ভাবছি, এমন কুমড়ো যার গাছে ফলে, তার উপর ভগবানের অসীম দয়া।'

শ্রীনিবাস বেশ ধাঁধায় পড়ে গেল। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত চিন্তামণির কাছ থেকে সে সব কথাই জানতে পারল। চিন্তামণিও শ্রীনিবাসের কথা থেকে বুঝল আসল ঘটনাটা কী। সে তখন শ্রীনিবাসকে বলল, 'দেখ ভাই, ঈশ্বরের কৃপাতেই এমনটা ঘটেছে। আমাদের কোনো হাত নেই। আমার উচিত কুমড়োর ভেতরে পাওযা মোহরগুলো তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া। কিন্তু ভাই, কিছু মোহর যে খরচ হয়ে গেছে, সেগুলো ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা তো আমার নেই। তবে বাকিগুলো সবই তুমি নিয়ে নাও।'



একথা শুনে শ্রীনিবাস ভারি অবাক হয়ে গেল। চিন্তামণির সরল ও নির্লোভ মনের পরিচয় পেয়ে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। সে তখন দুহাত দিয়ে চিন্তামণিকে জড়িয়ে ধরে বলল,

'ভাই, তুমি আমার চোখ খুলে দিলে। তোমার কথা শুনে প্রথমে মনে হয়েছিল যে, রাজাই এসব ঘটিয়েছেন। এখন আমার ভুল ভেঙে গেছে। তোমার মতো এখন আমারও বিশ্বাস হল যে, ঈশ্বরই আমাদের প্রকৃত প্রভু। সব কিছুই ঘটে তাঁরই ইচ্ছায়।'

তারপর দুজনে মিলে তারা একসাথে রাজার কাছে হাজির হল। রাজা তাদের মুখে সব কিছুই জানতে পারলেন। তিনি চিন্তামণির উদার মনের পরিচয় পেয়ে ভীষণ খুশি হলেন। তাদের বললেন,

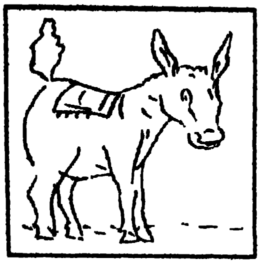
'তোমাদের কাহিনী শুনে আমার নিজেরও একটা ভুল ভেঙে গেল। আমার মনেও কোথাও একটা সূক্ষ্ম অহঙ্কার ছিল যে, আমিই বুঝি সবকিছু করছি। আজ চিন্তামণি আমাকে বুঝিয়ে দিল— রাজার ইচ্ছায় কিছু হয় না, যতক্ষণ না রাজার-রাজা সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ইচ্ছা করছেন।'

এই কথা বলার পর রাজা শ্রীনিবাসকেও প্রচুর অর্থ দান করলেন, বললেন,

'ঈশ্বরের কৃপা হলে এতেই তোমার অভাব ঘুচতে পারে।'

শ্রীনিবাস ও চিন্তামণি রাজাকে সাধুবাদ জানিয়ে একসঙ্গে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে করতে বাড়ি ফিরে গেল।

গাধা কি মানুষ হয়?



কুনিগালের সুব্বাশাস্ত্রীর পণ্ডিত হিসাবে খুবই নামডাক ছিল। নিজের বাড়িতেই তিনি একটি পাঠশালা চালাতেন। প্রচুর ছাত্র সেখানে পড়াশুনো করত। ছাত্রদের মধ্যে বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছাত্র যেমন ছিল, তেমনই কিছু বোকা বা নির্বোধ ছাত্রও ছিল। একদিন কয়েকটি স্থূলবুদ্ধি ছাত্রের মূর্খামির বহর দেখে সুব্বাশাস্ত্রী খুবই বিরক্ত হলেন। রাগের চোটে চিৎকার করে তিনি তাদের বললেন,

জানিস, তোদের মতো অনেক গাধাকে আমি মানুষ করেছি?

ঠিক সেই সময় মাদা নামে এক ধোপা শাস্ত্রীর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। শাস্ত্রী যখন মূর্খ ছাত্রদের ধমক দিচ্ছিলেন, তখন হঠাৎই মাদার নজর গিয়েছিল তাঁর পাঠশালার দিকে। শাস্ত্রীর গাধা পিটিয়ে মানুষ করার কথাটা তার কানে গেল।

মাদার ছেলেপুলে কিছুই ছিল না। তবে মাদা তো ধোপা, তাই তার অনেকগুলো গাধা ছিল। শাস্ত্রীর কথায় তার মাথায় গজাল একটা নতুন চিন্তা। আর তখনই সে একছুটে বাড়ি পৌঁছে তার স্ত্রীকে বলল,

জানো, সুব্বাশাস্ত্রী মশাই-এর অদ্ভুত ক্ষমতা! তিনি গাধাকে মানুষ বানিয়ে দিতে পারেন।

তার বউও ভীষণ অবাক হয়ে গেল এই কথা শুনে। স্বামীকে জিজ্ঞেস করল,

হ্যাঁ গো, সত্যি?

তাহলে আর বলছি কী? আমি যে নিজের কানে শুনে এলাম।

মাদার কথা শুনে তার স্ত্রী রঙ্গীরও বিশ্বাস হল। সে তখন মাদাকে বলল,

দ্যাখো, আমাদের তো ছেলেপুলে নেই। আমরা আমাদের সবচেয়ে ভালো গাধা মুথুকে শাস্ত্রী মশাই-এর কাছে নিয়ে যাব। উনি যদি দয়া করে মুথুকে মানুষ করে দেন, তাহলে আমাদের আর কোনো দুঃখ থাকে না।

স্ত্রীর এই পরামর্শ মাদারও খুব মনে ধরল।

পরদিন সাতসকালেই মাদা সুব্বাশাস্ত্রীর বাড়ি গিয়ে হাজির। পণ্ডিতকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মাদা বলল,

পণ্ডিতমশাই, আমার কোনো ছেলেপুলে নেই। তবে আমার অনেকগুলো গাধা আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো গাধাটাকে যদি দয়া করে আপনি মানুষ করে দেন, আমি আর আমার বউ আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।

মাদার এই কথা শুনে সুব্বাশাস্ত্রী তো একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি মাদাকে বললেন,

তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? কখনও কি শুনেছ যে গাধা মানুষ হয়?

মাদা একেবারে নাছোড়বান্দা। সে বলল,

আমি খুব ভালো ভাবেই জানি পণ্ডিতমশাই, আপনি গাধাকে মানুষ বানাতে পারেন। আমাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য আপনি এখন অন্য কথা বলছেন। দয়া করুন পণ্ডিতমশাই, তাহলে আমরা বড়ো উপকৃত হব।

সুব্বাশাস্ত্রী মাদাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু মাদা কিছুতেই বুঝতে রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত চালাক মানুষ সুব্বাশাস্ত্রী ভাবলেন— এই বোকা ধোপাটার বোকামিকেই কাজে লাগান যাক্। একটুক্ষণ ভেবে তিনি মাদাকে বললেন,

শোন বাপু, সাধারণত এ কাজ আমি করতে চাই না। তুমি যখন অনেক করে বলছ, তখন না-হয় এটুকু কষ্ট স্বীকারই করলাম। শুধু তোমার জন্যই এই কাজের ভার আমি নিচ্ছি। কথাটা পাঁচ-কান করবে না।

মাদা ভীষণ খুশি হয়ে পণ্ডিতের পা দুটো জড়িয়ে ধরল। তখন শাস্ত্রী বললেন,

দ্যাখ মাদা, এ কাজে অনেক খরচ। তুমি আমাকে এজন্য দুশো টাকা দাও। আমার ছ-মাস সময় লাগবে তোমার গাধা মুথুকে মানুষ করে তুলতে।



পরদিনই মাদা টাকা আর মুথুকে সঙ্গে নিয়ে শাস্ত্রীবাড়ি হাজির হল। শাস্ত্রী টাকাটা নিলেন। মাদাকে বললেন গাধাটাকে উঠোনের একধারে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখতে। গাধাটাকে বাঁধার পর তিনি মাদাকে বললেন,

তোমার গাধাটি বড়ো চমৎকার। আমার মনে হয় একে মানুষ করতে আমায় বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তোমার গাধা মুথু একদিন গণ্যমান্য মানুষ হয়ে যাবে— দেখে নিও। এখন তুমি যাও, ছ-মাস বাদে এসে ওর খবর নিয়ে যেও।

মাদা চলে যাওয়ার পর শাস্ত্রী তাঁর এক ছাত্রকে হুকুম দিলেন— মাদার গাধাটাকে কোনো এক গোপন জায়গায় বেঁধে রাখতে।

ক্রমে ক্রমে ছ-টা মাস পার হল। একদিন মাদা বনের মধ্যে অনেক আশা নিয়ে শাস্ত্রীবাড়ি এসে হাজির হল। শাস্ত্রী মাদাকে দেখেই বললেন,

আরে এসো এসো— কেমন আছ? ক-দিন ধরে তোমার কথাই ভাবছিলাম। তোমার মুথু— কী বলব, সে এখন একজন কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে উঠেছে হে।

শাস্ত্রীর কথা শুনে মাদার সে কী স্ফূর্তি! কই, কই— কোথায় আমার মুথু?

মুথুকে দেখবার জন্য মাদার যেন আর তর সইছে না।

মাদার অধীরতা দেখে চালাক শাস্ত্রীজি মুখ টিপে হাসলেন। বললেন,

আরে তাকে এখানে কোথায় পাবে? সে এখন কত বড়ো মানুষ! আমার মতো সামান্য পণ্ডিতের কাছে কি তাকে মানায়? সে এখন চিন্তামণি গাঁয়ের প্যাটেল হয়েছে। কত মানুষ তাকে মান্যিগণ্যি করছে। তুমি চিন্তামণি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা কর।

শাস্ত্রীর কথা শুনে মাদার খুব চিন্তা হল। তাই তো, মুথু তো এখন আর নিরীহ মোট-বওয়া গাধাটি নয়। সে এখন মস্ত বড়ো মানুষ। কত বড়ো বড়ো মানুষের সঙ্গে তার ওঠা-বসা। সে কি আর এখন তার পুরোনো মনিবকে পাত্তা দেবে? ভয়ে ভয়ে তাই সে শাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল,

আমি দেখা করলে সে কি আমায় চিনতে পারবে, পণ্ডিত মশাই?



আরে নিশ্চয় চিনবে। শাস্ত্রী মাদাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, তুমি এক কাজ কর। যে থলিতে করে মুথুকে ছোলা-ভুসি খাওয়াতে, আর যে লাঠিটা দিয়ে তাকে হরদম ঠ্যাঙাতে, সে দুটোও সঙ্গে নিয়ে যাও। যদি সে একান্তই তোমাকে না চিনতে পারে, ও-দুটো দেখলে নিশ্চয় চিনবে।

আনন্দে গদগদ হয়ে মাদা বাড়ি ফিরে তার বউকে সব কথা বলল। সব শুনে মাদার বউ-এরও খুব আনন্দ হল। ঠিক হল পরদিনই মাদা চিন্তামণি গাঁয়ে গিয়ে মুথুর সঙ্গে দেখা করবে।

পরদিন সকালেই মাদা চিন্তামণি গাঁয়ের পথে রওনা দিল। সঙ্গে নিল মুথুকে খাওয়ানোর সেই থলি আর লাঠিটা। চিন্তামণি গাঁয়ের প্যাটেল তখন একটা চত্বরে বসে গ্রামবাসীদের নানা অভিযোগ শুনছে এবং সে-সবের নিষ্পত্তি করছে। সব দেখে-শুনে গর্বে মাদার বুকটা দশহাত ফুলে উঠল। তার মুথু এখন একটা মানুষের মতো মানুষই হয়েছে বটে! মনে মনে ভাবল— সত্যিই সুব্বাশাস্ত্রী যথার্থই পণ্ডিত মানুষ। না হলে মুথুর মতো আস্ত গাধাকে কেউ এমন চমৎকার একটা মানুষ করে তুলতে পারে?

মুথুর চোখে পড়ার জন্য মাদা অনেক চেষ্টা করতে লাগল। চত্বরের এধার থেকে ওধার ঘুরে, হাত নেড়ে ইশারা করে নানাভাবে সে মুথুর নজরে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই আর প্যাটেলের নজর তার দিকে পড়ে না। শেষে শাস্ত্রীর কথা মনে পড়ল। সে তখন সেই থলি আর লাঠিটা নাড়াতে লাগল আর প্যাটেলের দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

অবশেষে প্যাটেলের দৃষ্টি পড়ল মাদার উপর। কৌতূহলী হয়ে সে মাদাকে ডেকে পাঠাল। মুথু যে তাকে শেষ পর্যন্ত চিনতে পেরেছে—এই ভেবে মাদা দারুণ খুশি হয়ে চিন্তামণি গাঁয়ের প্যাটেলের সামনে এসে দাঁড়াল।

কৌতূহলী প্যাটেল মাদাকে প্রশ্ন করল— সে কে এবং কোথা থেকে কী প্রয়োজনে এই গাঁয়ে এসেছে? প্যাটেলের প্রশ্ন শুনে ক্ষোভে আর রাগে মাদা একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। সে চিৎকার করে বলে উঠল,

ওরে ব্যাটা অকৃতজ্ঞ! আজ তুই তোর মনিবকেও ভুলে গেছিস? এই থলিতে করে তোকে কত ছোলা-ভুসি খাইয়েছি আমি আর আমার বউ—সব ভুলে গেলি? তুই তো আচ্ছা বেইমান! এই লাঠিটা কতবার তোর পিঠে পড়েছে—এটা দেখেও তোর কিছু মনে পড়ছে না? ওর ব্যাটা মুথু, আজ তুই মস্ত বড়ো লোক হয়েছিস বলে তোর অতীতকে একেবারেই ভুলে বসলি? না, তা কিছুতেই আমি হতে দেব না। আয়, চলে আয় আমার সঙ্গে কুনিগালে। ওখানে রঙ্গীও যে তোর জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে রে!

চিন্তামণির প্যাটেল তো মাদার কথা শুনে একেবারে থ। বুঝল, আচ্ছা এক ছিটগ্রস্ত মানুষের পাল্লায় পড়া গেছে। সে তাই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মাদাকে ঠাণ্ডা করতে গেল। কিন্তু মাদা তো ঠাণ্ডা হলই না, উলটে আরো রেগে গেল।

তখন প্যাটেল উপায়ান্তর না দেখে, তার লোকজন দিয়ে মাদাকে জোর করে চিন্তামণি গাঁয়ের বাইরে বার করে দিল। মাদা কি সহজে যায়! যাবার সময় সে চিৎকার করে বলতে বলতে গেল,

আমারই ভুল হয়েছিল, তোর মতো এক মহামূর্খ গাধাকে মানুষ করতে দিয়ে। তবে এর পরিণাম তোকে ভুগতে হবে— এই বলে গেলাম।

কুনিগালে ফিরেই মাদা সোজা সুব্বাশাস্ত্রীর বাড়ি গিয়ে হাজির হল। চিন্তামণি গাঁয়ে গিয়ে মুথুর কাছ থেকে কেমন ব্যবহার পেয়েছে, শাস্ত্রীজিকে তার আদ্যোপান্ত বিববণ দিল। শেষে সে শাস্ত্রীজিকে বলল,

আমি মুথুকে উচিত শিক্ষা দিতে চাই পণ্ডিতমশাই। যত টাকা লাগে আমি খরচ করতে রাজি। আপনি শুধু ও ব্যাটাকে আবার গাধাই বানিয়ে দিন।

সব শুনে শাস্ত্রী নিজের মনে হাসলেন। শেষে বললেন,

দ্যাখ বাপু, গাধা থেকে প্যাটেল বানানোর যা মেহনত, প্যাটেল থেকে গাধা বানানোর মেহনত তার চেয়ে অনেক বেশি। তবু তুমি যখন বলছ, তখন তাই না হয় করা যাবে। তবে আরও দুশো টাকা লাগবে। টাকা নিয়ে তুমি এক সপ্তাহ বাদে এস।

এক সপ্তাহ বাদে মাদা দুশো টাকা নিয়ে শাস্ত্রী-বাড়ি গেল। ইতিমধ্যে শাস্ত্রী মুথুকে সেই গোপন জায়গা থেকে নিয়ে এসে তাঁর উঠোনে বেঁধে রেখেছেন। মাদা তার সেই প্রিয় গাধাটিকে দেখামাত্রই চিনতে পারল। সে তখন মুথুকে বলল,

কীরে ব্যাটা, মানুষ হয়ে খুব যে লায়েক হয়েছিলি। এখন আমায় চিনতে পারছিস? আর নাইবা চিনতে পারলি, এবার তোকেই চিনিয়ে ছাড়ব।

এই বলে মাদা বেচারি মুথুর গলায় বাঁধা দড়িটা ধরে টানতে টানতে আর হাতের লাঠিটা দিয়ে সমানে পেটাতে পেটাতে তাকে বাড়ির দিকে নিয়ে চলল।

সিংহাসনের উত্তরাধিকারী



গঙ্গাবতীর রাজার যমজ দুই ছেলের একজনের নাম অজয়সীমা আর অপর জনের নাম বিজয়সীমা। এই দুই ছেলের জন্য রাজা তাঁর বুক-ভরা স্নেহ উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন। ছেলে দুটিও যেন হিরের দুটি সমান মাপের টুকরো। বিদ্যায় বুদ্ধিতে দুজনেই সমান। কেউ কারও থেকে কোনো অংশে একটুও কম নয়। যুদ্ধবিদ্যায়ও দুজনে সমান পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। শত্রুসৈন্যের হাত থেকে তাদের রাজ্যকে রক্ষা করতে দুই অকুতোভয় যোদ্ধাই সমান সমর্থ ছিল।

ক্রমশ দুই রাজকুমার যৌবনে পা দিল। রাজার মাথায় এখন নতুন এক চিন্তা। দুজনের মধ্যে কে হবে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী? দুজনেই সমান শিক্ষিত এবং সমান সাহসী। কোন্ যুক্তিতে একজনকে বাদ দিয়ে অপরজনের হাতে তুলে দেবেন রাজ্যের ভার। ভাবতে ভাবতে রাজার খাদ্যে অরুচি, নিদ্রায় ব্যাঘাত। রাজগুরু রামাচার্যের শরণাপন্ন হলেন রাজা। এঁর হাতেই ছিল দুই কুমারের শাস্ত্র ও শস্ত্রশিক্ষার ভার। রামাচার্য এ সমস্যার কোনো সমাধানই করতে পারলেন না।

চিন্তা ও ভাবনার কাঁটায় জর্জরিত রাজা তাঁর প্রধানমন্ত্রী লিঙ্গপন্থের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনা ও বুদ্ধিতে রাজা যথেষ্ট আস্থাবান ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী সব শুনে রাজাকে বললেন,

মহারাজ, আপনি দুই কুমারকেই সমান ভালোবাসেন, তাই এই সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের একটাই উপায় হল— পরীক্ষা।



রাজা অধীর হয়ে বললেন,

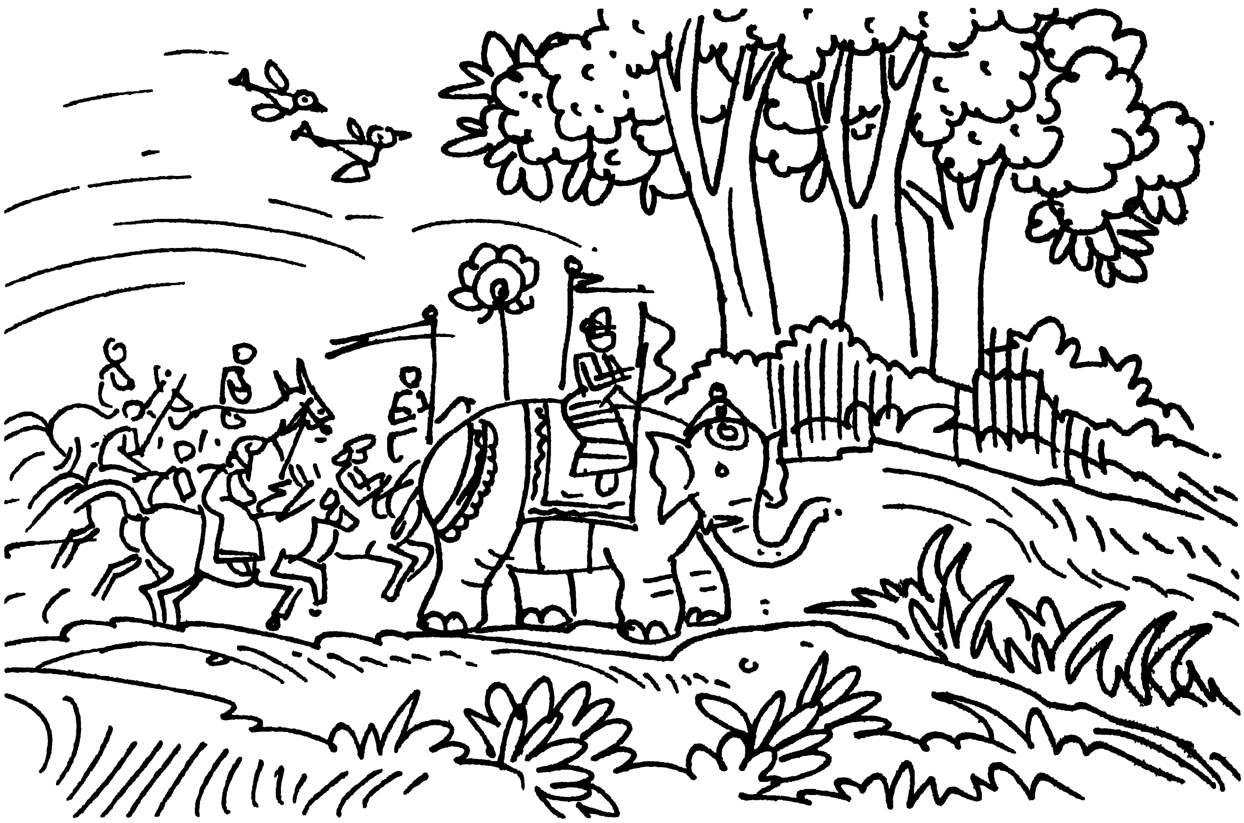
কীসের পরীক্ষা?

রাজার অধীরতা লক্ষ করে মাথা-ঠাণ্ডা প্রধানমন্ত্রী লিঙ্গপন্থ মৃদু হেসে বললেন,

—আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে অজয় আর বিজয়ের মধ্যে কে আপনাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে? যে আপনাকে বেশি ভালোবাসে, সেই আপনার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

লিঙ্গপন্থের কথার উত্তরে রাজা বললেন,

—দুজনেই আমাকে সমান ভালোবাসে— একথা আমি জানি। যদিও এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহই নেই, তবু আমি জানতে চাই— কে আমাকে বেশি ভালোবাসে। এখন আপনি বলুন, কেমন ভাবে তা পরীক্ষা করা যায়?



রাজার কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কিছু বুঝি ভাবলেন। তারপরে চাপা স্বরে রাজাকে কিছু পরামর্শ দিলেন।

পরদিন রাজা দুই কুমারকে সঙ্গে নিয়ে বনে গেলেন মৃগয়া করতে। প্রধানমন্ত্রী লিঙ্গপন্থও তাঁদের সঙ্গী হলেন। তাঁরা যখন বনের কাছাকাছি এসেছেন, তখন একজন প্রজা চিৎকার করে ছুটতে ছুটতে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াল। সেই প্রজা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল,

— মহারাজ! সর্বনাশ হয়েছে। আমাদের রাজ্য শত্রুসৈন্য ঘিরে ফেলেছে। এখনি আপনি আমাদের রক্ষা করতে ফিরে চলুন।

এই কথা শুনে রাজা তাঁর ছেলেদের দিকে তাকালেন। দুই কুমারই রাজার ইঙ্গিত বুঝতে পারল। অজয় ও বিজয় দুজনেই সেই প্রজাকে সঙ্গে নিয়ে নগরের দিকে শত্রুসৈন্যের মোকাবিলা করবার জন্য যাত্রা করল। তারা কিছুদূর মাত্র গিয়েছে, এমন সময় রাজার দেহরক্ষীদের একজন ছুটতে ছুটতে এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল,

রাজকুমার, ভীষণ বিপদ! একদল দস্যু রাজা আর প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করেছে। আপনারা শীঘ্র চলুন।

দেহরক্ষীর কথা শুনে বিজয় ভীষণ ব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে তার যমজ-ভাইকে বলল,

—ভাই অজয়, চল আমরা দস্যুদের তাড়াই। আমাদের পিতা নিশ্চয় ভীষণ বিপদে পড়েছেন। এ অবস্থায় তাঁকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।

অজয় বলল,

না ভাই, বিজয়। পিতার আমাদের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি জানি নিজেকে রক্ষা করতে তিনি যথেষ্ট সক্ষম। কিন্তু আমাদের প্রজাদের শত্রু প্রতিরোধ করবার সামর্থ্য নেই। তাদের কাছে আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন অনেক বেশি।

অজয়ের কথা বিজয়ের মোটেই মনঃপূত হল না। সে ছুটে গেল রাজাকে দস্যুদের হাত থেকে বাঁচাতে। সেখানে পৌঁছে বিজয় অবাক হয়ে দেখল— আশে-পাশে দস্যু-তস্করের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। রাজা তাঁর প্রধানমন্ত্রী লিঙ্গপন্থের সঙ্গে হাল্‌কা আলাপে মশগুল। তাঁরা দুজনেই হাসছেন।

ইতিমধ্যে অজয়ও জানতে পারল তাদের রাজ্য শত্রু আদৌ আক্রমণ করেনি।

আসলে এসবই ঘটানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী লিঙ্গপন্থের বুদ্ধি ও পরামর্শ অনুযায়ী।

প্রধানমন্ত্রী রাজাকে এবার বললেন,

মহারাজ! আপনি এবার নিশ্চিত জানতে পারলেন যে, কুমার বিজয় আপনাকে অজয়ের চেয়ে বেশি ভালোবাসে! বিজয়ই আপনার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনে হা-হা করে অট্টহাসি হেসে উঠলেন রাজা। তাঁর সে হাসি যেন আর থামতেই চায় না। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন,

আমি আপনার মতের সঙ্গে একমত হতে পারছি না, প্রধানমন্ত্রী। অজয় যে আমাকে বিজয়ের থেকে কম ভালোবাসে— তা আমি মোটেই মনে করি না। আমি একথা ভালোভাবেই জানি— অজয়ও আমাকে সমান ভালোবাসে। শুধু শুধু ভালোবাসাই নয়, তার অন্তরে আছে আমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং আমার সাহস ও সামর্থ্যের প্রতি প্রচণ্ড আস্থা। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অজয় আরও প্রমাণ করেছে— রাজ্যের প্রজাদের সে কতখানি ভালোবাসে। প্রজাদের নিরাপত্তার দিকে তার গভীর দৃষ্টি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আর এই জন্যেই আমি মনে করি - অজয়ই গঙ্গাবতী রাজ্যের সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তার হাতে রাজ্যের ভার থাকলে জনগণ সুখে এবং নিরাপদে থাকবে।



চালাক ব্রাহ্মণের গল্প



কোনো এক সময় এক নগরীতে পুত্তশাস্ত্রী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করত। একদিন বাড়ির কাছাকাছি নদী থেকে স্নান সেরে বাড়িতে ঢোকার সময় ভারী সুন্দর একটা গন্ধ তার নাকে এল। এ গন্ধ পুত্তশাস্ত্রীর চেনা। সে বুঝল তার বউ ধোসা তৈরি করছে। পুত্তশাস্ত্রী কোনো কথা না বলে চুপিচুপি রান্নাঘরে ঢুকে দরজার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখল। দেখল, তার বউ একে একে মোট তিরিশটা ধোসা তৈরি করল। রান্না শেষ হতেই সে চুপিসাড়ে রান্নাঘর ছেড়ে চলে গেল। খেতে বসে বউকে বলল,

—আজ তাহলে তুমি তিরিশটা ধোসা রেঁধেছ?

এই কথা শুনে বউ চমকে উঠল। ওতো আর জানে না— তার স্বামী দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ করেছে। তাই ভাবল— নিশ্চয়ই তার স্বামী কোনো দৈবশক্তি লাভ করেছে।

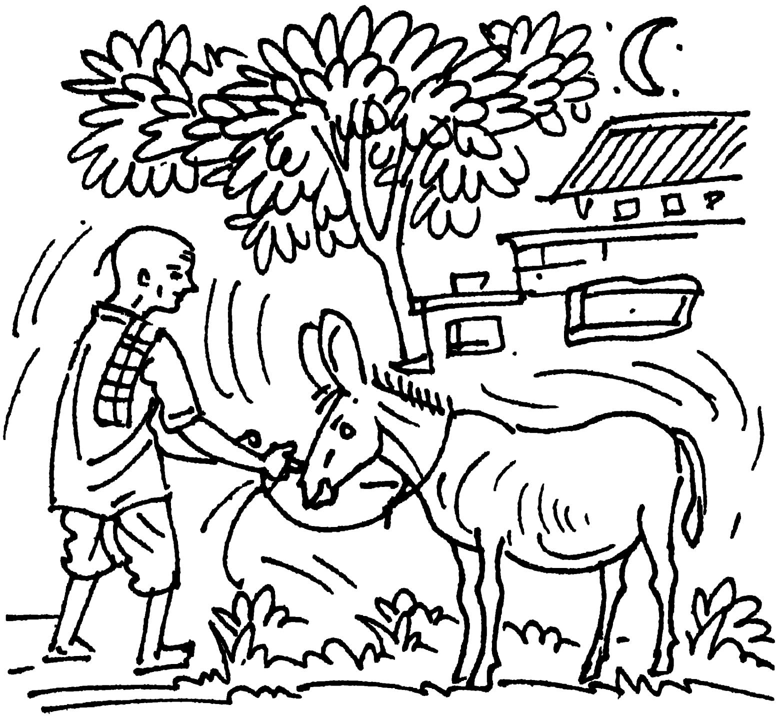


খাওয়া শেষ হতে ব্রাহ্মণী বাড়ির কাছের কুয়োয় গেল জল নিতে। সেখানে গিয়ে সে দেখল ধোপা-বউ নিঙ্গি কুয়োর পাশের চাতালে পা ছড়িয়ে বসে চিৎকার করে কাঁদছে। নিঙ্গিদের গাধাটা কোথায় হারিয়ে গেছে— খুঁজে পাচ্ছে না। সেই শোকে নিঙ্গি অমন করে কাঁদছে। ব্রাহ্মণী তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করে বলল—

—এখনই তুমি আমার স্বামীর কাছে যাও। আমার স্বামী দৈববলে তোমার গাধাকে ঠিক খুঁজে বার করবে।

পুত্তশাস্ত্রী নিঙ্গির গাধা হারানোর বৃত্তান্ত মন দিয়ে শুনল। শোনার পর নিঙ্গিকে বলল,

—তুমি কাল আমার বাড়ি এস। আসবার সময় সঙ্গে এনো ষোলোটি টাকা, চারটে নারকেল, দুসের চাল, কিছু পান-পাতা আর বারোটা কলাপাতা। এই সব উপকরণ দিয়ে আমাকে চামুণ্ডী দেবীর পুজো করতে হবে। পুজোর শেষে তোমার গাধাটা কোথায় আছে, আমি বলে দেব।



চালাক ব্রাহ্মণ নিঙ্গির কাছ থেকে গাধাটার নিখুঁত বর্ণনা জেনে নিয়েছিল। সেইদিন রাতে সে নগরীর সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করল। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে একটা ভাঙা পোড়ো বাড়ির কাছে গাধাটাকে দেখতে পেল। সে একটা দড়ি দিয়ে গাধাটাকে সেইখানেই বেঁধে রাখল। তারপর চুপিচুপি বাড়ি ফিরে এল।

পরদিন সকালে ধোপাবউ তার বাড়ি এল। পুত্তশাস্ত্রী যা যা আনতে বলেছিল, সবই সে সঙ্গে করে এনেছিল। তার আনা জিনিসপত্রগুলো দেবীর সামনে সাজিয়ে পুত্তশাস্ত্রী অনেকক্ষণ ধরে পুজোর ভান করল। শেষকালে ধোপাবউকে গাধাটা কোথায় আছে, বলে দিল।

এই ঘটনার পর পুত্তশাস্ত্রীর খ্যাতি সেই নগরীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। একদিন এক চাষি তার কাছে এসে তার দুঃখের কথা বলল। বৃষ্টির অভাবে তার জমি শুকিয়ে যাচ্ছে। তাই সে জানতে চাইল,

কবে বৃষ্টি হবে?

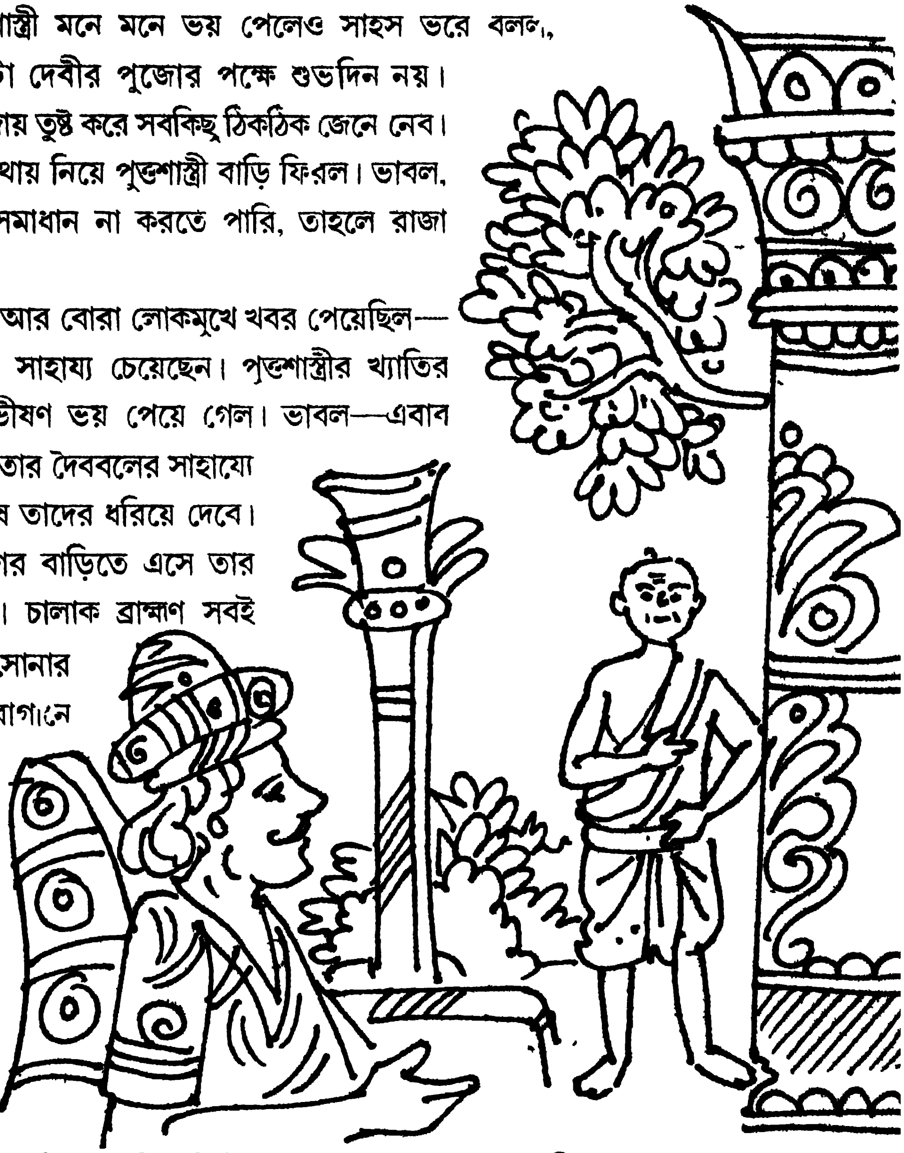
পুত্তশাস্ত্রী তাকে টাকা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সঙ্গে করে পরের দিন আসতে বলল। বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ জানত চাষির জমিটা কোথায়। সেই রাতেই সে তার বউকেও কিছু না বলে চুপিচুপি চাষির জমিতে গেল। ভাগ্যের জোর, চাষির জমির কাছাকাছি একটি কুয়ো ছিল। সে সেই কুয়ো থেকে জল তুলে চাষির জমিতে ভালোভাবে সেচ করল। তারপর বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে চাষি এল। ধোপাবউ-এর বেলায় যেমন করেছিল, তেমনি এবারও সে অনেকক্ষণ ধরে চাষির আনা টাকা ও জিনিসপত্র দিয়ে পুজো করল। পুজোর শেষে চাষিকে বলল,

গত রাত্রে শুধু তোমার জমিটুকুতেই বৃষ্টি হয়েছে। অন্য সবাই-এর জমিই শুকনো আছে।

এই শুনে চাষি তাড়াতাড়ি তার জমিতে গিয়ে দেখল ব্রাহ্মণ ঠিকই বলেছে। ব্রাহ্মণের এই গুণের কথা চাষি চারদিকে বলে বেড়াতে লাগল।

চেন্না আর বোরা নামে দুই চোর রাজবাড়ির ঠাকুরঘর থেকে একটা দামি সোনার হার চুরি করেছিল। পুত্তশাস্ত্রীর দৈবশক্তির কথা রাজার কানেও পৌঁছেছিল। রাজা ব্রাহ্মণকে ডেকে পাঠালেন। সে যখন রাজার সামনে হাজির হল, তখন রাজা চুরির ঘটনাটা বর্ণনা করলেন এবং তাকে চোর আর চোরাই হারের সন্ধান দিতে আদেশ করলেন। পুত্তশাস্ত্রী মনে মনে ভয় পেলেও সাহস ভরে বলল,



মহারাজ, আজকের দিনটা দেবীর পুজোর পক্ষে শুভদিন নয়। আগামীকাল আমি দেবীকে পুজোয় তুষ্ট করে সবকিছু ঠিকঠিক জেনে নেব।

একরাশ ভয় আর চিন্তা মাথায় নিয়ে পুত্তশাস্ত্রী বাড়ি ফিরল। ভাবল, যদি আগামীকাল এই চুরির সমাধান না করতে পারি, তাহলে রাজা নিশ্চয় খুব রেগে যাবেন।

এদিকে সেই দুই চোর চেন্না আর বোরা লোকমুখে খবর পেয়েছিল— রাজা চোর ধরতে পুত্তশাস্ত্রীর সাহায্য চেয়েছেন। পুত্তশাস্ত্রীর খ্যাতির কথা তারাও জানত। তারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ভাবল—এবার আর রক্ষা নেই। ব্রাহ্মণ নিশ্চয় তার দৈববলের সাহায্যে সব জানতে পারবে এবং শেষে তাদের ধরিয়ে দেবে। উপায় না দেখে তারা ব্রাহ্মণের বাড়িতে এসে তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। চালাক ব্রাহ্মণ সবই বুঝল। সে তাদের কাছ থেকে সোনার হারটা চেয়ে নিয়ে রাজার বাগানে একটা আমগাছের গোড়ায় পুঁতে রেখে এল।

পরদিন রাজবাড়িতে গিয়ে যথারীতি সে পুজোপাঠ করল। পুজো শেষ করে রাজাকে বলল কাউকে পাঠিয়ে আমগাছের গোঁড়া খুঁড়ে হারটি নিয়ে আসতে। হার পাওয়া যেতে রাজা তো ভীষণ খুশি। তিনি ব্রাহ্মণকে প্রচুর পুরস্কার দিলেন।

এইবার ব্রাহ্মণ ভাবল— সৌভাগ্য বার বার আসবে না। নতুন কোনো ঝামেলা আসার আগে এ দেশ ছেড়ে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। দেশ ছেড়ে অন্য দেশে বাসা বাঁধবার পর একদিন সে ব্রাহ্মণীকে তার দৈবশক্তির আসল ব্যাপারটা খুলে বলল।

সব শুনে ব্রাহ্মণী মজা পেয়ে খুব একচোট হেসে নিল।

মৃতদেহ ফিরে পায় প্রাণ



শোকে দুঃখে পাথর হয়ে গেলেন রাজা বজ্রবাহু। এ যেন ভাবা যায় না। রূপে গুণে সারা রাজ্য যার জুড়ি মেলা ভার— সেই রাজকুমার জয়শেখর আর বেঁচে নেই—একথা কেমন করে বিশ্বাস করবেন তিনি? শোকের আঘাত সহ্য করতে না পেরে রানি জ্ঞানহারা। শোকে স্তব্ধ হয়ে গেছে সারা রাজপুরী। রাজ্যের প্রজাদের হৃদয়েও শোকের ঢেউ। তরুণ রাজকুমার জয়শেখরেব কোমল স্বভাবের জন্য সবাই যে তাকে ভীষণ ভালোবাসত। মন্ত্রী, অমাত্য আর পাত্রমিত্রের দল ঘিরে রয়েছেন শোকমগ্ন রাজাকে। কী ভাষায় যে তাঁরা সান্ত্বনা দেবেন— ভেবে পাচ্ছেন না। পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন রাজা বজ্রবাহু। দুচোখের উদাস দৃষ্টি যেন দূর আকাশে হারিয়ে গেছে।



রাজা বজ্রবাহুর অনেক তপস্যার ফল— তাঁর একমাত্র সন্তান জয়শেখর। কত দেবতার মন্দিরে ঘুরে— কত কঠোর ব্রত আর উপবাস পালনের পর, ভগবানের পরম আশীর্বাদই যেন সুন্দর একটি ছেলের রূপ ধরে এসেছিল তাঁদের কাছে। আদর করে নাম রেখেছিলেন—জয়শেখর। রাজা-রানির নয়নের মণি— জয়শেখর ধীরে ধীরে যতই বড়ো হয়ে উঠতে লাগল ততই সে সকলের মন কেড়ে নিতে লাগল তার সুন্দর স্বভাবের গুণে। রাজা-রানির বড়ো সাধ ছিল এইবার তরুণ জয়শেখরের বিয়ে দেবেন। বিয়ে দিয়ে রাজ্য

টুকটুকে একটি বউ নিয়ে আসবেন। সে সাধ আর তাঁদের পূর্ণ হল না। ভগবান যা দিলেন, আবার নিজেই তা কেড়ে নিলেন। কয়েক দিনের সামান্য রোগভোগের পর এই কিছুক্ষণ হল জয়শেখরের মৃত্যু হয়েছে। সেই প্রাণচঞ্চল সুন্দর তরুণের দেহ এখন পাথরের মতো কঠিন, বরফের মতো শীতল।

অকস্মাৎ সমস্ত শোক ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন রাজা বজ্রবাহু। মন্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন,

আমাদের স্বপ্ন আর সাধ এমনভাবে ভেঙে যেতে দেব না। আমি জয়-শেখরের বিয়ে দেব।



রাজার কথা শুনে চমকে উঠলেন মন্ত্রী। ভাবলেন —রাজা পুত্রশোকে পাগল হয়েই প্রলাপ বকছেন বুঝি। তাই রাজার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নীরবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রবীণ মন্ত্রী। মন্ত্রীর দৃষ্টির অর্থ বোধ হয় বুঝতে পারলেন রাজা। তিনি ধীর অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন,

এ আমার প্রলাপ নয়। আমি আমার মরা ছেলেরই বিয়ে দিতে চাইছি। যে স্বেচ্ছায় আমার মরা ছেলেকে কন্যাদান করবে, আমি তাকে দশলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করব। আর সেই কন্যাকে আমার একমাত্র পুত্রবধূর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করব এই রাজ-সংসারে। যান মন্ত্রী, আপনি আর দেরি করবেন না। এই মুহূর্তে এই কথা সারা রাজ্যে ঘোষণা করে দিন।

রাজার আদেশ রাজ্যের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করে ফিরতে লাগল রাজার লোক নগরীর পথে পথে।

এই ঘোষণা শুনলেন মাধব শর্মা। মাধব শর্মা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। লোকের বাড়ি পুজো-অর্চনা শ্রাদ্ধ-শান্তি করে কায়ক্লেশে দিন চলে তাঁর। ঘরে পাঁচটি মেয়ে। একটিকেও এখনও পর্যন্ত পাত্রস্থ করতে পারেনি। ঘোষকদের ঘোষণা শুনে তাঁর মনটা ভারী চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনি ভাবলেন— যদি রাজার মৃত ছেলের সঙ্গে তাঁর একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে দারিদ্র্যের জ্বালা থেকে সংসারটা রক্ষা পায়।

ব্রাহ্মণের সংকল্প শুনে তাঁর স্ত্রী সুশীলা কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। কাঁদতে কাঁদতে স্বামীকে বললেন,

তুমি কী বলছ? কোনো বাপ তার মেয়েকে একটা মরা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা ভাবতে পারে? অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। তোমার স্বভাবই শুধু নষ্ট হয়নি। মনে হচ্ছে, তুমি পাগল হয়ে গেছ।

ব্রাহ্মণের পাঁচ মেয়ের মধ্যে চার মেয়েই কাঁদছিল মায়ের সঙ্গে। সবচেয়ে ছোটো মেয়ে ললিতা তার বাবাকে ভীষণ ভালোবাসত। ললিতার মনটা ছিল ভারী নরম; আর স্বভাব— বড়োই সরল। ঈশ্বরের প্রতি ছিল অটুট বিশ্বাস আর অচলা ভক্তি। সে বাবার কাছে এগিয়ে এসে বলল,

বাবা, আপনি আমাকে স্বচ্ছন্দে দান করে দিন মৃত রাজকুমারের হাতে। ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন, আমি সারাজীবন বিধবা হয়েই কাটাব— তাঁর ইচ্ছার উপর আমাদের কারোরই হাত নেই।



ললিতার কথা শুনে মাধব শর্মাও অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর সংসারের সুখের জন্যই ছোটো মেয়ে চরম স্বার্থত্যাগ করতে চাইছে, বুঝতে পেরে তিনি ললিতাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন, তারপর হাত ধরে তাকে নিয়ে গেলেন রাজার কাছে।

বৈদিক রীতি অনুযায়ী মৃত রাজকুমারের সঙ্গে ললিতার বিয়ে হয়ে গেল। ললিতা একাগ্রচিত্তে প্রতিটি বৈদিক মন্ত্র পরম নিষ্ঠার সঙ্গে উচ্চারণ করল। মনে-প্রাণে সে মৃত জয়শেখরকেই নিজের স্বামী হিসাবে বরণ করল।

বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হতেই জয়শেখরের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। রাজা বজ্রবাহু তাঁর পুত্রবধূ ললিতাকে অনুরোধ করলেন জয়শেখরের চিতায় আগুন ছোঁয়াতে।

নীরবে চিতার দিকে এগিয়ে গেল ললিতা। আগুন ছোঁয়াবার আগে সে দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশ্যে মনে মনে প্রণাম জানিয়ে বলল—

‘প্রভু আমার প্রাণের প্রভু
সবই তোমার ইচ্ছাতে হয় জানি,
সে ইচ্ছাতেই মৃত কুমার
গ্রহণ করেছিলেন আমার পাণি।
নিত্য তোমার পূজাব্রতে
পুণ্য যদি জমেই কিছু স্বামী,
শবকে তুমি শিব করে দাও
তোমার কাছে এ বর মাগি আমি।



হঠাৎ আকাশ ফুঁড়ে নেমে এল বৃষ্টি। বৃষ্টির সঙ্গে দারুণ ঝড়। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে সঙ্গে চারদিক কাঁপিয়ে বাজের আওয়াজ। সেই ভীষণ দুর্যোগের মধ্যে বাজা এবং তাঁব লোকজন কে যে কোথায় গেল, কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। মৃত স্বামীর চিতা আঁকড়ে ধরে একমাত্র ললিতাই সেই শ্মশানে বসে বইল। ঘোর অমাবস্যার বাত ছিল সেদিন। চারদিক ঘন অন্ধকারে ঢাকা। সেই অন্ধকারেব মধ্যে শ্মশানের চারধার থেকে শেয়াল, শকুনের কর্কশ চিৎকার ভেসে আসছে। ললিতার ভীষণ ভয় করছিল। এই ভীষণ দুর্যোগ—এই ভয়-জোগানো সব অদ্ভুত আওয়াজের মধ্যেও সে চুপচাপ বসে আছে। স্বামীর শবদেহ ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। দুর্যোগ যত ভীষণই হোক না কেন, ভয় যত প্রবলই হোক না কেন, পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাকে কর্তব্য থেকে বিবত করতে পারবে না। সে চোখ বুঁজে একমনে ভগবান শিবকে ডাকতে লাগল।

হঠাৎ সমস্ত দুর্যোগ যেন স্তব্ধ হযে গেল। ললিতা এক মনে প্রার্থনা করে চলেছে। দু-চোখ দিয়ে দরদর করে ঝরছে জলের ধারা। তার বাহ্যজ্ঞানও যেন হাবিয়ে গেছে। হঠাৎ একটা সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনে চোখ মেলে চাইল ললিতা। দেখল তাঁর সামনে এসে দাঁড়িযেছেন পরম করুণাময়ী এক বৃদ্ধা। তিনি ললিতাকে পরম স্নেহভরে বললেন,

কাঁদিসনি মা। তুই ভক্তিভবে জ্যোতি পুজো কর, তাহলেই তোর স্বামী আবার জীবন ফিরে পাবে।

এই কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ললিতা সেই বৃদ্ধাব পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। তাঁর পা দুটি জড়িয়ে ধরে আকুল স্বরে বলে উঠল,

মাগো, কেমন করে এ পুজো করতে হয় আমি তা জানি না। তুমি আমায় বলে দাও এ পুজোর রীতি কী।

সেই বৃদ্ধা আর কেউ নন— স্বয়ং দেবী পার্বতী। দেবী ললিতাকে বললেন,

‘পুজোর স্থানকে পরিষ্কার করে সেখানে একটা পিঁড়ে পাতবি। তারপর পিঁড়েয় আলপনা দিবি। তারপর তার উপর কিছু চাল ছড়িয়ে দিয়ে রাখবি একজোড়া ঘিয়েব প্রদীপ। তারপর ভক্তিভরে পুজো করবি। সবশেষে কাড়াবু (ভেতরে পুর দেওয়া ভাপানো মিষ্টি পিঠে) তৈরি করে দেবতার ভোগ দিবি।’

এই বলে দেবী অন্তর্ধান করলেন। কিন্তু সেই ঘোর অন্ধকার শ্মশানের মধ্যে ললিতা পুজোর উপচার পাবে কোথায়? তবু ললিতা অদম্য উৎসাহে জ্যোতি পুজোর আয়োজন করল।

গাছের পাতা দিয়ে পুজোর স্থান পরিষ্কার করে ঝাঁট দিয়ে সাজানো চিতা থেকে এক টুকরো কাঠ নিয়ে

পেতে দিল। কাদামাটি দিয়ে একজোড়া প্রদীপ বানিয়ে সেই কাঠের উপর রাখল। বটগাছের আঠা ঢেলে দিল সেই প্রদীপে—ঘিয়ের বদলে। গাছের ছাল দিয়ে প্রদীপের সলতে তৈরি করল। পাথরে পাথরে ঠুকে আগুন জ্বেলে সেই আগুনে জ্বালাল প্রদীপ। আলপনার সরঞ্জাম পাবে কোথায়? আঙুল চিরে সেই রক্তে মাটির উপর দাগ কেটে আঁকল আলপনা। বুনো ফুল আর পাতা দিয়ে জ্যোতি দেবতার পুজো করে কাদামাটি দিয়ে তৈরি কাড়াবুর ভোগ দিল পরম ভক্তিভরে।

ললিতার পুজো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত জয়শেখরের দেহে প্রাণ ফিরে এল। সে উঠে বসল। যেন গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠল এই মাত্র। ললিতার চোখে সেই অন্ধকার, ভয়াল শ্মশানভূমি এখন যেন আলো ঝলমল এক প্রাসাদপুরী! আর ওই চিতা আর চিতা নয়— যেন এক সিংহাসন। সেই সিংহাসন আলো করে বসে আছে তার জীবনের সম্পদ— তার স্বামী। যার দেহ আর শবদেহ নয়— প্রাণের চঞ্চল স্পন্দনে আর রক্তের দুরন্ত প্রবাহে সে-দেহ এখন সজীব।

ললিতাকে দেখে অবাক হয়ে গেল জয়শেখর। তার মুখে সবকিছু শুনে আনন্দে আর খুশিতে জয়শেখরের মন ভরে উঠল। পরম করুণাময় ভগবানের উদ্দেশ্যে দুহাত জোড় করে প্রণাম জানিয়ে সে বলল,

—ভগবান! ললিতার মতো স্ত্রী যেন জন্মে জন্মে পাই।

দুর্যোগ কেটে যেতেই রাজা বজ্রবাহু ছুটে এলেন শ্মশানে। সব দেখে এবং শুনে তাঁর চোখ বেয়ে কেবলই ঝরতে লাগল আনন্দের অশ্রুধারা। তারপর জয়শেখর আর ললিতাকে নিয়ে রাজা বজ্রবাহু পরমানন্দে ফিরে গেলেন রাজপ্রাসাদে। সারা রাজ্য জুড়ে উৎসবের ঢেউ বইতে লাগল।

আজও কর্ণাটকের ঘরে ঘরে আষাঢ় মাসের অমাবস্যার রাতে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে জ্যোতি পূজা করে মেয়েরা। ভক্তিভরে দেবতার পুজো করে বিবাহিতা মেয়েরা স্বামীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানায়, আর কুমারী মেয়েরা প্রার্থনা করে সুযোগ্য স্বামী।



স্বপ্নকাহিনী



রাজসভায় বসে আছেন চিত্রদুর্গের রাজা। তাঁকে ঘিরে আছেন রাজ-অমাত্য, পাত্রমিত্র, সভাসদের দল। রাজসভায় অনেক কাজ। তবু মাঝে মাঝেই যেন আনমনা হয়ে যাচ্ছেন রাজা। রাজ-অমাত্য অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছেন রাজার এই অন্যমনস্ক ভাব। প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ অমাত্য রাজাকে ভালো করেই চেনেন। চিত্রদুর্গের প্রজাদের মঙ্গল-চিন্তাতেই রাজার দিন কাটে। তাঁর একটা গোপন ব্যাপার অমাত্য জানেন, যা আর কেউই জানে না। মাঝে মাঝেই আশ্চর্য সব স্বপ্ন দেখেন রাজা, আর যতক্ষণ না সেইসব স্বপ্নের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা খুঁজে পান, ততক্ষণ তাঁর মন থাকে অস্থির—চঞ্চল। আজ কি সেই রকম কোনো স্বপ্ন দেখেছেন? সেই জন্যেই কি তিনি আজ এমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত? রাজকার্য সম্পাদনের এক ফাঁকে রাজাকে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করে বসলেন অমাত্য। মহারাজের দুশ্চিন্তার নতুন কোনো কারণ ঘটেছে কি?



অমাত্যের প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলেন রাজা। সত্যিই তো, গতরাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেছে তাঁর। রক্তবর্ণের এক আশ্চর্য শৃগাল যেন হেঁটমুণ্ড হয়ে ঝুলছে তাঁর শয্যার উপর। এই অদ্ভুত স্বপ্নের অর্থ কী? ঘুম ভাঙার পর থেকে চিন্তায় চিন্তায় রাজা অস্থির হয়ে উঠেছেন মনে মনে। অমাত্যের প্রশ্ন শুনে তিনি গত রাত্রে দেখা স্বপ্নের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। ক্রমে সভায় উপস্থিত জ্ঞানী গুণীজনেরাও শুনলেন রাজার সেই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা। কিন্তু অনেক ভেবেও কেউ এর কোনো সমাধান খুঁজে পেলেন না।

শেষ পর্যন্ত সারা রাজ্যে প্রচার করা হল রাজার এই স্বপ্নের কথা। সেই সঙ্গে ঘোষণা করা হল — যে এই অদ্ভুত স্বপ্নের যথাযথ ব্যাখ্যায় রাজাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

রাজার এই ঘোষণার কথা জানতে পেরে এক গ্রামের এক গরিব চাষি ভাবল— সে যদি এই স্বপ্ন-সমস্যার সমাধান করতে পারে, তাহলে তার মতো দরিদ্রেরও বরাত ফিরে যেতে পারে। সেই গ্রামে রামযোশী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর ছিল অগাধ জ্ঞান

এবং প্রশ্নাতীত সততা। সেই চাষি অনেক ভেবে-চিন্তে একটা মতলব ভেঁজে একদিন রামযোশীর কাছে গিয়ে হাজির হল। সে রামযোশীকে রাজার অদ্ভুত স্বপ্নের কাহিনীটি শুনিয়ে অনুনয় করে বলল,

পণ্ডিত মশাই, আপনি দয়া করে এর কী ব্যাখ্যা, আমায় বলে দিন। আমি বড়ো গরিব। তবে আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনার ব্যাখ্যা শুনে রাজা যদি খুশি হন, তাহলে পুরস্কারের অর্ধেক অর্থ আমি আপনাকে দেব।

রামযোশী ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানী এবং বড়োই নির্লোভ। অর্থ বা খ্যাতি— এর কোনোটার প্রতিই তাঁর কিছুমাত্র লালসা ছিল না। তবু তিনি সেই চাষির সততার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য তাকে বললেন, —রাজাকে গিয়ে বল—সামনে এক ভীষণ দুঃসময়ের মুখোমুখি হতে হবে তাঁকে। রাজ্য ছেয়ে যাবে মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা আর প্রবল অসাধুতায়। রাজার উচিত শক্ত হাতে এই সব মিথ্যাচাব, প্রবঞ্চনা আর অসাধুতার মোকাবিলা করা। যত শীঘ্র সম্ভব তাঁকে এই সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। চারদিকে রাখতে হবে সজাগ দৃষ্টি। তবেই দেশের ও দশের মঙ্গল হবে।

যথাসময়ে চাষি রাজার কাছে হাজির হয়ে তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা শোনাল তাঁকে। রাজা সেই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ঘোষিত পুরস্কার চাষিকে দিলেন। তারপর রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় কিছু কিছু সংস্কার সাধন করে তিনি মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা আর অসাধুতার অশুভ প্রভাব থেকে তাঁর রাজ্যকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হলেন এবং এ কাজে শেষ পর্যন্ত সফলও হলেন অনেকখানি।

সেই চাষি কিন্তু তার কথা রাখল না। ব্রাহ্মণ রামযোশীকে তাঁর প্রাপ্য পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা থেকে বঞ্চিত করল। চরম স্বার্থপরের মতো পুরস্কারের সমস্ত অর্থ সে নিজেই ভোগ করল। ভুলেও সে রামযোশীর বাড়ির দিকে পা বাড়াল না আর।

এমনি করে এক বছর প্রায় কেটে গেছে। চিত্রদুর্গের রাজা আবার এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। এবারে তিনি দেখলেন— একটা জ্বলন্ত ছোরা ঠিক যেন তাঁর মাথার উপর দাউ দাউ করে জ্বলছে। রাজার এই স্বপ্নেব ব্যাখ্যাকারীর জন্য এবার পুরস্কার ঘোষণা করা হল— পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

সেই নির্লজ্জ চাষি দারুণ লোভে এবারও গিয়ে হাজির হল ব্রাহ্মণ রামযোশীর কাছে। নানা মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে, আগেরবার যে সে কথার খেলাপ করেছিল, সেজন্য ক্ষমা চাইল ব্রাহ্মণের কাছে। এবার সে নিশ্চয়ই তার পুরস্কারের অর্ধেক অর্থ তাঁকে দিয়ে যাবে— এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে তাঁর সাহায্য চাইল।

রামযোশী চাষির কথা শুনে মনে মনে হাসলেন। বাইরে কিছু প্রকাশ না করে তিনি বললেন,

—শীঘ্রই চিত্রদুর্গ রাজ্যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটবে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই। রাজাকে এই আক্রমণ ঠেকাবার জন্য উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, তবেই চিত্রদুর্গের বিপদ কাটবে।

চাষির ব্যাখ্যা শুনে রাজা ভীষণ উদ্বিগ্ন হলেন। রাজ্যের সীমান্ত ঘিরে শক্ত প্রহরার ব্যবস্থা করলেন তিনি। শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম সতর্কতাই অবলম্বন করলেন। পূর্ব থেকেই যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সহজেই চিত্রদুর্গ রাজ্যকে রক্ষা করতে সমর্থ হলেন তিনি।

এবারেও চাষি রাজার ঘোষণামতো পুরস্কার পেয়েছিল পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। কিন্তু সেই লোভী চাষি এবারেও তার কথামতো পুরস্কারের অর্ধেক ভাগ সেই ব্রাহ্মণকে দিল না।

এর কিছুদিন পর রাজা আবার এক স্বপ্ন দেখলেন। এবারে দেখলেন, তাঁর প্রাসাদ-সংলগ্ন ফুলের বাগানে ঘাস খাচ্ছে একটি ভেড়া, আর ঠিক তার মাথার উপরে আকাশে উড়ছে একটি পায়রা।

যথাসময়ে এই স্বপ্নের কথাও প্রচার করা হল। প্রচুর পুরস্কারও ঘোষণা করা হল সেই সঙ্গে। এবারের পুরস্কারের পরিমাণ আগের চেয়ে অনেক বেশি এবং অনেক লোভনীয়।

সেই চাষি এবারও তার প্রবঞ্চনা এবং চরম অসাধু ব্যবহারের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে আবার গিয়ে হাজির হল সেই প্রাজ্ঞ রামযোশীর কাছে। রাজার দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল সে। আগের ব্যাপারে কোনো কিছুই জিজ্ঞাসা না করে সেই মহাত্মা রামযোশী তাকে বললেন,

—রাজাকে বল, এই স্বপ্ন এক শুভ সঙ্কেত বয়ে নিয়ে এসেছে। এই রাজ্যে এখন বিরাজ করবে অনাবিল সুখ, শান্তি আর আনন্দ।

চাষির মুখ থেকে এই ব্যাখ্যা শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন রাজা। ঘোষিত পুরস্কারের চেয়ে অনেক বেশি পুরস্কার এবং সম্মান দিলেন তিনি সেই চাষিকে।

এইবার বুঝি চাষির মনের মধ্যে কী একটা ভাব তোলপাড় করতে লাগল। তার নিজের অসাধু ব্যবহারের কথা ভেবে সে দারুণ লজ্জা পেল। চোখেব সামনে নিজেরই ঘৃণ্য প্রবঞ্চক মূর্তিটা যেন ভেসে উঠছে বারবার। ঘৃণা আর লজ্জার আগুনে পুড়ে যেন তার আত্মশুদ্ধি হল। ছুটে গেল সে সেই প্রবীণ প্রাজ্ঞ রামযোশীর কাছে। পুরস্কারের সমস্ত অর্থ তাঁর পায়ের কাছে নিবেদন কবে জড়িয়ে ধরল তাঁর দুটি পা। অনুশোচনা-ভরা কণ্ঠে সে বলল,

পণ্ডিত মশাই, এই নরাধমকে ক্ষমা করুন। রাজার দেওয়া পুরস্কাবেব সবটাই গ্রহণ করে আমাকে চরম পাপের হাত থেকে বাঁচান।

প্রশান্ত ব্রাহ্মণ মৃদু হেসে সেই চাষিকে বললেন, —এ অর্থে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। এসব তুমি ফিরিয়ে নাও। প্রথমবারে তুমি নিজেই ভুগছিলে মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা আর অসাধুতার প্রবল জ্ববিকারে। দ্বিতীয়বারে তোমার মনের মধ্যেও শত্রুতাসুলভ বিরাগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল স্বপ্নের ব্যাখ্যা মেনেই। আর এইবারে রাজার তৃতীয় শুভ-স্বপ্নের প্রভাবে তোমার হৃদয়ে এসেছে পরিবর্তন। এখন তোমার হৃদয় ভরে রয়েছে ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা আর সদ্‌বুদ্ধির সোনালি ফসলে। তাই তুমি সবকিছু দেবার জন্য আমার কাছে ছুটে এসেছ। তোমার কৃতকর্মের জন্য কোনো অনুশোচনা মনে রেখো না। আমার আশীর্বাদ রইল তোমার জন্য।



ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ পেয়ে সেই চাষি যেন এক নতুন জীবন পেল। সে তার প্রাপ্য অর্থের বেশির ভাগ নানা সৎকাজে দান করে, বাকি অর্থের সদ্ব্যবহার করে, সুখে জীবন যাপন করতে লাগল।

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু



গঙ্গার মতো মেয়ে হয় না। যেমনই তার সংসারের সকলের প্রতি কর্তব্যজ্ঞান, তেমনই তার দেব-দ্বিজে অচলা ভক্তি। স্বভাবটিও ভারী শান্ত। অথচ তার সঙ্গে তার স্বামী আর শাশুড়ির কী ব্যবহার! স্বামী কেম্পিয়া গাঁয়ের প্যাটেল। তার হাবভাব চালচলন সবের মধ্যেই মোড়লি ভাব সব সময়। পান থেকে একটু চুন খসেছে কী আর রক্ষে নেই! গঙ্গাকে শুধু মারতেই যা বাকি রাখে। সব সময় গঙ্গার প্রতি গালমন্দ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ লেগেই আছে। আর শাশুড়ি-ঠাকরুন? তিনিই বা কম যান কীসে? ভীষণ খাণ্ডার মহিলা। গঙ্গাকে সব সময় বকা-ঝকা আর শাসন করেই চলেছেন।

গঙ্গা অবশ্য এসবে কিছুই মনে করত না। সব কিছু হাসি মুখে সহ্য কর যেত। ঈশ্বরের উপর ওর ছিল অগাধ বিশ্বাস। মনে মনে সব সময় ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা করত। ভক্তের একনিষ্ঠ প্রার্থনায় ঈশ্বর যে সাড়া দেন— এই বিশ্বাস তার মনের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। গ্রামের কুয়া থেকে রোজ রোজ সে তিনটে পেতলের কলসি বোঝাই করে জল এনে পুজোর ঘরে তিনটে আসনের উপর বসিয়ে রাখত যত্ন করে। তারপর ভক্তিভরে এক একটি কলসিকে কাবেরী, তুঙ্গভদ্রা আর কপিলা বলে কল্পনা করে —কর্ণাটকের এই তিন পবিত্র নদীমাতাকে পুজো করত।

শাশুড়ি এই সব পুজোপাঠ একেবারেই পছন্দ করত না। মুখ ঝামটা দিয়ে সারা গ্রাম মাথায় করে রাখত, আমার বোকা বউ-এর কাণ্ডকারখানা দ্যাখো! কুয়োর জলকে বলছে কাবেরী, তুঙ্গভদ্রা, কপিলা। আবার ঢং করে পুজোও করছে। যত সব আজগুবি ব্যাপার!

অনেক সময় এইভাবে বিদ্রুপ করে, সংসারের কাজে ত্রুটি ধরে, যে-কোনো একটি অছিলায় রাগ দেখিয়ে সেই কলসিগুলোর জল ঢেলে ফেলে দিত গঙ্গার শাশুড়ি। গঙ্গা এসব নিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া বা তর্ক করত না। চুপচাপ মুখ বুঁজে সব অত্যাচারই সহ্য করে যেত, আর সেই তিন পবিত্র নদীমাতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়ে বলত—মা, আমাদের করুণা কর। শাশুড়ি, এমন কী স্বামীরও হাজার ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ গঙ্গার ভক্তি বা বিশ্বাসের উপর কোনো প্রভাবই খাটাতে পারত না।

একবার কেম্পিয়া ভগবান রঙ্গনাথের মন্দির দর্শন করতে যাবে বলে মনস্থ করল। তীর্থযাত্রার দিন কেম্পিয়াকে আশীর্বাদ করে তার মা বলল, ভগবান রঙ্গনাথ তোকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। যা বাছা, কাবেরীতে পুণ্যস্নান করে জমানো সব পাপ ধুয়ে আয়।

কেম্পিয়া মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা গঙ্গার দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল, ঠিক বলেছ মা। এ তো আর কুয়োর জলকে কলসিতে ভরে কাবেরী বলে ছেলেখেলা করা নয়। একেবারে সত্যিকারের কাবেরী। তবে মূর্খেরা এসব কথা কি আর বুঝতে চাইবে?

এই বলে কেম্পিয়া পশ্চিমবাহিনী রঙ্গনাথ মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

গঙ্গা তার স্বামীর বিদ্রূপ গায়ে না মেখে নিজের মনে সংসারের কাজ করে যায়। তার নিত্যদিনের কাজ—সেই তিন পবিত্র নদীর পূজা-অর্চনা সে ভক্তিভরেই সম্পন্ন করে। সর্বদাই প্রবাসী স্বামীর মঙ্গলের জন্য নদীমাতাদের কাছে প্রার্থনা জানায়।

এদিকে কেম্পিয়া গ্রাম থেকে যাত্রা করবার পর তিনদিনের দিন পশ্চিমবাহিনীতে পৌঁছেই কাবেরীতে পবিত্র স্নান করতে গেল। জলে নামতে যাবে, হঠাৎ অসাবধানে কেমন করে তার হাতের সোনার আংটি আর ট্যাকে-গোঁজা টাকার থলিটা পড়ে গেল কাবেরীর জলে। কেম্পিয়া হায়-হায় করে উঠল। বহু চেষ্টা করেও সে নদীর গর্ভ থেকে তার হারানো টাকার থলি আর আংটি উদ্ধার করতে পারল না। দারুণ হতাশাগ্রস্ত মন নিয়ে ভগবান রঙ্গনাথকে দর্শন না করেই সঙ্গীদের কাছ থেকে পথখরচার টাকা ধার করে বাড়ি ফিরে এল।



বাড়ি ফিরতেই কেম্পিয়ার বিপদগ্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তার মা জানতে চাইল—কী হয়েছে? কেম্পিয়া তার দুঃখের কাহিনী মায়ের কাছে সবই বলল। মা তো সব শুনে একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। ভীষণ চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে তার মা বলতে লাগল, —কি অপদার্থ ছেলেরে তুই! জানিস্ এ আমার মায়ের দেওয়া আংটি? এর দাম কত জানিস? অমন দামি জিনিসটা হারিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে তোর লজ্জা করল না?

গঙ্গা তখন সংসারের কাজে ব্যস্ত ছিল। শাশুড়ির চিৎকার কানে যেতেই ছুটে এল। সব ঘটনা শুনে তার শাশুড়িকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল,

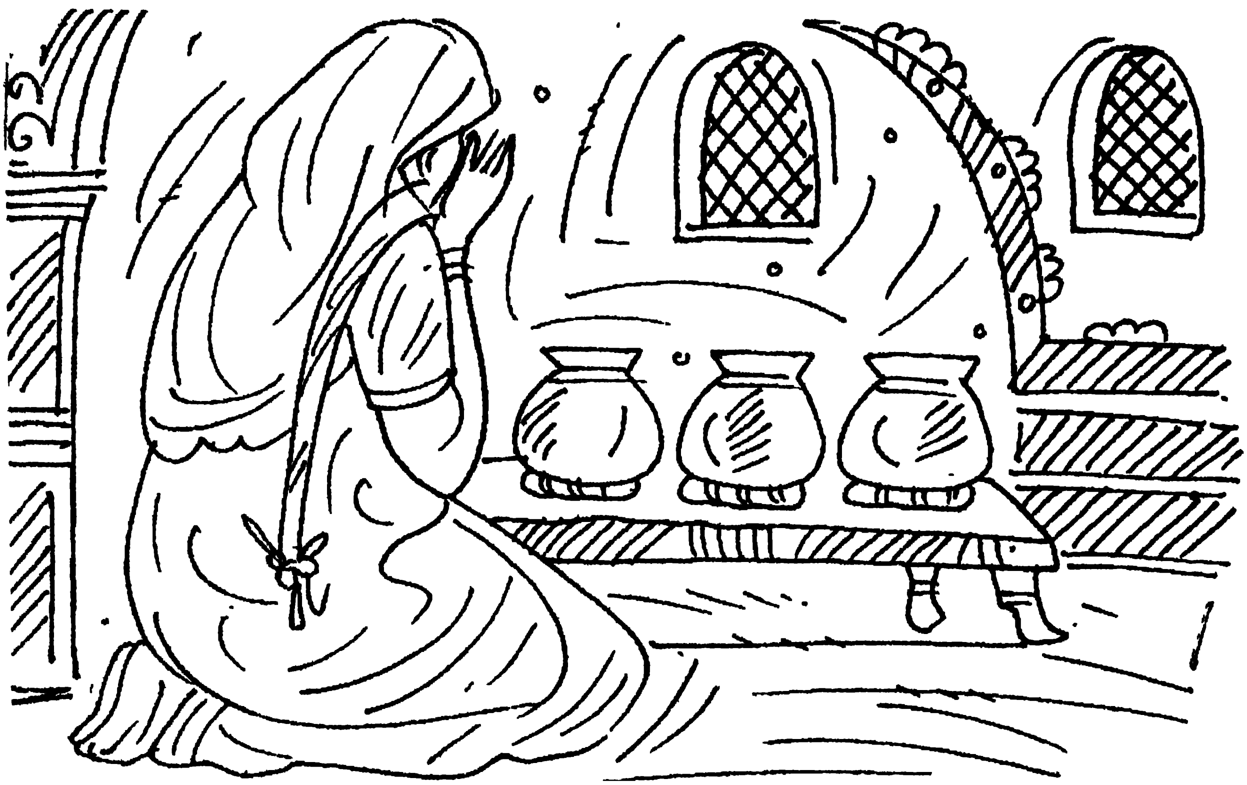
শান্ত হন মা। কাল সকালে আমি দেবী কাবেরীর পূজা করে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাব যাতে তিনি আংটি আর টাকার থলিটা ফিরিয়ে দেন।

গঙ্গার কথা শুনে শাশুড়ির রাগ তো কমলই না, উলটে গঙ্গাকে যাচ্ছেতাই ভাবে বকুনি দিতে দিতে বললেন,

মিথে কথা বলবার জায়গা পাওনি? আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছ, না? টাকা আর আংটি ডুবল কোথায় সেই পশ্চিমবাহিনী কাবেরীর জলে, আর তুমি এই ঘরে বসে বসে তা পেয়ে যাবে? ইয়ার্কি করতে এসেছ আমার সঙ্গে? দূর হয়ে যাও আমার সুমুখ থেকে।

গঙ্গা কিন্তু পরদিন সকাল থেকেই তার কথামতো কাজ শুরু করল। সেই তিনটি পূর্ণ কলসীর সামনে বসে আহার-নিদ্রা সব কিছু ভুলে এক মনে প্রার্থনা জানাতে লাগল। এইভাবে একে একে সাত-সাতটা দিন

কেটে গেল, কিন্তু হারানো জিনিসের কোনো চিহ্নই নেই। কেম্পিয়া আর তার মা শুরু করল ঠাট্টা বিদ্রুপ। গঙ্গার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। সে জলপূর্ণ কলসির সামনে আছড়ে পড়ে আকুল ব্যথায় ভেঙে পড়ল! কাঁদতে কাঁদতে পরিশ্রান্ত হয়ে মনে মনে স্থির করল— আগামীকাল পর্যন্ত সে দেখবে নদীমাতা তার প্রার্থনা শুনে তার স্বামীর হারানো জিনিস ফিরিয়ে দেন কি না! যদি না দেন, তাহলে এ প্রাণ সে আর রাখবে না। কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যাই করবে গঙ্গা।



পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে উঠেই গঙ্গা তার পূজা এবং প্রার্থনা শুরু করল। শেষ পর্যন্ত যখন তার সব আশা হতাশায় লীন হতে যাচ্ছে, আত্মহত্যার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সে যখন তার নিত্য-পূজার দেবী কাবেরীর উদ্দেশে শেষ প্রণাম জানাচ্ছে, তখনই ঘটল সেই অভাবনীয় ঘটনা। কাবেরী-জ্ঞানে পূজা-করা সেই কলসির জলে ভেসে উঠল তার স্বামীর আংটি আর টাকার থলিটা। আনন্দ আর পুলকে উৎফুল্ল হয়ে চিৎকার করে উঠল গঙ্গা '—জয় কাবেরী মা!'

গঙ্গার চিৎকার শুনতে পেয়েছিল তার স্বামী আর শাশুড়ি। তারা ছুটে এসে সেই অলৌকিক ঘটনা যখন দেখল, মহাবিস্ময়ে একেবারে বাক্যহারা হয়ে গেল তারা। ভক্তি ও বিশ্বাসের এক জীবন্ত প্রতিমার মতো তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গা। তার দুচোখ বেয়ে ঝরছে আনন্দের অশ্রুধারা। সারা শরীর ঘিরে রয়েছে যেন এক স্বর্গীয় জ্যোতি। গঙ্গার সেই পুণ্য মূর্তির দিকে তাকিয়ে কেম্পিয়া আর তার মায়ের হৃদয় অনুতাপের আগুনে পুড়ে যেতে লাগল। তারা বুঝল, সরল বিশ্বাস আর নিষ্ঠার কী মূল্য! তারা গঙ্গার কাছে তাদের অতীতের সমস্ত দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইল।

সেইদিন থেকে গঙ্গার স্বামী ও শাশুড়ি একেবারে অন্যরকম মানুষ হয়ে গেল। তারা নিষ্ঠাভরে তিন পবিত্র নদীমাতা— কাবেরী, তুঙ্গভদ্রা ও কপিলার পূজা করতে লাগল।

ভাগ্যবল ও কর্মবল



ভাগ্যবল আর কর্মবল দুই যমজ ভাই। দুজনে ভাবও যত, ঝগড়াও তত। একজনকে ছাড়া আর একজনের চলে না কোনো মতেই। একদিন তারা দুজনে এক বনের ধারে বেড়াতে বেড়াতে এক কাঠুরের দেখা পেল। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে বনের গাছ কেটে কাঠ সংগ্রহ করে সেই কাঠুরে। তারপর সেই সংগ্রহকরা কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে শহরে গিয়ে বিক্রি করে। সামান্য যা আয় হয়, তাতে তার একবেলার আহারই ভালোভাবে জোটে না। ভারি কষ্টে দিন কাটে তার। সেই কাঠুরেকে নিয়েই দুই ভাইয়ের বেধে গেল জোর তর্ক। ভাগ্যবল তার ভাই কর্মবলকে বলল,

—দেখি তোমার কত ক্ষমতা! এই কাঠুরের কষ্ট দূর করার জন্য তুমি কী করতে পার।

ভাই-এর কথা শুনে ভাগ্যবল মুচকি হাসল।

কর্মবল সেই কাঠুরের সঙ্গে দেখা করে তার হাতে একটা সোনার হার দিয়ে বলল,

আমার নাম কর্মবল। আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি। এই হার বেচে যে টাকা তুমি পাবে, তার কিছু দিয়ে তোমার কুঁড়েঘরের বদলে বানিয়ে ফেলতে পার একটা কোঠাবাড়ি। কিছু দিয়ে তুমি বিয়ে কর। আর বাকি টাকায় তোমার ভালো ভাবেই চলে যাবে— যদি বুদ্ধি করে চল। কাল থেকে আর কাঠ কাটতে হবে না তোমাকে।

কাঠুরে হারটা পেয়ে দারুণ খুশি হয়ে কাঠ কাটা ফেলে রেখে বাড়ির পথ ধরল।

কর্মবল ভাগ্যবলের দিকে তাকিয়ে বলল,

কেমন বুঝলে?

ভাগ্যবল কোনো জবাব না দিয়ে শুধু একটু মুচকি হাসল।

ওদিকে পথ চলতে চলতে কাঠুরের দারুণ তেষ্টা পেয়েছে। একটা জলাশয়ের ধারে উঁচু একটা পাথরের ধাপের উপর হারটা রেখে সে জলে নামল। সূর্যের আলো পড়ে হারটা ঝিকমিক করছে। আকাশ-পথে উড়ে-যাওয়া একটা ঈগল পাখির সেটা চোখে পড়ল। ঈগলের মনে হল ওটা বুঝি একটা গোখরো সাপ। সঙ্গে সঙ্গে ছোঁ মেরে হারটাকে তুলে নিয়ে গেল সেই ঈগল পাখি। তাই দেখে হায় হায় করে উঠল কাঠুরে। তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হল না। পরদিন থেকে আবার তাকে বনে যেতে হল— কাঠ কাটতে।

কাঠুরের দশা দেখে ভাগ্যবল কর্মবলকে বলল—

এটা তোমার উচিত কাজ হল না ভাই। যা দিলে তা আবার ফিরিয়ে নিলে?

আসলে লোকটা মহা অকর্মা। কর্মবল রেগে গিয়ে বলল। 'না হলে অত দামি হারটাকে কেউ যেখানে-সেখানে ফেলে রাখে?

ভাগ্যবল কোনো কথা না বলে আবার মুচকি হাসি হাসল।



কর্মবল আবার সেই কাঠুরের সঙ্গে দেখা করে তার হাতে কিছু সোনার বাট দিয়ে বলল,

দেখ, আগের বার নিজের বোকামির জন্য হারটা খুইয়েছ। এবারে সাবধানে থেক। এই সোনা বুঝে-সুঝে খরচ করলে সারাজীবন স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। তোমাকে আর কষ্ট করে কাঠ কাটতে হবে না।

কিন্তু এবার সে আগের মতো ভুল করল না। সেই জলাশয়ের কাছে আসতেই তার আবার জল তেষ্টা পেয়ে গেল। কিন্তু এবার সে আগের মতো আর ভুল করল না। এবার সোনার বাটগুলো সাবধানে তার ছেঁড়া ফতুয়ার পকেটে রেখে দিল। তারপর জল খেতে নামল। কিন্তু নীচে নেমে জল খাওয়ার জন্য যেই সে ঝুঁকেছে, অমনি সব সোনা জলে পড়ে গেল। কাঠুরের দুঃখের আর অবধি রইল না। সে নিজের কপাল চাপড়ে বলল, —আমার ভাগ্যটাই মন্দ। সেদিন রোজগার হয়নি কিছুই। তাই সে লোকের বাড়ি চেয়ে-চিন্তে দু মুঠো ভাতের জোগাড় করে কোনো মতে দিনটা চালিয়ে নিল। পরের দিন কুড়ুল-কাঁধে আবার সে বনে গেল কাঠ কাটতে।

কর্মবল সবই জানতে পারল। কাঠুরের অবস্থা ফেরাবার জন্য তার জেদ চেপে গেল আরো। এবারে সে টাকা-পয়সায় একটা পুরো থলি ভর্তি করে কাঠুরেকে দিয়ে গেল। কাঠুরে থলিটা নিয়ে আরও কোথাও দাঁড়াবে না ঠিক করে প্রাণপণে ছুটল বাড়ির দিকে। কিন্তু প্রচণ্ড খিদে আর তেষ্টায় কাতর হয়ে, তার কুঁড়েঘরের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেই রাস্তার উপর অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল সে। তখন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক বুড়ি। সেই বুড়িটা কাঠুরের টাকার থলিটা নিয়ে চম্পট দিল।

পরদিন কাঠুরেকে আবার কাঠ কাঠতে দেখে কর্মবল ভারি অবাক হয়ে গেল। তখন ভাগ্যবল হেসে ভাইকে বলল—

—তোমার দেওয়া ধন তিন-তিনবারই খুইয়ে ফেলল কাঠুরে। আর তুমি ওকে কিছু দিও না। এবার আমার পালা। তুমি দেখ আমি কী করতে পারি। এখন চল আমার সঙ্গে।

কাঠুরে কাঠ কেটে বোঝা বানিয়ে যখন মাথায় তুলতে যাচ্ছে, তখন তার কাছে এসে হাজির হল দুই ভাই। ভাগ্যবল কাঠুরেকে বলল,

—তোমার কাঠের বোঝাটার দাম কত?

—বারো আনা। কাঠুরে বলল।

দুই ভাই বারো আনায় কাঠুরের সমস্ত কাঠ কিনে নিল। কাঠুরে দশ আনা খরচ করে খাবার জিনিসপত্র কিনে যখন বাড়ি ফিরছে, তখন এক মেছুনি পথের ধারে বসেছিল একটা বড়ো মাছ নিয়ে। কাঠুরে অনেক দিন মাছ খায় না। তাই দরাদরি করতে আরম্ভ করল। শেষ পর্যন্ত বাকি দু আনায় মাছটা কিনতে পেরে খুশি মনে মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরল কাঠুরে। বাড়ি ফিরেই সে মাছ কাটতে বসল। মাছটা কাটতেই মাছের পেটের মধ্যে সেই সোনার বাটগুলো পেয়ে গেল। সোনাগুলো এমন ভাবে ফিরে পেয়ে ভারি আনন্দ হল তার। এইবার রান্না করতে গিয়ে দেখল জ্বালানীর কাঠ নেই। তখন সে গেল জ্বলানীর কাঠ জোগাড় করতে। কিছুদূরে



একটা বড়ো নিমগাছ দেখতে পেয়ে তার কয়েকটা ডাল কেটে নিতে কাঠুরে গাছে চড়ে বসল। গাছের ডাল

কাটতে গিয়ে তার নজরে পড়ল একেবারে মগডালের উপর ঈগল পাখির বাসা। কাঠকুটো দিয়ে তৈরি বাসার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল সূর্যের আলো পড়ে কী-যেন একটা চকচক করছে। কৌতূহলী হয়ে সেই গাছের মগডালে চড়ে কাঠুরে ঈগলের বাসার মধ্যে দেখতে পেল তার সেই হারানো হারটা।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে উঠল কাঠুরে,

—পেয়েছি, পেয়েছি।

নিমগাছের উলটো দিকেই ছিল সেই বুড়ির বাড়ি, যে কাঠুরের টাকার থলি নিয়ে পালিয়ে ছিল। চিৎকার শুনে বুড়ি নিমগাছের দিকে তাকিয়ে দেখে কাঠুরেকে চিনতে পারল। তার মনে হল—কাঠুরে বোধ হয় বুঝতে পেরেছে তার টাকার থলি নেওয়ার কথা। বুড়ি খুব ভয় পেয়ে টাকার থলিটা নিয়ে কাঠুরের কাছে এসে বলল,

—তোমার থলি তোমায় ফিরিয়ে দিচ্ছি। এর একটা পয়সাও আমি খরচ করিনি।

একে একে কর্মবলের দেওয়া সব উপহারই ভাগ্যবল তাকে ফিরিয়ে দিল। কাঠুরেকে আর কাঠ কেটে দিন চালাতে হয় না। ভারি সুখে এখন দিন কাটছে তার।

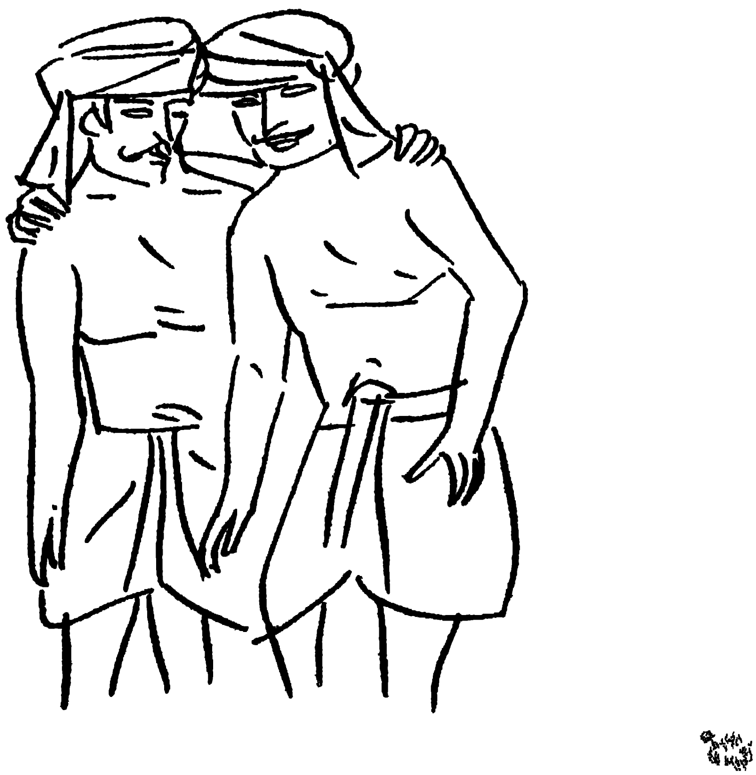
ভাগ্যবলের শক্তি দেখে কর্মবল বলল,

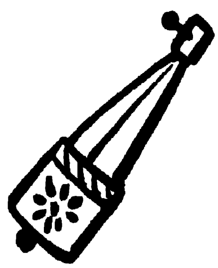
—মেনে নিচ্ছি— তুমিই বড়ো; কারণ তোমার ক্ষমতাই বেশি।

ভাগ্যবল হেসে বলল,

—আমার ক্ষমতাই যে বেশি একথা ঠিক নয়। কাঠুরের প্রয়োজন ছিল আমাদের দুজনকেই। কর্ম ছাড়া ভাগ্য নেই, ভাগ্য ছাড়া কর্ম নেই। কর্ম আর ভাগ্য যে ভাই-ভাই!

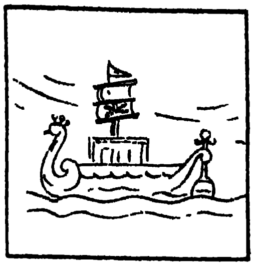
ভাগ্যবল আর কর্মবল দুই ভাই আনন্দে গলা জড়াজড়ি করে হাসতে লাগল।



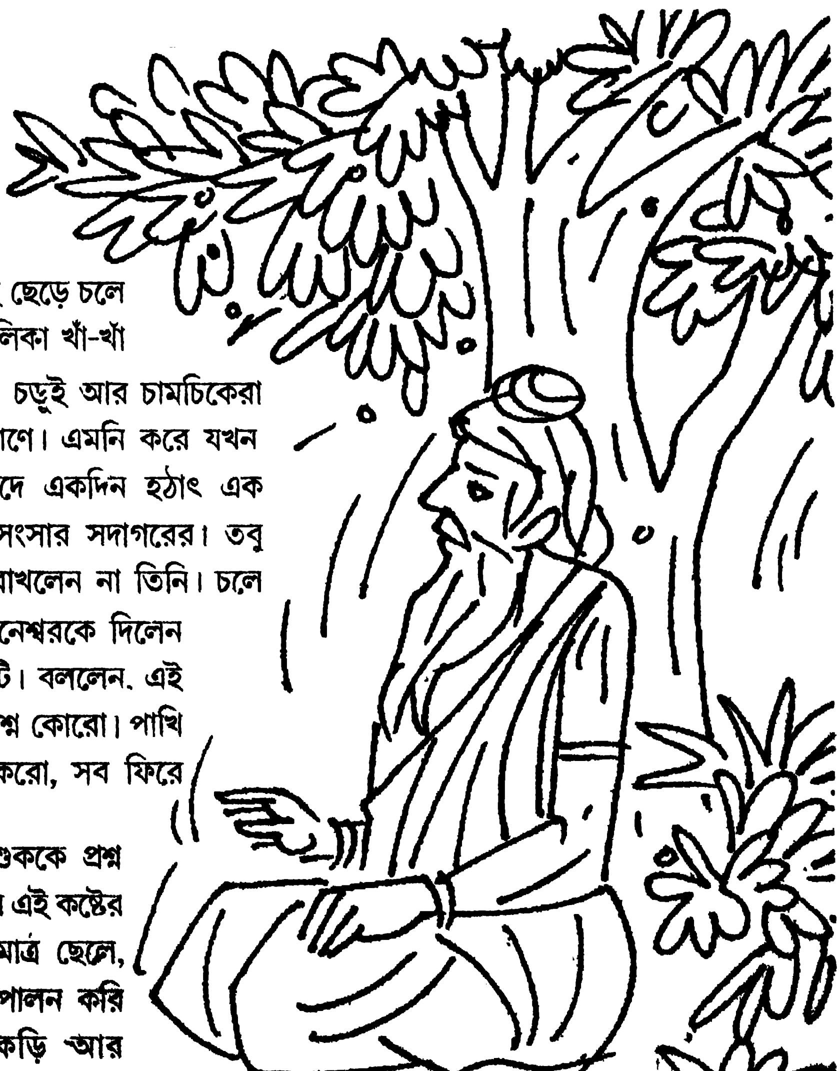


বঙ্গদেশ

কাজলরেখা



সওদাগরের নাম ধনেশ্বর। মা লক্ষ্মীর দয়ায় তাঁর ঘরে কোনো অভাব নেই। টাকা-পয়সা লোক-লশকর বিষয়-আশয় আর এক মেয়েকে নিয়ে ধনেশ্বর সাধু মহা সুখী। সদাগরের মেয়ের নাম কাজলরেখা। তার রূপে চারদিক আলো হয়ে ওঠে। সে যখন হাসে, তখন হিরের আলো ছিটকায়; কাঁদলে মুক্তো ঝরে। কাজলরেখার বয়স যখন দশ, সদাগরের ঘরে এল ছেলে রত্নেশ্বর। মেয়ের পর ছেলেকে পেয়ে ধনেশ্বরের সুখের পাত্র যেন উপচে উঠতে চায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাঁর ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে এল এক টুকরো কালো মেঘ। মা লক্ষ্মী ক্রুদ্ধ হলেন ধনেশ্বর সাধুর উপর। জুয়া খেলে সব টাকাকড়ি খোয়ালেন সদাগর। হাতিশালার হাতি, আস্তাবলের ঘোড়া, পাইক-বরকন্দাজ, ঝি-চাকর-কর্মচারী সবাই ছেড়ে চলে গেল ধনেশ্বরের গৃহ। বিরাট অট্টালিকা খাঁ-খাঁ করে। ধুলো আর ঝুলে ভরে যায়, চড়ুই আর চামচিকেরা বাসা তৈরি করে তার কোণে কোণে। এমনি করে যখন দিন কাটে, ধনেশ্বরের শূন্য-প্রাসাদে একদিন হঠাৎ এক সন্ন্যাসী এসে হাজির। অভাবের সংসার সদাগরের। তবু সন্ন্যাসীর সেবায় কোনো ঘাটতি রাখলেন না তিনি। চলে যাবার সময় সন্ন্যাসী খুশি হয়ে ধনেশ্বরকে দিলেন একটি শুকপাখি আর একটি আংটি। বললেন, এই আংটি পরে ধর্মমতি শুকপাখিকে প্রশ্ন কোরো। পাখি যা বলবে সেইমতো যদি কাজ করো, সব ফিরে পাবে।

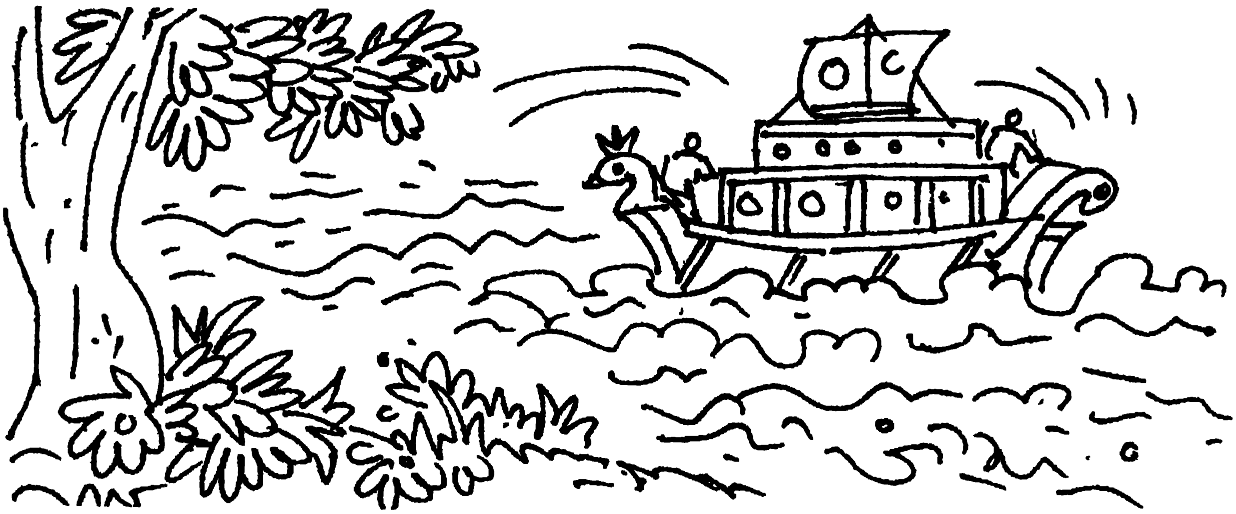


সন্ন্যাসী চলে গেলে সদাগর শুককে প্রশ্ন করেন, "বলো ধর্মমতি, কবে আমার এই কষ্টের শেষ হবে? এক মেয়ে আর একমাত্র ছেলে, বংশের বাতি— কিন্তু কী করে পালন করি তাদের? নিজের দোষে টাকাকড়ি আর জমিজায়গা যা ছিল সবই তো গেছে চলে!

"কি করে পালন করি দুই স্নেহধনে।
কহ গো উপায় পাখি মোর কানে কানে।"

সদাগরের বিলাপ শুনে পাখি বলে, "সন্ন্যাসীর দেওয়া আংটি বাজারে বেচে দাও। সেই পয়সায় ডিঙাগুলি সারিয়ে নিয়ে আর কিছু জিনিসপত্র সওদা করে পুবদেশে বাণিজ্যে যাও। হারানো টাকাকড়ি সব আবার ফিরে আসবে তোমার ঘরে।'

পাখির কথা শুনে ধনেশ্বর সদাগর পুবদেশে যান বাণিজ্যে। সেখানে বেচাকেনার শেষে সদাগর দেখেন তাঁর হারানো সম্পদের তিনগুণ ফিরে পেয়েছেন ব্যবসায়ে। লোক-লশকর, হাতিঘোড়া, সপ্তডিঙাভরা ধনে, সদাগরের পুরী ভরে যায় আবার।"



ধনেশ্বর সাধু এবার বাড়ি ফিরে মেয়ের দিকে মন দেন। মেয়ে বড়ো হয়েছে— তার রূপেগুণে চারদিক আলো। কিন্তু উপযুক্ত পাত্র কোথায়? সদাগর আবার— শুকপাখির কাছে যান; কাজলরেখার বিয়ের খবর জানতে চান। ধর্মমতি শুক তখন সদাগরকে বলে ঃ 'সাধু ধনেশ্বর, তুমি বাণিজ্য করে যা-কিছু হারিয়েছিলে, তার অনেক বেশি ফিরে পেলে। কিন্তু এই মেয়েই তোমার দুঃখের কারণ হবে। মরা স্বামীর সঙ্গে ওর বিয়ে হবে। তাই যাও ওকে এক্ষুনি বনবাসে রেখে এসোগে।' ধনেশ্বর তাঁর মেয়ে কাজলরেখাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসেন। পাখির কথা শুনে সদাগর তাই বুক চাপড়ে কাঁদতে থাকেন। কিন্তু সন্ন্যাসী তাঁকে বলেছেন— পাখির কথা মান্য করে চলতে। তাই কাঁদতে কাঁদতেই সদাগর আবার ডিঙা সাজান। কাজলরেখাকে বলেন, তাকে নিয়েই এবার বিদেশ যাবেন। সেখানে যদি পছন্দমতো পাত্র মেলে, বিয়ে দেবেন তার।

কাজলরেখা বাপের সঙ্গে পাড়ি দেয় দূর বিদেশের পথে। যেতে যেতে পথে পড়ে এক গভীর বন। সেই বনের ধারে সদাগর ডিঙা বাঁধেন। তখন কাজলরেখা মনে মনে ভীষণ ভয় পায়। বাবার সঙ্গে পাখির কথা সে শুনেছিল। কাঁদতে কাঁদতে মেয়ে তখন বাপকে বলেঃ

পাহাড় থেকে ভাটিয়াল নদী সাগর বইয়া যায়।
চারখুনোর কথা গো বাপ শুধাও না তা'য়।।
জিজ্ঞাস কর গো বাপ জিজ্ঞাস করো তারে।
বনেলা পঙ্খীর কথায় কে দেয় কন্যা বনান্তরে।।

কাজলরেখার কথা শুনে ধনেশ্বর সাধু শরমে মরে যান। মনে ভাবেন সদাগর, একী বিষম দায়! বাপ হয়ে মেয়েকে নিয়ে এসেছি বনে, বিসর্জন দেবার জন্য। ওদিকে বনের মধ্যে অনেকদূর গিয়ে বাপ আর মেয়ে দুজনেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। পথের ধারে একটি মন্দিরের চাতাল। সেখানেই বসেন দুজনে। মন্দিরের কপাট বন্ধ। ভরদুপুর বেলা।

তবু বনের মধ্যে কী ঘন অন্ধকার! কাজলরেখা খিদে-তেষ্টায় কাতর। তখন ধনেশ্বর মেয়েকে মন্দিরের চাতালে রেখে জলের খোঁজে যান। মেয়ে ভাবে, বাপ আর বুঝি ফেরে না। বারো বছরের মেয়ে কাজলরেখা। ঘন আঁধার বনের মধ্যে একলা পড়ে। ভয় পেয়ে মেয়ে দেয় মন্দিরের বন্ধ কপাটে ঠেলা। কপাট যায় খুলে। কাজলরেখা ঢোকে মন্দিরে, আর অমনি কপাট যায় বন্ধ হয়ে। কাজলরেখা দরজা ধরে অনেক টানাটানি করে, কপাট আর খোলে না।



ততক্ষণে সদাগর ফিরে এসেছেন মেয়ের জন্য পদ্মপাতায় করে জল নিয়ে।

মেয়েকে কোথাও দেখতে না পেয়ে সদাগর ডাকেন, 'কাজল! কাজল! কোথায় গেলি মা?' মন্দিরের ভিতর থেকে মেয়ে সাড়া দেয়। তখন সদাগর দরজায় ধাক্কা মারেন বারবার— কপাট কিন্তু খোলে না; বাপ আর মেয়ে দুধার থেকে টানাটানি করেন, ধাক্কাধাক্কি করেন; তবু খোলে না। বাইরে থেকে সদাগর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেন, ভিতরে কী দেখছ? কাজলরেখা বাপকে জানায়, মন্দিরের ভিতরে ভীষণ আঁধার। এককোণে জ্বলছে একটি ঘিয়ের প্রদীপ। সেই প্রদীপের আলোয় দেখা যায়— মন্দির-ঘরে একটি শয্যা পাতা, আর সেই শয্যায় শুয়ে আছেন পরম সুন্দর এক মৃত কুমার। কুমারের সর্বাঙ্গে বিঁধে আছে অসংখ্য সুচ।

কাজলরেখার কথা শুনে সদাগর বোঝেন— শুকপাখির কথাই সত্যি হল! মেয়েকে ডেকে বলেন, 'ওই মরা কুমারই তোমার স্বামী, ওকে নিয়েই তুমি থাকো এই মন্দিরে। স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে এনো। তোমার হাতের শাঁখা ও কপালের সিঁদুর অক্ষয় হোক। মা-রে, তোর কপালের লিখনই এই! বাপকে দুষিস না— আমি ফিরে যাই।'

এই বলে বিলাপ করতে করতে ধনেশ্বর সদাগর ফিরে চলেন ঘরের পথে। গভীর বনে বন্ধ মন্দিরের মধ্যে কাজলরেখা পড়ে থাকে একা। মৃত স্বামীর শিয়রে বসে কাজলরেখা গায় তার দুঃখের গান ঃ

জাগো জাগো সুন্দর কুমার, কত নিদ্রা যাও।

আমি অভাগিনী ডাকি, আঁখি মেলে চাও।।
কর্ম্মদোষে বেহুলা-নারী শিয়রে বসিয়া।
মরা পতির কাছে বাপ দিয়া গেছে বিয়া।।

গান গায় আর কাঁদে কাজলরেখা। কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের কপাট খুলে যায়। কাজলরেখা দেখে এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর হাতের ছোঁয়ায় লোহার কপাট খুলেছে—কাজলরেখা ভাবে সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই তার স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবেন। সাধুর পায়ের উপর পড়ে রোদন করে কাজলরেখা। অভয় দিয়ে সাধু বলেন ঃ 'ভয় নেই কন্যা। এই মৃত কুমার এক রাজপুত্র। এর গায়ে যত সুচকাঁটা আছে, সব তুমি একটি একটি করে তোল। শুধু চোখের কাঁটা দুটি রেখে দাও। এই নাও গাছের পাতা। স্নান করে শুদ্ধ হয়ে এই পাতার রস দেবে কুমারের দুই চোখে, তুলে নেবে চোখেব দুটি সুচ। তখনই জেগে উঠবে কুমার। কিন্তু, সাবধান, যত বিপদেই পড়ো, স্বামীর কাছে আত্মপরিচয় দেবার চেষ্টা করো না। তাহলেই কিন্তু তোমার স্বামী প্রাণ হারাবে। তোমার পরিচয় রাজকুমারকে দেবে ধর্মমতি শুক। যতদিন তা না হয়, ততদিন তোমার কষ্ট। এই কথাগুলি বলেই সন্ন্যাসী যেমন হঠাৎ এসেছিলেন, তেমনই হঠাৎই চলে গেলেন।



তখন কাজলরেখা সন্ন্যাসীর কথামতন একটি একটি করে কুমারেব দেহ থেকে তুলতে থাকে সুচ। সাতদিন সাতরাত কেটে যায় সব সুচ তুলতে। বাকি থাকে শুধু দুটি চোখের দুটি সুচ। কাজলরেখা তখন মন্দিরের কপাট ভেজিয়ে রেখে বেরিয়ে পড়ে জলের খোঁজে। কিছুদূর যেতেই চোখে পড়ে এক বিশাল সায়র। টলমলে কালো জলে ভরা। কাজলবেখা সরোবরে নামতে যাবে স্নানের জন্য, এমন সময় সরোবরের অপর পার থেকে একটি লোক এগিয়ে আসে তার দিকে। দেখে মনে হয় গরিব চাষি, সঙ্গে কাজলরেখার সমবয়সি একটি মেয়ে। লোকটি কাজলরেখাকে জানায় সে বড়ো গরিব। মেয়েকে দুবেলা দুমুঠো খেতে দেয় এমন সংস্থান নেই। তাই মেয়েকে সে বিক্রি করে দিতে বেরিয়েছে পথে। কিন্তু গ্রামে তো এমন লোক নেই যে তার মেয়েকে কিনবে। তখন একজন সন্ন্যাসী তাকে বললেন যে, বনের মধ্যে থাকেন এক রাজকন্যা। তিনি একলা থাকেন, তাঁর একটি দাসীর দরকার, তুমি তার কাছেই যাও।

কাজলরেখা রূপে সুন্দর, গুণে সুন্দর। মেয়েটির দুঃখের কথা ভেবে তার মনে বড়ো কষ্ট হল। কাজলরেখা ভাবল, বনের পাখির কথা শুনে এক বাপ তার মেয়েকে বনে ফেলে রেখে চলে গেছে। পেটের ক্ষুধা মেটাতে আর এক বাপ তার মেয়েকে বিক্রি করতে বেরিয়েছে। এ জগতে না জানি আরও কত কষ্টে কাঁদছে কত লোক। তখন হাতের কঙ্কণ দিয়ে সে মেয়েটিকে কিনে নেয় চাষির কাছ থেকে। নাম রাখে কঙ্কণা দাসী।

কঙ্কণা দাসীকে মন্দিরের পথ দেখিয়ে দিয়ে কাজলরেখা বলে ঃ 'তুমি মন্দিরে যাও। দেখবে ঘরের মধ্যে শুয়ে আছেন এক মৃত রাজকুমার। তাঁর দুচোখে দুটি সুচ বেঁধা। তাঁর কাছে যেও না। দেখবে ঘরের কোণে রাখা আছে গাছের কিছু পাতা। সেই পাতা বেটে রাখবে। আমি স্নান করে ফিরে সেই পাতার রস ঢেলে দেব কুমারের চোখে। তখনই বেঁচে উঠবেন কুমার।'

দাসী চলে যেতেই কাজলরেখার বাঁ চোখের পাতা কেঁপে ওঠে। কাজলরেখা ভাবে সব কথা দাসীকে বলা ঠিক হয়নি। দুরুদুরু বুকে তাড়াতাড়ি নামে স্নান করতে সরোবরের জলে।

ওদিকে মন্দিরের পথে যাওয়ার সময় কঙ্কণা দাসীর মনে কুবুদ্ধি খেলা করে। পাতা বেটে, রস করে সে আর কাজলরেখার জন্য অপেক্ষা করে না। নিজেই গিয়ে পাতার রস ফেলে দেয় কুমারের দুই চোখে। তার আগে তুলে নেয় সুচ দুটি। সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে যায়। ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন কুমার শয্যায়, যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে তাঁর। সামনে কঙ্কণা দাসীকে দ্যাখেন কুমার। তার হাত দুটি ধরে বলেন, 'কী চাও বলো, মেয়ে?' তুমিই কি আমায় প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছো?' দাসী বলে, 'কুমার, আমায় বিয়ে করো'। রাজকুমার কঙ্কণা দাসীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেন, বলেন, যার কৃপায় তিনি প্রাণ ফিরে পেয়েছেন, সে-ই তাঁর ঘরণী। কুমারের কথা শেষ হয়। তখনই ঘরে ঢোকে কাজলরেখা। ভিজে কাপড়, সদ্যধোয়া মুখ, অপরূপ সুন্দরী কাজলরেখাকে দেখে কুমার মুগ্ধ। কুমার বলেনঃ

কোথা হতে আইলে কন্যা কিবা নাম ধর।
কিবা নাম বাপ মা-র কোন্ দেশে ঘর।।

কাজলরেখা কুমারের কথার উত্তর দেবাব আগেই কঙ্কণা দাসী বলেঃ 'কঙ্কণে কিনেছি কন্যা নাম কঙ্কণ দাসী।' এইভাবে অদৃষ্টের খেলায় কাজলরেখা হল দাসী কঙ্কণ, আর কঙ্কণ দাসী হল নকল রানি। সন্ন্যাসী বলেছেন, নিজের থেকে স্বামীর কাছে নিজের পরিচয় দিলে তার স্বামী মারা যাবেন। কাজলরেখা তাই আত্মপরিচয় দেয় না। স্বামীর সঙ্গে নকল রানির দাসী হয়ে সে যায় স্বামীর রাজ্যে।

'রাজবাড়িতে কাজলরেখা কাজ করে দাসীর মতো। সে জল তোলে, ঝাঁট দেয়, ঘরদোর-পরিষ্কার করে, আর নকল রানির ফরমাশ খাটে। নকল রানির মনে বড়ো ভয়, কাজলরেখা কখন না জানি নিজের কথা খুলে বলে রাজকুমারকে। তাই সে কোনো সময়ও তাকে চোখের আড়াল করে না। সব সময় তার ফাইফরমাশ আর সবসময় তার খবরদারি কাজলরেখার উপর। এদিকে কাজলরেখাব মিষ্ট স্বভাব, হাবভাব আর তার রূপ দেখে সুচরাজা ভাবেন, এ নিশ্চয়ই কোনো বড়ো ঘরের মেয়ে। বারবার তাই রাজা কাজলরেখাকে একই প্রশ্ন করেন ঃ

কে তুমি সুন্দর কন্যা কোথা বাড়িঘর।
কিবা নামটি মাতাপিতার কিবা নাম তোর।।
তুমি যে হইবে কন্যা রাজার ঝিয়ারি।
কর্মের লিখনে তুমি ফির বাড়ি বাড়ি।।

কাজলরেখা উত্তর দেয় ঃ

আমি যে কঙ্কণা দাসী শুন দিয়া মন।
তোমার নারী কিনলো দিয়া হাতের কঙ্কণ।।
বনে ছিলাম বনবাসী দুঃখে দিন যায়।
ভাতকাপড় জোটে মোর তোমারই কৃপায়।।
মাও নাই বাপও নাই গর্ভসোদর ভাই।
আসমানের মেঘ যেন ভাসিয়া বেড়াই।।

দিনের পর দিন কাজলরেখার পরিচয় জানতে না পেরে রাজা পাগলের মতো হয়ে যান। খান না, ঘুমান না, রাজকার্যে মন দিতেও পারেন না। শেষে অনেক ভেবে রাজা ঠিক করলেন— দেশভ্রমণে বেরোবেন। বৃদ্ধ মন্ত্রীকে ডেকে সুচরাজা পরামর্শ দেন, তিনি যখন থাকবেন না, তখন মন্ত্রী যেন কৌশলে কাজলরেখার পরিচয়টি জেনে নেন। তারপর সুচরাজা যান নকল রানির কাছে। তাকে বলেন যে, তিনি দেশ ভ্রমণে যাবেন। কী আনবেন রানির জন্য, জিজ্ঞাসা করেন। নকল রানি রাজাকে ফর্দ দেয়— বেতের ঝাইল আর কুলা, আমলি কাঠের ঢেঁকি আর কাঁসার বেঁক খাড়ুয়ার। এরপর, রাজা যান দাসী কাজলরেখার কাছে। একই প্রশ্ন করেন তাকে— কী নিয়ে আসবেন তার জন্য? কাজলরেখা বলে, রাজার অনুগ্রহে তার কোনো কিছুরই অভাব নেই। তার জন্য রাজাকে কিছুই আনতে হবে না। তবু রাজার মন ভরে না। অনেক পীড়াপীড়ির পর কাজলরেখা বলে, রাজা তার জন্য যেন ধর্মমতি শুক পাখিকেই নিয়ে আসেন।

সুচরাজা বিদেশ যান, দেশে দেশে ঘোরেন। কত গ্রাম শহর গঞ্জ দেখেন। নকল রানির ফরমায়েশি জিনিস তিনি সহজেই পেয়ে যান। কিন্তু কাজলরেখার চাওয়া সেই ধর্মমতি শুক, সে তিনি আর কোথায় পাবেন? খুঁজে খুঁজে সময় চলে যায়। শেষে দেশে ফেরবার আর যখন মাত্র পনেরো দিন বাকি, তখন রাজা হাটে-বাজারে ঢেঁড়া দেওয়ান ঃ কেউ যদি একটি ধর্মমতি শুকপাখি নিয়ে আসতে পারে, রাজা অনেক দাম দিয়ে তার কাছ থেকে কিনে নেবেন সেই পাখি। সুচরাজ জানতেন না, তিনি তখন আছেন কাজলরেখার বাপের দেশে। ধনেশ্বর সদাগর রাজার দেওয়া ঢেঁড়া শুনে ভাবলেন, মেয়ে কাজলরেখা ছাড়া আর কেউ তো ধর্মমতি শুকের সংবাদ জানে না। সুখেই থাক আর দুঃখেই থাক, কাজলরেখা যেখানে আছে, এই পাখি নিশ্চয় সেখানেই পৌঁছাবে। এই কথা ভেবে ধনেশ্বর সুচরাজার লোকের কাছে বেচে দিলেন তার পাখি। দেশে ফিরে রাজা নকলরানিকে দিলেন তার বেতের কুলা আর ঝাইল, আমলি কাঠের ঢেঁকি, আর কাঁসার বেঁক খাড়ুয়া। কাজলরেখাকে দিলেন অনেক কষ্টে জোগাড় করা সেই ধর্মশুক।

তারপর সুচরাজা বৃদ্ধ মন্ত্রীর কাছে সব খোঁজখবর নেন— রাজ্যের কথা আর কাজলরেখার পরিচয়েব কথা। মন্ত্রী রাজাকে বললেন, কাজলরেখার সঠিক পরিচয় তিনি জানতে পারেননি, তবে সে যে খুব বড়ো-বংশের মেয়ে, সে-বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ নেই। রাজা যখন ছিলেন না, তখন রানির অন্যায় জেদ প্রজাদের খেপিয়ে তুলেছিল। রাজ্যের বিপদ হতে পারত; কিন্তু কাজলরেখার পরামর্শ মতন কাজ করে মন্ত্রী সে বিপদ কাটিয়ে ওঠেন। সুচরাজা আর বৃদ্ধ মন্ত্রী দুজনেই বুঝলেন— কে আসল রানি আর কে আসল দাসী। তবু আরও নিশ্চিন্ত হবার জন্য মন্ত্রী রাজাকে বললেন, বিদেশ ঘুরে দেশে ফিরলেন, মহারাজ। আপনার বন্ধুদের দুদিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। একদিন রাঁধুন আপনার রানি, আর একদিন দাসী কাজলরেখা। কথাটা রাজার মনে ধরল। সেইমতো ব্যবস্থা হল। নকল রানি রাঁধলে চালতার অম্বল, ডৌয়ার ঝাল, কচুশাকের ঘণ্ট, আরও কত কী আবোল-তাবোল। বন্ধুদের সঙ্গে খেতে বসে রাজার মাথা হেঁট। পরদিন দাসীর পালা। কাজলরেখা ভোরে উঠে স্নান করল, নদীর জল এনে পাকশালা পরিষ্কার করল। তারপর বসল রান্নায়। রান্না হল চিকন চালের ভাত, পাঁচ রকম মাছ, পায়েস আর পিঠা, চই, চপড়ি আর পোয়া। রান্নার শেষে ঘরে দিল জলের ছিটা; কাঁঠালের পিঁড়ি পেতে তার সামনে থালায় সাজাল পঞ্চব্যঞ্জন, পাশে দিল পাতিলেবুর টুকরো আর লবণ, বাটিতে সাজিয়ে দিল দই, দুধ আর ক্ষীর; দুধে দিল সবরি কলা, ঝারিতে রাখল আচমনের জল, বাটায় দিল মশলার পান। রাজার বন্ধুরা সুন্দর সুন্দর খাবার আর পরিপাটি ব্যবস্থার খুব প্রশংসা করলেন। সুচরাজা যত বোঝেন, তত হা-হুতাশ করেন।

আবার একদিন রাজা পরীক্ষায় ডাকেন দুজনকে। বলেন, বন্ধুরা আসবে, ঘরদোর সাজাও সব ভালো করে। যে যত সুন্দর করে পারো, আলপনা আঁকো। নকলরানি আঁকে কাউয়ার ঠ্যাঙ আর বগার পায়া, হুক্কুর টাইল আর ধানের ছড়া। দাসী আঁকে ধানের ছড়া; কিন্তু তার মাঝে সাজিয়ে দেয় মা লক্ষ্মীর পায়ের পাতা, পাশে আঁকে দেবদেবীর মূর্তি— কৈলাস পাহাড়ের শিবদুর্গা আর গোকুলের লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি। রাজার পাত্রমিত্র, মন্ত্রী-কর্মচারী সবাই একবাক্যে কাজলরেখার সুন্দর আলপনার প্রশংসা করেন। রাজা আর তাঁর বৃদ্ধমন্ত্রী বুঝতে পারেন সবই, কিন্তু কী করে কাজলরেখার সত্য পরিচয় জানা যাবে তা তাঁরা ভেবে পান না।



এদিকে রাতে সবাই যখন ঘুমায়, কাজলরেখা জেগে থাকে। জাগে আর তার সাধের শুকপাখিটির কাছে গিয়ে কাঁদে। কাঁদে আর বলে, বলো, শুক, বলো, বাপ-মা আমার কেমন আছে? দশটি বছর কেটে গেল, একদিনের তরেও দেখলাম না তাঁদের। দ্যাখো, পাখি, বাপের কথায় মরা সোয়ামীকে বাঁচিয়ে তুলতে সেবা করলাম। এমন কপাল আমার, হাতের কাঁকন দিয়ে যে দাসীকে কিনলাম, সেই আজ রানি হয়ে আমাকে দাসী করে রেখেছে। পাখি, তুমি বল, কবে আমার দুঃখের দিন শেষ হবে? কাজলরেখা রোজ কাঁদে— আর এই কথা বলে। একদিন শুকপাখি তাকে জানায়— তার দেশের বাড়িতে বাপ-মা ভালো আছেন। তবে মেয়েকে বনবাসে রেখে এসে কেঁদে কেঁদে ধনেশ্বর সদাগর অন্ধ হয়ে গেছেন। কাজলরেখার শোকে সদাগরের লোক-লশকর প্রজা কর্মচারী দেশ-ঘরের যত মানুষ সবাই কাতর। তবে কাজলের কপালে আরও দুবছর দুঃখভোগ রয়েছে। তারপর স্বামী আর রাজ্যপাট সবই সে ফিরে পাবে।

সুচরাজার প্রাসাদে হাসি নেই, আলো নেই। রাজার মন উতলা। রাজপাটে নেই মন। নকলরানির উপর তাঁর সন্দেহ হয়। কিন্তু কাজলরেখা তো নিজের পরিচয় খুলে বলে না; তাই রাজা কিছু করতেও পারেন না। ওদিকে কাজলরেখার মনেও সুখ নেই। রোজ রাতে সে পাখির কাছে নিজের দুঃখের কথা বলে একটু হালকা হয়। হয়তো এভাবেই পাখির কথামতো কাজলরেখার দুঃখের আর দুটো বছর যেত কেটে। কিন্তু সুচরাজার মতিগতি দেখে নকলরানি ভয় পায়। কাজলরেখাকে তো সে মোটেই দেখতে পারতো না। এখন

তার নামে বদনাম রটায়। কাজলরেখা নাকি মোটেই ভালো মেয়ে নয়। রাজার বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিল সোনাধর সদাগর। কাজলরেখাকে তার খুব পছন্দ। দাসীকে সে নিজের দেশে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কাজলরেখা তার স্বামীর দেশ ছেড়ে যাবে কেন? তখন নকলরানি আর রাজার সেই দুষ্ট বন্ধু দুজনে মিলে শলা-পরামর্শ করে রাজার কানে কাজলরেখার চরিত্র নিয়ে নানা মিথ্যে কথা বলে। সুচরাজার মন এমনিতেই উদ্‌ভ্রান্ত; এইসব কথা শুনে তিনি আরও পাগলের মতো হয়ে যান। খুব রেগে গিয়ে কোনো কিছু না ভেবে তিনি সেই বন্ধুকে বললেন, 'যাও, মেয়েটাকে রেখে এসো সাগরদ্বীপে।' বিনা দোষে দোষী কাজলরেখা চোখের জলে বুক ভাসায়। কিন্তু, সন্ন্যাসীর নির্দেশে নিজের থেকে কিছু বলতেও পারে না।

অকূলসমুদ্রে ডিঙা ভাসে কাজলরেখাকে নিয়ে। রাজার বন্ধু ডিঙায় বসে কাজলরেখাকে নিজের পরিচয় দেয়। তাকে বিয়ে করতে বলে। কাজলরেখা মহাবিপদে পড়ে। বলে—



শুন রাজা আমার কাহিনী।
বাপে বনবাসে দিল জানি কলঙ্কিনী॥
রাজার বাড়ি দাসী ছিলাম কলঙ্কী হইয়া।
ঘরের বাহির হইলাম আমি কলঙ্ক লইয়া॥
ডুবাইয়া দাও না মোরে এই সাগর জলে।
মানুষেরে না দেখাই মুখ কোনো কালে॥



সোনাধর কাজলরেখার কথা শুনতে চায় না। বিয়ে করবে বলে তাকে জোর করে নিজের দেশে নিয়ে যেতে চায়। উপায় না দেখে কাজলরেখা তখন দেবতাদের ডাকে। বলে, 'আমি যদি সতী নারী হই, সমুদ্রে উঠুক চড়া, ডিঙা যেন আর এগোয় না।' কাজলরেখার ডাকে সাগরের দেবতা সাড়া দিলেন। অকূলসায়রে উঠল চড়া; সোনাধরের নাও সেই চড়ায় গেল আটকে। মাঝিমাল্লারা বলে, এ কন্যা কোনো মানুষ নয়; ডাকিনী কিংবা যোগিনী। তখন সোনাধর কাজলরেখাকে সেই চড়ায় নামিয়ে দিয়ে চলে যায়।

কাজলরেখার বাপের বাড়ি এতদিনে অনেক কিছু ঘটে গেছে। মেয়ের শোকে ধনেশ্বর কেঁদে কেঁদে মারা গেছেন। ছেলে রত্নেশ্বর বাপের সপ্তডিঙা নিয়ে আবার বাণিজ্যে বেরিয়ে পড়েছে। বেচাকেনা সেরে দেশে ফেরার পথে ঝড়তুফানের মুখে রত্নেশ্বরের সপ্তডিঙা নোঙর ফেলে সেই মাঝদরিয়ার চরে, যেখানে কাজলরেখা একা পড়ে আছে। সুচরাজার কথামতো সোনাধর বণিক তাকে নির্বাসনে দিয়ে গেছে দু-মাস। চরের উপর জন্মায় আখের মতো এক ধরনের গাছ। সেই গাছের মিষ্টি রস খেয়ে প্রাণে বেঁচে আছে কাজলরেখা। রত্নেশ্বর চরে ডিঙি বেঁধেছে ঝড়ের রাতে। ভোর হলে ঝড়ের দাপট কমে। রত্নেশ্বর চরে নামে। দেখে এক পরমা সুন্দরী কন্যা। ভায়ের চার বছর বয়সে বনবাসী হয়েছে কাজলরেখা। ভাই আর বোন কেউ কাউকে চিনতে পারে না।

অকূলসাগরে অজানা চরে হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। রত্নেশ্বর তাকে ডিঙায় তুলে নিয়ে রওনা দেয় দেশের পথে; দেশে ফিরে রত্নেশ্বর যেই নিজেদের বিরাট অট্টালিকায় ঢোকে, কাজলরেখার আর কিছু বুঝতে বাকি থাকে না। বাড়িঘর দেখে সে সবই চিনতে পারে। কিন্তু সন্ন্যাসীর নিষেধ, নিজের পরিচয় দিতে পারে না কাজলরেখা ভাইয়ের কাছে। তাতে যে তার ফেলে-আসা স্বামী সুচরাজার মৃত্যু ঘটবে। শূন্য পুরী; মা নেই; বাপ নেই; দুজনেই কন্যার শোকে মারা গেছেন। নেই সেই প্রিয় শুকপাখিটিও। কাজলরেখা এখন নিজেদের বাড়িঘরে থেকে ঘরে ঘরে ঘোরে আর মনে মনে কাঁদে। বলে—

হায় বাপ ধনেশ্বর রইছ কোথাকারে।
তোমার কন্যা ঘরে আসে বারো বছর পরে।।

বাড়ির দাসদাসীরা কাজলরেখাকে কাঁদতে দেখে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। কন্যা উত্তর দেয় না, শুধু চোখের জল ফেলে। খবর যায় সদাগরের কাছে। রত্নেশ্বর নিজে এসে হাজির হয়। কাজলরেখা যে দিদি, সে তো জানে না। তাই তার মনের কথাটুকু সদাগর অকপটে বলে ফেলে কাজলরেখার কাছে। বলে, অকূলদরিয়ার চরে তাকে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল; তাই, বিয়ে করবে বলে সে কন্যাকে নিয়ে এসেছে নিজের গৃহে। ভাই রত্নেশ্বরের কথা শুনে কাজলরেখা মনে মনে বিপদ গোনে। রত্নেশ্বরকে, কাজলরেখা বলেঃ

হাড়ি কি ডোমের কন্যা নাহিক ঠিকানা।
না জানিয়া বিয়া করতে শাস্ত্র করে মানা।।
আমার যে পরিচয় কন্যা আমি কইতে নারি।
দশবছর কালে বাপ করল বনচারী।।
শুকপক্ষী আছে এক সুচরাজার পুরে।
পরিচয় কথা সেই কহিবে তোমারে।।

কালরেখার কথা শুনে রত্নেশ্বর শুকপক্ষীকে আনার জন্য প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে সুচরাজার রাজ্যে পাঠাল দূত। সে বাজ্যে তখন রাজা নেই; বাজপুরীতে নকলরানি একা। কাজলরেখাকে রাগের বশে সমুদ্রে বিসর্জন দিতে বলে সুচরাজা মনের দুঃখে দেশছাড়া। রত্নেশ্বরের দূত যখন অনেক ধনরত্ন নিয়ে রাজদরবারে হাজির হল, তখন অন্দরমহল থেকে সবকথা শুনে নকলরানি ভাবল, 'এই সুযোগ! পাখিটাকে বেচে দিই— ওইটা এবাড়িতে আসাব পব থেকেই রাজার মন উতলা হয়েছে।'

বত্নেশ্বব সদাগব পাখি পেয়ে খুব খুশি। নগরে গ্রামে ঢোল পিটিয়ে দেয়— সমুদ্র থেকে যে জলপরীকে নিয়ে এসেছে, তাকেই বিবাহ করবে সে। বিবাহের আগে সভার মধ্যে ধর্মশুক ঘোষণা করবে জলপরীর আসল পরিচয়। এই অদ্ভুত খবর খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সভার দিন কাছাকাছি, সবদেশ থেকে রাজা-রাজড়ারা এসে হাজির হলেন ধর্মশুক আর জলপরীকে দেখার জন্য। বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন যে সুচরাজা, তিনিও দেশে দেশে ঘুরতে ঘুরতে বত্নেশ্বর বণিকের সভায় এসে হাজির। সোনার খাঁচায় করে ধর্মমতি শুককে নিয়ে আসা হল সভার মাঝখানে। সুচরাজা পাখিকে দেখেই চিনলেন। মনে মনে সব ব্যাপারটা তিনি আঁচ করতে পারছিলেন। জলপরী যে কাজলরেখাই, তা যেন সুচরাজা ভেবেই নিয়েছিলেন। তবু কৌতূহল মেটানোর জন্য তিনি সভায় রইলেন।

তারপর পাখি শোনাল জলপরীর পরিচয়। সবাই জানল, ধর্মশুকের কথাতেই অমঙ্গল এড়ানোর জন্য ধনেশ্বর সদাগর তার মেয়ে কাজলরেখাকে একদিন বনবাসে রেখে এসেছিলেন।

সেই জলপরীই এই কাজলরেখা। শুক কাজলরেখার দুঃখের কাহিনী এক-এক করে বর্ণনা করে শোনাল সবাইকে।

কাজলরেখার দুঃখ-কষ্টের কাহিনী আর গুণের কথা শুনে সভার যত লোক, দেশ-বিদেশের মান্যগণ্য রাজ-রাজড়া, বণিক-সদাগর সবাই ধন্য ধন্য করলেন, একবাক্যে প্রশংসা করতে লাগলেন কাজলরেখার। শুধু রত্নেশ্বর সাধু লজ্জায় আর অনুতাপে মুখ লুকাল। শুকপাখি যখন তাকে দেখিয়ে বলল, 'ভাই হয়ে রত্নেশ্বর তার দিদিকে বিয়ে করতে চায়, তোমরা সবাই শোনো'— তখন সভা ছেড়ে রত্নেশ্বর চলে গেল দিদি কাজলরেখার ঘরে। বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল কাজলরেখার কাছে।

ওদিকে সভায়-উপস্থিত সুচরাজা চোখের জল ফেলেন আর রত্নেশ্বরের পাত্র-মিত্র-কর্মচারীদের কাছে কাজলরেখার কুশল জানতে চান। না বুঝে, না ভেবে নকলরানির কু-মন্ত্রণায় তিনি তাঁর স্ত্রী কাজলরেখাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন সাগরজলে। কত কষ্টই না সে ভোগ করেছে সেই নির্জন দ্বীপে। সুচরাজার পরিচয় পাওয়ার পর রত্নেশ্বর সদাগর খুব ধুমধাম করে তার দিদির বিয়ের আসর বসাল নতুন করে। রাজা কাজলরেখাকে পেয়ে খুশি মনে ফিরে গেলেন নিজের রাজ্যে।

রাজ্যে ফিরে সুচরাজা কাজলরেখাকে লুকিয়ে রাখলেন প্রাসাদের একটি ঘরে। তারপর নকলরানির সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, বিদেশে ঘুরে বেড়াবার সময় তিনি জানতে পেরেছেন তাদের কঙ্কণা দাসী আসলে রত্নেশ্বর সদাগরের বোন। সুচরাজার ঘরে কাজলরেখা যে দাসী হয়ে কষ্টভোগ করেছে, পরে তাকে সাগরে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে— এ সব কথা শুনে রত্নেশ্বর খুব ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তিনি সৈন্যসামন্ত জোগাড় করে সুচরাজ্য আক্রমণ করতে আসছেন। এখন তাদের কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে সব ধনরত্ন সঙ্গে নিয়ে। এইসব কথা বলে সুচরাজা লোক লাগালেন মাটি কেটে একটি সুড়ঙ্গ বানাতে। দুদিন লাগল সেই সুড়ঙ্গ কাটতে। তারপর রাজা নকলরানিকে বললেন, দামি গহনাগাঁটি আর যত ধনরত্ন সব নিয়ে তাঁরা কয়েকদিন সুড়ঙ্গের মধ্যে থাকবেন। রত্নেশ্বর তাদের দেখতে না পেয়ে লুঠ করে চলে গেলে, তাঁরা আবার বাইরে বেরিয়ে আসবেন। নকলরানি এইকথা শুনে নিজের যত গহনা, আর শুকপাখি বিক্রি করে যত মণিমুক্তা পেয়েছিল, সেই সব নিয়ে সবার আগে তাড়াহুড়া করে ঢুকল সুড়ঙ্গেব মধ্যে। তারপর সুচরাজা হুকুম দিলেন মাটিচাপা দিয়ে সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে দিতে। তাই করা হল। নকলরানি কঙ্কণা দাসী যে রাজার কাছে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে কাজলরেখাকে দশটি বছর রাজপুরীতে দাসী করে রেখেছিল, তার জন্য এইভাবে সে পেল উচিত শাস্তি। ওদিকে কাজলরেখাকে রানি হিসেবে পেয়ে সবাই খুশি। রাজা তো খুশিই। বৃদ্ধ মন্ত্রীও খুব খুশি, কারণ তিনি কাজলরেখার সুন্দর বুদ্ধির পরিচয় আগেই পেয়েছিলেন। খুশি সব প্রজারাও; কারণ কাজলরেখার মিষ্ট কথা, শান্ত স্বভাব আর গরিব লোকেদের প্রতি তার দয়া আর মমতায় তারা বাঁধা পড়ে গেছে তার কাছে। তারপর থেকে কাজলরেখা আর সুচরাজা মহাসুখে আমোদ-প্রমোদ আর দান ধ্যানে দিন কাটাতে লাগলেন।

কাজলরেখার কথাটি ফুরলো; নটে গাছটিও মুড়োলো।



দুখু আর সুখু



এক তাঁতির দু-বউ। দু-বউ-এর দু মেয়ে। বড়োর নাম সুখু আর ছোটোর নাম দুখু। তাঁতির অবস্থা বেশ ভালো। রাজবাড়ির যত কাপড়, সব তাঁতিই বুনত কিনা। তার বদলে রাজার কাছ থেকে দামি দামি মোহর পেত তাঁতি; তাই তার কোনো অভাব ছিল না। গোয়ালে গোরু, পুকুরে মাছ, মড়াই-এ ধান। আর ঘরভর্তি সুখ। কিন্তু সব সুখটুকু বড়ো বউ আর তার মেয়ে সুখুই ভাগ করে নিত। ছোটো বউ আর তার মেয়ে দুখুর ভাগে কিছুই থাকত না। কিন্তু তাহলে কী হয়? তার জন্যে একটুও মন খারাপ করত না তারা। বরং সারা দিনভোর মুখ বুজে কাজ করে যেত। এই ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। এই বাসন মাজছে। এই রান্নাবাড়ি করছে, মধ্যে মধ্যে আবার তাঁতির সঙ্গে থেকে কাপড় বোনা আছে। আছে চরকা কেটে সুতো তৈরি, সুতোয় রং দেওয়া—এইসব। সারাদিন কাজ করার পর বিকেল হলে বড়ো বউ তাদেব দুটি ভাত বেড়ে দিত। মোটা মোটা চালের ভাত। কাঁচা লঙ্কা আর নুন। কিন্তু দুখু আর দুখুর মা তাই খেত কত তৃপ্তি কবে। পেটটা ভরে খেয়ে মাটির দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। এই রকমই চলছিল। চলতে চলতে একদিন হঠাৎ তাঁতি গেল মরে।

ছোটো বউ যখন শোকে আছাড়ি-পিছাড়ি, বড়ো বউ তখন মনে মনে ভাবছে। হায়রে, দিন বোধহয় চলেই গেল। এবার যে রাজার পেয়াদা আসবে। তাঁতির সব কিছু ভাগ হয়ে যাবে। এইসব ভেবে চোখ মুছতে মুছতে ঘবে গেল বড়ো বউ। একটা থলির ভেতর সব মোহর ভরে নিল। পেতলের ঘড়ায় নিল সব গয়না। সেই সঙ্গে ভালো ভালো শাড়ি-জামা। তারপর মাটির ভেতর গর্ত করে কলসির মধ্যে রেখে দিল সবকিছু।

শোক কেটে গেলে রাজার পেয়াদা এসে সব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়ে গেল। ছোটো বউ আর তার মেয়ে পেল কিছু খারাপ জামা-কাপড়, কিছু চাল, ডাল, একটা মাটির বাড়ি আর একটা খারাপ তাঁত। সেই তাঁত বুনে ভালো শাড়ি হয়ই না। একখান গামছা তাও দরে বিকোয় না। দেখতে দেখতে বড়ো কষ্ট এসে গেল দুখু আর দুখুর মায়ের জীবনে। ওদিকে সুখুর মা সুখুকে রুই মাছের মুড়ো দিয়ে ভাত দেয়। বালাম চালের ভাত, ঘন ক্ষীর, ডাল। তার উপর তরকারি। আর এদিকে দুখু আর দুখুর মায়ের মাছের মুড়ো দূরের কথা, দুটো মোটা চালের ভাতও জোটে না। কোনোদিন শাকপাতা খায়। কোনোদিন বুনো ফল খায়। কোনোদিন পেট ভরে শুধুই জল। এতেও তাদের মনে কোনো হিংসে নেই। কোনো রাগ নেই। কোনো দুঃখ নেই। এমনি করেই চলছিল। চলতে চলতে একদিন—

একদিন দুখুর মা গেল নদীতে চান করতে। দুখুকে বলল — দুখু, তুলো কটা বাইরে রোদে শুকোতে দেওয়া আছে। দেখিস, যেন ঝড়ে উড়ে না যায়।

দুখু বলল — আচ্ছা মা, তুমি যাও। আমি দেখছি। — বলে দুখু আবার চরকায় সুতো কাটতে লাগল। ঠিক এই সময় এল একটা ঝড়। ধাঁ করে এসে সাঁ করে সবকটা তুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল। হায় হায় করে

উঠল দুখু। এখন কী হবে। ওই তুলো কটাই যে শেষ সম্বল। ওই তুলো থেকে সুতো কাটা হবে। সেই সুতো দিয়ে গামছা বোনা হবে। সেই গামছা বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে যে পয়সা হবে, সেই সামান্য পয়সা দিয়ে চাল কিনবে দুখুর মা। তবেই না দুটো খেতে পাবে তারা। অথচ সব তুলো কটা ঝড় উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। দুখুর দু-চোখ ভরে উঠল। সে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল — ঝড় ভাই, ঝড় ভাই, আমাদের ওই তুলো কটা ফিরিয়ে দিয়ে যাও।

কিন্তু ঝড় শুনল না তার কথা। শুনল ঝড়ের পেছনে পেছনে আসা সেই বাতাসটা। বাতাস বলল — দুখু তুমি কেঁদো না, আমার পেছন পেছন এসো, আমি তোমাকে সব তুলো ফিরিয়ে দোব।

দুখু তখন কী আর করে। তুলো কটা না হলে যে তাদেব চলবে না। তাই বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করল দুখু। একটু গেছে কি যায়নি, পেছন থেকে ডেকে উঠল মুংলি গোরু — দুখু-দি, দুখু-দি!

দুখু দাঁড়াল। বলল —কী ভাই মুংলি?

মুংলি গোরু বলল — তুমি কোথায় যাচ্ছ দুখু-দি।



আমি তুলো আনতে যাচ্ছি। দুখু তাড়াতাড়ি বলল। ঝড়ে আমার সব তুলো উড়ে গেছে। বাতাস বলেছে, সে আমাকে সব তুলো ফিরিয়ে দেবে। তাই যাচ্ছি বাতাসের সঙ্গে।

বেশ, বেশ। মুংলি শিং নেড়ে বলল। তবে যাবার আগে আমার গোয়ালটা একটু কেড়ে দিয়ে যাও না দুখুদি। বড়ো নোংরা হয়ে আছে এটা।

এ আর এমন কী কথা। সত্যিই তো এত নোংরায় কি মুংলি থাকতে পারে। দুখু জল দিয়ে ঝাঁট দিয়ে গোয়াল তকতকে করে রেখে আবার হাঁটতে লাগল। বাতাস কিছুটা এগিয়ে গেছে। তা যাক। একটু জোরে হাঁটলেই তাকে ধরে ফেলবে। তাই জোরে জোরে পা চালাল দুখু। একটু গেছে কি যায়নি। আবার হঠাৎ পেছন থেকে ডাক।

দুখুদি, দুখুদি!

দুখু তাকিয়ে দেখে কী, একটা কলাগাছ। সবুজ পাতা দু-পাশে ছড়িয়ে দিয়ে হাওয়ায় দুলছে আর বলছে —দুখুদি, আমার গোড়াটা বড়ো নোংরা হয়ে আছে। আগাছা জন্মেছে।

দুখু ঘাড় বাড়িয়ে দেখে নিয়ে বলল — তাইতো।

তুমি গোড়াটা একটু পরিষ্কার করে দেবে দুখুদি।

কেন দোব না ভাই। বলে গোড়ার কাছে চলে গেল দুখু। তারপর দু-হাতে বনপালা সরিয়ে, আগাছা তুলে ফেলে পরিষ্কার তকতকে করে দিল সে।

আঃ বাঁচলাম। কলাগাছ হাত নাড়িয়ে বলল — তা তুমি কোথায় যাচ্ছ দুখুদি।

আমি তুলো আনতে যাচ্ছি। বাতাস আমাকে তুলো ফিরিয়ে দেবে বলেছে। বলে দুখু ছুটতে শুরু করল। বাতাস আরও দূবে চলে গেছে। না ছুটলে বাতাসকে ধবতেই পারবে না সে।

সবে একটুখানি গেছে সেই সময় আবার ডাক।

ও ভাই দুখু, ও ভাই দুখু।

দুখু ফিবেই অবাক — ওমা, চাঁপাদি তুমি! এ কী ছিরি হয়েছে তোমার।

চাঁপা গাছ একটুখানি হেসে বলল — সেই জন্যেই তো তোমায় ডাকলাম, ওই দেখো না দুষ্টু ছেলেরা আমাব ডাল ভাঙছে, পাতা ছিঁড়ছে, ফুল তুলছে। তুমি ওদের একটু বারণ করে দাওনা ভাই।

দুখুও তাই দেখল। জনে জনে ছেলেদের কাছে গিয়ে তাদেব মাথায় হাত রেখে সে আদর করে বলল —ছিঃ, ডাল ভাঙতে নেই। পাতা ছিঁড়তে নেই। অমন করে ফুলও তুলতে নেই। তারা দুখুর কথা শুনতেই দুখু আবাব ছুটতে শুরু কবল।

ওইতো বাতাস আগে আগে যাচ্ছে। একটু ছুটলেই ধরে ফেলবে দুখু। সামনে একটা বড়ো বন। বনের ভেতর যে-ই ঢুকবে ঠিক সেই সময য পাশ থেকে এক ঘোড়া— দুখুদি, দুখুদি বলে ডেকে উঠল। আবার দাঁড়াতে হল দুখুকে। পাযে পায়ে গিযে দাঁড়াল ঘোড়ার কাছে। বলল —কী ভাই ঘোড়া?

আমাব বড্ড খিদে পেয়েছে দুখুদি। বনেব ভেতব কোনো ঘাস নেই। তুমি কি আমাকে কিছু ঘাস এনে দেবে?

এ আর এমন কী কথা। দুখু এক ছুটে গিয়ে জলায় নামল। তারপর লম্বা লম্বা সবুজ ঘাস দুহাত ভরে তুলে নিয়ে এল। ঘোড়া আহ্লাদে আটখানা। হাসতে হাসতে বলল — এবার তুমি যেতে পারো দুখুদি।

কিন্তু তখন যে বাতাস আরও দূর চলে গেছে। অনেক অনেক দূরে বাতাসের একটা কোণা দেখতে পেল দুখু। দেখেই সে ছুটতে শুরু করল। ছুটছে তো ছুটছেই। সে বন পেরুল। মাঠ পেরুল। জলা পেরুল। দরদর ঘামতে লাগল দুখু। হাঁসফাঁস করে করে নিশ্বাস পড়তে লাগল তার। শেষে হাঁফাতে হাঁফাতে একসময় এসে পৌঁছল দুখু।

দুখু দেখে তো অবাক। এমন সুন্দর বাড়ি সে জীবনে দেখেনি। ধবধবে সাদা আর ছোট্ট বাড়িটা। আর কেউ কোথাও নেই। শুধু এক বুড়ি দাওয়ায় বসে বসে চরকায় সুতো কাটছে। সেই সুতো দিয়ে আপনা-আপনি তৈরি হয়ে যাচ্ছে সুন্দর সুন্দর কাপড়। বুড়ি সেই কাপড় নিয়ে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিতেই সেগুলো মেঘ হয়ে উড়তে উড়তে আকাশ পাড়ি দিচ্ছে।

ও, এই তো সেই বুড়ি। ঠিক ঠিক, এতক্ষণে মনে পড়েছে দুখুর। এই সেই চাঁদবুড়ি। বাতাস কানে কানে এসে বলল — যাও বুড়ির কাছে গিয়ে তুলো চাও এবার।

চিনতে যখন পেরেছে তখন আর ভয় কী দুখুর। সে আস্তে আস্তে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তারপর বলল — চাঁদঠাকমা, চাঁদঠাকমা, ঝড় আমাদের সব তুলো নিয়ে চলে এসেছে এখানে। সেই তুলো না পেলে মা আমাকে খুব বকবে।

চাঁদঠাকমা তাকাল। চুলগুলো যেন চাঁদের আলো। চোখ দুটো যেন টুপটুপিয়ে জ্বলা তারা। একটু হাসল চাঁদঠাকমা। হাসিতে যেন মেঘের বুকে চিক্কুর। দুখুর দিকে তাকিয়ে আলতো করে গালটা ধরল তার — আহা রে, মুখটা যে বড়ো শুকিয়ে গেছে দিদিভাই! নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে। তুলোর ব্যবস্থা হবে'খন। প্রথমে ওই ঘরে যাও। ওঘরে গামছা আছে। তার পরের ঘরে কাপড় আছে। তার পরের ঘরে তেল আছে। সব শেষে ওই পাশেই পুকুর। ওই পুকুরে গিয়ে দুটো ডুব দিয়ে এসো। ডুব দিয়ে ওঘরে গিয়ে চাট্টি খেয়ে নাও। তারপর তুলো দোব'খন।



যেমন যেমন বলল চাঁদঠাকমা, ঠিক তেমন তেমন করল দুখু। প্রথমে ঘরে গেল। গিয়েই অবাক। কী ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর গামছা। রঙিন ফুলছাপ, আর মোলায়েম। এমন গামছা জীবনে দেখেনি দুখু। কিন্তু হাতের কাছে ভালো গামছা থাকতেও সে কিনা বেছে নিল ছোট্ট ম্যাড়মেড়ে একটা কানি। এরকম হয় পরের ঘরেও। সেখানে থরে থরে সাজানো কাপড়। রেশমের, মখমলের কিন্তু এখানেও সে-সবে হাত দিল না দুখু। চান করে উঠে পরার জন্যে নিল একটা কমদামি আটপৌরে ডুরে শাড়ি। শেষ ঘরে গিয়ে আরও চমকে উঠল দুখু। এঘরে থরে থরে সাজানো গন্ধ তেল, ফুলেল তেল, চন্দন-বাটা, কস্তুরি। নাঃ, সে-সবে হাতই দিল না দুখু। মাথায় একটু তেল দিল কী দিল না। ছুটে গিয়ে নামল পুকুরের জলে। এক ডুব দিয়ে জল থেকে উঠতেই অবাক কাণ্ড। দুখু গেল বদলে। কী ব্যাপার!

দুখুর গায়ের রঙ হল টুকটুকে। নাক হল টিকলো। চোখ হল কাজল কালো। দাঁত হল মুক্তো। আর চুল হল বর্ষার মেঘ। সে কী রূপ! রূপের আলোয় আলো চারদিক। এমন রূপের কথা দুখু জানতেও পারল না। দুখু দ্বিতীয়বার ডুব দিয়ে উঠতেই আবার অবাক কাণ্ড। অবাক বলে অবাক। এবার তার গা-ভর্তি গয়না। গায়ে আর গয়না ধরে না। গলায় সীতাহার। কপালে টিকলি। চুলে খোঁপা-বন্ধনী। কানে ঝুমকো। নাকে ফুল। হাতে কাঁকন আর চুড়।

দুখু তখন জল থেকে উঠে এল। এক দেহ রূপ নিয়ে। সারা গায়ে ঝমর ঝমর গয়না নিয়ে এবার সে গেল খাবার ঘরে। সেখানে ঢুকে দুখু তো থ। পোলাও, পরমান্ন, মাছের কালিয়া — আরও সব ভালো ভালো খাবার। এমন খাবার জীবনে দেখেনি সে। খিদেয় তার পেট জ্বলছে, তবু সে ভালো ভালো খাবারের দিকে লোভ দিল না। ঘরের এক কোণে বসে এক থালা পান্তা পেট ভরে খেয়ে ফিরে এল চাঁদঠাকমার কাছে।

—খেয়েছিস দিদিভাই? বলে চাঁদঠাকমা একগাল হাসল। এবার যাও, ওই ঘরে বাক্সে তুলো আছে নিয়ে যাও।

ঘরে গিয়ে দুখু দেখল ছোটোবড়ো বাক্সে ঘর ঠাসা। সে বেছে-বুছে সবচাইতে ছোটো বাক্সটা নিল। তারপর ফিরে এসে পায়ের ধুলো নিতেই একগাল হাসল চাঁদঠাকমা। বলল — রানি হও, দিদুভাই। রাজরানি হও। এবার মায়ের কাছে যাও তুমি।

তখন ফিরল দুখু। যে পথ দিয়ে এসেছে সেই পথ দিয়েই ফিরছে সে। পথে দেখা হল সেই ঘোড়ার সঙ্গে। ঘোড়া বলল — দুখুদি, দুখুদি, আমি তোমাকে একটা জিনিস দোব। বলে সে দুখুকে ফুটফুটে সুন্দর এক পক্ষিরাজ ঘোড়া দিল। এরপর দেখা হল চাঁপা গাছের সঙ্গে। চাঁপা গাছ বলল — তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ ভাই। আমি তোমাকে একটা উপহার দোব। বলে চাঁপা গাছ একঘড়া মোহর দিল দুঃখুকে। কলাগাছ দুখুকে দিল একছড়া সোনার কলা আর সেই মুংলি গাই ভালোবেসে দুখুকে তার বাছুর কপিলাকে দিল। সব নিয়ে দুখু বাড়ির পথ ধরল।

এদিকে চান করে ফিরে এসে দুখুকে না দেখতে পেয়ে মা তো কেঁদে কেঁদে সারা। পথ দেখল। ঘর দেখল। আশ দেখল। পাশ দেখল। শেষে কোথাও না পেয়ে হায় হায় করতে লাগল দুখুর মা। ঠিক তখনই দুখুকে দেখা গেল তাদের কুটিরের পাশে। তাকে আসতে দেখে ছুটে গেল দুখুর মা — কোথায় ছিলি বাছা আমার! বলতে বলতে কাঁদতে কাঁদতে এবার চোখ পড়ল দুখুর রূপে, দুখুর গয়নায়। টাটু ঘোড়া, মোহর, শেষে কপিলা বাছুর। সব দেখে দুখুর মা অবাক। কোথায় পেলি এসব। দুখু দাওয়ায় মায়ের কোলের কাছে বসে সব কথা খুলে বলল।



শুনে আনন্দ আর ধরে না দুখুর মায়ের। এত আনন্দ কি একা একা নেওয়া যায়! দুখুর মা গেল সুখুর মায়ের কাছে — দিদি, দিদি, দেখো কী কাণ্ড। চাঁদঠাকমা সব দিয়েছে দুখুকে। গা-ভর্তি রূপ দিয়েছে। দেহ-ভর্তি গয়না দিয়েছে। আরও কত সব। আমাদের দুখুর আর কোনো দুঃখ থাকবে না। তা এত সুখ কী করব আমরা। তাই সুখুও কিছু নিক।

— থাক থাক, অত সুখে আমার সুখুর কাজ নেই। মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠল সুখুর মা। অমন ভিক্ষের জিনিস নাই বা নিলুম। ওসব ছাতার মাথা তোরাই নিয়ে সুখে থাক। বাছা সুখুর আমার দরকার নেই ওসব। বলে দুখুর মাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল সুখুর মা।

কী আর করা। মন খারাপ করে ফিরে এল দুখুর মা। তারপর সেদিন রাতে ঘরের ভেতর সেই ছোট্ট বাক্সটা খোলা হল। বাক্স থেকে তুলো বেরিয়ে আসার কথা। কিন্তু ওমা একী কাণ্ড? তুলোর বদলে বাক্স থেকে বেরিয়ে এল এক সুন্দর রাজপুত্তুর। সে এসেই বলল — দুখুকে আমি বিয়ে করে রানি করব।

এদিকে সুখু আর সুখুর মা হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরছে। সব-সময় মা মেয়েতে গুজগুজ ফুসফুস। শেষে একদিন রোদে তুলো শুকোতে দিয়ে নাইতে গেল সুখুর মা। পাহারায় রইল সুখু। একটু পরেই ঝড় উঠল।

ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল তুলো। তখন ঝড়ের পেছন পেছন ছুটল সুখু। পথে গাই বলল — একটু শুনে যাও বাছা।

সুখু মুখঝামটা দিয়ে বলল — আমার খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই, বসে বসে তোমার কথা শুনি আর কী।

কলাগাছ, চাঁপাগাছ আর ঘোড়া সবাই ডাকল সুখুকে। সুখুর কারোর দিকে তাকাবার সময়ও নেই। সে হনহন করে এগিয়ে গেল। শেষে গিয়ে পড়ল সেই চাঁদঠাকমার কাছে। চাঁদঠাকমা তখনও বসে বসে সুতো কাটছে চরকায়।

ফরফর করে এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়াল সুখু। বলল,

— ও বুড়ি সুতো কাটা এখন থামা। আগে ওই পোড়ারমুখি দুখুটাকে যা যা জিনিস দিয়েছিস, তাই তাই দে আমাকে। কেন দেবার আর লোক ছিল না পৃথিবীতে?

চাঁদঠাকমা তো অবাক। কী কট কট করে কথা বলে মেয়েটা। ড্যাব ড্যাব করে চায়। লাজলজ্জা কিচ্ছুটি নেই গো।

—ভাবছিস কী শুনি। — বলে এক ধমক দিল সুখু। বেশি দেরি করবি তো ওই চরকাটাই দোব ভেঙে।

বুড়ি বলল — থাক থাক। আমি দিচ্ছি। আগে চান খাওয়া করে নে। তারপর সব পাবি।

বলতে তর সয়না। হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকল সুখু। ভালো গামছা নিল। সুন্দর শাড়ি নিল। মাথায় ফুলেল তেল দিল। সারা গালে চন্দন ঘষল। তারপর গেল পুকুরে। পুকুরে গলা জলে দাঁড়িয়ে ভাবল আর তাকে পায় কে। এক ডুবে পাবে রূপ। আর এক ডুবে গয়না। তিন ডুবে না জানি আরও কত কী পাবে। না! আর ভাবতে পারে না সুখু। টুপ টুপ টুপ করে একেবারে তিনটে ডুব দিল সে।

কিন্তু একি, একি! সব এরকম হয়ে গেল কেন। রূপ কী হল, গয়না কী হল! তার বদলে সারা গায়ে খোস, পাঁচড়া আরা আঁচিলে ভর্তি। চুল জটার দড়ি। বড়ো বড়ো নখ। ঠোঁট থেকে বেবিয়ে আসা দাঁত। হায় হায় করতে করতে কেঁদে ফেলল সুখু। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল বুড়ির কাছে। বলল — তুই আসলে ডাইনি। তুই-ই এরকম করেছিস।

চাঁদঠাকমা বলল — আ-পোড়াকপালি। আমি করব কেন বাছা। তোরই দোষ। লোভে পড়ে তিনটে ডুব দিয়েছিলি তো। তো যাক। কেঁদে আর কী হবে বল। যা হয়েছে তা হয়েছে। এখন বেলা পড়ে এল। এবার দুটো খেয়ে নে।

বুড়িকে গাল দিতে দিতে সুখু খাবার ঘরে গিয়ে দুধপুলি, ক্ষীরমোহন, পরমান্ন এমন সব ভালো ভালো খাবার খেল। খেতে খেতে আদ্দেক ছড়াল। খাওয়া শেষ হলে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বুড়ির কাছে এসে বলল — এবার আমার বাক্স দে। মায়ের কাছে ফিরে যাই।

বুড়ি চাঁদঠাকমা হেসে হাত তুলে বলল — ওই যে, ওই ঘরে যা, বাক্স আছে। পছন্দ করে একটা বাক্স নিয়ে যা।

হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকল সুখু। তারপর সবচাইতে বড়ো, সবচাইতে ভালো বাক্সটা মাথায় করে বাড়ির পথ ধরল সে। আসবার আগে অবশ্য চাঁদঠাকমাকে শাপশাপান্ত করতে ভুলল না।

পথে সুখুর রূপ দেখে ভয়ে আধখানা হয়ে গেল সবাই। সুখুকে দেখে কুকুর পালাল। বেড়াল কাছেই ঘেঁষল না। পথে প্রথমে পড়ল ঘোড়া। ঘোড়ার কাছাকাছি হতেই এক চাট মারল সুখুকে। ওগো, মা গো! বলে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল সুখু। এরপর চাঁপা গাছের ডাল ভেঙে মাথায় পড়ল তার। মাথা ফেটে রক্ত বেরুলো।

কলা গাছের কাছে যেতেই এক কাঁদি কলা পিঠের উপর পড়ল। কোমরের হাড় গেল ভেঙে। যন্ত্রণায় কেঁদে ফেলল সুখু। শেষে মুংলি গোরু যখন শিং নেড়ে তেড়ে এল, তখন আর কোনো উপায় নেই। ছুট ছুট ছুট।

এদিকে বাড়িতে সুখুর মা তৈরি হয়ে বসে আছে। সুখু রূপ নিয়ে, গয়না নিয়ে আর রাজপুত্র নিয়ে ফিরবে। আজ বড়ো আনন্দের দিন। সুখুর মা চারদিক পরিষ্কার করেছে। ঘরে ঘরে আলপনা দিয়েছে। আমপাতার শিকলি করে টাঙিয়েছে। সুখুকে দেখা গেলেই শাঁখে ফুঁ দেবে।

সেই সুখুকে দেখতে পেল একসময়। শাঁখে ফুঁ দেওয়া হল না। তার বদলে হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল শাঁখটা। একী, একী রূপ হয়েছে সুখুর। সুখু কাছে আসতে তাকে বুকে টেনে নিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল মা — কে, কে এমন করল আমার সুখু মাকে। এখন কী হবে! কোথায় যাব! বলতে বলতে মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে গেল সুখুর মা।

জ্ঞান ফিরে আসতে মা বলল — যা হয়েছে হয়েছে। আর তো চারা নেই। ওই বাক্সটাই ঘরে তোল। নিশ্চয়ই সেই রাজপুত্র আছে। রাজপুত্র এলে আবার সব আগের মতো হয়ে যাবে।

তখন দুজনে ধরাধরি করে বাক্স ঘরে তুলল।

রাতে সুখুর মা সুখুকে সাজাতে বসল। কিন্তু চুল বাঁধবে যে, চুলে জটা। গায়ে সাবান দেবে যে, গায়ে পাঁচড়া। হাতে কাঁকন পরবে যে, হাত ফুলে ঢোল। কী আর করা। ওই রকম চেহারাতেই ঘরে ঢুকল সুখু। মা বলল — দরজায় খিল দিয়ে তারপর বাক্স খুলিস। রাজপুত্রকে বিয়েতে রাজি করিয়ে তবে আমাকে ডাকিস।

সুখু ঘরে খিল দিল। মা এস বসল দাওয়ায়। কান পড়ে আছে ঘরের দিকে। কখন সুখু ডাকে। এক প্রহর গেল, ডাকল না। দু প্রহর গেল, ডাকল না। তিন প্রহর গেল, ডাকল না। আর পারল না সুখুর মা। মেঝেতে শাড়ি বিছিয়ে গা এলিয়ে দিতেই ঘুম। যখন ঘুম ভাঙল তখন সব প্রহর চলে গেছে। ঝনঝন করছে বেলা। কাঠফাটা রোদ্দুর উঠেছে। দরজার দিকে তাকাল সুখুর মা। দরজা যেমন কে তেমন।

মা দৌড়ে গেল — অ-সুখু, সুখু! অনেক বেলা হল মা, দরজা খোল।

তবু দরজা খোলে না। কোনো শব্দও হয় না।

মা বলল — অ-সুখু, চান-খাওয়া করবি না?

তবু দরজা খোলে না। শেষে কপাট ভাঙল সুখুর মা। কপাট খুলে সুখুর মা অবাক। ভেতরে খাঁ খাঁ। সুখুর চিহ্ন নেই। তাহলে সুখু কোথায় গেল! ভাবতে ভাবতে দেখতে পেল মেঝের ওপর রক্ত-লাগা কখানা হাড়। পাশেই অজগর সাপের খোলস।

— ওমা গো। বলে বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল সুখুর মা। সুখু আর নেই। অজগর খেয়েছে সুখুকে। আর সুখুর মা-ও দরজায় মাথা ঠুকে মরে গেল।



বাঘামামা



কুসুমপুরের ঘোষেদের বিরাট পরিবার। ঘোষেরা সাত ভাই। সাত ভাইয়েরই সাত বউ। সংসারের গৃহস্থালী কাজকর্ম মিলেমিশে সাত বউয়েই করে। বিধবা শাশুড়ি থাকে পুজো অর্চনা নিয়ে বেশির ভাগ সময়েই ঠাকুরঘরে। সংসারে আরও একজন আছে— ওই ছেলেদের ঠাকুমা— সাত বউয়ের দিদিশাশুড়ি। বয়স প্রায় একশোর কাছাকাছি। সে ঘরে একা একা বসে মালা জপ করে। একটা দাঁতও নেই। খাওয়ার জন্য গলানো, গুঁড়ো কিংবা নরম জিনিস দিতে হয় তাকে। খাওয়ার শেষে বউয়েরা পান ছেঁচে দেয়। বুড়ি ফোকলা গালে সেই ছেঁচা পান ফেলে পাকলে পাকলে খায়।

রাতের বেলা সবার খাওয়া শেষ হলে, সব কাজ চুকিয়ে একসঙ্গে রান্নাঘরে ভাতের থালা নিয়ে খেতে বসে সাত বউ। সেই সময় রাজ্যের গল্প হাসি ঠাট্টা চলে নিজেদের মধ্যে। খাওয়া শেষ হলে রান্নাঘর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে সাত বউ যে যার ঘরে চলে যায় শুতে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এক একটা দিন শেষ হয় এইভাবেই।

এমনি করেই দিন কাটে। দিন পেরিয়ে মাস, মাস পেরিয়ে বছর। ঘুরে ফিরে আসে শরৎকাল। নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো হালকা সাদা মেঘের দল ভেসে বেড়ায়। হালকা বাতাসে আনন্দে দোল খায় দুধসাদা কাশ ফুল। মাটি থেকে ভারী সুন্দর একটি সুবাস ওঠে। পুজো আসছে। নিজের নিজের ঘরে ফিরে আসে প্রবাসী পুরুষেরা। যে-সব মেয়ে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ঘর করে, তাদের বাপের বাড়ি থেকে কত রকম উপহার আর তত্ত্ব নিয়ে লোক আসে। কাপড়-চোপড়, আলতা-সিঁদুর—এমনি কত কী।

রাতের বেলায় রান্নাঘরে সাতবউ খেতে বসেছে। বড়ো বউ বলল,

'বাবা এসেছিলেন। কতকাল পরে দেখলাম বাবাকে। আমার জন্য এনেছেন রঙিন শাড়ি, আলতা, সিঁদুর, চুড়ি— আরও কত কী। কী আনন্দটাই যে হচ্ছে আমার!'

বড়ো বউয়ের কথা শুনে একে একে সবাই বলতে লাগল তাদের বাপের বাড়ি থেকে কে কী পেয়েছে, কারা সেসব নিয়ে এসেছিল —এই সব। কারও বাবা, কারওবা বড়ো ভাই এসেছিল। সে-সব কথা তারা সবাই মিলে বলাবলি করতে লাগল। এদের মধ্যে কেবল ছোটো বউই ছিল চুপচাপ। বেচারার তিনকূলে কেউ নেই। থাকবার মধ্যে ছিল এক মামা। মামাই তাকে মানুষ করেছিলেন। বিয়েও দিয়েছিলেন। সেই মামারও বহুদিন কোনো খবর নেই। যে সময়ের কথা— তখন না ছিল রেলগাড়ি, না ছিল আজকের মতো ডাক-ব্যবস্থা! তাই ইচ্ছে থাকলেও সাধারণ লোকের পক্ষে দূর দেশের আত্মীয়-স্বজনদের খবরাখবর নেওয়া কঠিনই ছিল। সবাইয়ের মনে আনন্দ, ছোটো বউয়ের মনটাই ভারি, মনটাও বিষণ্ন। বড়ো বউ জিজ্ঞাসা করল,

'কিরে ছোটো, তুই যে বড়ো চুপচাপ? তোর বাড়ি থেকে কেউ আসেনি এবার?'

ছোটো বউ বলল,

'দিদি, তোমরা তো জান, আমার বাবা-মা, ভাই-বোন কেউ নেই। থাকবার মধ্যে ছিলেন আমার বাঘামামা— তাঁরও তো আজ ক'বছর ধরে কোনো খবর নেই। এতদিন কি আর আমার বাঘামামা বেঁচে আছে? বোধ হয় মারাই গেছেন।'

বলতে বলতে ছোটো বউয়ের গলা ধরে এল। চোখ দুটো ভরে উঠল জলে।

বউয়েরা খেতে বসে যখন কথা বলছিল, তখন এক বাঘ সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। বউয়েদের গলার আওয়াজ পেয়ে কৌতূহলী হয়ে বাঘ সেই রান্নাঘরের দেয়ালের পাশে বসে তাদের কথা শুনছিল। সবশেষে ছোটো বউয়ের কথা শুনে বাঘেরও খুব দুঃখ হল। বাঘটার মনটা ছিল ভারী ভালো। সে ভাবল, মেয়েটির মামা হয়ে কিছু উপকার করলে কেমন হয়? এই ভেবে বাঘটা ঘোষবাড়ির সদব দরজার কড়া নাড়ল।



দরজা খুলেই শাশুড়ি তো মূর্ছা যায় আর কী! খোলা দরজার সামনে লেজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি বাঘ! বাঘ হাতজোড় করে বলল,

'বেয়ান, পেন্নাম হই। আমি আপনার ছোটো বউয়ের বাঘা-মামা। যদি অনুমতি করেন তাহলে ভাগ্নিকে কদিনের জন্য বাড়ি নিয়ে যাই। পুজোর সময় আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব।'

শাশুড়ির মুখ দিয়ে তো কথাই সরে না। অনেক কষ্টে ভয় কাটিয়ে শাশুড়ি বলল, 'এ তো বড়ো ভালো কথাই, বেয়াই। তবে কিনা— ছেলেরা আছে, তাদের না জিজ্ঞেস করে আপনাকে তো কিছু বলতে পারছি না। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি ওদের জিজ্ঞেস করে আসি।'

শাশুড়ি এসে তাঁর ছেলেদের সবকথা বললেন। ছেলেরা গেল ভীষণ ঘাবড়ে। এ অবস্থায় কী করা যায় ভাবতে ভাবতে তারা ঢুকল ঠানদির ঘরে পরামর্শ নিতে।

সব শুনে ঠানদি বলল,

'— দ্যাখ্, বাঘের কথায় রাজি না হলে বাঘ কি আর আমাদের ছাড়বে? বাড়িশুদ্ধ সবাইকে মেরে খেয়ে ফেলবে। আবার রাজি হলেও ছোটো বউয়ের নিস্তার নেই। তাকে কি আর বাঘ আদর করবে? খেয়েই ফেলবে ঠিক। আমি বলি, সবাইয়ের বিপদ না ডেকে এনে— একজনের উপর দিয়েই যদি বিপদটা কেটে যায়, তবে সেই ভালো। তোরা ছোটো বউকে ছেড়ে দে।'



তখন শাশুড়ি তার শাশুড়ি ঠাকরুণের পরামর্শ শুনে ছোটো বউকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন বাঘের কাছে। ছোটো বউকে দেখে বাঘ তো খুব খুশি। বলল,

'কীরে ভাগ্নি, তোর বাঘামামাকে চিনতে পারছিস?'

ছোটো বউ বেচারি আর কী করে! ভয়ে ভয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল— চিনতে পেরেছে। আরও খুশি হয়ে বাঘমামা খ্যাক্ খ্যাক্ করে একচোট হেসে নিল। তারপর বলল,

'ভাগ্নি আর দেরি করিসনি। আমার ঘাড়টা শক্ত করে ধরে পিঠের ওপর বসে পড়। চোখ দুটো মেলে থাকিস না, বুঁজে থাক।'

ছোটো বউ আর কোনো উপায় না দেখে মনে মনে দুর্গানাম স্মরণ করে বাঘের পিঠে চেপে বসল। বাঘ তিন লাফে তাকে নিয়ে গিয়ে তুলল বনের মধ্যে তার নিজের বাসায়।

ভয় পেলেও ছোটো বউ উপস্থিত-বুদ্ধি হারাল না। বাসায় পৌঁছে বাঘের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল,

'আমাকে পিঠে করে বয়ে আনতে তোমার খুব কষ্ট হয়েছে মামা। এস, তোমার গা হাত-পা একটু টিপে দিই।'

ছোটো বউ গা হাত-পা টিপে দিতে বাঘের তো খুব আরাম হল। বাঘ বলল,

'আচ্ছা ভাগ্নি, বলতো—আমায় দেখতে কেমন?'

বুদ্ধিমতী ছোটো বউ জবাব দিল—

'কি সুন্দর হলুদ রঙে কালো কালো ডুরে
তোমার রূপের আলো দেখি আমার দুচোখ জুড়ে।'

তাই শুনে বাঘ খুশি হয়ে আবার প্রশ্ন করল,

'বলতো ভাগ্নি, আমার চোখ দুটো কেমন?'

ছোটো বউ জবাব দিল—

'পদ্মফুলের পাপড়ি যেন
তোমার দুটি চোখ
তোমার চোখের মায়ায় আমি ভুলেছি সব শোক।'

চোখের প্রশংসা শুনে এবার বাঘ বলল,

'বলতো ভাগ্নি, আমার নাকটা কেমন?'

ছোট বউ মিষ্টি হেসে বাঘের গোঁফ জোড়ায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল—

'মামা তোমার নাক নয়তো যেন শ্যামের বাঁশি
তোমার নাকের গড়ন দেখে ফুটল মুখে হাসি।'

বাঘ বলল,

'আর, আমার গায়ের গন্ধ?'

ছোটো বউ হাসতে হাসতে বলল—

'গোলাপ? নাকি চাঁপাই সেরা? বড়োই মনে ধন্দ
এদের চেয়ে সেরা আমার মামার গায়ের গন্ধ।'

এই শুনে বাঘ হা-হা করে হেসে বলে উঠল,

'আমার মুখটা কেমন দেখছিস্ রে ভাগ্নি?'

ছোটোবউ বাঘের গলা জড়িয়ে ধরে বলল—

'আহা, তোমার চাঁদ মুখেতে কতই ভালোবাসা
ও মুখ দেখে পুরলো আমার অনেক দিনের আশা।'

নিজের চেহারার প্রশংসা শুনলে দেবতারাই গলে যায়— বাঘতো কোন ছার। ভারী খুশি হয়ে বাঘ বলল,

'ভাগ্নি, তুই একটু বসে থাক। আমি বাজার ঘুরে তোর জন্য কিছু নিয়ে আসি।'

ছোটো বউকে বসিয়ে রেখে বাঘ গেল বাজারে। হালুম আওয়াজ করে লাফ দিয়ে সে যখন বাজারের মধ্যে ঢুকল, দোকানদাররা তখন প্রাণের ভয়ে দোকান ছেড়ে দে— ছুট। বাঘ কোনো দোকান থেকে কাপড়-চোপড়, কোনো দোকান থেকে আলতা-সিঁদুর, কোনো দোকান থেকে গয়না-গাঁটি, আবার খাবারের দোকান থেকে নানা রকম সুস্বাদু খাবার নিয়ে বাসায় ফিরে এল। ছোটোবউকে সব দিয়ে বলল—

'মিষ্টি সোনা ভাগ্নি আমার দুঃখ ভুলে যাও
বাঘা-মামার দেওয়া জিনিস দু'হাত ভরে নাও।
এবার থেকে ঘুরলে বছর—পুজোর সময় এলে
এমনি অনেক জিনিস আমি দেব তোমায় ঢেলে।'

ছোটোবউ এত দয়া আর ভালোবাসা পেয়ে আনন্দে গদগদ হয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে বাঘামামাকে প্রণাম করল। বাঘ খুশি হয়ে তাকে আশীর্বাদ করে আবার পিঠে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে এল কুসুমপুরে তার শ্বশুরবাড়িতে।

ছোটো বউকে ফিরতে দেখে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা— যাকে বলে হতবাক। তারা ভেবেছিল ছোটোবউ এতদিনে বাঘের পেটের মধ্যেই চলে গেছে। বাঘের দেওয়া উপহারগুলো জায়েদের দেখাতে



তারা সবাই খুব খুশি হল। খুশি হল না শুধু এক জা— সেজোবউ। ছোটোবউয়ের অবস্থা দেখে তার হিংসেয় বুক ফেটে যেতে লাগল। সে বসে বসে ফন্দি আঁটতে লাগল, কী করে ছোটো বউয়ের মতো উপহার আদায় করা যায় বাঘের কাছ থেকে।

পরের বছর শরৎকালে এক রাত্তিরে বউয়েরা সবাই খেতে বসে গল্প করছে। এমন সময় সেজোবউ বলল,

'এবার আমার বাপের বাড়ি থেকে কেউ আসেনি। আমারও এক বাঘামামা ছিল, তারও কোনো খবর নেই। এবারের পুজোটা আমার দুঃখেই কাটবে।'

সেই বাঘ সেদিনও এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের রান্নাঘরের পাশে। সেজো বউয়ের কথা শুনে তার মনে খুব দয়া হল। সদর দরজায় গিয়ে সে কড়া নাড়ল এবারও

দরজা খুলে দিয়ে বাঘকে দেখে শাশুড়ি এবার আর আগের বারের মতো ভয় পেল না। একগাল হেসে বলল,

'কী খবর বেয়াই-মশাই? এতদিন পরে এলেন কী মনে করে?'

বাঘ সেজোবউকে তার বাড়ি নিয়ে যেতে চাইল। শাশুড়ি আর সেজোবউকে ডাকবে কী — সে নিজেই এসে হাজির।

তারপর বাঘের পিঠে চেপে সেজোবউ হাজির হল বনের মধ্যে বাঘের ডেরায়। সেজোবউয়ের শরীরটা ছিল বেশ ভারি। তাকে পিঠে বয়ে বাঘের খুবই পরিশ্রম হয়েছিল। বাঘ ভাবল, এইবার বুঝি ভাগ্নি তার গা হাত-পা টিপে দেবে। কিন্তু সেজোবউ সে-সবের ধার-কাছ দিয়েও গেল না। বাঘকে বলল—

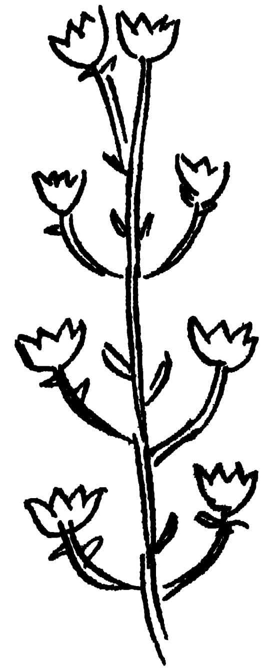
'কোথায় আমার গয়না শাড়ি শীঘ্র এনে দাও।
ওসব যদি না পাই আমি নড়ছি না এক পাও।'

সেজোবউয়ের কথা শুনে বাঘ মনে মনে বেশ অসন্তুষ্ট হল। তবু মনের ভাব গোপন করে বলল,—

'বলতো ভাগ্নি, আমায় দেখতে কেমন?'

সেজোবউ ছিল যেমনই স্বার্থপর, তেমনই মুখরা। সে বলল—

'তোমার ভীষণ চেহারাটা নয়কো মোটেই ভালো'
হলুদ রঙের ওপর— ছি ছি— ডোরাগুলো কালো।'



এই শুনে বাঘ ভীষণ রেগে গেল। অনেক কষ্টে রাগ চেপে সে বলল,

'বেশ, আমার চোখ দুটো দেখে কী মনে হয়?'

সেজোবউ সঙ্গে সঙ্গে বলল—

'ভাঁটার মতো চক্ষু দুটো জ্বলছে ধিকি ধিকি
তোমায় দেখে ছেলে-বুড়ো ভয় পায় যে ঠিকই'

বাঘেব বাগ বাড়তেই থাকে। তবু সে আবার জিজ্ঞেস করল,

'আচ্ছা, আমার নাকটা নিশ্চয়ই ভালো?'

সেজোবউ মুখ বেঁকিয়ে বলল,

'চ্যাপটা খ্যাঁদা নাকের তলায় ঝাঁটার মতো গোঁফ
মানুষ মেবে খাবার তরে তোমার বড়ো ঝোঁক।'

অনেক কষ্টে বাগ সামলে তবু বাঘ বলল,

'আব আমার গায়ের গন্ধ? সেটাও কি ভালো নয়?'

নাক সিটকে সেজোবউ বলল—

'বিট্‌কেল ওই গন্ধে আমার ঘুলিয়ে ওঠে গা
গন্ধে মালুম— তুমিই আসল সোঁদরবনের ছা।'

বাঘ রেগে হল অগ্নিশর্মা। তবু শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে সেজোবউকে আর একবার বলল,

'এইবার বল আমার মুখটা কেমন?'

এই কথা বলতে বলতে বাঘ লেজ আছড়াতে লাগল আর গলায় আওয়াজ করতে লাগল— গরর্‌-গরর্‌। সেজোবউ ওসবে ভ্রুক্ষেপ করল না। বলল—

'যেমন তোমার দেহের বহর তেমন বিরাট হাঁ
এক গরাসেই ঢুকবে পেটে প্রমাণ মানুষটা।'

সেজোবউয়ের কথা শেষ হতে না হতেই ভীষণ রাগে গর্জন করে উঠল বাঘঃ অনেক কষ্টে এতক্ষণ নিজেকে কোনো রকমে সামলে রেখেছিল; কিন্তু ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে। এমন দুর্মুখ আর স্বার্থপর মানুষকে কোনোমতেই ক্ষমা করা যায় না— এই ভেবে বাঘটা লাফিয়ে পড়ল সেজোবউয়ের ঘাড়ে।

বাঘের পেটের মধ্যে ঢুকে সেজোবউ হয়তো খুঁজছে শাড়ি, গয়না কিংবা আরও ভালো ভালো উপহার। ওসব না নিয়ে তো আর ফিরে যাওয়া যায় না।

আশ্চর্য ফুলগাছ আর আটটি ফুলের গল্প



রাজার বাগানের মালি গোকুল বড়োই সমস্যায় পড়েছে। রাজার বাগান দেখাশোনা করা আর রাজবাড়িতে নিত্য পূজার ফুল জোগান দেওয়া— এই কাজ তারা করে আসছে পুরুষানুক্রমে। এমন অদ্ভুত ব্যাপার কখনও শোনেনি সে; দেখেনি তো বটেই। তাই নিজের মনে ভাবে আর বাগানের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে গোকুল।

বাগানের মধ্যে কত অসংখ্য রকমের ফুলের গাছ। সব কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। একটা গাছেও আর ফুল ফুটছে না। এমন অবস্থা কি শুধু রাজার বাগানেই? সারা রাজ্য জুড়ে এক অবস্থা। কত রকমের সুন্দর পাখি এসে ভিড় জমাত, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত বাগানের গাছে গাছে ডালে ডালে কত তাদের নাচানাচি আর ডাকাডাকি। সেই পাখিগুলোও যে কোথায় গেল! ভাবতে ভাবতে হয়রান হয়ে যায় সে। গতকাল পর্যন্ত কোনো রকমে কিছু শুকনো বাসি মরাফুল খুঁজে পেতে পৌঁছে দিয়েছে রাজবাড়িতে। কিন্তু আজ তো কোনো উপায়ই দেখছে না। '—হায় হায়, কী যে অনাসৃষ্টি কাণ্ড শুরু হয়ে গেল রাজ্যে—'। বিড় বিড় করে নিজের মনেই এই কথা বলে আর হাত দিয়ে কপাল চাপড়ায় গোকুল। সত্যিই তো। অনাসৃষ্টি ছাড়া আর কী হতে পারে? অমন সুন্দর দেবীর মতো ছোটো রানি, তাঁকে রাজা অন্য রানিদের চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসতেন, তাঁর পেটে কিনা মানুষের বদলে—। আর ভাবতে পারে না গোকুল। কেমন একটা ভয়ের চোটে তার জীর্ণশীর্ণ শরীরটাও শিরশিরিয়ে ওঠে।

রাজার সাত সাতটা রানির মধ্যে ছোটোরানির রূপ আর গুণের কোনো তুলনা ছিল না। যেমন সুন্দর দেখতে, স্বভাবটিও ছিল তেমনই মিষ্টি। রাজবাড়িতে নিত্য ফুলের জোগান দিতে গিয়ে সবই তো দেখেছে গোকুল। গোকুলের হাত থেকে রোজ ভোরে ফুলের ডালা নিতেন ছোটোরানি। চান করে, ভিজে এলো চুল পিঠের উপর ছড়িয়ে, গোকুলের অপেক্ষায় রাজবাড়ির মন্দিরের চাতালে অপেক্ষা করতেন। গোকুল এলেই মিষ্টি হেসে তার হাত থেকে ফুলের ডালাটা নিয়ে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে যেতেন। তখন বাকি ছয়রানির ঘুমই ভাঙেনি। পুজো সারার পরও রাজসংসারের কত কাজ। সব কাজই হাসিমুখে সারতেন ছোটোরানি। এজন্য রাজাও বেশি পছন্দ করতেন ছোটোরানিকেই। বাকি ছয় রানি— চেহারা সুন্দর হলে কী হবে? গুণে ছোটোরানির ধারে কাছেও ছিল না। তার উপরে, বেশ বুঝতে পারত গোকুল— তাঁদের সবাইয়েরই ছিল ছোটোরানির উপর দারুণ হিংসে। ছোটোরানি তাঁর স্বভাবের গুণে সকলেরই মন জয় করতে পেরেছিলেন, কিন্তু পারেননি শুধু তাঁর সতীনদের মন জয় করতে। তিনি যতই সেবা আর যত্নে তাঁদের তুষ্ট করতে চাইতেন, ততই তাঁরা যেন তাঁর সঙ্গে বিরূপ ব্যবহার শুরু করতেন। কিন্তু এ-সব কথা কোনো দিনই রাজার কাছে তো নয়ই, কারও কাছেই তোলেন নি ছোটোরানি। সতীনদের হাজার অত্যাচার তিনি হাসিমুখে সহ্য করে যেতেন। বুড়ো মালি গোকুল তার অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে দেখে সবই বুঝতে পারত।

সেই ছোটোরানি যখন সন্তানসম্ভবা হলেন, তখন রাজ্য জুড়ে প্রজাদের মধ্যে কী আনন্দ! বাকি ছয় রানির কেউই আজ পর্যন্ত রাজাকে কোনো সন্তান উপহার দেন নি। রাজা যেমন খুশি হলেন, তখনি উদ্বিগ্নও হয়ে উঠলেন ছোটোরানির জন্য। বৈদ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি ভালো অভিজ্ঞ দাইয়ের খোঁজ করতে লাগলেন। আর সেই সময়, কী আশ্চর্য!—বড়ো ছয় রানি তাঁদের সমস্ত হিংসে আর বিরূপতা সবই যেন ভুলে গেলেন। তাঁরাই উপযাচিকা হয়ে রাজাকে বললেন— 'কোনো বাইরের দাইয়ের দরকার নেই। আমরাই ছোটোর দেখাশুনো করব।' রাজার মন থেকে সেদিন দুশ্চিন্তার ভারটা নেমে গিয়েছিল। ছোটোরানিও তার দিদিদের কাছ থেকে হঠাৎ যত্ন আর আদর পেয়ে ভীষণ খুশি হয়েছিলেন।



খুশি গোকুলও কম হয় নি। ছোটোরানিকে দেবীর মতোই ভক্তি-শ্রদ্ধা কবত গোকুল। কিন্তু কী সর্বনাশ যে হয়ে গেল। এরকম ঘটনাও ঘটে! ছোটো রানির পেটে নাকি আটটি সন্তান জন্মেছিল— তারা সবাই মরা। আর সবচেয়ে যেটা আশ্চর্য তা হল— তারা কেউই নাকি মানুষ নয়। গোকুল শুনেছে, একটি বেড়ালছানা, একটি কুকুরছানা আর বাকি সবই নাকি ইঁদুবছানা। বাজা কত আগ্রহ নিয়ে আঁতুড় ঘরের দিকে দৌড়ে এলেন। বড়োরানির মুখে সব শুনে প্রচণ্ড হতাশায় ভেঙে পড়লেন তিনি। তারপর রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে চেঁচিযে বলে উঠলেন, 'বেব করে দাও ওই ডাইনিকে। বাজবাড়িতে আর ওর ঠাঁই হবে না।'

সেদিনের সেই দৃশ্য মনে পড়লে গাকুলের চোখ দুটো ভিজে ওঠে জলে। সেই অসুস্থ অবস্থাতেই ছয় সতীন ঘাড় ধরে রাজবাড়ি থেকে দূর করে দিল ছোটো বানিকে। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে ছোটোরানি যতই বলেন— 'দিদি আমার কী হয়েছে— ছেলে না মেয়ে?'— দারুণ বিদ্রুপে ফেটে পড়ে তাঁর ছয় সতীন। বলেন, 'হয়েছে একটা কুকুর, একটা বেড়াল আর কটা ইঁদুবছানা। এখন রাজবাড়ি থেকে দূর হ তো'। একমাথা রুক্ষ চুল, পরনে ছেঁড়া কাপড়, দুর্বল দেহে ছোটোরানি কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন রাজবাড়ি ছেড়ে। গোকুল জানে না, এখন তিনি কোথায়। তবে শুনছে, এখন নাকি বড়োই দুঃখে দিন কাটে তাঁর। বনের মধ্যে পাতার কুটির বানিয়ে বাস করেন তিনি। গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দিয়ে, সেই ঘুঁটে বিক্রি করে দিন চলে তাঁর। আর রাজাও তারপর থেকে একেবারে গুম হয়ে আছেন। মুখে না আছে হাসি, না কথা। ছোটোরানির বিদায়ের দিনটি থেকেই সারা রাজ্য জুড়ে কোথাও আর গাছে ফুল ফোটে না, পাখি ডাকে না। সব যেন মরুভূমি হয়ে গেছে। গোকুলেরই হয়েছে বিপদ! ছয়রানি অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে কোনো রকমে দায়সারা গোছের পুজো করেন। তাঁরা গোকুলকে শাসিয়ে বলেছেন— 'কাল যদি ফুল না আনতে পারিস, তাহলে তোর গর্দান যাবে।' বুড়ো গোকুল সারা বাগান ঘুরে ঘুরে একটা ফুলেরও সন্ধান পায় না। এদিকে বেলাও বাড়ছে। সেই সঙ্গে গোকুলের ভয়ও বাড়ছে। গর্দান যাবার ভয়।

এমন সময় বাগানের একধারে একটা আশ্চর্য গাছ দেখে গোকুল যেন চমকে উঠল। এ বাগানের সমস্ত গাছই তার চেনা। এ গাছটা যে কবে জন্মাল আর কবেই বা এমন বড়ো হয়ে উঠল, তা তো গোকুল জানে না। গাছের আটটা ডালে আলো হয়ে ফুটে আছে আটটি ফুল। তার সাতটি সোনার বরন চাঁপা আর একটি গোলাপি রঙের পারুল ফুল। কিছুক্ষণ অবাক চোখে ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল গোকুল। তারপর ভাবল —'বুড়ো হয়েছি। খেয়ালও থাকে না সবকিছু। কিন্তু একই গাছে চাঁপা আর পারুল ফুল একসঙ্গে ফুটতে দেখিনি তো কখনও?' মনে মনে এই কথা ভাবতেই কে যেন ফিসফিস করে তার কানে কানে বলল— 'তাতে কী হয়েছে? কখনও কি শুনেছ মানুষের পেটে জানোয়ারের বাচ্চা হয়?' চমকে উঠে চারদিকে তাকিয়ে দেখল গোকুল। কই, কেউ তো নেই আশেপাশে? তবে কে বলল কথাটা? সেই গাছটার দিকে তাকিয়ে দেখল সবচেয়ে নিচু ডালে ফুটে-থাকা পারুল ফুলটি যেন তারই দিকে তাকিয়ে হাসছে। গোকুল ভাবল— তারই মনের ভুল হয়তো। যাকগে, এখন এই ফুল কটা তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের গর্দানটা বাঁচাই।

এই কথা ভেবে যেমনি সে সেই নিচু ডালের দিকে হাত বাড়াল, ডালটা তার হাতের নাগাল ছাড়িয়ে উঠে গেল অনেক উঁচুতে। অবাক হয়ে গোকুল শুনল একটি ছোটো মেয়ে মিষ্টি গলায় কাদের যেন ডেকে উঠল—

'সাত ভাই চম্পা আমার এবার মেল আঁখি'

সঙ্গে সঙ্গে সেই সাতটা চাঁপা ফুল যেন নড়ে উঠল। মনে হল তারাই যেন বলে উঠল—

'সকাল বেলায় পারুল বোনের কীসের ডাকাডাকি?'

এবার গোকুলের মনে হল— ছোট্ট মেয়ের মিষ্টি গলায় সেই পারুল ফুলটিই যেন বলল,—

'মোদের নিতে এসেছে যে রাজার বুড়ো মালি'

ভীষণ শোরগোল উঠল যেন সেই সাতটি চাঁপার ডালে।

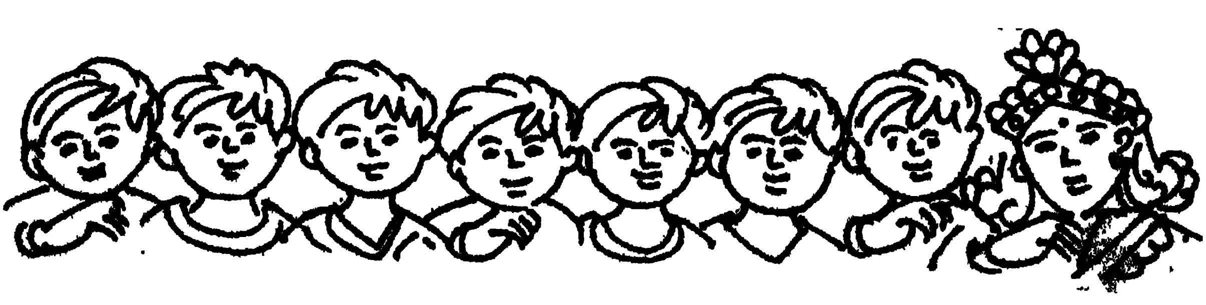
'তা হবে না মোদের নিতে রাজাই পারেন খালি।'

এমন অবাক কাণ্ড দেখে গোকুলের চোখ তো কপালে উঠে গেল। কী রকম ভয়-ভয় করতে লাগল তার। আর সেখানে এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে রাজবাড়ির দিকে ছুটল গোকুল।

রাজা প্রথমে গোকুলের কথা শুনে বিশ্বাসই করতে পারলেন না। শেষে নিজেই এলেন বাগানে। গাছটা দেখে তিনিও অবাক হলেন। রাজাকে গাছের কাছে আসতে দেখেই সেই পারুল ফুল যেন অবাক কথা বলে উঠল,—

'সাত ভাই চম্পা আমার, আমায় সাড়া দাও'

সঙ্গে সঙ্গে চম্পাদের ডালে ডালে যেন সাড়া জাগল। তারা সবাই যেন বলে ওঠে—



'কী হয়েছে পারুল বোনের কেনই বা ভয় পাও?'

পারুল মিষ্টি গলায় বলল—

'এবার এলেন রাজা মশাই কী বলব তাঁকে?'

চাঁপাদের স্পষ্ট জবাব—

'আগে রাজা আনুন ডেকে বড়ো রানিমাকে।'

রাজা তো সত্যিই অবাক! তবু তিনি ডেকে পাঠালেন বড়ো রানিকে। বড়ো রানি আসতেই চাঁপার দল বলে উঠল—

'আগে রাজা আনুন ডেকে মেজ রানিমাকে'

এমনি করে একে একে ছয় রানি এলেন। সবশেষে বলে উঠল সেই চাঁপার দল—

'বনের ধারে ঘুঁটে কুড়োন দুঃখে কাটান দিন
অভাবে আর দারিদ্র্যে যাঁর শরীর হল ক্ষীণ;
সেই দুঃখিনী ছোটো রানির হেথায় আসা চাই
ধরা দেব সবাই মোরা তাঁকেই যদি পাই।'

রাজা সব শুনছেন আর ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছেন। তাঁর আদেশে লোক ছুটল ছোটোরানিকে আনতে।

ছোটোরানি এলেন। দুঃখে-কষ্টে তাঁর মলিন চেহারা। পরনে শতচ্ছিন্ন নোংরা কাপড়। মাথার সেই কোঁকড়া কোঁকড়া সুন্দর চুল এখন তেলহীন রুক্ষ। ছোটোরানি এসে হাজির হতেই যেন সাড়া পড়ে গেল ফুলেদের মধ্যে। কল কল স্বরে আটটি ফুলের শিশু কথা কয়ে উঠল—

'মাগো, মোদের দুঃখী মাগো, মোদের ছিলি ভুলে
মোরা যে তোর ছেলে মেয়ে নে মা কোলে তুলে।
তোর সতীন ওই ছয়টি রানির হিংসে ভরা মন
পুঁতলো মোদের মাটির তলায় জন্মালাম যখন।
ছলনাতে ভুলল রাজা, রইলি দুঃখ সয়ে;
তাই তো রাজার ভুল ভাঙাতে ফুটেছি ফুল হয়ে।'

এই কথা বলার পর সেই আশ্চর্য ফুলের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল ছোটোরানির কোলে। রাজা দেখলেন, সাতটি সোনার বরন ফুটফুটে ছেলে আর একটি দুধে-আলতা বরন ফুটফুটে মেয়ে ছোটোরানির কোলজুড়ে রয়েছে। তাদের রূপে সারা বাগান যেন আলো হয়ে উঠেছে। বাগানের সব শুকনো মরা গাছের ডালে আবার যেন প্রাণ ফিরে এসেছে। সবুজ পাতায় আর সুগন্ধী নানা রঙিন ফুলে দেখতে দেখতে রাজার বাগান আবার ভরে উঠল। হারিয়ে যাওয়া পাখির দল আবার এসে বসেছে গাছের ডালে ডালে। তাদের মিষ্টি গলার গানে জীবনের আনন্দের সুর।

রাজা তখন ছয় রানিকে ডেকে শুধোলেন—'এসব সত্যি?'

ছয় রানি এমনভাবে ধরা পড়ে গিয়ে হেঁটমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কোনো জবাব দিতে পারলেন না রাজাকে। রাজা সবই বুঝলেন। রাগে আর ঘৃণায় জ্বলে উঠল তাঁর সমস্ত শরীর। রক্তচক্ষু রাজা সেনাপতিকে ডেকে আদেশ দিলেন—'এই ছয় ডাইনিকে জীবন্ত পুঁতে ফেল।'

সেনাপতিকে আদেশ দিয়ে ছোটো রানির কাছে এগিয়ে গেলেন রাজা। বললেন— 'ডাইনিদের ছলনায় ভুলে তোমার উপর কত অবিচার করেছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর।'

ছোটোরানির চোখে জল আর মুখে আনন্দের হাসি। তাড়াতাড়ি রাজার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললেন, —'ছি ছি, ও কথা বলবেন না মহারাজ। সত্যিই যে এই সব ফুলের মতো ছেলেমেয়েদের ফিরে পেয়েছি— এ আমাদের ভাগ্য।'

রাজা তখন আনন্দে অধীর হয়ে দুহাত বাড়িয়ে তাঁর ছেলে মেয়েদের কোলের মধ্যে টেনে নিলেন। তারপর ছোটোরানির হাত ধরে সাত রাজকুমার আর এক রাজকুমারীকে কোলে নিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে ফিরে গেলেন রাজা।

রাজাব বুড়ো মালি গোকুলেরও আনন্দ আর ধরে না। এখন সে সারা বাগান ঘুরে ঘুরে ফুল তুলে বেড়াচ্ছে। ভারি ব্যস্ত। কতক্ষণে ফুল তুলে ছোটোরানিমার কাছে পৌছে দিতে পারবে— এই চিন্তা তার। বেলা বেড়ে যাচ্ছে। মন্দিরে দেবতার পুজো যে এখনও বাকি।



কোজাগরী জোছনায়



এক ছিল রাজা। রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া। ধনাগার বোঝাই ধনসম্পদ। রাজলক্ষ্মী, সৌভাগ্যলক্ষ্মী আর যশোলক্ষ্মী— এই তিন্‌ লক্ষ্মীই বাঁধা আছে রাজার ঘরে। সবার উপরে আছেন ধর্মরাজ। তাঁকেও বেঁধে রেখেছেন রাজা তাঁর ধর্মপালনের জোরে। রাজার রাজ্যে প্রজাদেরও সুখ-সৌভাগ্য উথলে পড়ছে। রাজার যশ তাই ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে।

রাজধানীর মাঝ-বরাবর রাজার নামে বিরাট বাজার। এ রাজ্যের নিয়ম— যে ব্যাপারির পশরা বিক্রি না হয়ে পড়ে থাকে, রাজা নিজেই তা কিনে নেন উচিত মূল্যে। দেশ-বিদেশ থেকে ব্যাপারিরা আসে তাদের নানারকম পশরা নিয়ে। লোকসানের কোনো ভয় নেই, তাই।

একদিন সেই বাজারে ভিন দেশ থেকে এসে হাজির হল এক ব্যাপারি। সঙ্গে তার পশরা ছিল একটাই— এক বিকটদর্শন লোহার মূর্তি। দেখলেই ভয় লাগে। ব্যাপারিকে শুধাতেই জানা গেল, মূর্তিটা অলক্ষ্মীর। লোকে তার



দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। মূর্তিটা দেখে ভয় পেয়ে ফিরে যায়। কেনার নামও কেউ করে না। অথচ ব্যাপারির মনে কোনো ভাবান্তর নেই। লোকে তার মূর্তি কিনল কী না কিনল, তার জন্য একটুও মাথাব্যথা নেই। এ রাজ্যের নিয়ম সে জানে। তাই চুপচাপ পশরা সাজিয়ে বসে রইল। কখন রাজা আসেন— এই আশায়।

বেলা শেষ হওয়ার মুখেই রাজা এলেন। মূর্তিটা দেখে চমকে উঠলেন। কিন্তু উপায় কী? তাঁর ধর্মনিষ্ঠার জন্য স্বয়ং ধর্মরাজ বিরাজ করছেন তাঁর ঘরে। ব্যাপারিকে ফিরিয়ে দিলে ধর্মও ফিরে যাবেন তাঁর রাজ্য ছেড়ে। কাজে কাজেই সেই জগদ্দল লৌহপিণ্ডের অলক্ষ্মীকে নিয়েই ঘরে ফিরলেন রাজা। অলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা পেল রাজার ঘরে।

ক্রমে অলক্ষ্মীর অশুভ প্রভাব শুরু হয়ে যায়। রাজার রাজ্যপাট হাতছাড়া হয়ে যায়। মন্ত্রী সেনাপতি পাত্রমিত্র সভাসদের দল সবাই ছেড়ে চলে যায় রাজাকে। শূন্য খাঁ খাঁ রাজপুরীতে শুধু দুটি প্রাণী— রাজা আর রানি।

একদিন শূন্য রাজপুরীর সদর পেরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে যাচ্ছেন এক রমণী। তাঁকে দেখে রাজা চিনতে পারলেন। রাজলক্ষ্মী চলে যাচ্ছেন প্রাসাদ ছেড়ে। রাজা ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়ে বললেন— মা, আমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছ?



রাজলক্ষ্মী বললেন— আমি তোমাকে একাই ছেড়ে যাচ্ছি না, বাবা। ওই দেখ।

রাজা দেখলেন, রাজলক্ষ্মীর পেছনে পেছনে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আর যশোলক্ষ্মী দু-জনেই। তাঁরা তিনজনেই বললেন— অলক্ষ্মীর বাসস্থানে লক্ষ্মীর ঠাঁই হয় না, বাবা।

রাজা নীরবে চোখের জলে বিদায় দিলেন তাঁর রাজলক্ষ্মী, সৌভাগ্যলক্ষ্মী আর যশোলক্ষ্মীকে। হঠাৎ চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন ধর্মরাজও ছেড়ে চলেছেন রাজপুরী। তাঁর পা জড়িয়ে ধরে রাজা বললেন— একী ধর্মরাজ, আপনিও চলে যাচ্ছেন? ধর্ম পালনের জন্যই আজ আমি লক্ষ্মীছাড়া— রাজ্যহারা। আর আপনিই কিনা এখন আমাকে ছেড়ে যাচ্ছেন? আমি সব ছাড়তে পারি, কিন্তু ধর্মকে তো ছাড়তে পারি না।

রাজার কথায় শেষ পর্যন্ত শুধু ধর্মই রয়ে গেলেন। ছেড়ে গেল আর সবাই। রাজারও জেদ— এর শেষ দেখব আমি।

এদিকে রাজার ধর্মনিষ্ঠার রন্ধ্রপথে প্রবেশ করে অলক্ষ্মী বেশ জাঁকিয়েই বসেছে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে রাজা যা খুদ-কুঁড়ো জোগাড় করে আনেন, তাই দিয়ে কোনো রকমে কিছু রান্না করে রাজাকে খেতে দেন রানি। রাজার খাওয়ার পর যদি কিছু বাঁচে, নিজে খান।

একদিন রাজাকে খেতে দিয়ে রানি বসে আছেন সামনে। খেতে খেতে রাজার মনে হল কারা যেন তাঁকে নিয়েই কথাবার্তা বলছে। তাকিয়ে দেখলেন— তাঁরই পাতের ধারে দুটো পিঁপড়ে। রাজা মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীদের কথাও বুঝতে পারতেন। তাই তিনি পিঁপড়েদের কথা মন দিয়ে শুনতে লাগলেন।

এক পিঁপড়ে অন্য পিঁপড়েটাকে বলল— আমাদের রাজার কী বোকামি দ্যাখো। ধর্মের খাতিরে অলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা হল রাজবাড়িতে। আগে রাজার পাতে পড়ত রাজভোগ, এখন জুটছে খুদ-কুঁড়ো।



অন্য পিঁপড়েটা বলল— খুদ-কুঁড়োই হোক আর যাই হোক, রাজার পাতে যা থাকে তাই রাজভোগ।

পিঁপড়েদের কথা শুনে এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পায় রাজার। তিনি হেসে ওঠেন হা হা করে। রাজার হাসি শুনে রানি তো অবাক! তিনি হাসলেন কেন, রানি জানতে চাইলেন। তখন রাজার মুখ হল গম্ভীর। রাজা জানতেন, পিঁপড়েদের কথা রানিকে বললেই তাঁর মৃত্যু। এই যে অন্য প্রাণীদের কথা যে রাজা বুঝতে পারেন— তা কিন্তু অন্য কাউকেই বলা বারণ। মুখে বললেন— ও কিছু নয়। এমনিই হাসলাম।

রানির কৌতূহল বেড়ে তা ক্রমে পরিণত হয় জেদে। নিরুপায় হয়ে রাজা বলে ওঠেন— একথা বলার উপায় নেই আমার। বললেই মৃত্যু।

রানির মনে তখন অলক্ষ্মীর প্রভাব। তিনি বললেন— ও-সব জানি না। তোমাকে বলতেই হবে।

রাজা বললেন— আমার মৃত্যু হবে, তা জেনেও সে-কথা শুনতে চাও?

রানির সেই এক কথা— আমি শুনবই।

বিষণ্ণ হয়ে উঠল রাজার মুখ। বললেন— বেশ, একান্তই যদি শুনতে চাও তবে চল মা গঙ্গার কাছে। কথাটা বলার পরই যেন গঙ্গাপ্রাপ্তি হয় আমার।

দুজনেই গেলেন গঙ্গার ধারে। রাজা গঙ্গার জলে নামলেন। এক বুক জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন— এখনও তোমার বিশ্বাস হল না যে, এতে আমার মৃত্যু হবে? তবু কথাটা তুমি শুনবেই?

রানি ঘাড় নেড়ে যেন আচ্ছন্নের মতোই জবাব দিলেন— হ্যাঁ।

সেই সময়ে নদীর জলে একটা মড়া ভেসে যাচ্ছিল। নদীর পাড়ে দুটো শেয়াল দাঁড়িয়ে। একটা শেয়াল আর একটা শেয়ালী। মড়াটার দিকে লোভার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শেয়ালী। রাজা শুনলেন শেয়ালী শেয়ালকে বলছে— যাও না, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মড়াটাকে টেনে নিয়ে এস। মহা ভোজ হবে আজ।

শেয়ালটা বলল— আমাকে কি রাজার মতো বোকা পেয়েছ নাকি? বউয়ের কথায় নদীতে লাফ দিয়ে ভেসে যাই আর কী?

শেয়ালের কথায় টনক নড়ে রাজার। কোনও কথা না বলে জল ছেড়ে উঠে এসে রানিকে বললেন— চল আমার সঙ্গে।

তারপর রানিকে সঙ্গে নিয়ে রাজা ঢুকলেন গহন বনের মধ্যে। সেই বনের মধ্যে রানিকে ফেলে রেখে রাজা একাই ফিরে গেলেন রাজবাড়িতে।

গহন বনের মধ্যে একা একা বসে অনেক কাঁদলেন রানি। কেঁদে কেঁদে মনটা একটু হালকা হল। তাবপব পথ খুঁজে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। কিছুদূর যাওয়ার পর সন্ধে ঘনিয়ে এল। তবে সেদিন ছিল পূর্ণিমা। চাঁদের আলোর যেন বান ডেকেছে বনের পথে। যেতে যেতে এক জায়গায় কয়েকটি কুটির দেখতে পেয়ে থামলেন রানি। সেই কুটিরগুলো ঋষিদের। ঋষিপত্নীরা তখন শাঁখ বাজিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে কীসের যেন পুজো করছিলেন।

রানি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন— কীসের পুজো করছ মা তোমরা?

ঋষিপত্নীরা বললেন— আমরা কোজাগরী লক্ষ্মীর পুজো করছি।

রানি প্রশ্ন করলেন— এ পুজো করলে কী হয়?

ঋষিপত্নীরা বললেন— এ পুজো করলে ঘর থেকে বিদেয় হয় অলক্ষ্মী। লক্ষ্মীর হয় প্রতিষ্ঠা। ধন সৌভাগ্য যশ আপনিই এসে বাঁধা পড়ে ঘরে।

রানি বললেন— মা, আমিও যে চাই, ঘর থেকে অলক্ষ্মীকে বিদায় করে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করতে। আমাকে পুজো শিখিয়ে দাও, আমিও এ পুজো করব।

ঋষিপত্নীদের সঙ্গে রানিও বসলেন পুজোয়।

এদিকে রাজপুরীতে এসে হাজির সেই ব্যাপারি। ব্যাপারি বলল— মহারাজ, আপনার দেওয়া মূল্য ফিরিয়ে নিয়ে আমার অলক্ষ্মীর মূর্তিটা আমাকে ফিরিয়ে দিন।

ব্যাপারির কথা শুনে রাজার আনন্দ আর ধরে না। সে অলক্ষ্মী মূর্তিটা নিয়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজার ঘরে ফিরে এলেন রাজলক্ষ্মী। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে একে একে ফিরে এলেন সৌভাগ্যলক্ষ্মী আর যশোলক্ষ্মী। ধর্মরাজ রাজাকে বললেন— যাও, যার জন্য আবার সব ফিরে পেলে, সেই রানিকে ফিরিয়ে নিয়ে এস ঘরে।

ধর্মরাজের কথা শুনে রাজা তো অবাক। ধর্মরাজ বললেন, আজ কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। রানি আজ লক্ষ্মীর পুজো করছেন বনের মধ্যে। তাঁর সেই পুজোর ফলেই সবকিছু ফিরে পেলে তুমি।

রাজা ছুটলেন বনের মধ্যে। রানির পুজো তখন শেষ হয়েছে। ঋষিপত্নীরা রাজাকে দেখে খুশি হয়ে পুজোর প্রসাদ দিলেন। তৃপ্ত রাজা ঋষিপত্নীদের কাছে বিদায় নিয়ে রানির হাত ধরে ফিরে চললেন রাজপ্রাসাদে।

বনের পথ তখন জোছনার আলোয় আলোময়। রানির দুটি হাত রাজার হাতের মধ্যে। রানি বললেন— আজ আমাকে রাত জাগতে হবে। রাজা বললেন— তোমার সঙ্গে আমিও জাগব সারারাত।

আনন্দে রানির দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দুফোঁটা জল। কোজাগরী জোছনার আলো পড়ে সেই দুটি ফোঁটা মুক্তোর মতো টলমল করতে লাগল।



রাজপুত্র আর ঘুমন্তপুরী



এক দেশের এক রাজপুত্র। রাজপুত্রের মনে বড়ো কষ্ট। উঠতে বসতে দুঃখের কথা মনে পড়ে। মন খারাপ হয়ে যায় তখন। অথচ কী নেই তাঁর। যখন যা চান তখন তাই পান। যখন যা খেতে ইচ্ছে হয়, তখন তাই খান। এতদিন ছোটো ছিলেন, তাই কিছু মনে হয় নি। রাজবাড়ির ঘরে ঘরে যেখানে খুশি ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ইচ্ছে হলে রাজবাড়ির পাশের খোলা মাঠে খেলা করেছেন। কখনও বা নদীতে সাঁতার কেটেছেন। যার সঙ্গে ইচ্ছে হয়েছে বন্ধুত্ব পাতিয়েছেন। কিন্তু আর যে এসব ভালো লাগে না। সেই ছোট্ট বয়েসটি আর নেই। রাজপুত্র বড়ো হয়েছেন। এখন তাঁর একা একা নদীর পর নদী পেরিয়ে, বনের পর বন পার হয়ে, অনেক দূরের কোন অজানা দেশে যেতে ইচ্ছে হয়। বসে থাকবেন টাটু ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া টগবগিয়ে ছুটবে মাঠ, ঘাট, নদী, পর্বত। তাঁর হাতে থাকবে খোলা তলোয়ার। ভাবতে ভাবতে রাত ভোর হয়ে যায়। শরীর ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। একদিন তাই রানিমাকে বলেই ফেললেন— মা, আমি দেশভ্রমণে বেরুব।

রানিমার চোখ কপালে উঠল— বালাই ষাট, অমন কথা মুখে আনতে নেই। কোথায় কোন্ বিপদ আছে কে জানে।

কিন্তু রাজপুত্রের এক কথা— আমি দেশভ্রমণে যাব।

এ কথায় রানিমার খাওয়া বন্ধ হল, শোওয়া বন্ধ হল, ঘুম বন্ধ হল। রাজ্যের লোকের জনে জনে দুশ্চিন্তা। তবু রাজপুত্র নাছোড়বান্দা। শেষে রাজা বললেন— এতই যখন ইচ্ছে ওর, যাক।

রাজপুত্র দেশভ্রমণে যাবেন। সাজ সাজ রব পড়ে গেল রাজ্যে। ঘোড়া সাজল, হাতি সাজল, উট সাজল। তার উপর বাছা বাছা সৈন্য। সব রাজপুত্রের সঙ্গে যাবে।

কিন্তু রাজপুত্র কিছুই সঙ্গে নিলেন না। মণি-মাণিক্য, চর-অনুচর, হাতি, ঘোড়া, লোক-লশকর সব রইল পড়ে। শুধু নিজের টাট্টু ঘোড়াটির উপর বসে পথে নেমে হু-হু করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। ঘোড়া ছুটছে তো ছুটছে, ছুটছে তো ছুটছে। ছুটতে ছুটতে পেরিয়ে গেল কত দেশ, কত নগর। নদীর পর নদী। বনের পর বন। যেতে যেতে একসময় এক গভীর গহন বনের ধারে এসে ঘোড়া থামল। বড়ো আশ্চর্য লাগল রাজপুত্রের। এত চুপচাপ কেন চারদিক। কোথাও কোনো সাড়া নেই। শব্দ নেই। এত গভীর বন। বিশাল বিশাল তাল তমাল শাল পিয়াল গাছ। হাওয়া দিলেই পাতায় পাতায় সর সর শব্দ হবে। পাতা রয়েছে তবু শব্দ নেই। রাজপুত্র বনের মধ্যে ঢুকলেন। চারদিকে তাকান আর অবাক হয়ে যান। এ যে অবাক-করা ব্যাপার। বনের এধারে ওধারে জন্তু-জানোয়ার রয়েছে। গাছের ডালে ডালে পাখি বসে আছে। শাখায় শাখায় কত কত ফুল। কিন্তু জন্তু-জানোয়াররা টুঁ শব্দটিও করে না। গাছের ডালে পাখিরা বসে আছে তো বসেই আছে। গান গায় না। শাখায় শাখায় ফুল ফুটে আছে তো ফুটেই আছে। গন্ধ বিলোয় না। রাজপুত্র ভারী অবাক

হলেন, এমনটা জীবনে দেখেন নি। দেখতে দেখতে বন পেরিয়ে বনের সীমায় যেই গেছেন, দেখলেন এক রাজপ্রাসাদ। কত নগর পেরিয়ে এলেন। কত দেশ পেরিয়ে এলেন। কিন্তু এমন রাজপ্রসাদ আর কোথায় দেখলেন? বিশাল প্রাসাদ। এধার থেকে ওধার দেখা যায় না। আর কী উঁচু। চূড়া যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। দূর থেকে দেখতে পেলেন রাজপ্রাসাদের বিশাল ফটক। সেই লোহার ফটকের দুধারে দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। এমন রাজপুরীতে না গেলেই নয়। পায়ে পায়ে ফটকের সামনে আসতেই আবার অবাক কাণ্ড। প্রহরী দুজনের কোমরে তলোয়ার গোঁজা। মাথায় পাগড়ি। মোটা গোঁফ। তারা ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফটক পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু তাদের প্রাণ নেই। তারা পাথরের।

এরপর সবটা না জানতে পারলে থাকা যায়? ভেতরে ভেতরে ছটফট করছেন রাজপুত্র। এসব কী ব্যাপার। ব্যাপার দেখতেই ফটক পেরিয়ে ঢুকলেন রাজপুত্র।



রাজপুরী কী সুন্দর সাজানো। তকতকে ঝকঝকে। দুধের মতো সাদা দেওয়াল। স্ফটিকের মতো মেঝে। মস্ত আঙিনা। কিন্তু কোথাও যে টুঁ শব্দটি নেই। নিঝুম পুরী। পাতাটি পড়ে না। কুটোটি নড়ে না। অথচ চারদিকে সেপাই-সান্ত্রী, লোক-লশকর, ঝি-চাকর। সব সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে। সব পাথর। সেপাই-সান্ত্রী পাথর। লোক-লশকর পাথর। ঝি-চাকর পাথর। এমন কী ঘোড়াশালে শ'য়ে শ'য়ে ঘোড়া। হাতিশালে হাতি সব পাথর।

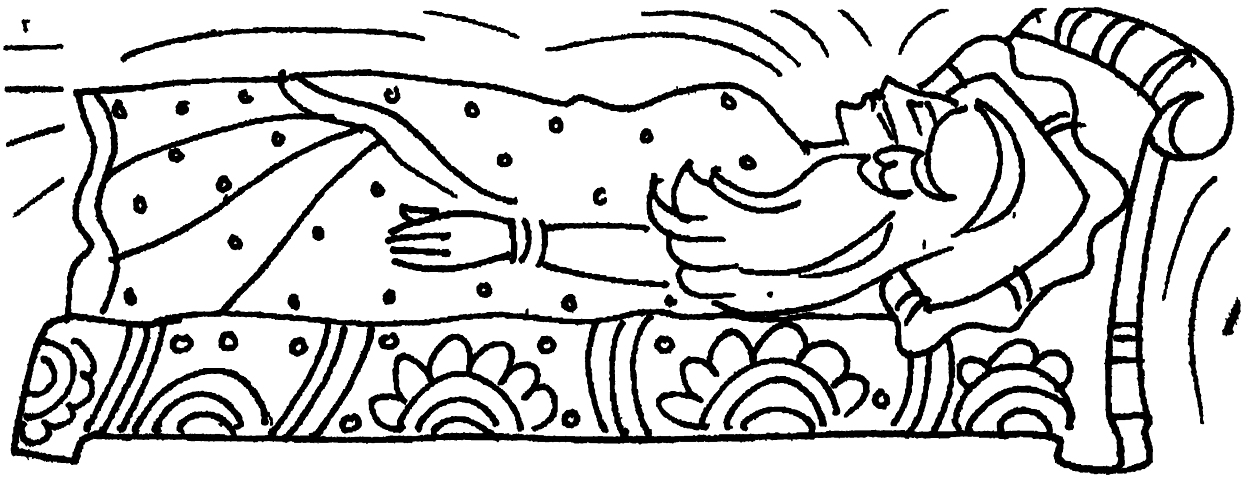
এক কুঠরিতে গিয়ে দেখলেন দেওয়ালে দেওয়ালে কত রকম অস্ত্র টাঙানো রয়েছে। ঢাল, তলোয়ার, বল্লম, তির-ধনুক। অস্ত্রের গায়ে আলো পড়ে ঝকঝক করছে। যেন এক্ষুনি দেওয়াল থেকে নামিয়ে নিয়ে যুদ্ধে যাওয়া হবে। কিন্তু সেপাইরা সব পাথরের মূর্তি।

আর এক কুঠরিতে গিয়ে দেখলেন রাজ-দরবার। পাত্র মিত্র অমাত্য মন্ত্রীকে নিয়ে রাজা রাজদরবারে বসেছেন। রাজার সিংহাসন মণি-মুক্তো-হিরে আর মানিক দিয়ে তৈরি। আলো পড়ে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। সোনার বাতিদানে ঘি-এর প্রদীপ জ্বলছে। রাজা বিচার সভায় বসেছেন। অথচ টুঁ শব্দটি নেই কোথাও।

রাজসিংহাসনে রাজা পাথরের মূর্তি। বসে আছেন তো বসেই আছেন। মন্ত্রীর আসনে মন্ত্রী বসে আছেন তো বসেই আছেন। পাত্র-মিত্র অমাত্য সবাই তাই। কারো চোখের পাতা পড়ছে না। কেউ নিশ্বাস ফেলছে না। কেউ কথাও বলছে না। সব যেন দাঁড়িয়ে বসে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছে। সবাই পাথরের মূর্তি।

এখান থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে গেলেন রাজপুত্র। দরজা হাট করে খোলা। ভেতরে কত রকমের ধনরত্ন। কত সোনা, কত দানা। কত কত মোহর। ঘরে আর রাখার জায়গা নেই। ঘরে আলো নেই, তবু এই ধনরত্নে ঘরে যেন দশটা চাঁদের আলো। রাজপুত্র কিছুতেই হাত দিলেন না। শুধু দেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

পাশের ঘরে ঢোকার আগেই হাজার লক্ষ ফুলের গন্ধ ভেসে এল রাজপুত্রের নাকে। গন্ধে মাতাল হয়ে গেলেন রাজপুত্র। এমন পবিত্র গন্ধ কোথা থেকে আসে। মন আন-চান করল। শরীর টাল-মাটাল হল। গন্ধ রাজপুত্রকে ঘরে টেনে নিয়ে এল। ঘরে ঢুকে রাজপুত্র অবাক। ঘর আলো হয়ে আছে রঙিন ফুলে। হাজার হাজার পদ্মফুল। ঘরের ভেতর হিরের স্বচ্ছ ফটিক জল। চিকমিক ঝিকমিক। ঢেউ খেলছে জলে। সেই জলের উপর সবুজ পান্নার ডাঁটি। সেই ডাঁটিতে সবুজ মখমলের পাতা। ঢল-ঢল। ঢল-ঢল। পাতায় পাতায় ফুটন্ত সোনার ফুল। হাওয়ায় দুলছে। ভাসছে টুলুক টুলুক। ফুলের বনে হিরের পালঙ্ক। পালঙ্কের উপর সোনার ফুলের বিছানায়, মুক্তো বসানো ঝিকমিক মখমলের উপর ও কে শুয়ে! রাজপুত্র অবাক তাকিয়ে আছেন। এ কী রাজকন্যা! এত রূপ রাজকন্যার! গায়ের রং নয়, যেন চাঁদের আলো। নাক নয়, যেন চিকন বাঁশি। চোখ নয়, যেন পাখির তুলতুলে ছানা। দাঁত নয়, যেন মুক্তো। কত আর দেখবেন রাজপুত্র। দেখতে দেখতে বিভোর। রাজপুত্র আর চোখ ফেরাতে পারলেন না। দেখতে লাগলেন। শুধু দেখতেই লাগলেন।



দেখতে দেখতে দিন গেল। মাস গেল। বছর গেল। এদিকে রাজকন্যার ঘুম আর ভাঙে না। রাজপুত্রও চোখ ফেরাতে পারেন না। হঠাৎ একদিন রাজপুত্র দেখলেন— রাজকন্যার মাথার কাছে, মেঘের মতো চুলের পাশে একটা সোনার কাঠি। সোনার কাঠিটা হাতে তুলেছেন কী তোলেন নি, হঠাৎ চোখ পড়ল পায়ের দিকে। পায়ের কাছে আর একটা রুপোর কাঠি। সেটাও হাতে তুলে নিলেন রাজপুত্র। কাঠি দুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। হঠাৎ সোনার কাঠিটি কখন টুক করে রাজকন্যার মাথায় ঠেকে গেল। অমনি হু-হু করে কোথায় যেন বাতাস উঠল। পদ্মের বনে উঠল ঢেউ। ফুলেরা এ ওর গায়ে ঢলে পড়ল, হিরের জলে ঢেউ উঠল। আর সেই সঙ্গে রাজকন্যার হাত নড়ল। পা সরল। রাজকন্যা হাই তুললেন। এরপর আস্তে আস্তে চোখের পাতা খুলে গেল রাজকন্যার। আর তাকিয়েই চমকে উঠে বসলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রাজপুরীর চারদিকে পাখি গান গেয়ে উঠল। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজল। কেল্লায় তূর্য নিনাদ হল। ঘোড়া ডাকল। হাতি ডাকল। দরবারে রাজার ঘুম ভাঙল। মন্ত্রী চোখ কচলে উঠে বসলেন। পাত্র মিত্র অমাত্য সান্ত্রী সেপাই সবাই ঘুম ভেঙে কলকল করে উঠল। তলোয়ারে শব্দ উঠল ঝনঝন। তির ধনুকে শব্দ হল শনশন। সবাই অবাক। এতদিন পরে, এতবছর পরে কে এল রাজপুরীতে।

অবাক রাজপুত্রও।

তখন বাজকন্যা সব খুলে বললেন— এক দৈত্য ছিল। বিশাল কদাকার দৈত্য। মুলোর মত বড়ো বড়ো দাঁত। ভাঁটাব মতো চোখ। থ্যাবড়া থ্যাবডা জববজং নাক। হাতির মতো লটপট লটপট দুটো কান। হাসি তো নয়, যেন পাহাড়ি নদী। কথা তো নয় যেন মেঘ গর্জন। ছোটা তো নয়, যেন পৃথিবী কাঁপানো। সেই দৈত্যোব একদিন বাজকন্যাকে দেখে ভালো লেগে গেল। বলল, আমি বিয়ে কবব। এদিকে এই বিয়েতে কেউ বাজি নয। বাজা নয। বানি নয। মন্ত্রী, পাত্র, মিত্র, অমাত্য কেউ নয। এমনকী বাজ্যেব লোকজনও বলল— না, এ বিয়ে হবে না। শেষে দৈত্য এসে বাজকন্যাকে বলল— তোমাব কী মত। বাজকন্যাও বলল— না।



একথা শুনে বাগে অন্ধ হযে দৈত্য তাব জাদুবিদ্যায সব দিল ঘুম পাডিযে। বাজ্যেব যা কিছু সব হযে গেল পাথব। সব পাথর হয়ে গেলে ঘুমন্ত পাথবের বাজকন্যার পাশে রেখে দিল একটা সোনার কাঠি, একটা রুপোব কাঠি। যদি কোনো দিন, কোনো রাজপুত্র আসে। যদি তিনি সোনাব কাঠিটা রাজকন্যার মাথায় ছুঁইয়ে দেন। তাহলে ঘুমন্ত পুবী আবাব জেগে উঠবে।

কথা শেষ কবে বাজকন্যা হাসলেন। বললেন— আপনিই সেই বাজপুত্র। আপনিই আমাদের ঘুম ভাঙিয়েছেন।

রাজা এলেন। রানি এলেন। মন্ত্রী এলেন। সকলে এসে দেখেন এক রাজপুত্র সোনার কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম ভাঙিয়েছেন সবাব।

রাজা বলিলেন— তোমাকে আমি কী দোব?

রানী বলিলেন— তোমাকে আমি কী দোব?

রাজ্যের লোকজন বলল— আপনি কোন্ দেবরাজ্যের রাজপুত্র। এমন রূপ। এমন গুণ। আমাদের উপর এত দয়া। আপনি কী চান?

রাজপুত্র কী আর চাইবেন। মাথা নিচু করে আছেন। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠছেন। আনন্দে ভরে যাচ্ছেন থৈ-থৈ। কিন্তু কথা বলতে পারছেন না।

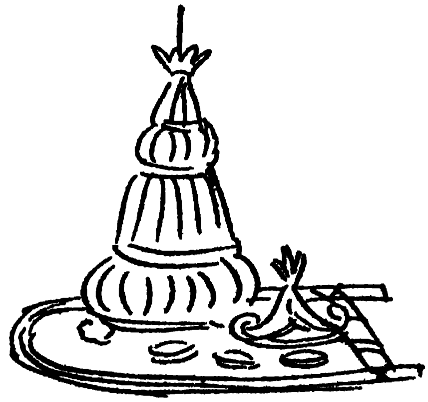
রাজা বললেন— আমার তো দেবার আর কিছুই নেই। এই রাজকন্যা তোমার হাতে দিলাম। এই রাজত্ব তোমার হাতে দিলাম।

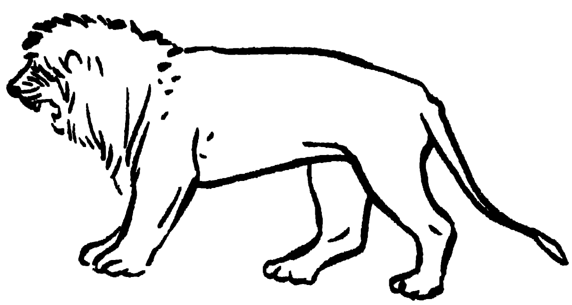
এ কথায় চারিদিকে উৎসব শুরু হয়ে গেল। রাজকন্যা হেসে লজ্জায় মাথা নামালেন। রাজপুত্র লজ্জায় মাথা নামালেন। সারা রাজ্যের লোক আনন্দ উৎসবে মেতে উঠল। শাঁখ বাজল, উলুধ্বনি দিল, আম্র-পল্লব টাঙানো হল। ঘরে ঘরে ফুল, চন্দন। বাঁশি বাজল। কাঁসর বাজল। ঘণ্টা বাজল। পুরোহিতের গলার মন্ত্রে গমগম করে উঠল রাজপুরী। রাজপুরীতে এমন উৎসব কেউ দেখেনি। রাজকন্যার বিয়ে বলে কথা। কেউ সামিয়ানা টাঙায়। কেউ ঘর-দোর সাজায়। কেউ মাছ কোটে। কেউ বাটনা বাটে। এয়োরা বাজায় শাঁখ। দুয়ারে দুয়ারে আলপনা। পিঁড়িতে পিঁড়িতে আলপনা। শেষে রাজকন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে হয়ে যায়।

এদিকে একবছর দু-বছর করে কতদিন পার হয়ে গেল তবু রাজপুত্রের দেখা নেই। রাজপুত্র বিদেশ ভ্রমণে গেল তো গেলই। কেঁদে কেঁদে রানি পাগল-পারা। শোকে শোকে রাজা পাথর। কারো মনে সুখ নেই। গাছে ফুল ফোটে না। পাখিরা ডাকে না। কেউ হাসে না। কেউ গান গায় না। যেন শ্মশানপুরী।

তারপর একদিন ভোরবেলা শোনা গেল রাজপুত্র ফিরছে। একজন এসে খবর দিল রাজ্যের সীমানায় এসে পৌঁচেছেন। আর একজন এসে বলল— নদী পেরুচ্ছেন রাজপুত্র। আর একজন বলল— রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যা, সঙ্গে হাতি, ঘোড়া, লোক-লশকর। ধনরত্নের ছড়াছড়ি। একথায় হুলুস্থুলু পড়ল রাজপুরীতে। রাজা শোক থেকে উঠে এলেন। রানি চোখ মুছে উঠে এসে দাঁড়ালেন। দূরে এইমাত্র দেখা গেল চতুর্দোলায় চেপে রাজপুত্র আসছেন। রাজা কী করবেন বুঝতে পারলেন না। রানি কী করবেন বুঝতে পারলেন না। আনন্দে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললেন দু-জনেই।

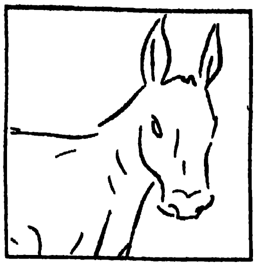
ওদিকে রাজপুরীতে বেজে উঠল শঙ্খ। কাড়া-নাকড়া। ঢাক-ঢোল আর সানাই। রাজা এসে তুলে নিলেন রাজপুত্রকে। রানি এসে বুকে তুলে নিলেন রাজকন্যাকে। এরপর সবাই মিলে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।





গুজরাট

গাধা



স্বর্গে দেবসভায় দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদের সঙ্গে বসে বিদ্যাধরীদের গান শুনছিলেন আর অপ্সরাদের নাচ দেখছিলেন।

মোহিনী নামে এক অপরূপ সুন্দরী অপ্সরা অপূর্ব নৃত্য করছিল। তার নাচে সব দেবতাই মোহিত হয়ে গেলেন। মোহিনীর চমৎকার নৃত্যকৌশল দেখতে দেখতে ইন্দ্র মনে মনে ভাবতে লাগলেনঃ মোহিনীকে ভগবান শিবের কাছে পাঠিয়ে দিই, তিনি মোহিনীর নাচ দেখে খুব খুশি হবেন।

মোহিনীর নৃত্য শেষ হতে ইন্দ্র তাঁকে বললেন ঃ মোহিনী, তোমার নাচ দেখে আমি এবং দেবতারা সবাই খুব আনন্দ পেলাম, এখন আমি তোমাকে যে আদেশ করছি শোনো। তুমি কৈলাসনগরে যাও। তুমি যে কতো ভালো নাচ জানো, ভগবান শিবকে তা দেখিয়ে এসো। আমি নিশ্চিত যে, তিনিও তোমার নাচ দেখে খুব খুশি হবেন।



দেবরাজের আদেশ পেয়ে তরুণী মোহিনী কৈলাসের উদ্দেশে যাত্রা করল।

মোহিনী চলেছে। হঠাৎ ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। জয়ন্ত মোহিনীর রূপ দেখে অতিশয় মুগ্ধ হয়ে বলল ঃ মোহিনী সুন্দরী, তুমি কোথায় চলেছ?

উত্তরে মোহিনী বলল ঃ আমি কৈলাসে চলেছি, ভগবান শিবকে নাচ দেখানোর জন্যে। তোমার পিতা দেবরাজ ইন্দ্রই আমাকে তাঁর কাছে যেতে আদেশ করেছেন।

জয়ন্ত বললঃ তার আর দরকার নেই। তোমাকে কৈলাসে যেতে হবে না। বরং আমি আদেশ করছি, তুমি আমার সঙ্গে চল। এখন থেকে তুমি আমার কাছেই থাকবে।

এই বলে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত মোহিনীকে তার প্রাসাদে নিয়ে গেল। মোহিনী কী আর করে! সে জয়ন্তের প্রাসাদে তার সঙ্গেই বাস করতে লাগল।

কিছুকাল পরে ইন্দ্র শিবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি শিবকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ প্রভু, আমার নৃত্যাঙ্গনা অপ্সরা মোহিনীর নাচ কেমন দেখলেন, বলুন।

শিব মাথা নেড়ে ইন্দ্রকে বললেনঃ কই, এ-পর্যন্ত কোনো অপ্সরা তো আমার কাছে নাচ দেখাতে আসেনি, ইন্দ্র।



ইন্দ্র প্রমাদ গণলেন, মনে মনে খুব আশ্চর্য আর বিরক্তও হলেন। অত্যন্ত বিনীতভাবে শিবকে বললেনঃ প্রভু, আমি মোহিনীকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম। কী ব্যাপার— ঠিক বুঝতে পারছি না!

এই বলে শিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইন্দ্র কুপিত মনে স্বর্গে ফিরে এলেন। ফিরে এসেই মোহিনীকে এত্তেলা পাঠালেন ঃ সে যেন এখনই এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

মোহিনী কাঁপতে কাঁপতে দেবরাজের কাছে এসে নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। ইন্দ্র তাকে খুব একচোট ধমক লাগালেন, বকাবকি করলেন। তখন কাঁদতে কাঁদতে মোহিনী তাঁকে সমস্ত কাহিনী খুলে বলল।

ইন্দ্র আরো চটে গিয়ে তাঁর ছেলে জয়ন্তকে ডেকে পাঠালেন।

জয়ন্ত এলে ক্রুদ্ধভাবে তাকে বললেন ঃ যেহেতু তুমি আমার আদেশের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেছ এবং ভগবান শিবকে অপ্রসন্ন করেছ, সেহেতু আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি— তুমি পৃথিবীতে যাও এবং সেখানে গর্দভরূপে জীবন যাপন করো।

পিতার মুখে এই ভয়ঙ্কর অভিশাপ শুনে জয়ন্ত তাঁর পায়ের উপর পড়ে গেল এবং পা ধরে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করল। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র কিছুতেই তাকে ক্ষমা করলেন না।

তখন ভোলানাথ শিব জয়ন্তের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে বললেন ঃ বাছা, আমি তোমার পিতার অভিশাপ পুরোপুরি নষ্ট করতে পারি না। সে ক্ষমতা কারো নেই। তবে তোমাকে এইটুকুই সাহায্য করতে পারি,— এই যে— তুমি কেবল দিনের বেলায় গর্দভ রূপে থাকবে, কিন্তু রাত্রিবেলায় তুমি আবার রাজপুত্রের রূপ ফিরে পাবে। তারপর তুমি এক রাজকন্যাকে বিয়ে করবে; এবং সেই রাজকন্যা যখন একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, তখনই তুমি মুক্তিলাভ করে আবার স্বর্গে ফিরে আসবে।

ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত এক কুমোরের ঘরে গর্দভরূপে জন্ম নিল।

একদিন রাত্রিবেলায় সে কুমোরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বলল ঃ আর ঘুমিয়ো না। এখন তোমার ভাগ্য ফিরেছে। আমার আদেশ শোনো। তুমি এখনই তোমাদের রাজার কাছে যাও। তাঁকে আমার হাতে তাঁর কন্যাকে সম্প্রদান করতে বল।

গাধার কথা শুনে কুমোর তো একেবারে যৎপরোনাস্তি হতবাক! বলে কী? গাধা বিয়ে করতে চায় রাজকুমারীকে! কুমোর গাধার কথা গেরাহ্যিই করল না। রাগে আর বিরক্তিতে মুখ গোমড়া করে সে আবার শুতে গেল।

কিন্তু তাতে কী, গাধাটা দমবার পাত্র নয়। সে রোজ রাত্রে কুমোরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ওই একই কথা বলে। এমন করুণ মুখে আর কাতর স্বরে বলে যে, কুমোরটা রাগ করতেও পারে না। বেচারা কুমোর! সে একজন অতি তুচ্ছ সাধারণ ছা-পোষা মানুষ। সে যাবে রাজার কাছে? এমন কথা সে যে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না!



শেষমেশ হল কী, একদিন সে রাজামশায়ের দেওয়ানের কাছে গেল এবং তার গাধাটা তাকে যা বলে— সে-সব কথা সে দেওয়ানজিকে জানিয়ে দিল। কুমোরের কথা শুনে একদিন দেওয়ানজি তার গাধাটাকে দেখতে এলেন। গাধাটাও নিজের মুখে দেওয়ানজির কাছে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করল। দেওয়ানজি রাজার কাছে গিয়ে গাধাটার সমস্ত কথা নিবেদন করলেন।

পরের দিন স্বয়ং রাজা এবং মন্ত্রীমশাই কুমোরেব বাড়ি এলেন।

গাধাটা রাজার সামনে এসে বিনীতভাবে বলল ঃ আমি বুঝতে পারছি— রাজামশাই এবং মন্ত্রীমশাই আমার মুখের কথা শুনতে এসেছেন। মহারাজ, আপনার কাছে আমার অনুরোধ— আপনি রাজকন্যাকে আমার হাতে সম্প্রদান করুন; নতুবা আপনার এই রাজধানী মাটির তলায় বসে যাবে। আমার অনুরোধ রাখলে আপনি যা চান, আমি তাই করব।

রাজা খুবই ধূর্ত। তিনি গাধার কথায় রাগ করলেন না। বললেন ঃ যদি তুমি এই শহরের চারিদিকে রুপোর ফটকঅলা একটা তামার দুর্গ বানিয়ে দিতে পারো, তাহলেই আমি তোমার হাতে আমার মেয়েকে দান করতে পারি।

তৎক্ষণাৎ জয়ন্ত বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করল; এবং বিশ্বকর্মার সহায়তায় অচিরেই রুপোর ফটকঅলা একটি সুন্দর দুর্গ বানিয়ে ফেলল।

পরদিন সকালে সূর্যের আলোয় রাজপুরী ঝলমল করতে লাগল। রাজাও খুশি হয়ে কথামতো সেই গাধার সঙ্গেই রাজকন্যার বিয়ে দিলেন এবং তাদের বসবাসের জন্যে একটা ছোটো প্রাসাদও বানিয়ে দিলেন।

একদিন রাজকন্যার মা— মহারানি মেয়েকে দেখতে গেলেন,— একটা গাধার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে হওয়ায় তিনি মনে মনে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন।

মেয়ে বলল : মা, তুমি আমার জন্য অনর্থক কষ্ট পেয়ো না। আমি খুব সুখেই আছি। যদি বিশ্বাস না হয়, রাত্রিবেলা এসো, নিজের চোখেই দেখে যেয়ো।

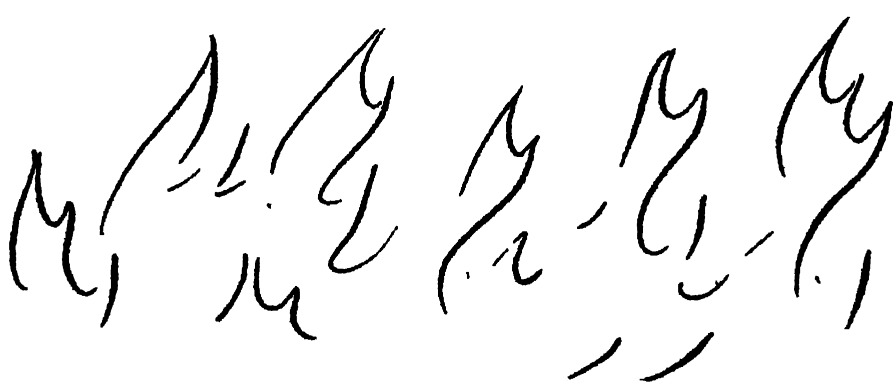
সুতরাং রানিমা একদিন রাত্রিবেলা আবার মেয়েকে দেখতে এলেন। প্রাসাদের ফটক পার হয়ে তিনি দেখতে পেলেন— একটা মরা গাধা পড়ে আছে এবং ঘরের মধ্যে ঢুকে তিনি দেখতে পেলেন— তাঁর মেয়ে একটি লম্বা, ফরসা, সুদর্শন যুবকের সঙ্গে কথা বলছে। তিনি মুহূর্তে ভেবে বসলেন, যদি গাধার মৃতদেহটা এই সুযোগে পুড়িয়ে ফেলা যায়, তাহলে রাজপুত্র আর গাধার খোলসের মধ্যে আত্মগোপন করতে পারবে না, এবং একজন রূপবান রাজপুত্র হয়েই তাঁর জামাই সকলের চোখের সামনে ঘুরে বেড়াবে।

তিনি আর দেরি করলেন না; তৎক্ষণাৎ চাকরদের ডেকে গাধার মৃতদেহটা পুড়িয়ে ফেলতে আদেশ দিলেন।

জয়ন্ত তার স্ত্রীকে বলল, আমার মনে হচ্ছে, কেউ আমার দেহটা পুড়িয়ে ফেলছে। রাজমাতা একটা মারাত্মক ভুল করে বসলেন। এর ফলে আমাকে স্বর্গে ফিরে যেতে হবে, কখনই আমার আর পৃথিবীতে ফিরে আসা হবে না। তুমি এই শহর ছেড়ে চলে যাও, কেননা কাল শহরটা মাটির তলায় বসে যাবে,— ধ্বংস হয়ে যাবে সমস্ত পুরীটা।

পরদিন সমস্ত শহরটা ঘনঘন কেঁপে উঠতে লাগল এবং অগ্নিকাণ্ডে ও জলপ্লাবনে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল। সব লোক মারা গেল। কেবল রাজকন্যা সময়মতো পালিয়ে প্রাণে বেঁচে গেল।

অনেক বছর পরে সেই পুরোনো শহরের ধ্বংসস্তূপের উপর আবার একটা নতুন শহর গড়ে উঠেছিল। সেই শহরটাই কালে ক্যাম্বে নামে বিখ্যাত হয়।



আঈ জসল



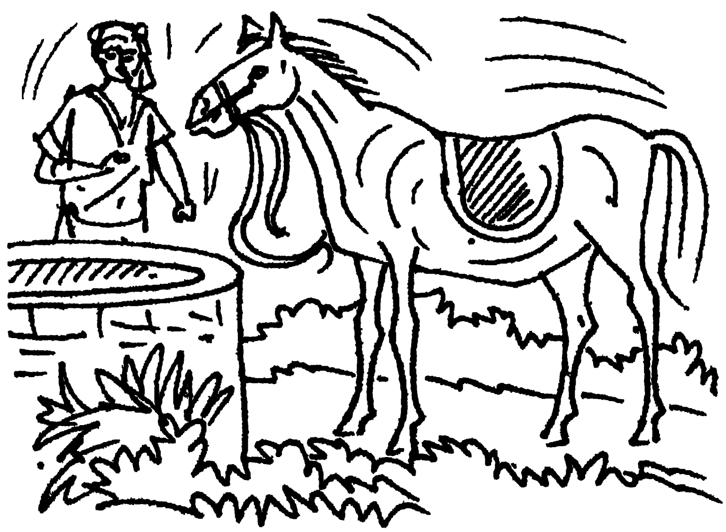
বারাদি জেলায় জামনগরের কাছে পুণ্যবতী আঈ জসলের পবিত্র স্মৃতিমন্দিরটি আজও দাঁড়িয়ে আছে। সেই মন্দিরেব পাশ দিয়ে যেতে যেতে আজও পথিকরা হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়, সাধ্বী আঈ জসলের স্মৃতিমন্দিরের উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম জানায়।

কয়েক-শো বছর আগে আঈ জসল পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁর নামে অনেক গল্প আজও মুখে মুখে চলে আসছে। বারাদি গ্রামের অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আজও আঈ জসলের কাহিনী বর্ণনা করে শোনান তাঁদের নাতি-নাতনিদের। চারণেরা আঈ জসলের অনেক কাহিনীগাথা গীতির আকারে গেয়ে বেড়ায় আজও।

ওই বাবাদি গ্রামেই আঈ জসলের জন্ম হয়েছিল।

ধানো ভেদ নামে এক চারণের দ্বিতীয় পত্নী ছিলেন আঈ জসল। যৌবনে তিনি পরমা সুন্দরী ছিলেন। তাঁর চেহারায় এমন একটা অসাধারণ দীপ্তি আর লাবণ্য ছিল যে, চারণের প্রথম পক্ষের স্ত্রী পুনশ্রী তাঁকে ভীষণ ঈর্ষা করত।

একদিন সকালে আঈ জসল জল আনতে গেলেন গ্রামের বারোয়ারি কুয়োয়। ঠিক সেই সময় একজন ঘোড়সওয়াব পথিক সেই কুয়োতলার পাশে এসে ঘোড়া থামিয়ে আঈকে বললেনঃ দয়া করে আপনি কি আমার তৃষ্ণার্ত ঘোড়াটাকে একটু জল দেবেন?



জসল কুয়ো থেকে জল তুললেন এবং ঘোড়াটাকে সেই জল পান করতে দিলেন। ঘোড়াটা জল পান করে তার আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিবৃত্ত করল।

ওই পথিকের নাম লাধোয়া। তিনি কুচরি নামে একটি গ্রামের বাসিন্দা।

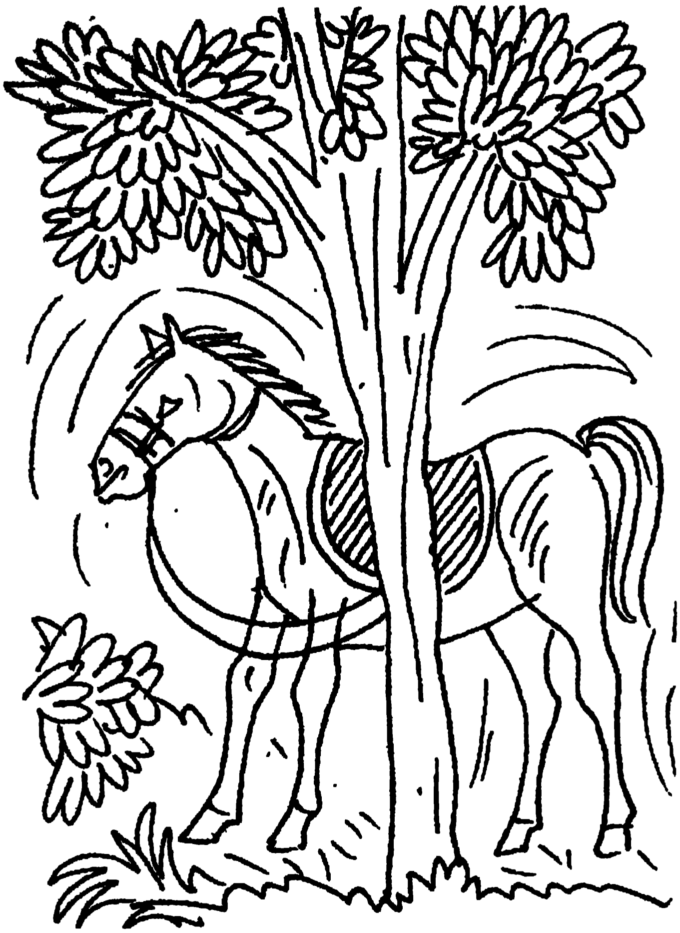
যুবতি আঈয়ের সহৃদয় ব্যবহারে লাধোয়া খুব খুশি হলেন এবং প্রতিদানে আঈকে কিছু দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন।

ব্যাগ থেকে কিছু টাকা বের করে তিনি আঈকে বললেনঃ আমি তোমার ভাই; কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসাবে তোমাকে যৎসামান্য অর্থ দিচ্ছি; তুমি নিলে আমি খুবই আনন্দ পাব।

জসল তাঁকে বললেনঃ তুমি আমার ভাই বলেই যখন নিজের পরিচয় দিলে, তখন আমি তোমার উপহার

অবশ্যই নেব। তবে তার আগে তোমাকে আমার সঙ্গে আমার বাড়ি আসতে হবে; আমার সঙ্গে খেতে হবে, তারপরে তোমাকে যেতে দেব।

লাধোয়া যেতে চান নি; কিন্তু আঈ তাঁকে বারবার এমনভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন যে, তিনি আর 'না' বলতে পারলেন না— আঈয়ের পেছনে পেছনে তাঁকে তাঁদের বাড়ি যেতেই হল।



বাড়ি পৌঁছে বাড়ির বাইরে একটা গাছের সঙ্গে ঘোড়াটাকে বেঁধে লাধোয়া ভেতরে গেলেন. মেঝেয় বসলেন।

আঈ তাঁকে কয়েকখানা বজরার রুটি, এক পাত্র দুধ আর খানিকটা তালের গুড় খেতে দিলেন। লাধোয়া সেগুলি খুব তৃপ্তি করে খেয়ে বললেনঃ বোন, তোমার দয়ার কথা আমি কোনোদিন ভুলব না।

জসল বললেনঃ মনে রেখো, তুমি আমার ভাই। আমি যখনই তোমাকে ডেকে পাঠাব, — আসবে। আমার মাতৃকুলে কেউ বেঁচে নেই,— বাবা-মা. ভাই-বোন— কেউ না।

এই কথা বলে আঈ লাধোয়ার মাথা স্পর্শ করে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

পুনশ্রী. চারণের কুচুটে বউটা, সারা গাঁয়ে এই কুৎসা ছড়িয়ে বেড়াল যে— তার সতীন স্বামীর অবর্তমানে একজন অচেনা অজানা উটকো লোককে ঘরে ডেকে এনে খুব আদর-আপ্যায়ন করেছে। গাঁয়ের মেয়েরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে এই নিয়ে অনেক কানাঘুঁষো করল এবং আঈয়ের নামে অনেক মিথ্যে কথা ছড়িয়ে বেড়াতে লাগল।

আঈয়ের স্বামী বিদেশ থেকে ফিরে এল। প্রথমেই সে এক পাত্র জলের জন্যে গেল প্রথম পক্ষের বউ পুনশ্রীর ঘরে। পুনশ্রী আঈয়ের নামে মিথ্যেমিথ্যি অনেক লাগানো-ভাঙানো করল। আঈয়ের চরিত্র সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথাও বলল।

লোকটা একেই তেতে-পুড়ে এসেছে। তার উপর, সোহাগের ছোটো-বউ সম্পর্কে যাচ্ছেতাই নিন্দে-মন্দ শুনে তার মাথায় খুন চেপে গেল। একটা লকলকে বেত কুড়িয়ে নিয়ে সে রাগে গরগর করতে করতে বাড়ি পৌঁছল।

জসল তাঁর স্বামীর জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বাগানে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন তাঁর স্বামী হনহন করে ছুটে আসছে, হাতে একটা পাকা বেতের লাঠি।

চরণ ঘরে ঢুকে কোনো উচ্চবাচ্য না করে বউকে বেধড়ক পেটাতে লাগল। কিন্তু আঈ কোনো প্রতিবাদ করলেন না।

আঙ্গ অত্যন্ত ঠাণ্ডা আর নিরীহ মহিলা। তাঁর গায়ের চামড়া খুবই পেলব আর নরম। উপর্যুপরি বেতের আঘাতে তাঁর গায়ের চামড়া জায়গায় জায়গায় ফেটে গেল, ক্ষতস্থান দিয়ে দরদর-ধারায় রক্ত বের হতে লাগল। তিনি দাঁত দিয়ে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে নীরবে স্বামীর বেত্রাঘাত সইতে লাগলেন, একবারের জন্য 'উঃ', 'আঃ' করলেন না,— কেবল তাঁর বড়ো বড়ো দুটি চোখ থেকে অনর্গল জল ঝরতে লাগল।

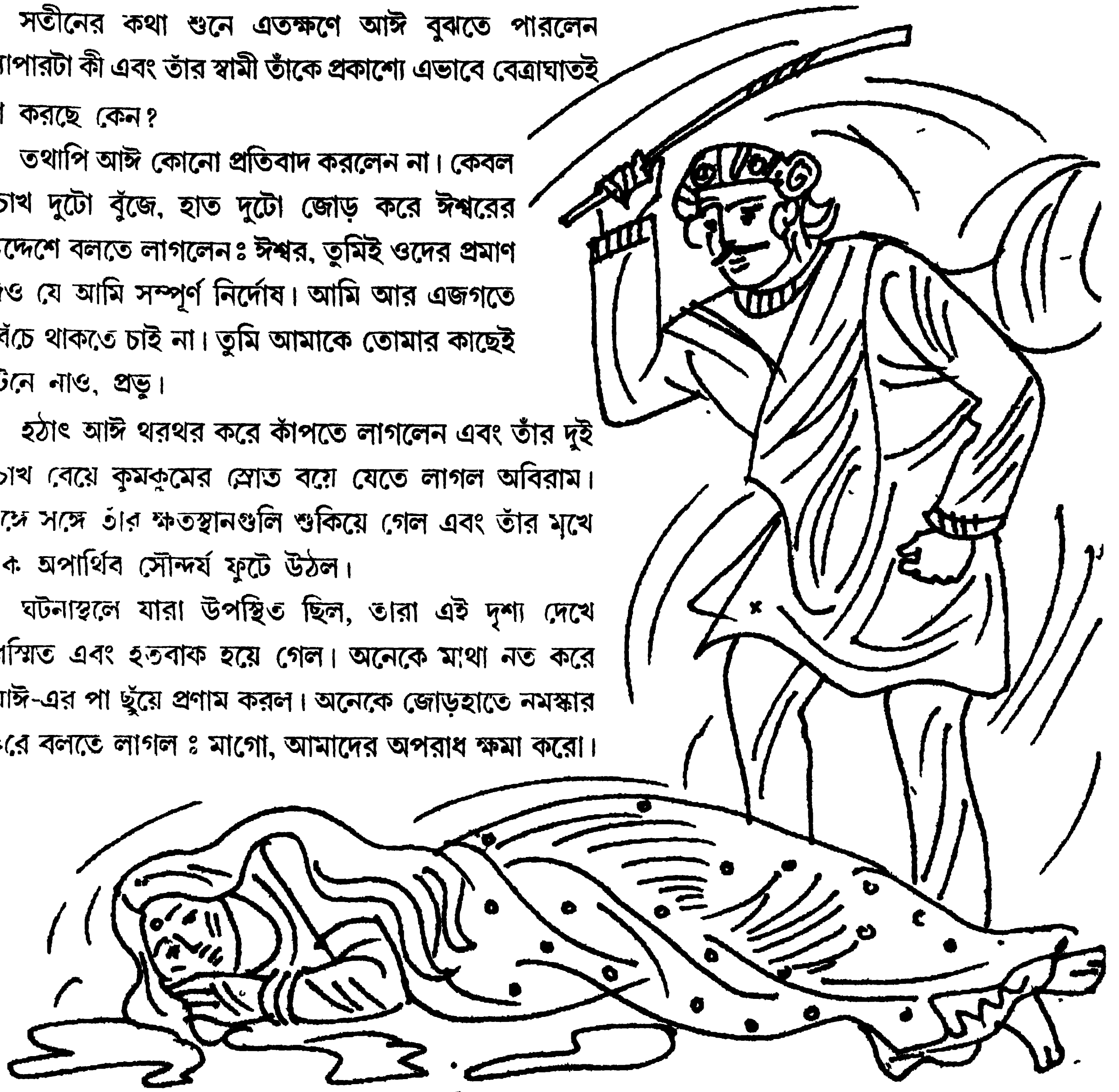
এই সময় পুনশ্রী কাছে এসে আঙ্গকে লক্ষ করে বললঃ 'তোর জন্যে সারা গাঁয়ে আমাদের মাথা হেঁট হয়েছে,— তোকে মেরে ফেলাই উচিত।'

সতীনের কথা শুনে এতক্ষণে আঙ্গ বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কী এবং তাঁর স্বামী তাঁকে প্রকাশ্যে এভাবে বেত্রাঘাতই বা করছে কেন?

তথাপি আঙ্গ কোনো প্রতিবাদ করলেন না। কেবল চোখ দুটো বুঁজে, হাত দুটো জোড় করে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলতে লাগলেনঃ ঈশ্বর, তুমিই ওদের প্রমাণ দিও যে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমি আর এজগতে বেঁচে থাকতে চাই না। তুমি আমাকে তোমার কাছেই টেনে নাও, প্রভু।

হঠাৎ আঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগলেন এবং তাঁর দুই চোখ বেয়ে কুমকুমের স্রোত বয়ে যেতে লাগল অবিরাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্ষতস্থানগুলি শুকিয়ে গেল এবং তাঁর মুখে এক অপার্থিব সৌন্দর্য ফুটে উঠল।

ঘটনাস্থলে যারা উপস্থিত ছিল, তারা এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত এবং হতবাক হয়ে গেল। অনেকে মাথা নত করে আঙ্গ-এর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। অনেকে জোড়হাতে নমস্কার করে বলতে লাগল ঃ মাগো, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো।



আঙ্গ জসল তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লোককে বললেনঃ কুচরি গাঁয়ে গিয়ে এক্ষুনি আমার ভাইকে ডেকে আনো। তাঁকে তাড়াতাড়ি আসতে বোলো এবং তাঁকে খানিকটা বিশুদ্ধ ঘি ও একটা চুনারিও আনতে বোলো।

সংবাদ পাওয়ামাত্র লাধোয়া ঘি ও চুনারি সংগহ করে উটে চড়ে বারাদি গ্রামের উদ্দেশে রওনা হলেন। দ্রুতবেগে উটটাকে ছুটিয়ে এনে যখন তিনি গাঁয়ের কাছাকাছি এসে পড়েছেন, তখন সারা গাঁয়ে যেন একটা উৎসবের ধুম পড়ে গেছে। সানাই বাজছে। ঢাক বাজছে। গাঁয়ের যতো রুগ্ণ, পঙ্গু, অন্ধ সবাই ছুটছে। তারা সবাই আঙ্গী জসলের পা ছুঁতে চায়। তাঁর পা ছোঁয়া মাত্র তারা সুস্থ হয়ে উঠছে। যারা নিঃসন্তান, তারা সন্তান-কামনায় ছুটে আসছে। বৃদ্ধ এবং অশক্তরা শক্তিলাভের জন্য ছুটে আসছে। আঙ্গী তাঁদের স্পর্শ করছেন, আশীর্বাদ করছেন, আর মুহূর্তের মধ্যে তারা লাভ করছে তাদের প্রার্থিত বস্তু।

লাধোয়া এইসব দেখতে দেখতে এগিয়ে এলেন। চন্দনকাষ্ঠের একটা চিতা জ্বলছে। সেই চিতা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিশাল মিছিল। আঙ্গী আস্তে আস্তে চিতার উপর উঠে যাচ্ছেন। আগুনের শিখা তাঁর পায়ের আঙুলগুলো স্পর্শ করল। ক্রমে ক্রমে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল চিতাগ্নি। আঙ্গী লাধোয়াকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন ঃ ভাই, ওই পবিত্র ঘি ঢেলে দাও আমার মাথায়, আর ওই চুনারি দিয়ে ঢেকে দাও আমার সর্বাঙ্গ।

লাধোয়া আঙ্গীয়ের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। আঙ্গী হাত তুলে লাধোয়াকে আশীর্বাদ করলেন। লাধোয়া তাঁর মাথায় ঢেলে দিলেন পবিত্র ঘি, আর তাঁর সুন্দর মুখটি ঢেকে দিলেন সেই রঙিন চুনারিটি দিয়ে।

তারপর দাঁড়িয়েই থাকলেন। আগুনের নীল শিখা আকাশের দিকে উঠে যেতে লাগল। লাধোয়া দেখলেন—সেই শিখার সঙ্গে আঙ্গী জসলের পবিত্র আত্মাও স্বর্গের দিকে উঠে যাচ্ছে।



ধূর্ত ব্রাহ্মণ



যাধোজি ভট্ট সুরেন্দ্রনগরের পুরনো রাজপুরোহিত। তাঁর বয়েস প্রায় নব্বই বছর, অগাধ পণ্ডিত, সাহিত্য-দর্শনে অসম্ভব মেধা।

যেহেতু তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে পুরোহিতের সকল দায়-দায়িত্ব হস্তান্তরিত করতে হয়েছে। তাঁর ভাইপো বল্লভজি এখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

তাই বলে যাধোজি যে রাজপরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বা সম্পর্ক ছেদ করেছেন, তা নয়। বাজপরিবারের ব্যাপারে তাঁর কৌতূহল কিছুমাত্র কমেনি। প্রায় প্রত্যেকদিনই তিনি বল্লভজির কাছে রাজপবিবাপেব খোঁজ-খবর নেন; মহারানি বা সভাসদরা কে কী বলছেন, তা শোনেন। সংবৎসরের মধ্যে মাত্র একবার —নববর্ষ উপলক্ষে তিনি রাজবাড়ি যান, নানান উপহার দ্রব্য নিয়ে মহানন্দে বাড়ি ফিরে আসেন।

একদিন ব্রাহ্মণ বসে বসে ধ্যান করছিলেন। এমন সময় রাজবাড়ি থেকে বল্লভজি ফিবে এসে ব্রাহ্মণকে খবব দিলেন যেঃ শিঘ্রি বাজপরিবারের ভূ-সম্পত্তি দুই ভাই অর্জন সিং আব সবল সিংয়ের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে; এখন থেকে তাঁরা পৃথকভাবে রাজ্য শাসন কববেন।

বল্লভজি বললেনঃ দুই ভাইয়েরই লোভ সুরেন্দ্রনগবের উপর, দুই ভাই-ই সুরেন্দ্রনগর দাবি করেছেন।

সব শুনে বৃদ্ধ যাধোজি ভট্ট জপতপ ছেড়ে উঠে বসলেন। সুরেন্দ্রনগরের ব্যাপারে তাঁর নিজের স্বার্থও জড়িত ছিল, কেননা তিনি দুই রাজভ্রাতার মধ্যে বড়ো ভাই অর্জন সিংকেই বেশি পছন্দ করতেন। তাঁরও ইচ্ছাঃ অর্জন সিং-ই সুরেন্দ্রনগরের স্বত্ব লাভ করুন, ছোটো ভাই সবল সিং পান চৌদা নামে অঞ্চলটি।



পরদিন সকালে ব্রাহ্মণ রাজবাড়ি গেলেন। তাঁকে দেখে সকলেই বিস্মিত। দুই রাজভ্রাতা যে-ঘরে বসেছিলেন, যাধোজি সেই ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন— দুই ভাই একসঙ্গে বসে কথাবার্তা বলছেন।

'আপনি আবার কষ্ট করে এতখানা পথ হেঁটে এখানে এলেন কেন? আপনি খবর দিলে বরং আমরাই আপনার কাছে যেতাম।'— অর্জন সিং বললেন।

ব্রাহ্মণ বললেনঃ আমি শুনতে পেলাম যে তোমরা ভূসম্পত্তি সবকিছু ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে উদ্যোগী হয়েছ,— তাই তোমাদের আশীর্বাদ করতে চলে এলুম।

'আমরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করছিলাম কে কী পাবে, কীভাবে ভাগ-বণ্টন হবে। কিন্তু দু-ভাই কিছুতেই নিষ্পত্তি করতে পারছি না। যেহেতু আমি বড়ো, আমি মনে করি আমার পছন্দ মতোই ভাগ-বণ্টন হোক। কিন্তু আমার ভাই মনে করে, যেহেতু সে ছোটো— তার পছন্দ অনুসারেই তা হওয়া উচিত।... এখন আপনি এসে পড়েছেন, ভালোই হয়েছে। আপনিই আমাদের সমস্যার সমাধান করে দিন।' —দুই ভাইই এই কথা বললেন।

ব্রাহ্মণ চালাকি করে বললেন ঃ রাজকুমার, আমাকে আবার এসব বিষয়-সম্পত্তির ঝামেলার মধ্যে জড়াতে যাচ্ছো কেন? আমার কাছে তোমরা দুজনেই সমান। তোমাদের বৈষয়িক ব্যাপারে আমার নাক না-গলানোই উচিত। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, দিনরাত পুজো-আচ্চা নিয়েই বেশ আছি।

'সেইজন্যেই তো আমরা চাই আপনি থেকে আমাদের মধ্যে ভাগ-বণ্টন করে দেন। আমরা দুজনেই আপনাকে বিশ্বাস কবি।'— রাজপুত্রেরা বললেন।

ব্রাহ্মণ বললেনঃ তবে তোমাদের একটা গল্প বলি, শোনো। ... একদা এই নগরে এক ঋষি বাস করতেন। তাঁর দুজন শিষ্য ছিল। দশ বছর যাবৎ তারা ঋষির কাছে থেকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। ঋষি যা জানতেন, তিনি প্রাণ ঢেলে তাদের সব শিখিয়েছিলেন। শিক্ষা শেষ করে শিষ্য-দুজন বাড়ি ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ কবছে। একদিন রাত্রে ঋষি ধ্যানে বসেছেন। তাঁর চারদিকে মাটির পাত্রে ধূপাগ্নি জ্বলছে। শিষ্যদ্বয় তাঁর আশীর্বাদ নিতে এল। ঋষি পাত্র থেকে খানিকটা ছাই তুলে নিয়ে দুই শিষ্যকেই সেই ছাই দিলেন। দুজনের একজন ভাবল ঃ যজ্ঞের ছাই অত্যন্ত পবিত্র। এই ভেবে সে সমস্ত ছাই মুখে পুরল, গিলেও ফেলল। অন্যজন সেই ছাই দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। যে ছাইটা গিলে নিয়েছিল, সে ভবিষ্যতে খুব বড়ো পণ্ডিত হয়েছিল; আর যে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল, সে হয়েছিল অত্যন্ত নির্বোধ। অনেককাল পরে গুরুর সামনে ফিরে এসে যথোচিত শিক্ষাদান, না-করার অভিযোগে সে গুরুকে খুব তিরস্কার করেছিল।

তোমরা দুজনেই আমার খুব প্রিয়। আমার ভয় হচ্ছে, এক্ষেত্রে আমার সিদ্ধান্ত হয়তো তোমাদের দুজনকে খুশি করতে পারবে না। তাই বলছিলাম— আমাকে এসব বিষয়-সম্পত্তি বণ্টনের মধ্যে জড়িয়ো না। তোমবা কেউ আমার কাজে মনে কষ্ট পাও, তা আমি চাই না।

ব্রাহ্মণের এসব কথা শুনেও দুই ভাই তাঁকে চাপ দিতে লাগলেন এবং স্থির হল— পরদিন সকালে ব্রাহ্মণ যে মীমাংসা করবেন, দুই ভাই নির্বিবাদে তা-ই মেনে নেবেন।

পরদিন রাজবাড়ি যাওয়ার আগে ব্রাহ্মণ বল্লভজির মাধ্যমে অর্জন সিংয়ের কাছে একটা চিরকুট পাঠালেন। তাতে লেখা আছে ঃ বাধ্য শিষ্য যেমন আচরণ করেছিল, তা করলে তোমারও মঙ্গল হবে।

পরদিন যথাসময়ে যাধোজি রাজবাড়ি এলেন। সমস্ত রাজকর্মচারী এবং চাকর-বাকরদের ঘর ছেড়ে যেতে বলা হল। তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। ভট্ট খুব শান্ত আর নম্র স্বরে বললেন ঃ 'সেই দুজন শিষ্যের গল্প তোমাদের মনে আছে তো?'

রাজপুত্রেরা মাথা নেড়ে বললেন ঃ 'ঠাকুরমশাই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন— আমরা কোনো কারণেই আপনাকে দোষী করব না।'

তখন ভট্টজি দু-টুকরো কাগজ নিলেন, তারপর সেগুলোর উপর কীসব লিখে রাজপুত্রদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, যার যেটা খুশি—নাও। একটায় সুরেন্দ্রনগর, অন্যটায় চৌদার নাম লেখা আছে। বাকি বারোটা গ্রাম তোমাদের দুজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে।



অর্জন সিং প্রথমেই একটা টুকরো তুলে নিলেন, —নিয়েই সেটা মুখের মধ্যে চালান করে দিলেন, এবং হ্যাঁ, গিলেও ফেললেন। সবল সিং দাদার এই কাণ্ড দেখে বললেন ঃ কী লেখা আছে না-দেখেই তুমি ওটা গিলে ফেললে?

'তার জন্যে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে-না। তোমার টুকরোটা তো আছে। তোমার টুকরোয় যেটার নাম লেখা নেই, সেইটাই না-হয় আমার ভাগ্যে বর্তাবে।'—অর্জন সিং বললেন।

সবল সিং তাঁর টুকরোর ভাঁজ খুললেন, দেখলেন— তাতে লেখা আছে ঃ চৌদা।

বণ্টনের পর্ব শেষ হল। সবল সিং চৌদায় চলে গেলেন এবং সেখানকার শাসন-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এদিকে অর্জন সিং সেই সুরেন্দ্রনগরেই বহাল হলেন।

কিছুকাল পরে ধূর্ত ব্রাহ্মণের কারসাজি ওই অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। ওই ব্রাহ্মণ দুটি টুকরো-কাগজেই 'চৌদা'— এই শব্দটি লিখে ভাঁজ করে রেখেছিলেন, এবং অর্জন সিংহ গল্পে-বলা সেই 'বাধ্য শিষ্যে'র মতো একটা টুকরো হাতে পাওয়ামাত্র গলাধঃকরণ করে বসেছিলেন।

এই গল্পটা সুরেন্দ্রনগরে আজও খুব চালু আছে, এবং সেখানকার লোকেরা এই গল্পটি বলে আজো খুব হাসাহাসি করে থাকে।

ছেলে



কুখ্যাত ডাকাত অপা দেবতের বাড়ি চালালা গ্রামে।

কাহিনীর শুরুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঃ গ্রামের কাঠিদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে অপা দেবত মজলিশ করছে। কাঠিদের একজন তাকে দামি এবং সুগন্ধি তামাক দিয়ে তোষামোদের সুরে বলছে ঃ একমাত্র অপা দেবতই এই তামাকের কদর বোঝেন। আর একজন দাঁড়িয়ে উঠে সোনা এবং রুপোর কাজ-করা একটা হুঁকো উপহার দিয়ে বলছে ঃ এরকম হুঁকো ব্যবহারের যোগ্যতা একমাত্র অপা দেবতেরই আছে।

তারপর আর একজন অপাকে তার ঘোড়ার জন্য একটা লাল পতাকা উপহার দিল।

অপা দেবত প্রসন্ন হাস্যসহ সেইসব উপহার গ্রহণ করল, তারপর চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল, এবং একবার গোঁফে তা-ও দিয়ে নিল, ভাবল ঃ আমি কে, আর রাজা-বাদশাই বা কে?



ভিড়ের মধ্যে, অল্প একটু তফাতে ভিন গাঁয়ের এক কাঠিও বসেছিল। সে এইসব নিঃশব্দে পর্যবেক্ষণ করল, তারপর পাশে বসে-থাকা একটা লোককে বলল ঃ কবে থেকে কাঠিরা এরকম উপহার দেওয়া এবং স্তাবকতা করা শুরু করেছে? অপা দেবত কে?

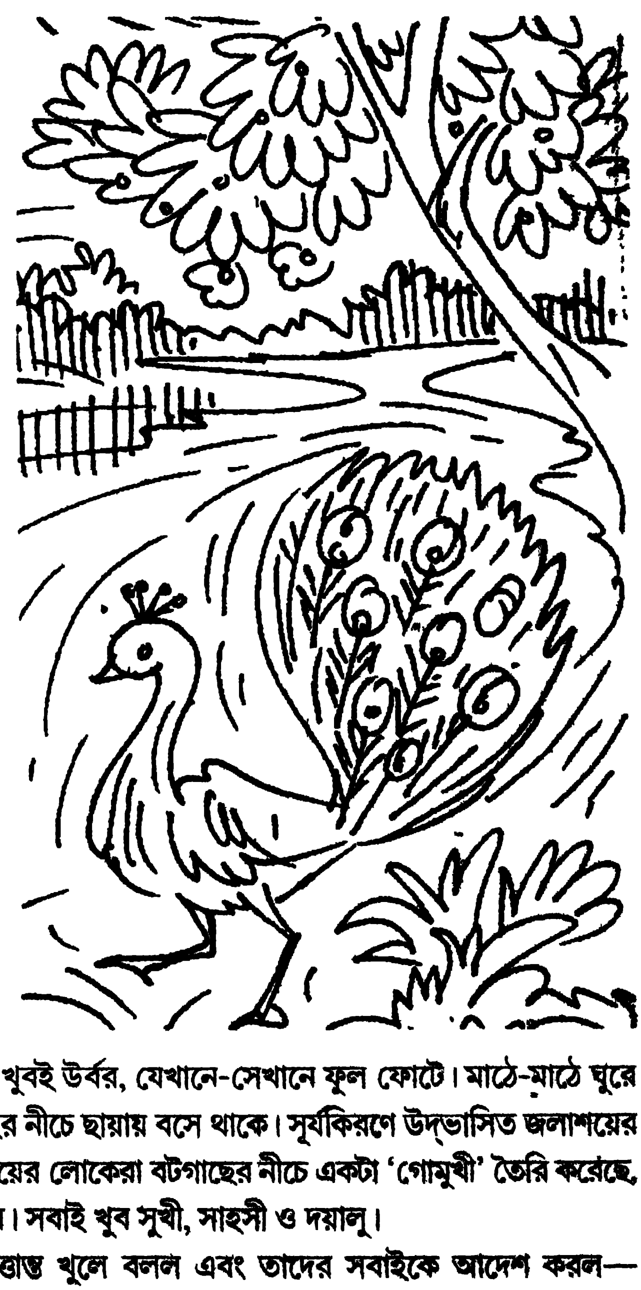
লোকটি উত্তরে বলল ঃ অপা লখা, তুমি আজও ছেলে মানুষ রয়ে গেলে। বুঝতে পারছি, অপা দেবতের লোকজন এবং ঘোড়ারা আজও তোমাদের গাঁ লুঠ করেনি। যদি তা করত, তাহলে তুমিও আজ তোমার গাছের সবথেকে ভালো আমগুলো ওকে উপহার দিতে নিয়ে আসতে।

অপা লখা মাথা নেড়ে জবাব দিল ঃ না, আমি ভয়ে কখনো কাউকে কোনো জিনিস ভেট দিই না। বরং পাখিরা আমগুলো খেয়ে নষ্ট করুক, সেও স্বীকার। আমরা কাঠিরা জন্মসূত্রেই সমান, কেউ কারো চেয়ে বড়ো বা ছোটো নই।

অপা লখার শেষ কয়েকটা শব্দ অপা দেবতের কানে গেল, এবং কথাগুলো শোনামাত্র তার মাথায় রক্ত চড়ে গেল, চেঁচিয়ে বলে উঠল ঃ কে হে? একথা যে বললে সে কেডা? ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আর একবার বল দেখি কথাগুলো।

অপা লখা বলল ঃ আমি অপা লখা। বলছি— সব কাঠিই সমান। আমার স্বজাতীয়দের ভয়বশত তোমাকে উপহার দিতে দেখে আমি খুব কষ্ট বোধ করছি। ওদের উপহার নেওয়ার সময় তোমারও লজ্জা বোধ করা উচিত ছিল।

অপা দেবত রাগে খেপে গেল, এবং হেঁড়ে গলায় লখাকে বলল ঃ তোমাদের গাঁয়ের চারধারে শীঘ্রি একটা দুর্গ বানিয়ে নাও, কেননা কদিনের মধ্যেই আমি সেখানে যাচ্ছি— তোমাকেও ধ্বংস করব।



লখা বলল ঃ স্বাগতম। আমি একটা ছোট্টো গাঁয়ের মালিক; আমাব পক্ষে অত বড়ো একটা দুর্গ বানানো সম্ভব নয়, তা তুমি ভালোই জানো। তবে আমি তোমাব সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে যথাসম্ভব প্রস্তুত থাকব এবং তোমাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করতেও ভুলব না।

অপা দেবত ভ্রু কুঁচকে লখার দিকে চেয়ে থাকল।

ইতিমধ্যে একজন বয়ঃপ্রবীণ ব্যক্তি অপাব পাযেব উপব পড়ে লখাব হযে ক্ষমা চেয়ে বলল ঃ অপা দেবত, লখাব কথায ৰাগ কোরো না। ও এখনো চ্যাংড়া, আব ভীষণ বদমেজাজি। তোমাকে কী বলছে ও নিজেও জানে না।

কিন্তু লখা ভয পেল না, অপা দেবতকে উদ্দেশ্য করে বলল ঃ আমি তোমাকে নেমন্তন্ন কবে গেলাম। যেদিন খুশি, এসো। তরবারির মালিক সে-ই, যে তাকে যোগ্য মর্যাদা দিতে জানে।

এই বলে ঘোড়ায চেপে লখা নিমেষে উধাও হয়ে গেল।

লখার গাঁয়েব নাম লখাপাদার। শেলনদীর ধাবে গ্রামটা। তীরস্থ শিলারাশির উপর আঘাত করে করে প্রবাহিত হয়ে যায় শেল নদীর জলধারা। গ্রামের মাটি খুবই উর্বর, যেখানে-সেখানে ফুল ফোটে। মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ায় ময়ূরেরা, কখনো সুন্দর পেখম ছড়িয়ে বটগাছের নীচে ছায়ায় বসে থাকে। সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত জলাশয়ের জলে নেচে বেড়ায় নানা রকমের, নানা রঙের মাছ। গাঁয়ের লোকেরা বটগাছের নীচে একটা 'গোমুখী' তৈরি করেছে, সবাই সেই গোমুখীর টাটকা ও সুস্বাদু জলই পান করে। সবাই খুব সুখী, সাহসী ও দয়ালু।

গাঁয়ে ফিরে লখা গ্রামবাসীদের কাছে সমুদয় বৃত্তান্ত খুলে বলল এবং তাদের সবাইকে আদেশ করল— সবাই যেন অপা দেবতের সঙ্গে মোকাবিলার জন্যে সর্বদা তৈরি থাকে।

কয়েক মাস কেটে গেল। অপা দেবত এল না। সবাই মনে করল— হয় সে ভয় পেয়েছে, না-হয় তার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেছে।

একদিন লখাকে কোনো কাজে গাঁ-ছেড়ে চলালা যেতে হল। সারারাত তার সেখানেই কেটে গেল। সেই রাত্রেই অপা দেবত সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে লাখাপাদার লুঠ করল। গ্রামবাসীরা বর্শা নিয়ে অপা এবং তার লোকজনের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গেই লড়ল বটে, কিন্তু অশ্বারোহী শক্তিশালী দুর্দান্ত দস্যুদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তারা এঁটে উঠতে পারল না। অপা দেবত গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে, বহু লোককে হত্যা করে বীরবিক্রমে লখার বাড়ির সামনে এসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তার নাম ধরে ডাকতে লাগলঃ কই, কাঠি— বেরিয়ে এসো। তুমি আমাকে নেমন্তন্ন করেছিলে না? এখন লুকিয়ে পড়লে কেন?



এই কথা শুনে লখার স্ত্রী বেরিয়ে এসে বললঃ অপা দেবত, যদি কাঠি বাড়ি থাকত, তাহলে শেল নদীর ওপারেই তোমার সঙ্গে দেখা করত। তোমার ভয়ে লুকিয়ে থাকার পুরুষ সে নয়। এই বলে সে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

সমস্ত ক্ষণ,— লখার পনরো বছরের মেয়ে হীরবাঈ দেয়ালে ঠেস দিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। দস্যুসর্দারের ভয়ানক দৃষ্টি, তার হাতের রক্তমাখা বর্শা, সে যে ঘোড়াটার উপর বসে আছে, সেই ঘোড়াটা— এই সবই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। হঠাৎ দেবতের চোখে পড়ল— একটা টাট্টু ঘোড়া কাছেই গাছের নীচে জাবর কাটছে। ভারি সুন্দর জন্তুটা! দেবত ভাবল— সে এটাকে নিয়ে যাবে; লোকে দেখবে ও জানবে যে সে লখাকে হারিয়ে এসেছে, টাট্টুটাই তার সাক্ষী। মুহূর্তের মধ্যে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নীচে নেমে এল এবং একটা গাছের গায়ে বর্শাটাকে হেলিয়ে রেখে টাট্টুটার বাঁধন খুলতে লেগে গেল।

হীরবাঈ বুঝতে পারল তার বাবার সম্মান রক্ষার এই হল একমাত্র সুবর্ণ সুযোগ! একটি মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না। মুহূর্তের মধ্যে সে বর্শাটা নিজের হাতে তুলে নিল এবং সর্বশক্তি দিয়ে সেই বর্শাটা অপা দেবতের পিঠে আমূল বিঁধিয়ে দিল। অপা ছটফট করতে করতে মাটির উপর গড়িয়ে পড়ে গেল। ডাকাতরা ভাবল, তাদের সর্দার বোধ হয় সম্মুখের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। এই ভেবে তারা ঘোড়ায় চেপে গাঁ ছেড়ে একটা গভীর বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

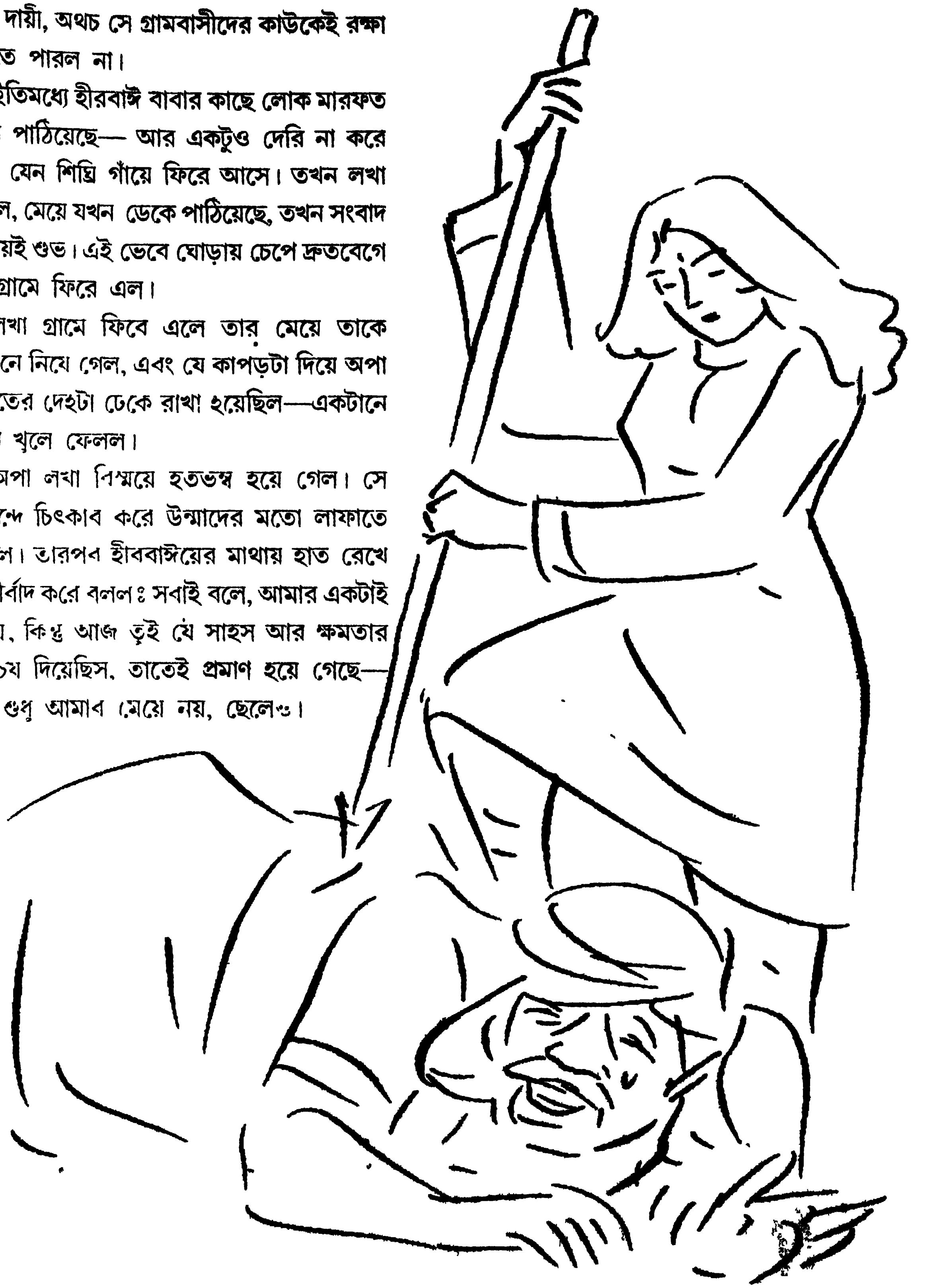
লুঠতরাজের খবরটা ইতিমধ্যে অপা লখার কানে গিয়ে পৌঁছেছে। সে দুঃখে লজ্জায় অপমানে একেবারে ভেঙে পড়লঃ কিছুতেই আর সে গ্রামে ফিরবে না। তার মনে হল— গাঁয়ের লোকের দুর্দশার জন্য একমাত্র

সেই দায়ী, অথচ সে গ্রামবাসীদের কাউকেই রক্ষা করতে পারল না।

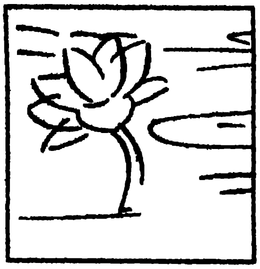
ইতিমধ্যে হীরবাঈ বাবার কাছে লোক মারফত খবর পাঠিয়েছে— আর একটুও দেরি না করে বাবা যেন শিঘ্রি গাঁয়ে ফিরে আসে। তখন লখা ভাবল, মেয়ে যখন ডেকে পাঠিয়েছে, তখন সংবাদ নিশ্চয়ই শুভ। এই ভেবে ঘোড়ায় চেপে দ্রুতবেগে সে গ্রামে ফিরে এল।

লখা গ্রামে ফিবে এলে তার মেয়ে তাকে বাগানে নিয়ে গেল, এবং যে কাপড়টা দিয়ে অপা দেবতের দেহটা ঢেকে রাখা হয়েছিল—একটানে সেটা খুলে ফেলল।

অপা লখা বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল। সে আনন্দে চিৎকাব করে উন্মাদের মতো লাফাতে লাগল। তারপব হীববাঈয়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বলল ঃ সবাই বলে, আমার একটাই মেয়ে, কিন্তু আজ তুই যে সাহস আর ক্ষমতার পবিচয দিয়েছিস, তাতেই প্রমাণ হয়ে গেছে—তুই শুধু আমাব মেয়ে নয়, ছেলেও।



পদ্মফুলের গল্প



অনেককাল আগে বিক্রম নামে এক রাজা ছিলেন।

একদিন তিনি কয়েকজন অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে মৃগয়ার জন্যে বনে গেলেন।

হঠাৎ একটি বন্য শূকরকে দেখতে পেয়ে তিনি তার পিছু ধাওয়া করলেন। জঙ্গল খুবই ঘন। জানোয়ারটা সেই জঙ্গলের মধ্যে নিমেষে কোথায় যে লুকিয়ে পড়ল, রাজা তার কোনো হদিশই পেলেন না।

অনুচরেরা বনে-বনান্তরে রাজাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কোথাও তাঁব সন্ধান পেল না। অবশেষে নিরাশ হয়ে তারা রাজধানীতে ফিরে গেল।

রাজা নিজেও বুঝতে পারলেন যে, তিনি ঘোর বনে পথ হারিয়ে ফেলেছেন।

যা হোক, ঘোড়ার পিঠে চেপে রাজা ধীরে ধীরে বনের ভেতরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় এসে তিনি একটা হ্রদ দেখতে পেলেন। বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে তিনি সেই হ্রদের পাড়ে বসে পড়লেন।

হঠাৎ রাজার চোখে পড়ল হ্রদের নিচুদিকে জলের কাছাকাছি একজন যুবক বসে আছে। যুবকটি খুবই রোগা। তাকে খুব বিষণ্ণ আর ভীষণ দুঃখী-দুঃখীও মনে হচ্ছিল।

রাজা তার কাছে এগিয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই, তোমাকে দেখে খুব অসুখী মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন? তোমার জন্য আমি কি কিছু করতে পারি?

যুবক রাগের সঙ্গে জবাব দিলঃ আমার কষ্টের জন্য আপনাকে আমি বিব্রত করতে যাব কেন? আমার কষ্টের কথা শুনলে আপনি আমাকে বিদ্রূপ করবেন। আপনি কি মনে করেন, আপনি শুভঙ্কর (শুভ বা মঙ্গল করে যে) রাজা বিক্রমের মতো,— যে, আপনি সকলের ভালো করে বেড়াবেন?

বিক্রম হেসে বললেনঃ আমিই রাজা বিক্রম, এবং আমি তোমাকে সাহায্য করতেও চাই। যুবক, বলো— তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি?

যুবকটি বিক্রমের পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধায় বিনত হয়ে প্রণাম করল, তারপর বললঃ

মহারাজ, তাহলে আপনাকে আমার গল্পটাই বলি শুনুন।

আমার নাম অজিত দে। আমার পিতা পাটানের রাজা যশোবন্ত দে। ছেলেবেলা থেকে আমার ঝোঁক ধর্মগ্রন্থ পাঠে, পূজা ও উপাসনায়। রাজগৃহের বিলাসবহুল ভোগ-সম্ভোগপূর্ণ জীবনে আমি কোনোদিনই তৃপ্তি বোধ করিনি। একদিন কাউকে কিছু না বলে আমি গৃহত্যাগ করি, এবং স্থির করিঃ ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থস্থান একা একা পায়ে হেঁটেই পরিভ্রমণ করব। ঘুরতে ঘুরতে আমি এই বনে চলে আসি। খুব ক্লান্ত আর তৃষ্ণার্ত হয়ে হ্রদের নিকটবর্তী ওই অশ্বত্থ গাছটার নীচে বসে বিশ্রাম উপভোগ করছি, হঠাৎ হ্রদের জলে একটা পদ্মফুল দেখতে পাই,— পদ্মের বোঁটাটা জলের নীচে ডুবে আছে। আর সব পদ্মফুলের মধ্যে এই পদ্মফুলটি এত

সুন্দর যে, আমি তার দিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারি না। আমার সারাটা জীবনে এই পদ্মফুলটির মতো সুন্দর জিনিস আর দ্বিতীয় দেখিনি। আমি ওই ফুলের সৌন্দর্যের বর্ণনা দেব— এমন শক্তি আমার নেই। ওতে নানান বর্ণের এক হাজারটি পাপড়ি আছে। দেখামাত্র ধরবার জন্য আমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম কী,— ফুলটাকে ধরবার জন্য যতই আমি হাত বাড়িয়ে দিই, ফুলটা ততই আমার নাগালের বাইরে চলে যায়। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, ফুলটাকে পেতেই হবে। রাত্রিবেলা আমি গাছের ডালের উপর ঘুম যাই, আর দিনের বেলা বসে বসে কেবল ফুলটাকেই দেখি। প্রতি আটদিন অন্তর ফুলটা হ্রদের জলের উপর ভেসে ওঠে; এবং যতবার আমি ধরতে যাই, ততবারই বিফল হই।

মহারাজ বিক্রম স্থির করলেন— তিনিও যুবকের সঙ্গে থেকে ফুলটাকে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ফুলটা তাকেই উপহার দেবেন।

অষ্টম দিনে পদ্মটি জলের উপর আবার ভেসে উঠল। রাজাও ফুলটির সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ এবং নির্বাক হয়ে গেলেন।



তারপর, 'হে জলদেবতা, আমাকে রক্ষা করো,' এই বলে রাজা হ্রদের জলে ঝাঁপ দিলেন।

জলের তলায় ডুব দিয়ে বিক্রম বুঝতে পারলেন যে, তিনি অন্য এক জগতে এসে প্রবেশ করেছেন। এক অপূর্ব দেশ, আশ্চর্য সুন্দর এক পুরী। সামনেই একটি বিশাল রাজপ্রাসাদ।

রাজা সেই রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে প্রাসাদের সম্মুখে একটি বিশাল বাগান দেখতে পেলেন। সেই বাগানে অজস্র ফুল ফুটে আছে, অজস্র ফল ফলে আছে। সেখানেও একটা হ্রদ আছে, এবং হ্রদের স্বচ্ছ জলে হাজার হাজার পদ্ম সূর্যের আলোয় স্নান করে বাতাসের সঙ্গে নাচছে, কেবলই নাচছে। যে ফুলটা তিনি দেখে এসেছিলেন, রাজা দেখলেনঃ ফুলগুলোও অবিকল তেমনি।

কে যেন তাঁকে দেখল, এবং চোর ভেবে ভয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে লাগল। রাজা সব শুনতে পেলেন। ধীরে ধীরে একটা ছোটে-খাটো বাহিনীই সমবেত হয়ে রাজাকে চারপাশ থেকে ঘিরে দাঁড়াল এবং রাজার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দিল।

রাজা সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের সবাইকে হারিয়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ এক পরমা সুন্দরী সুহাসিনী জ্যোতির্ময়ী দেবী রাজার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

তুমি কে? এখানে কী করতে এসেছ? কোথায় তুমি এত শক্তি পেলে যে হ্রদের মধ্যে দিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হলে এবং একটা পুরো বাহিনীকে যুদ্ধে হঠিয়ে দিলে?

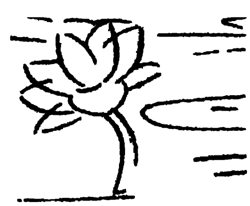
রাজা বললেনঃ আমি রাজা বিক্রম। যারা আমার সাহায্য প্রার্থনা করে, আমি প্রাণ দিয়ে তাদের সাহায্য করি। হ্রদের পাড়ে এক রাজপুত্র বসে আছে। এখানে যে-সব দুর্লভ পদ্মফুল ফুটে আছে, তেমনি একটা পদ্মফুল সে পেতে চায়। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি তাকে এই ফুল একটা উপহার দেব। দয়া করে আপনি আমাকে একটি পদ্ম দিন।

দেবী বিক্রমকে বললেনঃ এই রাজপ্রাসাদ তোমাকে দিলাম, যখন ইচ্ছা হয় তখনই তুমি এখানে এসো।

এই বলে তিনি বিক্রমকে এক হাজারটি পদ্মফুল দিলেন। রাজা সেই ফুলগুলি নিয়ে রাজপুত্রের কাছে ফিরে এলেন। ফুল পেয়ে রাজপুত্র এত খুশি হল যে কী বলব। রাজা তাকে পাতালপুরীর রাজপ্রাসাদের কাহিনীও শোনালেন। এতে সেই রাজপুত্র কিন্তু রাজার প্রতি ভীষণ ঈর্ষা বোধ করতে লাগল। রাজাকে বলল ঃ আমি আপনাকে ওই পদ্মফুলটার কথা বলেছিলাম বলেই-না আপনি হ্রদের নীচে গেলেন এবং এমন অপূর্ব রাজপ্রাসাদ ও ধনরত্ন লাভ করলেন!

বিক্রম হেসে বললেনঃ আমার এসবে কোনো প্রয়োজনই নেই। তুমি অতো করে চেয়েছিলে বলেই আমি তোমার জন্যে একটা পদ্মফুল আনতে গিয়েছিলাম। আমার মতো তুমিও যদি পাতালপুরীতে যেতে পারো, তাহলে তুমিও ওই রাজপ্রাসাদ আর ধনরত্নের মালিক হবে। বীর ও সাহসী ব্যক্তির পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

এই বলে রাজা ঘোড়া ছুটিয়ে ঝড়ের বেগে চলে গেলেন।



সাহসী আরবের কাহিনী



একটা বিশাল অশ্বত্থ গাছের নীচে দুজন পথিক বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। একজন এক বেনিয়া— তার গায়ে সাদা কুর্তা আর পরনে ধুতি। অন্যজন এক আরব-যোদ্ধা— তার পরনে আঁট-সাঁট পাজামা আর গায়ে জামা।

আরবের মাথায় একটা পাগড়িও ছিল, এবং তার কোমরে জড়ানো ছিল একটা নকশাকাটা রেশমি ফিতে; ওই ফিতের সঙ্গে বাঁধা ছিল একটা ছোটো আকারের ছোরা।

বেনিয়া তার ঝুলি থেকে খাবার বের করে তার থেকে আরবকে কিছুটা দিতে গেলে, আরব জানাল যে সে আগেই তার খাবার খেয়ে নিয়েছে, আর দরকার নেই— বেনিয়া স্বচ্ছন্দে তার খাবার খেয়ে নিতে পারে।

বেনিয়া খেতে খেতে আরবের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। কথাবার্তায় জানা গেল তাদের গন্তব্যস্থল একই গ্রাম। গ্রামটির নাম খোপালা, এখান থেকে মাইল কয়েক দূরে অবস্থিত।

বেনিয়ার সঙ্গে ছিল সোনার টাকা আর সোনার গয়না, যার মূল্য অন্তত পাঁচ হাজার টাকার কম নয়। ওই টাকা আর গয়না সে নিয়ে যাচ্ছিল তার মেয়ের জন্যে। পথে একজন শক্ত সমর্থ সাহসী সঙ্গী পাওয়া গেল ভেবে বেনিয়া বেশ খানিকটা স্বস্তি বোধ করল।

আরব জিজ্ঞাসা করল ঃ তোমার কাছে টাকা-পয়সা আছে কি? কেননা, এই জায়গাটা তেমন নিরাপদ নয়। যদি মূল্যবান তেমন কিছু থাকে তো আমাকে দাও, আমি আমার পাগড়ির মধ্যে লুকিয়ে রাখি।

বেনিয়া বলল ঃ না, আমার কাছে কিছুই নেই।

তারপর দুজনে নিজের নিজের ঘোড়ার পিঠে চেপে যাত্রা শুরু করল। যেতে যেতে তারা এসে পৌঁছল ঘন জঙ্গলে-ঘেরা একটা ঢালু পাহাড়িয়া জায়গায়। বিপদসঙ্কুল পথ, অচেনা-অজানা দেশ। কাজেই তারা কথা বন্ধ করে নিঃশব্দে সেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলতে লাগল।

হঠাৎ খানিকটা দূরে— সম্মুখে তারা কজন অশ্বারোহীকে দেখতে পেল। আরব বুঝতে পারল তারা ডাকাত— এই জঙ্গলে আত্মগোপন করে থেকে, হঠাৎ চড়াও হয়ে পথিকের যথাসর্বস্ব লুঠ করে নেয়।

কিন্তু আরব ডাকাতদের দেখে আদৌ ভয় পেল না, কারণ তার কাছে এমন কিছু মূল্যবান সামগ্রী নেই যে ডাকাতেরা লুঠ করবে। কিন্তু বেনিয়া ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল।

এখন আমাদের কী হবে? বেনিয়া আরবকে জিজ্ঞাসা করল।

আমাদের কাছে যখন টাকা-পয়সা কিছুই নেই, তখন ভয় কীসের? আরব বলল ঃ ওরা আমাদের কোনো ক্ষতিই করবে না।

কিন্তু আমার কাছে যে সোনার টাকা আর সোনার গয়না আছে! বেনিয়া ভয়ে ভয়ে কবুল করে বসল।

তাহলে আগে আমি যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন মিথ্যে কথা বলেছিলে কেন? আরব রাগতভাবে

বলল: এখন আর কী করবে? গয়না আর টাকা-পয়সাগুলো আমার কাছে জমা করে এক্ষুনি তুমি চম্পট দাও— সামনে যে গ্রাম পাবে, সেই গ্রামে পৌঁছে আমার জন্য অপেক্ষা করো গে।

সঙ্গে সঙ্গে বেনিয়া তার সব জিনিসপত্র আরবের হাতে গছিয়ে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে সরে পড়ল। পৈতৃক প্রাণটা তো আগে বাঁচুক।

ইতিমধ্যে ডাকাতরা আরবের কাছে পৌঁছে গেছে। তারা আগেই দেখে ফেলেছিল— বেনিয়া তার ঝুলি থেকে কী যেন বের করে আরবকে দিয়ে গেল।

ডাকাতদের সর্দাব আরবের বুকের উপর বর্শা উঁচিয়ে ধরে বলল:



আমরা বুঝতে পেরেছি তোমার কাছে কিছু দামি জিনিসপত্র আছে। যদি প্রাণে বাঁচতে সাধ থাকে, সেগুলো আমাদের দিয়ে দাও।

আরব বেনিয়ার গচ্ছিত-রাখা জিনিসপত্রগুলো দিতে অস্বীকার করে দস্যু সর্দার 'জিগোশিয়ার'কে বলল:

জিনিসগুলো আমার নয়। আমার সঙ্গী সেগুলো বিশ্বাস করে আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে। সেগুলো আমি তোমাদের কিছুতেই দিতে পারব না।

এই বলে আরব হঠাৎ ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

তখন দস্যুরাও দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আরবের পেছনে ধাওয়া করল।

দস্যুদের সকলের হাতে আছে তির-ধনুক, আর আরবের কাছে মাত্র একটা খুদে বন্দুক। কাজেই একজন মানুষের সঙ্গে লড়তে হলেও দস্যুরা তাকে ঘাঁটাতে বেশ খানিকটা ভয়ই বোধ করছিল। এদিকে আরব জানে যে তার বন্দুকে মাত্র একটাই গুলি আছে। কাজেই যতক্ষণ পারে ততক্ষণ কিছুতেই সে সেই গুলিটা খরচ করবে না,— করলে তার মৃত্যু নিশ্চিত।

গাঁয়ের কাছাকাছি আসতেই ডাকাতরা একযোগে তির ছুঁড়তে আরম্ভ করল। আরব তার শরীর থেকে তিরগুলো তুলে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে নির্ভুল নিশানায় সেই একটিমাত্র গুলিতে দস্যুদলের সর্দারের ভাইকে মেরে বসল। বাকি দস্যুদের মোকাবিলা করল ছোরা দিয়ে,— তিনজন দস্যুকেও হত্যা করল। মুহূর্তের মধ্যে বাকি দস্যুরা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন আরব একটা নদীর ধারে পৌছে ঘোড়াটাকে দাঁড় করাল, তারপর ঘোড়া থেকে নেমে নদীর জলে ক্ষতস্থানেব রক্ত ধুয়ে ক্ষতস্থানগুলো পরিষ্কার করল। তারপর ঘোড়ার পিঠে চেপে ধীরে ধীরে সম্মুখের একটি গ্রামে গিয়ে পৌছল। গ্রামটির নাম অংকারিয়া।

গ্রামেব প্রধান তখন গ্রামবাসীদের নিয়ে একটি সভা করছিল। আরব সেখানে পৌছতেই গ্রামপ্রধান ভিখাভাই তার কাছে ছুটে এল, দেখল সে আহত; তখন ভিখাভাই সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিজের বাড়ি নিয়ে গেল এবং তাকে আশ্রয় দিল।



পরে বিকেলবেলায় ডাকাতদের সর্দার জিগোশিয়াব সেই গ্রামে এসে ভিখাভাইকে বললঃ এই আরবটা আমার ভাইকে খুন করেছে, আমি ওর মুণ্ডু চাই। তোমরা যদি ওকে আমার হাতে তুলে না-দাও, তাহলে আমি গ্রামসুদ্ধ সকলকে পুড়িয়ে মারব।

ভিখাভাই বললঃ আমরা এই গ্রামের ষাট জন পুরুষ তোমাকে প্রতিরোধ করব। তুমি যা খুশি করতে পারো, কিন্তু ওই আরব আমাদের শরণাগত; কাজেই কোনো রকমেই আমরা তাকে তোমার হাতে ছেড়ে দেব না।

ডাকাতেরা চলে গেল এবং আরব সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ওই গ্রামেই রয়ে গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই আরব নীরোগ হয়ে উঠল এবং আবার তার গন্তব্যস্থল বরোদার উদ্দেশে যাত্রা করল

ভিখাভাই তাকে বলল: তোমার কাছে কিছু টাকা-পয়সা আছে তো?

আরব বলল : না।

তখন গ্রামপ্রধান তাকে কয়েকটা টাকা দিল এবং শহর পর্যন্ত এগিয়ে দেবে বলে তার সঙ্গ নিল।

শহরে পৌছনোব পর তাদের সঙ্গে সেই বেনিয়ার দেখা হল। আবাব যে টাকাপয়সা ও সোনাদানাগুলো ফিরে পাবে— বেনিয়া সে-আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিল। আবব তাকে গয়না আর টাকাকড়ির বাক্সটা হস্তান্তরিত করলে সে খুলে দেখল— সব জিনিসই অটুট আছে। খুশিতে ডগমগ হযে পাঁচটা টাকা হাতে নিয়ে সে আরবকে পুরস্কার দিতে গেলে আরব জানাল তার পুরস্কাবেব দবকার নেই। বেনিয়ার ক্ষুদ্রমনতায ভিখাভাই ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ হয়ে একপাটি জুতো খুলে তার দিকে ছুঁড়ে মেরে ঘৃণাপূর্ণ স্বরে বলল: তোমার পাঁচ-পাচ হাজার টাকা বাঁচাতে গিয়ে এই লোকটা মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েছিল, আর তুমি তাকে মাত্র পাঁচটা টাকা পুরস্কার দিতে যাচ্ছো!

আরব ভিখাভাইয়েব আন্তরিক ব্যবহার ও সাহায্যের জন্যে গভীব কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার বরোদার উদ্দেশে যাত্রা করল।

বরোদায পৌছে সে রাজার সঙ্গে দেখা করল। রাজা একটা চাকরি দিলেন তাকে।

সেই বেনিয়াও ওই রাজাব একজন উচ্চপদস্থ কর্মচাবী ছিল।

এদিকে ওই বেনিয়ার বউ বেড়াতে গিয়েছিল বাপের বাড়ি। বেনিযা বউকে সেখান থেকে নিয়ে আসতে চায। এইজন্য তাব চাই একজন সাহসী ও শক্তসমর্থ রক্ষী, যাতে পথেঘাটে বিপদ হলে সে বেনিয়ার বউকে রক্ষা করতে পাবে এবং নিরাপদে বাড়ি পৌছে দেয়।

বেনিয়া রাজাকে ধরল। রক্ষী হিসেবে সে সঙ্গে নিতে চায় আরবকে। রাজা সম্মত হলে আরবকে বেনিয়ার সঙ্গী হিসেবে বেনিয়ার শ্বশুরবাড়ি যেতে হল।

বেনিয়া এবং বেনিয়ার বউ আলাদা-আলাদা রথে চড়ে স্বদেশে ফিরছিল। আরব বেনিয়ার বউয়ের রথের পাশে পাশে আসছিল ঘোড়ায় চেপে। বেনিযার রথ চলছিল বেনিয়ার বউয়ের রথের আগে আগে।

এক জায়গায় এসে বেনিয়ার বউ জল খেতে চাইল; আরবকে বলল তার জন্যে একটু জল আনতে।

আরব বলল, আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। বরং পুকুরে নেমে নিজেই গিয়ে জল খেয়ে আসুন। জল আনতে হলে অনেকগুলো সিঁড়ি পেবিয়ে পুকুরে নামতে হবে। জায়গাটা নির্জন। আপনাকে ছেড়ে গেলে বিপদ ঘটতে পারে।

বেনিয়ার বউ মিনতি করে বলল: দু-পাঁচ মুহূর্তে কিছুই ঘটবে না। আমি নিরাপদেই থাকব। আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। তুমি দয়া করে আমাকে একটু জল এনে দাও।

আরব আর কী করে! বন্দুকটা সিঁড়ির উপর রেখে জল আনতে পুকুরের ধাপ ভেঙে নীচে নামতে লাগল। জল নিয়ে পড়ি-কি-মরি করে ছুটে এসে দেখল: রথের চালক হাত-পা ছুঁড়ে পাগলের মতো চেঁচামেচি করছে। বন্দুকটা লোপাট হয়ে গেছে। বেনিয়ার বউয়ের কোনো চিহ্নও চোখে পড়ল না।

রথের চালক বলল, কয়েকজন সিন্ধি উটের পিঠে চেপে অতর্কিতে এসে ওই মহিলাকে উটে উঠিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে; বন্দুকটাও নিয়ে যেতে ভোলে নি।

বেনিয়া তো আগেই সরে পড়েছে!

আরব মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এখন কী হবে! বন্দুক ছাড়া খালি হাতে সিন্ধিদের পেছনে ধাওয়া করেই বা সে কী করবে!

ঠিক সেই সময় এক অশ্বারোহী রাজপুত সেখানে এসে হাজির। আরব তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে রাজপুত তাকে নিজের বন্দুকটা দিয়ে বলল: এখনো তারা খুব বেশিদূর যেতে পারেনি। একটু জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে গেলেই তুমি ওদের পাত্তা করতে পারবে।

বন্দুকটা হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে আরব হাওয়ার বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কিছুক্ষণ ছোটার পর সে উটসহ গোটা ডাকাত দলটাকেই দেখতে পেল, দেখল— উটের পিঠে উটের চালক আর কজন সিন্ধির মাঝখানে বেনিয়ার বউকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

কীভাবে গুলি ছুঁড়বে, বেনিয়ার বউকে বুলেটের আঘাত থেকে বাঁচিয়ে কীভাবে সিন্ধিদের ঘায়েল করবে— আরব কিছুই ঠিক করতে পারল না।

হঠাৎ উটের চালক— আরব তাদের পেছনে পেছনে আসছে কিনা, দেখার জন্যে যেই উটটার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছে, অমনি আরব বুলেট ছুঁড়ল। নির্ভুল নিশানায় প্রথমে ধরাশায়ী করল উটের চালককে, তারপর বাকি কজনাকে।

তারপর বেনিয়ার বউকে উদ্ধার করে সে নির্বিঘ্নে ফিরে এল রাজপ্রাসাদে।

রাজা আরবের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে তাঁর নিজস্ব দেহরক্ষী রূপে নিযুক্ত করলেন। এইভাবে সেই সৎ সাহসী ও বীর আরব পুরস্কৃত হল।



বলিদান



সিয়ালবেট আরবসাগরের উপকূলে অবস্থিত, সৌরাষ্ট্রের একটি প্রসিদ্ধ বন্দর।

এক সময় এই সিয়ালবেটে এক বেনিয়া পরিবার বাস করত। বেনিয়ার নাম ছিল সাগালশাহ শেঠ এবং তার স্ত্রীর নাম— চঙ্গাবতী শেঠানী।

তাদের ছ-বছরের একটি ছেলে ছিল।

শেঠ আর শেঠানী খুব ধার্মিক ছিল। তারা সবসময় নিজেদের গ্রামের সকল লোকের মঙ্গল কামনা করত।

একদিন অঘোরীবাবা নামে এক সাধু তাদের বাড়ি এলেন। শেঠ অঘোরীবাবাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে অভ্যর্থনা করল এবং পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজো করল।

অঘোরীবাবা আসন গ্রহণ করে জানালেন যে তিনি খুব ক্ষুধার্ত।



শেঠ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল তিনি কী আহার করতে চান।

সাধু বললেনঃ আমার অন্য কোনো আহার্যের প্রয়োজন নেই। যদি তুমি তোমার একমাত্র পুত্রের মাংস রেঁধে দিতে পার, আমি কেবল সেই মাংসই আহার করতে পারি।

শেঠ বললঃ আপনি আমার পুত্রের মাংস আহার করতে চান, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য। তাই হবে, আমার স্ত্রী আমার পুত্রের মাংস রেঁধে দেবে, আপনি সেই মাংসই ভোজন করবেন।

এই কথা বলে শেঠ তার স্ত্রীকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে সাধুর ইচ্ছার কথা বলল।

সে-কথা শুনে শেঠানী একটু দুঃখিত হল বটে, কিন্তু মুখে কিছু বলল না, মনে মনে ভাবলঃ ঈশ্বর হয়তো এ-ই চান, সুতরাং তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতেই হবে। শেঠানী বললঃ ঠিক আছে, আমি আমাদের একমাত্র পুত্রের মাংস রেঁধে দেব।

অঘোরীবাবা বললেনঃ তোমাদের নিজের হাতে নিজেদের ছেলেকে হত্যা করতে হবে, কিন্তু এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলা চলবে না। বরং পুত্রকে হত্যা করার সময় প্রসন্নমুখে তোমাদের ঈশ্বরের মহিমাগীতি গাইতে হবে। তারপর পুত্রের মাংস রান্না করে আমাকে নিবেদন করবে, তখনই আমি তা ভোজন করব।

সাগাল শেঠ এবং তার স্ত্রী তাতেই সম্মত হল। ছেলে বিদ্যালয়ে পাঠ নিতে গিয়েছে। তাকে ডেকে আনানো হল।

বাড়ি ফিরে ছেলে বাবা-মাকে শুধাল— তাঁরা তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন।

বাবা-মা তাকে বলল যে, সাধু খুব ক্ষুধার্ত। তিনি কেবল তার দেহের মাংস ভক্ষণ করেই ক্ষুধানিবৃত্তি করতে চান।

বালক মিষ্টি করে হেসে বললঃ আমি রাজি।

তখন বাবা-মা ছেলেকে ভালো করে স্নান করাল, তারপর শুদ্ধি করিয়ে তার কপালে টিকা এঁকে দিল। তারপর একটা বিশাল হামানদিস্তার মধ্যে রেখে তারা সেই শিশুকে হত্যা করল।

যোগী তাদের এইসব কাজ মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলেন, দেখলেনঃ তাদের চোখ থেকে এক ফোঁটা জলও পড়ল না।

মাংস রান্না হল। তারপর মা হাসিমাখা মুখে সাধুকে সেই মাংস নিবেদন করল।

সাধু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বাবা-মায়ের এইসব কাণ্ডকারখানা নিশ্চুপভাবে লক্ষ করে গেলেন। অতিথিপরায়ণ শেঠ-শেঠানীর মহত্ত্বে তিনি অভিভূত। আনন্দিত চিত্তে হর্ষোৎফুল্ল ভাষায় তিনি তাদের বললেনঃ তোমাদের এই বিশ্বাস সর্বদাই পুরস্কারযোগ্য।

তিনি শেঠ-শেঠানীকে প্রাণভরা আশীর্বাদ করলেন। হঠাৎ দেখা গেল ঃ শেঠ-শেঠানীর বালক পুত্রটি কখন থেকে দরজাব সম্মুখেই দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে মৃদু হাসি।



নিয়তি



একদা পাটনা রাজ্যে এক জ্ঞানী ও দয়ালু রাজা রাজত্ব করতেন।

তিনি প্রায়ই ছদ্মবেশ ধারণ করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। উদ্দেশ্য—প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শোনা, সুবিধা-অসুবিধা দেখা, বিপদে-আপদে সম্ভাব্য সাহায্য করা।

একদিন রাত্রিবেলা তিনি একটা গাঁয়ে এলেন এবং রাত্রিবাসের জন্য এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নিলেন। এই ব্রাহ্মণের স্ত্রী সদ্য একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন। শিশুর বয়স মাত্র এক সপ্তাহ।

রাতের খাবার খেয়ে ব্রাহ্মণ এবং ছদ্মবেশী রাজা ঘুমিয়ে পড়লেন। রাজার বিছানার এক পাশে পড়ে থাকল তাঁর তরবারিটি।

মাঝরাতে ভাগ্যদেবী নিয়তি এলেন সেই ব্রাহ্মণের বাড়ি। তাঁর এক হাতে একটি কুমকুমপাত্র, অন্য হাতে একটি মুণিমুক্তাখচিত কলম।

নিয়তি ধীরে ধীরে পালঙ্কের কাছে এগিয়ে গেলেন,— যেখানে ব্রাহ্মণ পত্নী এবং তাঁর শিশুপুত্রটি ঘুম যাচ্ছেন।

তারপর দেবী একটি প্রদীপ জ্বাললেন এবং কলমটি হাতে নিয়ে কুমকুমপাত্রে ডুবিয়ে সেই কলম দিয়ে শিশুটির হাতের তেলোয় তার ভাগ্যরেখা আঁকতে লাগলেন। তিনি ধীরে ধীরে, স্পষ্টভাবে অনেকগুলো রেখা আঁকলেন। কিন্তু যেই তার আয়ুরেখা আঁকতে যাবেন, অমনি তাঁর হাত থেকে কলমটি মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন, এবং দুঃখিত মনে প্রদীপের আলোটা কমিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। অন্ধকার বারান্দায় হঠাৎ নিদ্রিত রাজার সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লেগে গেল, রাজা তৎক্ষণাৎ জেগে গেলেন এবং হুড়মুড় করে বিছানার উপর উঠে বসে নিয়তির একটা হাত ধরে ফেললেন, বললেনঃ কে তুমি?— মানুষ, না প্রেতাত্মা?

দেবী বললেন ঃ রাজা, আমাকে যেতে দাও, আমি নিয়তি। আমি ব্রাহ্মণের শিশুপুত্রের হাতে ভাগ্যরেখা লিখতে এসেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ আমার কলমটা পড়ে ভেঙে গেল। সুতরাং এখনই আমাকে চলে যেতে হবে।

রাজা বললেন ঃ আপনি শিশুটির হাতে কী লিখলেন না বললে আমি আপনাকে কিছুতেই ছাড়ব না।

অত্যন্ত দুঃখিত স্বরে দেবী বললেনঃ বাছা, দুঃখের কথা কী বলব,— ওই ব্রাহ্মণশিশু আঠারো বছর বয়সে মারা যাবে— ঠিক তার বিয়ের দিন। যখন সে নববধূকে নিয়ে যজ্ঞাগ্নির চারদিকে সাতপাক ঘুরতে যাবে, তখনই একটা সিংহ ছুটে এসে তাকে হত্যা করবে।

এই বলে দেবী চলতে লাগলেন।

রাজাও তাঁর পেছনে পেছনে চলতে চলতে বলতে লাগলেনঃ আজ আপনি ব্রাহ্মণের শিশুপুত্রের হাতে ভয়ানক 'দুর্ভাগ্য' লিখে রেখে গেলেন। আমি এই ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। কাজেই আমি যতক্ষণ আপনার এই ভাগ্যলিপি ব্যর্থ করতে না পারব, ততক্ষণ মনে কিছুতেই শান্তি পাব না।

পরদিন সকালে রাজা ব্রাহ্মণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার আগে বলে গেলেনঃ ব্রাহ্মণ, আপনার ছেলের বিয়ের দিন আমাকে নেমন্তন্ন করতে কোনোরকমেই যেন ভুলে যাবেন না। আমি তার জন্য অনেক উপহার নিয়ে আসব।



তারপর অনেক বছর কেটে গেল, এবং ওই ব্রাহ্মণের ছেলের বিয়ের দিন রাজা খুব জাঁকজমক সহকারে ব্রাহ্মণের বাড়ি উপস্থিত হলেন। রাজার সঙ্গে মিছিল করে এল একটা বিশাল সুসজ্জিত হস্তী ও অশ্ববাহিনী, বাদক দল, লোকলশকর, চাকর-বাকর, আরও কত কী! নানারকম বাজনা বাজতে লাগল। বাজি ফাটতে লাগল। হাউই পুড়তে লাগল। সারা গাঁয়ে আনন্দ-উৎসবের ধুম পড়ে গেল।

গাঁয়ের লোক অবাক! কী ব্যাপার, স্বয়ং মহারাজ একজন সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলের বিয়েতে এসে এমন জাঁক করছেন!

রাজা তাঁর লোক-লশকরদের আদেশ দিলেন তারা যেন সমস্ত গ্রাম ঘিরে রাখে,— একটা মাছিও গলে যেন বিবাহ-মণ্ডপে পৌঁছতে না পারে। রাজা নিজে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে বিবাহমণ্ডপের যজ্ঞাগ্নির কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বর সাতপাক ঘুরতে লাগল। একবার, দুবার, তিনবার। চারবারের বার হঠাৎ সিংহের গর্জন শুনতে পাওয়া গেল। তৎক্ষণাৎ একটা বিশাল সিংহ ছুটে এসে বরবেশী ব্রাহ্মণপুত্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, এবং পর মুহূর্তেই তাকে হত্যা করল। ঘটনাটা এত চকিতে ঘটে গেল যে কেউ কিছুই করতে পারল না। সকলেই বোকা বনে গিয়ে ভাবতে লাগল ঃ সিংহটা কী করে এল,— কোত্থেকে এল?



উপস্থিত নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এক ব্যক্তি একটা মাটির ভাঁড়ের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললঃ আমি নিজের চোখে দেখলাম, সিংহটা ওখান থেকেই বেরিয়ে এল। তারপর বরকে হত্যা করে ছুটে গিয়ে আবার ওই মূর্তিটার মধ্যেই মিলিয়ে গেল।

লোকটার কথা শুনে সকলে ওই বিশাল ভাঁড়টার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল— ভাঁড়টার গায়ে খোদাই করা আছে একটা ভয়ঙ্কর সিংহ-মূর্তি। তাহলে ওই মূর্তিটাই প্রাণ পেয়ে কি একটা সত্যিকার জীবন্ত সিংহে পরিণত হয়েছিল? সকলে নিজেদের মধ্যে এই কথাই বলাবলি করতে লাগল।

রাজা, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নীকে ডেকে বললেনঃ আপনারা ছেলের মৃতদেহ ছ-মাস পর্যন্ত সৎকার করবেন না। একটা তৈলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে শেকড়-বাকড় গাছগাছালি দিয়ে ওর মৃতদেহটা চুবিয়ে রাখুন।

ছ-মাসের মধ্যেই আমি ফিরে আসব এবং আপনাদের ছেলেকে বাঁচিয়ে তুলব। যদি আমি ওকে বাঁচিয়ে তুলতে না পারি, তাহলে আমি আর কখনো পাটনার সিংহাসনে বসব না।

কয়েক মাস কেটে গেল।

রাজা যশোবন্ত দে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

একদিন তিনি বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। এমন সময় দেখতে পেলেন বনের চতুর্দিকে দাবাগ্নি ছড়িয়ে পড়েছে। পশুরা প্রাণভয়ে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালাচ্ছে। একটা ভয়ঙ্কর মহানাগ আগুনের মধ্যে পড়ে ছটফট করছে।

তিনি তৎক্ষণাৎ মহানাগকে সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ধার করে বাঁচিয়ে দিলেন। তারপর চলতে চলতে একটা কুয়োর কাছে পৌঁছে গাছের ছায়ার নীচে বসে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। সেই কুয়োর মধ্যে বাস করত সেই মহানাগের স্ত্রী মহানাগিণী। রাজা স্বামীর জীবন রক্ষা করায় মহানাগিণী রাজার প্রতি খুব প্রসন্ন হয়েছিল। কুয়োর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সে রাজাকে অনেক ধন্যবাদ দিল এবং বলল, রাজা আমি যদি তোমার কোনো রকম উপকার করতে পারি, তাহলে নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবতী বলে মনে করব।

তখন রাজা দুঃখিত স্বরে মহানাগিণীকে ব্রাহ্মণপুত্রের গল্পটি শুনিয়ে বললঃ আজই ছ-মাস পূর্ণ হবে। আমি এতদিন ধরে সর্বত্র সঞ্জীবনী ওষধি খুঁজে বেড়িয়েছি। বনে-বনান্তরে—কত জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম; কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই সঞ্জীবনী ওষধি আমার চোখে পড়ল না। আমি বুঝতে পারছি, আমার প্রতিশ্রুতি নিষ্ফল হবে। ব্রাহ্মণের ছেলেকে আমি বাঁচাতে পারব না।

রাজার সব কথা শুনে মহানাগিণী সেই কুয়োর গভীর জলের মধ্যে ডুব দিল, তারপর সেই জীবনদায়ী সঞ্জীবনী ওষধি নিয়ে উঠে এসে রাজাকে দিয়ে বললঃ এই ওষধি ছোঁয়ালেই মৃত ব্রাহ্মণপুত্র আবার জীবন ফিরে পাবে।

রাজা মহানাগিণীকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে ঘোড়ায় চেপে দ্রুতবেগে ছুটতে লাগলেন।

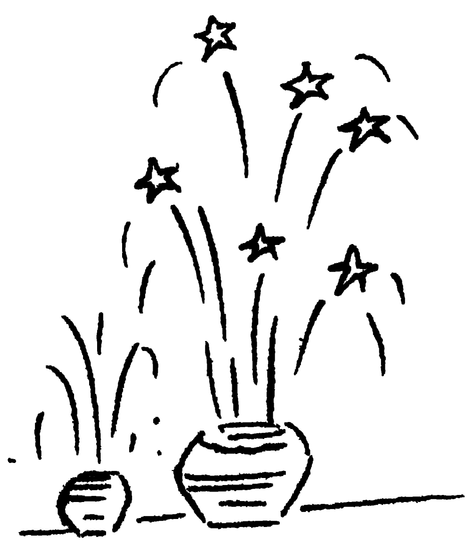
ব্রাহ্মণের বাড়ির কাছাকাছি এসে রাজা দেখলেন, গাঁয়ের সমস্ত লোক ব্রাহ্মণের বাড়ি জমায়েত হয়েছে, তারা রাজার আগমনের প্রতীক্ষা করছে।

যে ঘরে ব্রাহ্মণপুত্রকে রাখা হয়েছিল, রাজা সেই ঘরের ভেতর প্রবেশ করলেন। ঘরের মধ্যে একটা ছোটো প্রদীপ দমকা হাওয়ায় নিবুনিবু করছে। ধূপের ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে।

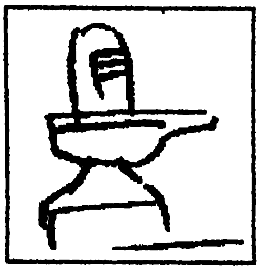
রাজা ব্রাহ্মণপুত্রের কাছে গিয়ে তার শরীরে মহানাগিণীর দেওয়া সেই সঞ্জীবনী ওষধি ছুঁইয়ে দিতেই ব্রাহ্মণপুত্র আস্তে আস্তে চোখ মেলল এবং হঠাৎ উঠে বসল।

সেই সময় অদৃশ্য থেকে বাতাসে নিয়তি দেবীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলঃ

রাজা, তুমি আমাকে পরাস্ত করেছ। দুঃসাহসী রাজা, জেনো— মানুষের দুঃসাহসের কাছে নিয়তি সর্বদাই পরাজয় মেনে নেয়।



নাগমদেবী



যখন ছোট্টো গারো ভার্‌দ গাঁটিতে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা মামে, জুঁইফুলের গন্ধে বাতাস ভরে যায়— তখন যদি কোনো পথিক হঠাৎ সেই গাঁয়ের শিবমন্দিরের চত্বরে এসে পড়ে, সে শুনতে পাবে— অদ্ভুত এক কান্না বিলাপ আর আর্তনাদ ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে, গাছ-গাছালির ডালপালায়— পাতায়-পাতায়, পাহাড়তলির চুড়োয়, তার কানের পাশে— বাতাসের শব্দে। যদি সেই পথিক সাহসী হয়, এবং সারারাত্রি সেখানে বসে থাকে, তাহলে সে দেখতে পাবে— হ্রদের ধারে দুটি ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুনতে পাবে তাদের কলহাস্য, মধুর সঙ্গীত। যদি সেই সাহসী পথিক কোনো পূর্ণিমার রাত্রে সেই নির্জন মন্দিরে সারারাত্রি জেগে বসে থাকতে বাজি হয়, তাহলে সে দেখতে পাবে— হ্রদের জলে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা,— যেন একটি হংসমিথুন। তারপর ভোরের আলো ফুটতেই তার কানে এসে পৌছবে এক নারীকণ্ঠের করুণ বিলাপধ্বনি— 'ও নাগ, আমাব প্রিয় নাগ।' সূর্যের আলো আর একটু বাড়তে সেই ধ্বনি হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে যাবে। তখন মন্দিরে এসে ভিড় জমাতে থাকবে গ্রামবাসীরা,— সেই দীর্ঘ করুণ .আর্তস্বর আর শোনা যাবে না।

ভারোয়াদ উপজাতির একটা ছোট্টো গোষ্ঠীর দলপতির কন্যা নাগমদেবী। তারা যাযাবর। পেশা মেষপালন। একদল মেষ নিয়ে শহর থেকে শহরান্তরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায় তারা— এইভাবেই নির্বাহ করে তাদেব জীবিকা।

নাগমদেবীর জন্ম হয়েছিল উঁচু পাহাড়ে একটি সুন্দর উপত্যকায়,— নীল আকাশের নীচে, যেখানে ছোটো ছোটো নদী আর ঝরনা সবসময় সুরের তরঙ্গ তুলে সমতলের দিকে বয়ে চলেছে।

প্রকৃতির সৌন্দর্য ছেড়ে বিধাতা যেন গড়ে তুলেছিলেন নাগমের সুন্দর দেহলতা। তার হাসিতে ছিল ঝরনার কলস্বর, তার চোখে মাখানো ছিল নীল আকাশের কাজল।

সারাদিন সে বেড়াত গান গেয়ে। ভোরবেলায় তার গানে ঘুম ভাঙত গ্রাগবাসীদের। রাত্রিবেলায় জ্বলন্ত আগুনের চারপাশে বসে গ্রামবাসীরা তার নাচ দেখত, তার সুরেলা কণ্ঠের গান শুনত।

গ্রামের যুবকেরা তাকে পাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতাই শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু নাগমদেবী কারো পানে চোখ তুলেও তাকাত না।

প্রত্যেক দিন সকালে সে এবং তার সখীরা বাজারে যেত ঘি বিক্রি করতে। ক্রেতারা ঘি কিনতে এসে ফাউ হিসেবে লাভ করত তার মিষ্টি মধুর হাসি।

একদিন সকালবেলা বাজারে গিয়ে নাগমদেবী ঘি বিক্রি করছিল। হঠাৎ চারদিকে একটা শোরগোল। কী ব্যাপার? দেখা গেল— ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়িয়ে সেখানে এসে হাজির হয়েছে এক যুবক— এক রাজপুত বীর, নাগদেও। সে শহর থেকে বাড়ি ফিরছে।

নাগদেওকে দেখে নাগমদেবী ঘি-বিক্রির কথা বেমালুম ভুলে গেল, কেবল চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল সেই অপূর্বসুন্দর যুবাকে— যেন মনের পটে সে তার মূর্তিটি খোদাই করে রাখছে।

ইতিপূর্বে এই বীর যুবকের বীরত্ব ও সাহসিকতার অনেক গল্প কানে এসেছে তার। ইচ্ছে ছিল, তাকে একবার সে দেখবে। কিন্তু তার বিশ্বাস হত না যে, এরকম একটা দুর্লভ সুযোগ কখনো আসবে তার জীবনে। ধীরে ধীরে শোরগোলটা থেমে গেল। অশ্বারোহী যুবক ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। নাগমতী অজান্তে কখন ঘিয়ের পাত্রটা ভেঙে ফেলেছে,— তাই দেখে বাজারের লোকেরা তাকে নিয়ে একচোট হাসি-ঠাট্টার সুযোগ পেয়ে গেল। লজ্জায় ওড়নার আড়ালে মুখ ঢেকে নাগমতী তাদের তাঁবুতে ফিরে এল।

সেদিন বিকেলবেলায় নাগমতী শিবের মন্দিরে গেল পুজো দিতে। পুজো দিয়ে নাগমতী হ্রদের তীরে বসে তার সুরেলা গলায় গাইতে লাগল একটি প্রেমগীতি। এই সময় নাগদেও পুজো দিতে এসেছিল দেবমন্দিরে। নাগমদেবীর গান শুনে সে এতই মুগ্ধ হল যে ধীরে ধীরে কখন সেই হ্রদের তীরে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে নিজেও জানে না।



চার চোখের মিলন হল।

সেইদিন থেকেই তাদের মিলনস্থল হল ওই হ্রদটি। নাগমদেবী সেখানে আসত জল নিতে, আর নাগদেও— দেবতাকে পুজো দিতে।

কিন্তু ভালোবাসার পথ বড়োই রুক্ষ।

নাগদেও জাতিতে রাজপুত, আর নাগমদেবী যাযাবর কন্যা। তাদের দুজনের জাত আলাদা, কাজেই তারা কিছুতেই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে না।

গ্রামে তাদের ভালোবাসা নিয়ে নানান কথা উঠল, সমালোচনার ঝড় বইতে শুরু করল। গ্রামবাসীরা কেউ চায়না নাগমতীর সঙ্গে নাগদেওয়ের বিয়ে হোক।

একদিন নাগমদেবী দেবমন্দিরে এল না। নাগদেও মনে মনে ভাবতে লাগলঃ কী হল নাগমের? তবে কি সে আর নাগদেওকে ভালোবাসে না?

নাগদেও চারদিকে চেয়ে চেয়ে কী যেন অন্বেষণ করছে। এমন সময় জঙ্গল ভেদ করে তার কাছে এসে হাজির হল একটা মহিষ; এসেই সে লাফালাফি ও চিৎকার শুরু করে দিল। নাগদেওয়ের মনে হল— সে যেন কিছু বলতে চায় তাকে।

নাগদেও মহিষের কাছে এগিয়ে গেল, দেখতে পেল— মহিষের শিঙে একটা চিঠি বাঁধা আছে। মুহূর্তে সেই চিঠিটা হাতে নিয়ে কৌতূহলের সঙ্গে সে পড়তে শুরু করল। তাতে লেখা ছিলঃ নাগমদেবীর অন্যত্র,— তার্দের গোষ্ঠীর এক যুবকের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়েছে। কিন্তু সে নাগদেও ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করবে না। নাগদেও যেন আগামী পূর্ণিমা পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করে। পূর্ণিমার রাত্রে শিবমন্দিবে নাগদেওয়ের সঙ্গে সে দেখা করবে। তারপর দুজনে এই দেশ ছেড়ে অন্য কোনো দেশে পালিয়ে যাবে।

দিন যেতে লাগল। পূর্ণিমাও এসে পড়ল। হ্রদের জলের উপর কিরণ দিতে লাগল পূর্ণিমার চাঁদ। মন্দির একেবাবে নির্জন। আকাশে অগুনতি তারা মিটমিট করছে। কিন্তু কোথায় নাগমদেবী? রাত গড়িয়ে চলল। মাঝরাতও গেল পেরিয়ে। নাগমদেবীর দেখা নেই।

হঠাৎ নিঃশব্দ রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে নাগমদেবীর আর্ত আহ্বান শোনা গেলঃ নাগদেও, তুমি কোথায়? আমি— এসেছি।

কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নেই, কেবল প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল দূরে—দূরান্তরে।

নাগমদেবী দেবমন্দিরের কাছে এসে দেখল— বেদীর উপর কে যেন শুয়ে আছে। নিদ্রিত।

নাগমদেবী ছুটে গেল, কিন্তু তাকে স্পর্শ করামাত্র তার দুটি হাত বক্তে লাল হযে উঠল। ভয়ে শিউবে উঠল নাগম। চেঁচিয়ে উঠলঃ নাগদেও, নাগদেও, তুমি এ কী সর্বনাশ কবলে? কেন এমন সর্বনাশ করলে? তার সেই বুকভাঙা কান্না আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। কিন্তু নাগদেওয়েব মুখ থেকে কোনো জবাবই সে পেল না।

কেবল পেঁচারা তীব্রস্বরে চিৎকার কবছে, নিশাচর জন্তুরা চিৎকার করছে। আর কোনো শব্দ নেই। নাগম কান্নায় ভেঙে পড়ল। নাগদেওয়ের বুকের উপর লুটিয়ে কেবল বিলাপ কবতে লাগল। হয়তো তার আসাব দেরি দেখে অপেক্ষা করতে করতে নাগদেও মনে মনে ভেবেছে— নাগম আর আসবে না। এই ভেবেই হয়তো সে নিজের হাতেই নিজেকে হত্যা করেছে।

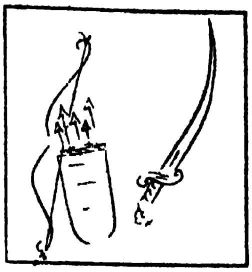
আর একটি প্রভাত এল। মন্দিরের ঘণ্টা বেজে উঠল। ভক্তেরা একে একে মন্দিরে এসে জমায়েত হতে লাগল। মন্দিরের বেদির উপর পড়ে আছে দুটি মৃতদেহ— একটি নাগমদেবীর, আর একটি নাগদেওয়ের। ভয়ে, শোকে, বিস্ময়ে, আকস্মিকতায় সকলে যেন পাথরের মতো বোবা হয়ে গেল।

হ্রদের জলে ছায়া ফেলে বৃক্ষেরা যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে। বাতাস হু-হু শব্দে বয়ে যাচ্ছে— যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের বুকের হাহাকার। হ্রদের জলের তরঙ্গ-শব্দে যেন কার কান্না উঠছে বুক ঠেলে।

দেবমন্দিরে দেবতার চোখেও যেন অশ্রুকণা।



সর্ষে বীজ



সর্ষে বীজ আকারে খুবই ছোটো, কিন্তু এর গন্ধ খুবই ঝাঁঝালো।

এই কাহিনীর রাজপুত রাজপুত্র ছিল এই সর্ষে বীজের মতোই শক্তিশালী আর রাগি।

তার নাম ছিল বানাজি। সে যখন একেবারে শিশু, তখন তার বাবা মারা যান। তাই তার খুড়োরাই তাকে মানুষ করেন। খুড়োরা তাকে একজন সত্যিকার রাজপুতের আচার-আচরণ এবং স্বভাবে অভ্যস্ত ও শিক্ষিত করে তোলেন।

অল্প বয়স থেকেই সে অসি ও তির-ধনুক চালনা, অশ্বারোহণ বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করে এবং শৈশবেই একজন পাকা ও সাহসী রাজপুত যোদ্ধাব সমস্ত গুণাবলী আয়ত্ব করে।

একবাব একটা দারুণ দৌড়বাজ ঘোড়া হঠাৎ বিগড়ে যায়, কেউ তাকে ধরতে পারে না। শেষ পর্যন্ত এই বানাজিই তাকে ধরতে সমর্থ হয়, এবং পোষ মানায। তাবপর তাকে শিক্ষা দিয়ে এমনভাবে বশ মানায় যে, সে রাজপুত্রেব বাধ্য ভৃত্যে পরিণত হয়। রাজপুত্র ছাড়া আব কাউকে সে তার পিঠে বসতে দিত না।

একদিন কান্দালা থেকে একজন ব্যবসায়ী রাজপ্রাসাদে এল তরবারি বিক্রি করতে। বানাজির তরবারিটি তাব পক্ষে এখন বেশ ছোটোই হয়ে উঠেছিল। তাই সে ঠিক করল ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে একটা নতুন তরবাবি কিনবে।

ব্যবসায়ীব পাশে বসে বানাজি অনেকগুলো তরবারি পরখ করে দেখল এবং একটা বেশ ভারি আর ধারালো তরবাবি পছন্দ কবে নিজের জন্য সরিয়ে রাখল। কিন্তু কেউই তার এই আশ্চর্য মেধার কদর বুঝল না। একমাত্র সেই তরবারি ব্যবসায়ীই বুঝতে পারল এই তরুণ রাজপুত্র তরবারির গুণাগুণ যথার্থই বোঝে। সে বলল : রাজপুত্র, ওই তরবারিটাই এগুলির মধ্যে সেরা জিনিস।

বানাজি বলল : হ্যাঁ, আমি এইরকম একটা তরবারিব খোঁজ করছিলাম। এই তরবারিটা হাতে থাকলে আমি শত্রুর চোখেও অদৃশ্য হয়ে উঠব।

রাজপুত্র তরবারিটি হাতে নিয়ে খুড়োদের কাছে গেল, তাঁদের দেখিয়ে বলল : আমি এটা কিনতে চাই।

তার কথা শুনে মেজ খুড়ো বললেন : যতদিন আমরা বেঁচে আছি, তুমি তরবারি দিয়ে কী করবে? তাছাড়া, এই তরবারিটা তোমাব পক্ষে যথেষ্ট বড়ো।

বানাজি বলল : আমিও তো বড়ো হচ্ছি। আর, আমার আগের তরবারিটা খুবই ছোটো।

সেই কাকা হেসে, তার মাথা চাপড়ে আদর করে বললেন : তরবারি লম্বা কী বেঁটে— তাতে কিছু আসে যায় না; সাহস ও শক্তি— যা দিয়ে তুমি অস্ত্রটা ব্যবহার করবে, সেটাই হল মূল কথা। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় তরবারি নিয়ে তোমার পক্ষে মাত্র এক পা-ই এগোন সম্ভব, এই কথাটা ভুলে যেয়ো না।

কাকার কথা শুনে হতাশ হয়ে বানাজি তরবারিটা ব্যবসায়ীরা হাতে ফেরত দিল।

একদিন বানাজির কাকাদের কোনো একটা কাজে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে যেতে হয় অন্য গ্রামে। তাঁরা চলে যাওয়ার পর এক কাঠি একদল লোক সঙ্গে করে এসে গ্রামের সমস্ত গোরুবাছুর তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। গাঁয়ে কোনোরকম দুর্ঘটনা ঘটলে ঢাক পিটিয়ে গ্রামবাসীদের জানান দেওয়া ওই অঞ্চলের একটা রীতি। সুতরাং ঢাকের শব্দ কানে যেতেই বানাজি প্রাসাদের চাকরবাকরদের জিজ্ঞাসা করল ঃ ব্যাপার কী?

তারা রাজপুত্রকে বলল ঃ কাঠি-চোরেরা এসে গাঁয়ের সব গোরু-বাছুর চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।



তাদের কথা শুনে বানাজি মনে মনে ভাবতে লাগল ঃ আমি জীবিত এবং এখন বাজপ্রাসাদে একমাত্র আমিই আছি। সুতবাং আমি থাকতে আমার গ্রামবাসীবা কষ্ট পাবে কেন? এখন আমি যদি কিছু একটা না করি, তাহলে আমার কাকাদের মানসম্মান ধুলোয় লুটোবে, আমার মাও আমার মতো অপদার্থ ছেলেকে জন্ম দিয়েছেন বলে লজ্জাবোধ কববেন। কাঠিদের হাত থেকে আমাকে গ্রামবাসীদেব গোরু বাছুবগুলো উদ্ধার কবে আনতেই হবে।

এই কথা ভেবে রাজপুত্র ঘোড়ার পিঠে চেপে হাতেব তববারিটা ঘোরাতে ঘোরাতে কাঠিদেব পেছনে ধাওয়া করল। নিমেষে সে তাদেব বন পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেল এবং দলপিতকে পাকড়াও করল।

দস্যু-সর্দার বানাজির দিকে চেয়ে হেসে বলল ঃ তুমি একেবারেই ছেলেমানুষ,— এখনো গোঁফ পর্যন্ত গজায়নি। তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো যে তুমি আমাব এবং আমার লোকজনের কাছ থেকে গোরু-বাছুরগুলোকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে?

কিন্তু বানাজি বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করতে চায় না। সে মুহূর্তের মধ্যে কোষ থেকে তরবারিটা বের করে সজোরে ও সবেগে দস্যু-সর্দারের মাথায় আঘাত করে বসল। দলপতি নিমেষে মাথাটা সরিয়ে নিল, কিন্তু তরবারির ঘায়ে তার নাক এবং জিবটা কাটা

গেছে। দলপতি রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠল, লোকজনকে আদেশ করল ঃ গোরু-বাছুরগুলো ছেড়ে দাও,— এই ছোকরাকেই খুন করো।

ওদিকে ছাড়া পেয়ে গোরু-বাছুবগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে গাঁয়ের দিকে ছুটতে শুরু করেছে। বানাজি বুঝতে পারল সে একা, এতগুলো কাঠিকে সে একা শেষ করতে পারবে না। সুতরাং ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে, তুবন্ত তার পিঠে চেপে হাওয়াব বেগে তাকে ছুটিয়ে দিল সে। কাঠিরা তাকে তাড়া করল বটে, কিন্তু ধরতে পারল না। সে গ্রামেব মধ্যে ঢুকে পড়ল।



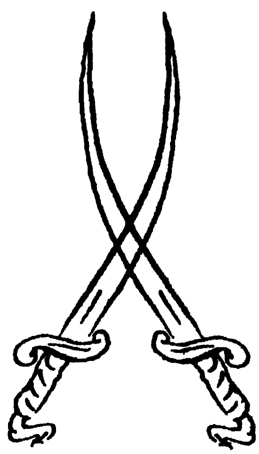
রাজপ্রাসাদের সম্মুখে মাঠে গ্রামবাসীরা জমায়েত হয়ে হায়-হায় করছিল। হঠাৎ তারা দেখতে পেল—ধুলোর মেঘ উড়িয়ে তাদের গোরু-বাছুরগুলো তাদের দিকেই ছুটে আসছে।

তখন গ্রামবাসীরা মহানন্দে শোরগোল শুরু করে দিল।

কিছুক্ষণ পরেই বানাজি এসে হাজির হল। তার ঘোড়ার মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। বানাজিকে পেয়ে কাকারা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন ঃ তুমি এত অল্প বয়সে এত বড়ো একটা বিপদের ঝুঁকি নিলে কেন? আগে বড়ো হও, জীবনে এরকম অনেক সুযোগই তো আসবে।

বানাজী বলল ঃ আমি ছোটো হতে পারি; কিন্তু জেনো, আমি সর্ষে বীজের মতোই তেজি আর ঝাঁঝালো।

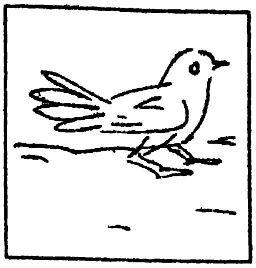
বানাজির কথা শুনে গ্রামবাসীরা একযোগে হেসে উঠল। তারা বহুদিন পর্যন্ত বানাজির এই কথাটা বলাবলি করে ভারি মজা উপভোগ করত।





হরিয়ানা

তু-পি, তু-পি



তিহি পাখি 'তু-পি, তু-পি' বলে কেন কাঁদে জানো? সেই গল্পই বলছি তোমাদের।

অনেকদিন আগে বাস করত এক তিহি-দম্পতি। তাদের কোনো বাচ্চা ছিল না। একদিন স্ত্রী-তিহি জঙ্গলে কুড়িয়ে পেল একটি ছোট্ট মেয়েকে। পুরুষ-তিহিকে বলল : আমি এই মেয়েটাকে বাড়ি নিয়ে যাব।

'ওকে নিয়ে গিয়ে তুমি কী করবে?' পুরুষ-তিহিটা জানতে চায়।

'আমি নিজের মেয়ের মতো মানুষ করব।'

'কিন্তু একটা মেয়ের দায়িত্ব যে অনেক।'

তুমি চিন্তা করো না। আমার উপর সব ভার ছেড়ে দাও।'

পুরুষ-তিহি আর কিছু না বলে চুপ করে থাকল। স্ত্রী তিহি মেয়েটাকে বাড়ি নিয়ে এল, পুরুষ-তিহি আর বাধা দিল না।

ধীরে ধীরে মেয়েটি বড়ো হতে লাগল। পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুন্দর হয়ে উঠতে লাগল সে। যতই মেয়েকে ভালোবাসুক মা— একদিন তার বিয়ে দিতে হবে, শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে হবে তাকে। যখনই একথা ভাবে স্ত্রী-তিহি, তখনই ব্যথায় তার বুকটা টনটন করে ওঠে।

তবু ভালো দেখে একটা পাত্র জোগাড় করার জন্য রোজই সে তাগাদা দিতে থাকে স্বামীকে। স্বামী বাড়ি ফিরলেই সে জিজ্ঞাসা করে : 'কিগো, কিছু খবর পেলে?'

স্বামী জানায়— খবর নেই।

একদিন খেপে গিয়ে মেয়ের মা বলল : 'যতক্ষণ না তুমি মেয়ের জন্যে একটা পাত্র ঠিক করে আসছ, ততক্ষণ আমি জল পর্যন্ত স্পর্শ করব না।'

স্ত্রীর ধনুক-ভাঙা পণ দেখে বাধ্য হয়ে পুরুষ-তিহিটা মেয়ের জন্য পাত্রের অন্বেষণে বের হয়ে পড়ল।

সেদিন সেই বনে এক রাজা এলেন শিকার করতে। রাজাকে দেখে পুরুষ-তিহি ভাবল : ইনিই আমাদের মেয়ের উপযুক্ত পাত্র।

কিন্তু সেকালে পাত্রী নিজেই তার পাত্র পছন্দ করত। সেই জন্যে পুরুষ-তিহি রাজাকে তার বাড়িতেই নিয়ে এল। মেয়ে রাজাকে দেখে বাবাকে কানে কানে বলল : 'বাবা, কী সুন্দর পুরুষ উনি! অমন রূপবান পুরুষ আমি আর দেখিনি।'

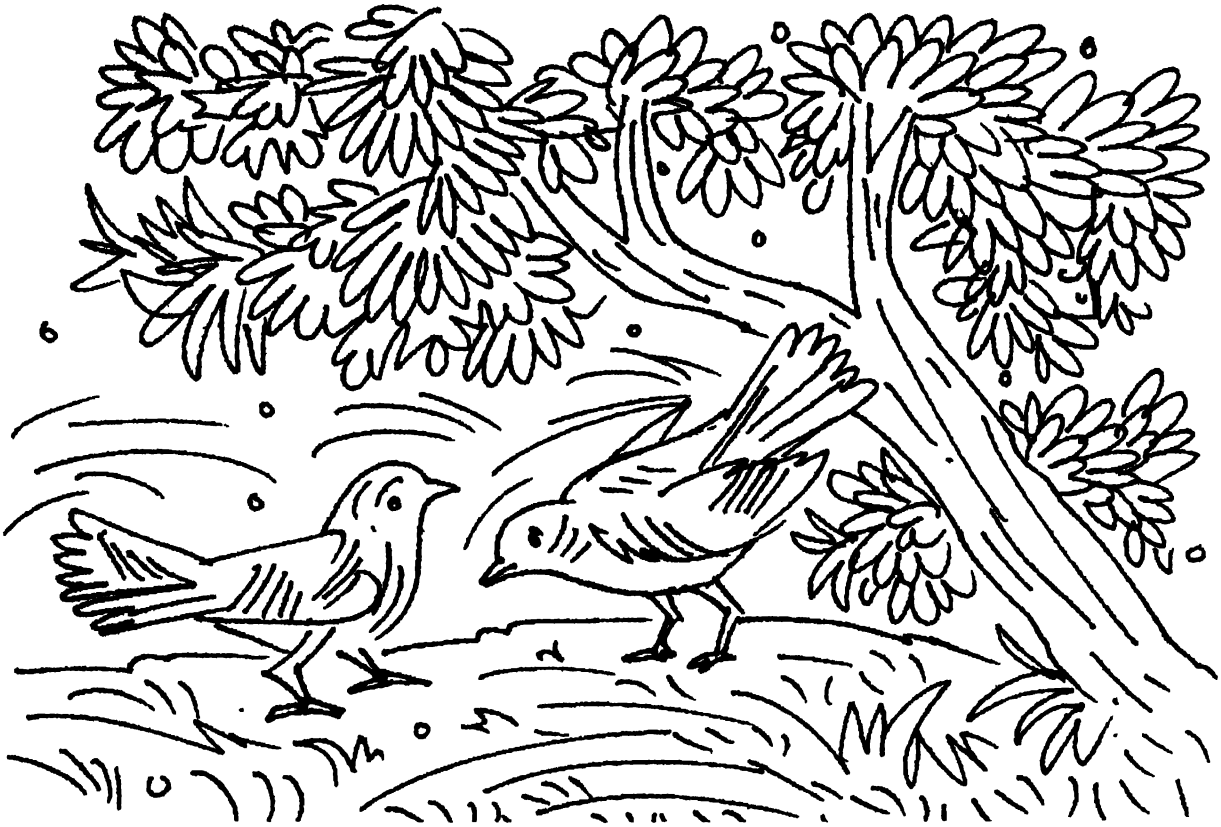
'তোমার পছন্দ হয়েছে? তুমি ওঁকে বিয়ে করতে চাও?'— তিহি জানতে চাইল।

'হ্যাঁ', হেসে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল মেয়ে।

তখন তিহি রাজাকে গিয়ে বলল : 'রাজামশাই, আমার মেয়ে আপনাকে বিয়ে করতে চায়। আপনি রাজি?'

সুন্দরী মেয়েটিকে রাজার খুবই ভালো লেগেছিল। তিনি রাজি হলেন এবং তিহির মেয়েকে শুভদিনে শুভক্ষণে তিনি বিয়ে করলেন। বিয়ের পর নববধূকে নিয়ে রাজা ফিরে গেলেন রাজধানীতে।

মেয়ে স্বামীগৃহে চলে যাওয়ার পর স্ত্রী-তিহি স্বামীকে বলল ঃ 'এই জঙ্গল আমাদের মেয়ে-জামাইয়ের রাজ্য। শাস্ত্র অনুসারে এখানকার অন্নজল কিছুই আমরা গ্রহণ করতে পারি না। কেননা তার ফল আমাদের মেয়ের পক্ষে অশুভ হবে। তাই চল, আমরা অন্য কোথাও যাই।'



পুরুষ-তিহি স্ত্রীর পরামর্শ মেনে নিল। তারপর দুজনে অন্য রাজ্যের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল।

হাঁটছে। হাঁটছে। বহুদিন এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে একদিন তারা তাদের মেয়ের রাজ্যের শেষ সীমানায় এসে পৌঁছল। ক্লান্তিতে, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তখন তারা মরো-মরো। আর কিছুটা হাঁটতে পারলে মেয়ের রাজ্য পার হয়ে যেতে পারে। তাই মরিয়া হয়ে আবার হাঁটতে থাকল তারা। মেয়ের রাজ্য পার হয়ে এক জায়গায় এসে একটা গোষ্পদের মধ্যে একজনের পান করার মতো সামান্য জলের সন্ধান পেল অবশেষে।

পুরুষ-তিহি বলল ঃ 'আমার চেয়ে তুমিই বেশি পিপাসার্ত; সুতরাং জলটুকু তুমিই পান করো।'

কিন্তু স্ত্রী-তিহি মাথা নেড়ে বলল ঃ 'তুমি থাকতে আগে আমি জল পান করি কী করে? নারীর ধর্ম তা নয়। স্বামীর পান করা হলে তবেই স্ত্রী অবশিষ্ট জল পান করতে পারে।'

পুরুষ-তিহি বলল ঃ 'তা হোক। আগে তুমিই পান করো —তু-পি।'

নারী তিহি বলল ঃ 'তু-পি'।

তারপর দুজনেই ক্রমান্বয়ে বলতে লাগল ঃ 'তু-পি, তু-পি'।

শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে মারা গেল দুজনেই।

সেই থেকেই তিহি পাখিরা কাঁদে আর বলে ঃ 'তু-পি, তু-পি'। 'তুমি পান করো', তুমি পান করো'।

কুন্দনলালের অতিথিসেবা



বড়ো ধার্মিক মানুষ কুন্দনলাল। সারা গাঁয়ের লোক এইজন্য তাকে মান্যগণ্য করে। গাঁয়ের মধ্যে কুন্দনলাল বেশ সম্পন্ন চাষি। কিন্তু এই নিয়ে তার মনে একটুও অহঙ্কার নেই। গরিব দুঃখীকে রোজই কিছু দান করত, আর কমপক্ষে তিনজন অতিথিকে আগে না খাইয়ে জলগ্রহণ করত না সে। কিন্তু রোজ রোজ তিনজন অতিথি পাওয়াও মুশকিল হয়ে পড়ত মাঝে মাঝে। অতিথি না জুটলে সেই দিনটা অনাহারেই কাটত তার। যেদিন তিনজন অতিথি জোটাতে পারেনি, সেই দিনই অনাহারে কাটাতে হয়েছে তাকে। এমন ভাবে তো আর বেশি দিন চলতে পারে না। আবার তিনজন অতিথিকে না খাওয়ালে তার ধর্মপালনও হয় না। এক ব্রাহ্মণ তাকে উপদেশ দিলেন— মিছরি দিয়ে তিনটি অতিথির মূর্তি তৈরি করে রাখতে। যেদিন তিনজন অতিথি জুটবে না, সেদিন ওই মিছরি-অতিথিদের ভোগ নিবেদন করে পরে সে নিজে খেতে পারে। ব্রাহ্মণের উপদেশমতো মিছরির তিনটি অতিথির মূর্তি গড়ে আলমারিতে তুলে রাখল কুন্দনলাল। তবে মিছরির মূর্তি তো। কদিন আর রাখা যায়। হয় পিঁপড়েতে খায়, নয়তো খেয়ে ফেলে তার ছেলে। সব সময় পাওয়াও যায় না মিছরির মূর্তি। তাই মাঝে মাঝেই অনাহারে কাটাতে হয় তাকে।

একবার তিন দিন অনাহারে কাটানোর পর তিনটি মিছরির মূর্তি তৈরি করল কুন্দনলাল। আর সেই সময় তার বাড়িতে এসে হাজির হল তিনজন অতিথি। কুন্দনলাল তো ভারি খুশি। সে অতিথিদের আপ্যায়ন করে বলল—

'অতিথি দেবতা, আপনারা বিশ্রাম করুন। আপনাদের সেবা করে আমি তৃপ্ত হই।'

কুন্দনলাল তিন অতিথির জন্য তিনটি খাটিয়া পেতে দিল। বউকে বলল— 'তুমি তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না সেরে ফেল। আমি চট্ করে একবার মাঠ থেকে ঘুরে আসছি।'

এই বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল কুন্দনলাল। তার অতিথিরা অনেক দূর থেকে অনেক পথ হেঁটে এসেছে। তারা খাটিয়া তিনটের উপর গা এলিয়ে দিল।

এমন সময় কুন্দনলালের বাচ্চা ছেলেটা খেলা ফেলে ছুটে এসে তার মাকে বলল—

'মা, বাবার তো আজ তিন অতিথিই জুটেছে। তবে এখন ওই তিনটের একটাকে খাই আমি। আর বাকি দুটো খাও তুমি আর বাবা।' এই বলে ছেলেটা আলমারির দিকে এগিয়ে যায়, যেখানে রাখা ছিল সেই মিছরির তৈরি তিন অতিথি।

ছেলের মা বলে, 'না বাবা, আজ নয়। কালকে আমরা তিনজনে একসঙ্গে ওগুলো খাব।'

মা আর ছেলের কথা কানে যেতেই ধড়মড় করে খাটিয়ার উপর উঠে বসে তিন অতিথি। তারা ভাবল— বোধ হয় কোনো ডাইন কিংবা দৈত্যের পাল্লায় পড়েছে তারা। যেই একথা ভাবা, অমনি তারা তিনজনেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে কুন্দনলালের বাড়ি ছেড়ে লাগাল লম্বা দৌড়।



ঠিক সেই সময় কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে কুন্দনলাল। তিন অতিথিকে দৌড় লাগাতে দেখে ভাবি অবাক হল সে। তাদের পেছনে পেছনে সেও দৌড়তে লাগল, আর চিৎকার করে বলতে লাগল—

'অতিথি-দেবতারা, আপনারা চলে যাচ্ছেন কেন? শুনুন, আজ তিনদিন ধরে আমি অতিথি পাইনি বলে অনাহারে আছি। এমন করে চলে যাবেন না। দয়া করুন আমাকে।'

কুন্দনলালের এই কাতর ডাকে সেই তিন অতিথি তো থামলই না, উলটে দারুণ আতঙ্কে আরও বাড়িয়ে দিল তাদের দৌড়ের গতি। নিজেকে ডাইন কিংবা দৈত্যের খাদ্য হিসেবে ভাবতে কার না আতঙ্ক হয়? প্রাণভয়ে ছুটতে ছুটতে কুন্দন-লালের গ্রামের সীমানা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই তিন অতিথি।

বকবকানির ওষুধ



এক জাঠের মেয়ের নাম ছিল সরলা। নামটি সরলা হলে কী হয়, মেয়েটি ছিল ভীষণ মুখরা। তার বকবকানির চোটে বাড়ির লোক তো বটেই, পাড়া-পড়শিরাও অস্থির। সরলার জিভের ডগায় যেন ধারালো ক্ষুর বসান। কারও কোনো বারণ মানত না। দিনরাত কেবলই চলত তার বকবকানি। পাতিয়ালার কাছে গুল্‌হা গ্রামে বর্ষাকালে এক মেলা হয়। সেই মেলায় মুখরা মেয়েদের মুখ বন্ধ করার একটা ব্যবস্থা ছিল। সেখানে একটা দেয়ালের গায়ে ছোট্ট গর্তের মধ্যে মুখরা মেয়েদের চেপে-চুপে ধরে তাদের মুখটা ঢুকিয়ে দিতে বাধ্য করা হত। গর্তের মধ্যে উইপোকার বাসায় থাকত প্রচুর উইপোকা। সেই উইপোকাদের কামড়ের ঠেলায় অনেক মেয়েরই বকবকানি রোগ সেরে যেত। সরলার বাপ-মা তাকে গুল্‌হাতে নিয়ে গিয়ে চেষ্টা করে দেখেছিল। কিন্তু সে ওষুধেও কোনো কাজ হয়নি। উলটে সরলার বকবকানির মাত্রা গেল আরও বেড়ে।

সরলার জন্য ভেবে ভেবে তার বাপ চরণদাসের তো আর ঘুম আসে না দু-চোখে। মেয়ের স্বভাবের কথা আশেপাশের গাঁয়েও জানাজানি হতে বাকি ছিল না কিছু। এদিকে মেয়েটার বয়স পার হয়ে যায়। কিন্তু অমন মুখরা মেয়েকে কে আর জেনে-শুনে নিজের বউ করবে। এ নিয়ে অবশ্য সরলার কোনো দুশ্চিন্তাই নেই। যত দিন যায়, তত তাব মুখ বাড়ে। গলার স্বর চড়ে। কোমর বেঁধে সমানে কোঁদল চালিয়ে যায়— সে নিজের বাড়ির লোকই হোক, পাড়াপড়শিই হোক, কিংবা চেনা-অচেনা যে কেউ হোক— তার সঙ্গে।

জাঠ চরণদাস যখন তার মেয়ে সরলার বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছিল, তখন অনেক দূরের গ্রাম থেকে এক তরুণ জাঠের সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ এল। সরলার স্বভাবের খ্যাতি হয়তো অতদূর অবধি পৌঁছায়নি এখনও পর্যন্ত।

চরণদাস আর দেরি করল না। চটপট শুভকাজের ব্যবস্থা করে ফেলল।

বিয়ের পর বর মোহনদাসের সঙ্গে সরলা বলদজোতা গাড়িতে চেপে কনে বউটি সেজে শ্বশুরবাড়ি চলল। বিয়ের সময় একটুও বকবক করার সুযোগ পায়নি সরলা। মুখ না চালাতে পেরে পেটটা যেন ফুলে ঢোল হয়ে গেছে তার। ভাবছে কতক্ষণে বকবকানি শুরু করার সুযোগ মিলবে। হাজার হোক সরলা এখন কনে-বউ। নিজে যেচে তো আর বরের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। তবে একটু সুযোগ এলেই সে তার বরকে হাড়ে হাড়ে মালুম করিয়ে ছাড়বে— সে কেমন চিজ।

বরকনের সঙ্গে হাঁড়ি-কুড়ি বোঝাই করে অনেক খাবার-সামগ্রী দিয়েছিল সরলার বাপ চরণদাস। গাড়ি চলার সময় সেই সব হাঁড়িকুড়ির ঠোকাঠুকিতে খটমট শব্দ উঠছিল। সরলার বর মোহন শব্দ শুনে ভ্রু কুঁচকে তাকাল হাঁড়ি-কুড়িগুলোর দিকে। হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে চোখ রাঙিয়ে ধমক লাগাল—

'এ্যাই চোপ্! আর একটু শব্দ হলেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব একেবারে।'

কিন্তু কে কার ধমকের ধার দারে? হাঁড়ি-কুড়িগুলোর শব্দ হতেই থাকে। হঠাৎ পথের মাঝখানেই গাড়ি থামাল মোহনদাস। হাতের লাঠির ঘায়ে সবকটা হাঁড়ি-কুড়ি ভেঙে চুরমার করে দিলে।

ব্যাপার দেখে সরলার তো আক্কেল গুড়ুম। ভয়ে শিউরে উঠে নিজের মনে মনেই বলল—'আরেব্বাস সত্যিসত্যিই লোকটা হাঁড়ি-কুড়িগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল দেখছি।'



আবার কিছুদূর যাবার পর মোহনদাস গাড়িতে জোতা বলদ-দুটোকে হাঁক দিয়ে বলল—

'তোদের গলার ঘণ্টির টুংটাং শব্দে কানটা যে ঝালাপালা হয়ে গেল। ওই বিচ্ছিরি শব্দ যদি বন্ধ না হয়, তাহলে তোদেরই একদিন কি আমারই একদিন।'

তবুও বলদ জোড়ার গলার ঘণ্টা বেজে চলে টুং-টাং, টুং-টাং। আবার গাড়ি থামাল মোহনদাস। কোমবে গোঁজা তলোয়ারটা বার করে ঘ্যাচ ঘ্যাচ কবে কেটে ফেলল বলদ দুটোর মাথা। ভয়ে চিৎকার করে উঠতে গিয়েও অনেক কষ্টে সামলে নিল সবলা। ভয়ে জড়সড় হয়ে চুপচাপ সেই বলদহীন গাড়ির মধ্যেই বসে রইল।

এবার মোহনদাস নিজেই টেনে নিয়ে চলল গাড়িটা। গাড়ি চলার সময় চাকাজোড়ায় শব্দ ওঠে ক্যাঁচ-কঁচড় ক্যাঁচ—। আবার বিরক্ত হয় মোহনদাস। চেঁচিয়ে বলে ওঠে—

'আবার ক্যাঁচড় ক্যাঁচড় করলেই টুকবো টুকরো করে ফেলব।'

গাড়ি চলে। কিন্তু চাকাব ক্যাঁচড় ক্যাঁচড় থামে না। হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে চাকাজোড়াকে আছাড় দিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলল মোহনদাস। তারপর গম্ভীর গলায় সরলাকে ডাকল—

'নেমে এস গাড়ি থেকে। এবার হেঁটে চল আমার সঙ্গে।'

বাধ্য মেয়েটির মতো সরলা নেমে এল গাড়ি থেকে। বরের পিছু-পিছু হেঁটে চলল শ্বশুরবাড়ির দিকে। তারা জিভের ডগায় বসান ক্ষুরটার ধার যেন কোন্ মন্ত্রবলে কখন ভোঁতা হয়ে গেছে একেবারে।

অ-কাজের লোক



একজন কাজের লোকের অভাবে ভীষণ বিপদে পড়েছে এক জাঠ। কাজ করবার লোক নেই, তাই খামারের সব কাজই তাকে নিজের হাতে করতে হয়। দু-একটা কাজের লোকের সন্ধান যে একেবারেই পায়নি তা নয়। তবে তারা যা মাইনে চায়, তা দেবার সাধ্য তার নেই। তাই নিরুপায় হয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয় তাকে।

হঠাৎ একদিন একটি অচেনা লোক এসে হাজির হল তার কাছে। কাজ খুঁজতে বেরিয়েছে লোকটি। লোকটিকে দেখে বেশ চালাক চতুর আর চটপটে মনে হল জাঠের। জাঠ ভাবল— এমন একটা লোকের মাইনে জোগাবার সাধ্য কি তার হবে? তাই সে ভয়ে ভয়ে লোকটিকে প্রশ্ন করল—

'তোমাকে কত মাইনে দিতে হবে?'

'মাইনে?' লোকটি যেন আকাশ থেকে পড়ল। তারপর হাসতে হাসতে বলল—

'দেখুন কর্তা, আমি কাজ পেলেই খুশি। মাইনে-টাইনে কিছুই আমার চাই না। শুধু একটু খেতে দেবেন আর দু-একটা পরনের কাপড় দেবেন, ব্যস। তাতেই আমার চলে যাবে। তবে—।' তার কথা শেষ না করেই আচমকা থেমে যায় লোকটি।

এমন অদ্ভুত কাজের লোক পেয়ে জাঠ তো মনে মনে খুব খুশি। তাই সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—

'থামলে কেন? কী বলতে চাও বল না?'

'না মানে—।' একটু যেন আমতা আমতা ভাব লোকটির কথায়। আর কথার সঙ্গে মুচকি মুচকি হাসি।

'আসলে কী জানেন, আমার একটা বদ স্বভাব আছে। তা যদি আপনি মেনে নিতে পারেন—।'

'আরে বলেই ফেল না।' জাঠের যেন আর তর সয় না।

'অবশ্য মানা না-মানা সে আপনার খুশি।' এই বলে একটু যেন লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গিতে জাঠের মুখের দিকে তাকায় লোকটি। তারপর বলে—

'আসলে বছরে একবার— ওই একবারই— একটি কুকর্ম বা অপকর্ম যাই বলেন আপনি — তা করে ফেলি আমি। তবে ওই যে বললাম— মাত্র একবার। একবার বই দুবার করি না। যদি এখন আপনি সেটা মেনে নেন কর্তা, তাহলে এক্ষুনি আপনার কাজে লেগে পড়ি।'

জাঠ মনে মনে ভাবল— এ তো ভারী অদ্ভুত লোক। শুধু খাওয়া আর পরার বিনিময়ে খামারের সব কাজই করতে রাজি। মাইনে নিতে চায় না। কী আর এমন কুকর্ম বা অপকর্ম করবে? দেখাই যাক না কী হয়?—এই ভেবে লোকটিকে কাজে লাগিয়ে দিল জাঠ।

সত্যিই লোকটি খুব কাজের। যত রকমের কাজ আছে খামারে— সব মুখ বুঁজে করে যায়। কাজে একটুও খুঁত থাকে না তার। কয়েকটা মাস পেরিয়ে যায় এইভাবে। লোকটির কাজের গুণে জাঠের জমিতে সোনার

ফসল ফলে। এবারে ফসলের পরিমাণও অন্যবারের তুলনায় অনেক বেশি। জাঠের মনে ভারি সুখ। লোকটির স্বভাব-দোষের কথা— যা সে বলেছিল— তা ভুলেই গিয়েছিল জাঠ।

কিন্তু জাঠ ভুললেও লোকটি তোর আর ভোলেনি। সে ভাবল— এইবার কর্তাকে কিছু খেল দেখাই' এই কথা ভাবতে ভাবতে লোকটার মুখে একটা দুষ্টুমির হাসি ফুটে ওঠে।

সেদিন জাঠের বাড়িতে তার ভাই এসেছে বউকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে। সেই দিনটাকেই বেছে নিল লোকটি। সোজা জাঠের বাড়ি গিয়ে হাজির হল সে। জাঠের বউকে বলল—



'কর্তা-মা, একটা ভারি দরকারি কথা বলি আপনাকে —শুনুন।'

জাঠের বউ একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—

'কী কথা?'

চোখে-মুখে একটা ছদ্ম উদ্বেগের ভাব ফুটিয়ে লোকটি বলল—

'কর্তার তো ভীষণ অসুখ।'

'সে কী?' জাঠের বউ তো লোকটির কথা শুনে ভয়ে আঁতকে ওঠে।

'আপনি বুঝতে পারেননি কিছু?' লোকটির প্রশ্ন শুনে জাঠের বউ ঘাড় নেড়ে জবাব দেয়—'না'। লোকটি তাই দেখে বলতে শুরু করে—

'কর্তার যা রোগ তা সারানো একেবারেই অসম্ভব। আর কটা দিন বড়ো জোর বাঁচবেন উনি। বাইরে থেকে অবশ্য কিছুই বোঝা যায় না। তবে আপনি একবার পরখ করে দেখতে পারেন। আজ দুপুরে কর্তা

যখন বাড়িতে খেতে আসবেন, তখন আপনি সুযোগ মতো কর্তার পিঠটা একটু জিভ দিয়ে চেটে দেখবেন— নোনতা লাগে কিনা?'

এই বলে লোকটি সরে পড়ল সেখান থেকে। যাবার আগে চুপি চুপি দেখা করল জাঠের ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে। তাকে সে বলল—

'কর্তা আর কর্তামার সম্পর্কটা মোটেই ভালো যাচ্ছে না। দিন-রাত শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া। আপনি একটু খেয়াল রাখবেন। কর্তার যা রাগ, হয়তো কর্তামাকে মেরেই বসবেন কোনোদিন।'

এই বলে লোকটা খামারে ফিরে গেল। জাঠ তাকে দেখে বলল—

'খামারের কাজকর্ম ফেলে কোথায় গিয়েছিলি তুই?'

লোকটি বলল—

--আজ্ঞে বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখানে যা দেখলাম—।

তার কথা শুনে জাঠ উদ্বিগ্ন হয়ে তাকায় তার দিকে। বলে—

'কী আবার দেখলি বাড়িতে?'

'আজ্ঞে কর্তামার যেন কেমন-কেমন ভাব। মনে হয় মাথারই কিছু দোষ হয়েছে। তবে এমনি দেখে কিছু বোঝা যায় না। একটু লক্ষ করলেই বুঝতে পারবেন।'

লোকটি এই বলে সরে পড়ল। জাঠ খুব চিন্তিত মনে বাড়ি ফিরল। বউকে বলল চান করার জল দিতে। গায়েব জামা খুলে দাওয়ায় বসে লক্ষ করতে লাগল বউয়ের হাবভাব। বউ চানের জল এনে দিয়ে জাঠের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। ভাবল— কর্তার খালি গা, এখনই সেই পরীক্ষাটা করা যাক। এই ভেবে জাঠের পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যেমনি সে জিভ দিয়ে চাটতে যাবে, অমনি তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে জাঠ। চিৎকার করে বলে ওঠে—

'হায় হায়, এতো দেখছি সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। এখন আমায় কামড়াবার তাল করছে।'

এই বলে একটা লাঠি নিয়ে সে তাড়া করে বউকে। এদিকে তার ভাইয়ের বউ সবকথা জানিয়ে রেখেছিল তার স্বামীকে। তারাও তক্কে তক্কে ছিল। গণ্ডগোল দেখে ছুটে এসে তারা চেপে ধরল জাঠকে। বেঁধে গেল ধুন্ধুমার কাণ্ড। হই-চই শুনে ছুটে আসে পাড়াপড়শির দল। চিৎকার চেঁচামেচিতে সারা গ্রাম একবারে সরগরম। শেষ পর্যন্ত আসল ব্যাপারটা ধরা পড়তে খোঁজ পড়ল সেই কাজের লোকের। সে কিন্তু তখন ধারেকাছেই নেই। কথামতো অপকর্মটি সেরে একেবারে উবে গেছে— কর্পূরের মতো।

হাসতে হাসতে ফিরে যায় পাড়াপড়শির দল। এমন তামাশা তারা কোনো দিন আর দেখেনি।



কিপটে মুদি আর চালাক বামুনের গল্প



মুদি-বউয়ের কী একটা ব্রতের জন্য একজন বামুনকে খাওয়ানো দরকার। মুদি বেরিয়েছে বামুন খুঁজতে। দারুণ কিপটে। তাই একটা রোগা-শুঁটকো চেহারার বামুন খুঁজে বেড়াচ্ছে। যে খাবে কম। মুদির ধারণা— বামুনগুলো খালি পরের খেয়ে পেটমোটা করবারই তালে থাকে। এসব কথা অবশ্য মুখে বলে না সে। বামুনের অভিশাপের ভয় আছে তো!

মুদি পথ চলে আর চারপাশে তাকায়। পেটমোটা নাদুস-নুদুস চেহারার বামুন দেখলেই সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। এক সময় একটি কুঁড়েঘরের দাওয়ায় বসে-থাকা এক বামুনকে নজরে ধরল মুদিব। রোগা শুঁটকো চেহারার বুড়ো বামুন। মুদি মনে মনে ভাবল— 'আহা, যেমনটি খুঁজেছিলাম ঠিক তেমনটিই পেয়েছি।'

বামুনের সামনে এসে গড় হয়ে পেন্নাম করে মুদি বলল—

'পেন্নাম হই ঠাকুর।'

সেই বামুন মুদিকে চিনত। মুদির কিপটেমির কথাও অজানা ছিল না তার। মনে মনে ভাবল— 'কিপটে মুদিটা সাতসকালে কী মতলবে এসেছে কে জানে।' মনের ভাব গোপন করে বলল—

'এই সকালবেলায় আমার কাছে কী মনে করে?'

মুদি খুব ভক্তি দেখিয়ে বলল—

'আমার যে একটু উদ্ধার করতে হচ্ছে, ঠাকুর। আমার গিন্নির ব্রত আছে, তাই আগামীকাল দয়া করে আপনাকে দুটি আহার করতে হবে।'

'আমি বুড়ো মানুষ। তেমন খেতে-টেতে পারি না। যারা পারে তেমন একজন জোয়ান মানুষের খোঁজ কর-না বাপু। আমায় ছেড়ে দাও।'

কিপটের নেমন্তন্ন এড়াতে বামুন কথাগুলো বলল।

মুদি বামুনের কথা শোনামাত্র একেবারে হাঁ-হাঁ করে উঠল। বলল—

'সে কী কথা ঠাকুর! আমি আপনার কথা ভেবে কত আশা নিয়ে এলাম আপনার কাছে। আর আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে মহাপাতকের মধ্যে ফেলবেন? না না, তা হবে না। আমার বাড়ি আসতেই হবে আপনাকে। যা পারেন তাই খাবেন আপনি।'

বামুন ছিল ভারি চালাক। বুঝল, কী মতলবে তার কাছে এসেছে কিপটে মুদিটা। বলল—

'বেশ। তুমি যখন ছাড়বেই না, তখন যেতেই হচ্ছে।'

মুদি আনন্দে গদগদ হয়ে বামুনের পায়ের ধুলো নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। বউকে বলল—

'দেখ, বামুনঠাকুর কাল দুপুরবেলায় আসবেন। উনি যা চান তাই দিও। দেখ বাপু, বামুনকে ভালোভাবে

পেট ভরে খাইয়ে দিও কিন্তু। কাল আমাকে দু-একদিনের জন্য শহরে যেতে হবে। আমি না থাকায় বামুনঠাকুরের কোনো অসুবিধা যেন না হয়।'

পরদিন ভোরবেলাতেই মুদি শহরে রওনা হয়ে গেল। কথামতো বামুন এল মুদির বাড়ি। বামুন তার সাধ্য অনুযায়ী যা পারল খেল। মুদি-বউ কিন্তু তার স্বামীর মতো নয়। ভারি সরল আর ভালো মানুষ। ছোটো মেয়েটাকে বামুনের কাছে পাঠিয়ে মুদি-বউ বারবার জানতে চায়— আর কিছু লাগবে কিনা? বামুন মেয়েটিকে বলে—

'না না, আমার আর কিছু চাই না। এবার আমার ভোজন-দক্ষিণাটা দিয়ে দিলেই আমি চলে যাই।'



মুদি-বউ দরজার আড়ালেই ছিল! মেয়েকে বলল—

'ঠাকুরকে জিজ্ঞেস কর ওঁর দক্ষিণা কত?'

মুদি-বউয়ের কথা বামুনের কানে যেতেই সে বলে উঠল—

'এ আর বলার কী আছে মা। দক্ষিণা দিতে হলে একশো টাকাই দিতে হয়।'

মুদি-বউ বামনুকে একশো টাকাই দিল। সে ভাবল— তার স্বামীও তো তাকে বলে গেছে— বামুন যা চাইবে তাই দিতে।

মুদি শহর থেকে ফিরে এসেই বউকে জিজ্ঞেস করল—

'ঠাকুরমশাই এসেছিল?'

মুদি-বউ বলল—

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব তৃপ্তি সহকারেই খাওয়া-দাওয়া করেছেন ঠাকুরমশাই। একশো টাকা দক্ষিণাও নিয়ে গেছেন।'

বউয়ের কথা শুনে মুদির তো মাথায় হাত! রেগে-মেগে বলল—

'হায় হায়, একী সর্বনাশ করেছ তুমি! আমার এত কষ্টের টাকা। তুমি বোকার মতো একশোটা টাকা দিয়ে দিলে বামুনকে?'

মুদি আর দেরি না করে বামুনের বাড়ির দিকে ছুটল।

চালাক বামুন আন্দাজ করেছিল কিপটে মুদি দক্ষিণার কথা জানতে পারলে ঠিকই ছুটে আসবে তার কাছে। তাই সে তার বউকে মুদি এলে কী বলতে হবে ভালো করে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিল। মুদি আসতেই বাড়ির ভেতর লুকিয়ে রইল বামুন। বামনি বেরিয়ে এসে মুদিকে বলল—

'বাবা, আমার স্বামীর অবস্থা তো খুব খারাপ! আর বুঝি বাঁচে না। কোথায় এক যজমান বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে এসে সেই যে বিছানা নিয়েছে, আর উঠতে পারছে না। হায় হায়, আমার কী সর্বনাশ হল। যজমান-বাড়ির খাওয়াটাই কাল হল আমার স্বামীর।'— এই বলে বামনি ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল।

মুদি আর কী করে? মনের দুঃখ মনের মধ্যে চেপে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বাড়ি ফিরে এল। বাড়ি ফিরে এসে বউকে বলল—

'বামুনটা মরেছে।'

ভালো মানুষ মুদি-বউয়ের একথা শুনে ভারি দুঃখ হল।

এদিকে বামুনও কটা দিন আর বাড়ির বাইরে বার হল না। বাড়ির ভেতরেই ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রইল। কিছুদিন এইভাবে কাটবার পর মাঝে-মধ্যে বাড়ির বাইরে বার হতে শুরু করল, একটু-আধটু।

একদিন কুয়ো থেকে জল নিয়ে বাড়ির পথে আসছিল মুদি-বউ। বামুনও যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে। মুদি-বউ বামুনকে দেখে অবাক হয়ে গেল। বলল—

'একি ঠাকুর! আপনি তো মারা গিয়েছেন! তবে কেমন করে আবার এখানে ফিরে এলেন?' মুদি-বউয়ের কথা শুনে বামুন জবাব দিল—

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক কথা। আমি তো এখন স্বর্গেই থাকি। তবে ইচ্ছে হলে এখানে নেমেও আসি মাঝে মাঝে।'

'সত্যি!' চেঁচিয়ে উঠল মুদি-বউ। 'তা হলে আমার বড়ো মেয়েকে নিশ্চয় সেখানে দেখেছেন আপনি? এক বছর হল মেয়েটা আমার মরে স্বর্গে গেছে।'

বলতে বলতে চোখ ছলছল করে উঠল মুদি-বউয়ের। মেয়েটাকে বড়ো ভালোবাসত সে। চালাক বামুন মুদি-বউয়ের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বলল—

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব দেখেছি তোমার মেয়েকে। আর সে তো আমার পাশেই থাকে। রোজই দেখা হয় তার সঙ্গে।'

'আহা, কেমন আছে সে— সুখে আছে তো ঠাকুর?' মুদি-বউ ব্যাকুল হয় মেয়ের কথা জানতে।

বামুন মাথাটা নেড়ে বলে—

'ভালোই আছে, তবে একটাই দুঃখ তার। গয়না-গাঁটি কিছুই নেই, তাই ওখানে সবাই ওকে নিয়ে বড়ো হাসি-তামাশা করে।'

'ঠাকুর, আমি আপনাকে ওর গয়নাগুলো দিয়ে দেব। আপনি দয়া করে ওর কাছে পৌঁছে দেবেন।'

মুদি-বউয়ের কথা শুনে চালাক বামুন বলল—

'ঠিক আছে। তুমি যখন বলছ এটুকু কষ্ট না-হয় করব।'

মুদি-বউ তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে মেয়ের গয়নার পুঁটলিটা নিয়ে এসে বামুনের হাতে দিয়ে বলল—

'দেখবেন, আমার স্বামী যেন জানতে না পারে।'

'সে আর বলতে— ।'

বামুন মুদির মেয়ের গয়নাগুলো নিয়ে চম্পট দিল। কিন্তু মেয়েদের পেটে নাকি কোনো কথা চাপা থাকে না। কয়েকদিন চুপচাপ থেকে মুদি-বউ মুদিকে বামুনের স্বর্গ থেকে নেমে-আসা আর তার হাত দিয়ে মেয়ের কাছে গয়না পাঠাবার কথা— সব বলে ফেলল। শুনেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল মুদি। চিৎকার করে বলতে লাগল—

'হায় হায়, কী বোকা বউয়ের পাল্লায় পড়েছি আমি! দাঁড়াও, সেই বিটলে বামুনকে উচিত শিক্ষা দিয়ে আসছি।'

এই বলে মুদি তার ঘোড়ায় চেপে বামুনের বাড়ি গিয়ে হাজির। দূর থেকে মুদিকে ঘোড়ায় চেপে আসতে দেখেই বামুন তার বাড়ির সামনের এক বিরাট পিপুল গাছে উঠে লুকিয়ে থাকল। তাই দেখে মুদি ঘোড়া থেকে নেমে সেই পিপুল গাছে উঠতে গেল। বামুন ভারি চালাক। মুদি গাছ বেয়ে ওঠার আগেই সরসর করে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে মুদিরই ঘোড়ায় চেপে সে দিল চম্পট। তাই দেখে মুদি হায়-হায় করে উঠল। হতাশ হয়ে চিৎকার করে সে বামুনকে বলল—

'ঠাকুর, যাচ্ছ যাও! কিন্তু ঘোড়াটা যেন আমার মেয়েকে দিয়ে দিও।'



ঘুমের মাশুল



হরিয়ানা রাজ্যে বহু জাঠের বাস। জাঠেরা যেমন সরল, তেমনি কষ্টসহিষ্ণু। জলহীন রুক্ষ ভূমিতে কঠোর পরিশ্রমে সোনার ফসল ফলায় জাঠ কৃষক। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসেবে জাঠেদের প্রচুর সুনাম। আবার পরিহাসপ্রিয় ও রঙ্গরসিক হিসেবে তাদের জুড়ি মেলা ভার। গল্প বলতে আর গল্প শুনতেও ভীষণ ভালোবাসে জাঠেরা। একটু অবসর পেলেই তাদের গল্পের আসর বসে যায়। কতরকম গল্পই-না হয় সেখানে' কতক গল্পতো প্রবাদ হয়ে ফেরে লোকের মুখে মুখে। এ গল্প তেমনি এক গল্প।

এক জাঠকে একবার গ্রাম ছেড়ে যেতে হল অনেক দূরের ভিন গাঁয়ে। সঙ্গে নিয়ে চলেছে একটি মোষ। মোষটির বাচ্চা বিয়োবার সময় হয়ে এসেছিল। তাই মোষটার যাতে কষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ রেখে জাঠ পথ চলছিল খুব ধীরে ধীরে। চলতে চলতে এক বেদের সঙ্গে দেখা। বেদেও চলেছে ওই একই পথে। তারও হাতের দড়ির সঙ্গে বাঁধা একটা মোষ। আর এমনি মজার ব্যাপার যে তার মোষটিরও জাঠের মোষের মতোই অবস্থা— যে কোনো সময় সেও বাচ্চা বিয়োতে পারে। জাঠেরা যেমন সরল আর দিলখোলা, বেদেরা কিন্তু তার একেবারেই উলটো। তাদের পেটভর্তি শয়তানি আর ধূর্তামি। তবুও তাদের দুজনেব মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গেল। দুজনেরই মোষ দুটোর এক দশা। বোধহয় 'সেইজন্যই একে ভাব জমিয়ে ফেলল অপরের সঙ্গে।

পথ চলতে চলতে রাত ঘনিয়ে এল। জাঠ আর বেদে রাত কাটাবার জন্য আশ্রয় নিল এক গাছতলায় জাঠ বেদেকে বলল— 'ভাই, আমাদের মোষ দুটোর তো দেখছি একই অবস্থা। কখন কী হয়ে যায়। দুজনের একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়া ঠিক হবে না। তার চেয়ে আমরা পালা করে রাতটা জেগে কাটাই।

জাঠের কথা শুনে বেদে বলল—'ঠিকই বলেছ। তা হলে আমি এখন ঘুমোই। দু-ঘণ্টা বাদে আমায় তুমি ডেকে দিও। তখন আমি জাগব আব তুমি ঘুমোবে।'

এই বলে বেদে সেই গাছতলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। জাঠ জেগে থেকে মোষ দুটোকে পাহারা দিতে থাকল। দুঘণ্টা বাদে জাঠ বেদেকে জাগিয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়ল। শোবার আগে বেদেকে বলল— 'আমার মোষটার কিছু হলে আমাকে ডেকে দিও কিন্তু।'

বেদে তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল— 'সে আর তোমায় বলতে হবে না।'

জেগে বসে থাকতে থাকতেই বেদে লক্ষ করল দুটো মোষেরই বাচ্চা জন্মাল প্রায় একই সঙ্গে। সে দৌড়ে এগিয়ে গেল মোষেদের কাছে। বেদে দেখল— তার মোষ জন্ম দিয়েছে এঁড়ে বাছুর, আর জাঠের মোষ জন্ম দিয়েছে বক্‌না বাছুর। এঁড়ে বাছুর তো দুধ দেয় না, শুধু খায় দায় আর ঘুরে বেড়ায়। বেদের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শয়তানী বুদ্ধি ভর করল তার মাথায়। ধূর্ত বেদে জাঠের বক্‌না বাছুরটিকে বাঁধল নিজের মোষের সঙ্গে আর এঁড়ে বাছুরটিকে বেঁধে দিল জাঠের মোষের সঙ্গে।

এরপর বেদে জাঠকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। বলল—

'আরে ভাই, ওঠো ওঠো। আমাদের দুটো মোষই একসঙ্গে বাচ্চা দিয়েছে।'

জাঠ ধড়মড় করে উঠে বসল। তাকে দেখে বেদে হেসে বলল—

'তোমার ভাগ্যটা খারাপ। একটা এঁড়ে বাছুরের জন্ম দিয়েছে তোমার মোষ।'

'আর তোমার?'

জাঠের কথা শুনে বেদে আবার হাসল, বলল— ' দেখ না, বক্‌নাটা তার মায়ের কাছে কেমন তিড়িং-বিড়িং করে লাফ মারছে।'

ভোর হয়ে আসছে। বেদে তার মোষের দড়ি খুলে হাতে নিয়ে বলল—

'চলি ভাই। তোমার জন্য সত্যিই দুঃখ হচ্ছে।'

জাঠ ম্লান হেসে কপালে চাপড় মেরে বলল— 'দুঃখের আর কী আছে বল? এ তো জানা কথা— যে ঘুমোয় তার বরাতে এঁড়ে বাছুর ছাড়া আর কী জুটবে?'

এই বলে জাঠ তার মোষের দড়ি খুলে হাতে নিল। তারপর মোষ আর এঁড়ে বাছুরটিকে নিয়ে নিজের পথে রওনা হল।

এ গল্পে মজা আছে ঠিকই। তবে সবটাই মজা নয়। হরিয়ানার জাঠেদের মধ্যে একটা চালু রসিকতা হল : 'যে ঘুমোয় তার ভাগ্যে জোটে এঁড়ে বাছুর।'

মানুষ যদি অলস হয়, সংসারের সবদিকে সজাগ দৃষ্টি না রাখতে পারে, তা হলে গল্পের ওই জাঠের মতোই জীবনের প্রকৃত পাওনা থেকে বঞ্চিত হতে হয় তাকে।

এ গল্পের এটিই হল মূলকথা।



উপকারীর শিক্ষা



একবার একটা পাখির সঙ্গে এক ইঁদুরের খুব ভাব হল। ভাব বলে ভাব! একসঙ্গে শোওয়া, একসঙ্গে বসা, আবার একসঙ্গে বেড়ানো। দুজনের কেউ কাউকে এক দণ্ডও ছেড়ে থাকতে পারে না। শোওয়া, বসা আর বেড়ানোর মতো খাওয়াও চাই একসঙ্গে। একদিন দুই বন্ধুতে মিলে গেল কুল খেতে এক বনের মধ্যে। বনের মধ্যে ফলে রয়েছে গাছভর্তি পাকা-পাকা মিষ্টি-মিষ্টি কুল। দুই বন্ধুতে মনের আনন্দে কুল খায়। পাখি তার ডানায় ভর দিয়ে উড়ে গিয়ে বসে একবার এ-ডালে, একবার ও-ডালে। ইদুর উড়তে পারে না। কিন্তু সে গাছ বেয়ে উঠতে পারে। ইঁদুরও বেয়ে বেয়ে এ-ডাল ও-ডাল ঘুরে কুল খেতে থাকে। কুল গাছের আছে কাঁটা। কুল খেতে খেতে ইঁদুরের শরীরটা এক সময় আটকে যায় কাঁটায়। কাঁটা থেকে নিজেকে ছাড়াতে যতই ছটফট করে, ততই সে আটকে পড়ে কাঁটার ফাঁদে। শেষে যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে ওঠে বেচারা। কাতর গলায় পাখিকে ডেকে বলে— 'বন্ধু, আমাকে বাঁচাও।'

ইঁদুর-বন্ধুর কাতর ডাকে ছুটে আসে পাখিটা। তার শক্ত ঠোঁট দিয়ে কাঁটা সরিয়ে বন্ধুকে মুক্ত করে সে। কাঁটার ফাঁদ থেকে মুক্তি পেয়ে সুড়ুৎ করে গাছ বেয়ে মাটিতে নেমে আসে ইঁদুর। তারপর গটগটিয়ে চলে যায় নিজের গর্তের দিকে। পাখিটাও উড়ে উড়ে সঙ্গে যায় তার। গর্তের কাছে পাখিটা একটা গাছের ডালে বসে গান গাইতে আরম্ভ করে। ইঁদুরটা কিন্তু গর্ত থেকে বেরোয় না আর। পাখি মনে মনে ভাবে— বন্ধু বুঝি লজ্জা পেয়েছে।

পরদিনই ইঁদুরের হল আর এক বিপদ। বিপদ বলে বিপদ! এক মোষের খাটালে কী যেন করতে গেছে ইঁদুরটা। আর অসাবধানে পড়বি-তো পড় একেবারে একতাল গোবরের মধ্যে। কিছুতেই আর সেই গোবরের তালের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না ইঁদুর। যতই নড়াচড়া করতে যায়, ততই সেঁধিয়ে যায় গোবরের মধ্যে। শেষকালে যখন দম আটকিয়ে আসে, তখন প্রাণভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে ইঁদুরটা— 'কোথায় আছ পাখি ভাই—আমাকে বাঁচাও।'

ইঁদুরের ডাক শুনে ছুটে আসে পাখি। দুটো ঠোঁটের ফাঁকে ইঁদুরের শরীরটা চেপে ধরে টেনে তুলে বাঁচায় প্রিয় বন্ধুকে। এবারও গোবর থেকে মুক্ত হয়েই এক ছুটে নিজের গর্তের দিকে ছুট লাগাল ইঁদুর। বন্ধুকে ধন্যবাদ জানাতেও ভুলে গেল সে। পাখি অবাক হয়। তবু সে মনে মনে ভাবে— বন্ধুর বোধ হয় কষ্ট হয়েছে।

এর কিছুদিন পরে একদিন একটা উট হেঁটে যাচ্ছিল ইঁদুরের গর্তের পাশ দিয়ে। উট দেখতে গর্তের বাইরে বেরিয়ে এল ইঁদুর। আর বেরিয়ে আসতেই পড়ে গেল একেবারে উটের পায়ের তলায়। এবারও ইঁদুরের ডাকে ছুটে এল পাখি। উটের পায়ের খুরের ফাঁক থেকে অনেক কষ্টে টেনে বার করে আনল ইঁদুরকে। ছাড়া পেয়েই ইঁদুরের আর এক মূর্তি। কিছুই যেন হয়নি— এমন ভাব দেখিয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে যায় নিজের গর্তে। পাখি তার বন্ধুর ব্যবহারে আবার অবাক হয়, কিন্তু কিছুই বলে না।

একদিন ইঁদুর এক মুদির দোকান থেকে কিছু গুড় জোগাড় করে আনল। তারপর একাই বসে বসে বেশ তারিয়ে তারিয়ে সেই গুড় খেতে লাগল সে। তাই দেখে পাখি বলল—

ইঁদুর ভায়া ইঁদুর ভায়া একা একাই খাচ্ছ,
বন্ধুকে ভাগ না দিয়ে কি সত্যি মজা পাচ্ছ?

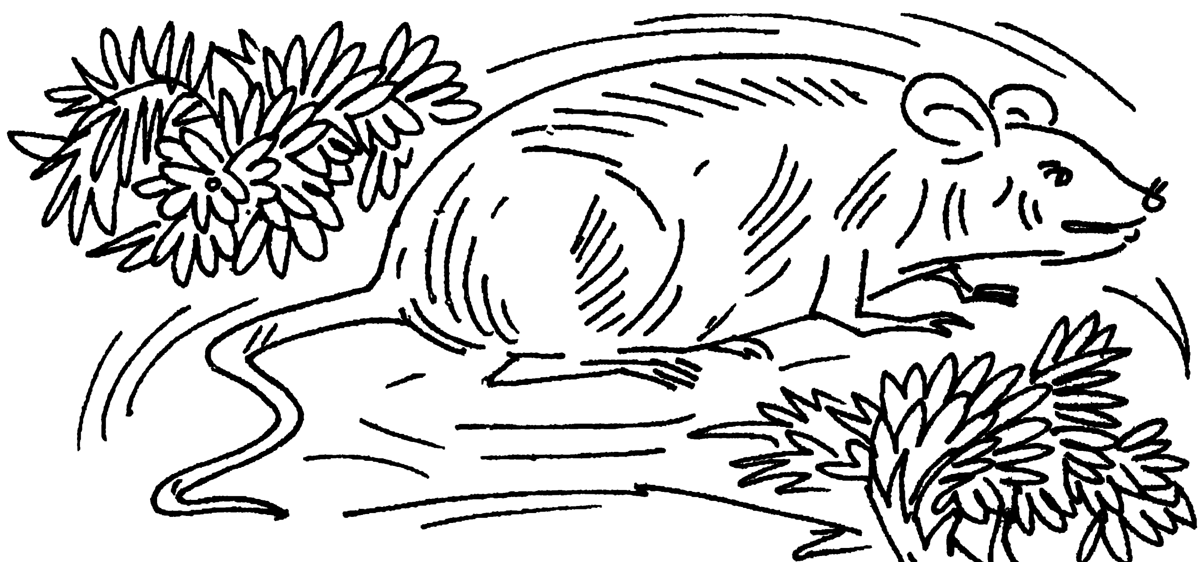
ইঁদুরটা ছিল ভারি স্বার্থপর। সে বলল—

চেষ্টা করে গুড় এনেছি নিজের খাওয়ার জন্য,
বয়েই গেছে ভাগ দিয়ে তার করতে তোমায় ধন্য।

ইঁদুরের কথা শুনে পাখির মনে বড়ো কষ্ট হয়। কী অকৃতজ্ঞ বন্ধু! এতবার তার প্রাণ বাঁচালাম, সবই কি সে ভুলে গেল? ইঁদুরকে সে-সব কথা মনে করিয়ে দিতে পাখি বলল—

কুলের কাঁটায় আটকা পড়ে ওষ্ঠাগত প্রাণ,
ভুলেই গেছ কে তোমাকে করল সেদিন ত্রাণ।

ইঁদুরটা যেমনই স্বার্থপর, তেমনই নির্লজ্জ। গুড় খেতে খেতে সে বলল—



কুলের কাঁটা দিয়ে সেদিন বিঁধিয়েছিলাম কান,
মূর্খ তুমি, ভাবলে বুঝি বাঁচালে মোর প্রাণ।

পাখিতো ইঁদুরের কথা শুনে থ। তবু সে ইঁদুরের দ্বিতীয়বার বিপদে পড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বলে—

ভুলেই গেলে— আঁকু-পাঁকু গোবর গাদায় পড়ে—
না তুললে টেনে সেদিন যেতেই তুমি মরে।

পাখির কথা শুনে রাগ দেখিয়ে ইঁদুর বলে—

ভেবেছিলাম শুদ্ধ হব গোবরে গা ধুয়ে,
বুদ্ধু সেটা বুঝলে নাতো দিলে আমায় ছুঁয়ে।

পাখি এবার শেষ চেষ্টা করে। বলে—

উটের পায়ে চ্যাপ্‌টা হয়ে পেতে কি আর ছাড়া?
না বাঁচালে সেদিন তোমাব দফাই হত সারা।

এসব কথায় হার মানবার পাত্র ইঁদুব নয়। তাই সে জাঁক করে বললে—

পড়ছে মনে গা টেপাতে গিয়েছিলাম বটে,
বুঝতে, যদি বুদ্ধি কিছু থাকত তোমাব ঘটে।



বলতে বলতে স্বার্থপর ইঁদুব পাখিকে একটুও ভাগ না দিয়ে সবটুকু গুড় একা একাই সাবাড় করে ফেলল। বেচারা পাখি আব কী করে! এমন স্বার্থপবেব সঙ্গে কেউ কখনো বন্ধুত্ব করে! ক্ষোভে-দুঃখে একদিন সেখান থেকে দূরে কোথাও উড়ে চলে গেল পাখিটা।

উপকার করা ভালো— প্রতিদান চেও না,
প্রতিদান চেয়ে মিছে মনে দুখ পেও না।

রূপ আর বসন্তের গল্প



রাজবাড়ির বাগানের কোণে এক গাছে চড়ুই পাখির বাসা। বাবা মা আর দুটি বাচ্চা নিয়ে একটি সংসার। রানির শরীর খারাপ। রোজ বিকেলে তাঁকে হাওয়া খাওয়াতে বাগানে নিয়ে আসেন রাজা। রানি বাগানে আসেন। এদিক ওদিক ঘোরেন ধীর পায়ে। কখনো চুপচাপ বসে চড়ুই পাখির বাসাটা দেখেন। মা-চড়ুই খাবার এনে তার বাচ্চা দুটোকে যখন খাওয়ায় তখন সঙ্গে সঙ্গে রূপ আর বসন্তের কথা মনে পড়ে যায় রানির। রূপ আর বসন্ত— ফুলের মতো দুটি ছেলে তাঁদের। রানি রাজাকে বলেন—

'দ্যাখো দ্যাখো, ঠিক আমাদের মতোই সংসার ওদের—।'

রাজা রানির কথা শুনে হাসেন। মুখে কিছু বলেন না।

একদিন হঠাৎ কেমন করে কে জানে, সেই মা চড়ুইটা গেল মরে। কিচির মিচির, কিচির মিচির ডাকে বাচ্চা দুটো তাদের মাকে খোঁজে। রানি মনে বড়ো দুঃখ পান। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে তাঁর। ভাবেন— আমি মরে গেলে আমার রূপ আর বসন্তের কী দশা হবে?

আর একদিন বাগানে গেছেন রানি। চড়ুইয়ের বাসাব দিকে তাকিয়ে দেখেন আর একটি মেয়ে চড়ুই এসে বসল সেখানে। বুঝলেন, ও চড়ুইয়ের নতুন বউ— বাচ্চা দুটোর সৎমা। হঠাৎ এমনি একটা নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখে রানির সারা শরীব যেন অবশ হয়ে গেল। নতুন চড়ুই বউটা এসে বাচ্চা দুটোকে বাসার বাইরে ফেলে দিল। বাচ্চা দুটো সেই উঁচু গাছের ডালের বাসা থেকে নীচে পড়ামাত্র মরে গেল। হায় হায় করে উঠলেন রানি। সেই করুণ দৃশ্য সইতে না পেরে তিনি জ্ঞান হারালেন। রাজা কাছেই ছিলেন। জ্ঞান ফিরতে দুচোখ মেলে রানি দেখতে পেলেন রাজাকে। করুণ গলায় বললেন—

'আমি মরলে আবার নতুন রানি হবে তোমার— তাই না?'

'তুমি কি পাগল হয়েছ?' রাজা বললেন।

রাজার হাত দুটো নিজের দুটো হাতে আঁকড়ে ধরে রানি বললেন—

'কথা দাও, আমি মরে গেলে আমার রূপ-বসন্তের সৎমা আনবে না তুমি!'

রাজা বললেন—

'তাই কখনও হয়! আর এখন মরার কথাই বা ভাবছ কেন তুমি?'

এরপর মাত্র ক-টা দিনের জন্য শুধু বেঁচেছিলেন রানি। রূপ-বসন্তের কথা ভাবতে ভাবতে তাদের কাঁদিয়ে একদিন সত্যিসত্যিই চোখ বুঁজলেন তিনি।

রানির মৃত্যুর অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর কথা ভুলে গেলেন রাজা। আবার বিয়ে করলেন। নতুন রানির বিষ নজরে পড়ল দু ভাই— রূপ আর বসন্ত। রাজাও যেন কেমন হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত রানিকে খুশি করতে রূপ আর বসন্তকে রাজ্য থেকে নির্বাসন দিলেন রাজা।

দুই ভাই পাঠশালায় গুরুমশাইয়ের কাছে পাঠ শিখে রাজবাড়িতে ফিরছে। রাজবাড়ির দরজায় ঝুলছে রাজার নিজের হাতে সই-করা নির্বাসনের আদেশনামা। সেই আদেশে রূপ আর বসন্তকে বারো বছরের জন্য নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছে। রাজার আদেশনামা দেখে দু-ভাই পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। মরা মায়ের কথা ভেবে তাদের দুচোখে টলটলিয়ে জল নামে। অনেক কষ্টে চোখের জল মুছে বড়ো রূপ ছোটোভাই বসন্তকে বলল,

'ভালোই হল রে বসন্ত। যার মা নেই তার কেউ নেই। চল, আমরা এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাই।'

দু-ভাই হাত ধরাধরি করে পথ দিয়ে চলে। এক ভাইয়ের চোখে জল এলে আর এক ভাই মুছিয়ে দেয়। রাজ্যের প্রজারা তাই দেখে চোখের জল ফেলে। কিন্তু রাজার আদেশের প্রতিবাদ করবে কিংবা রূপ-বসন্তকে আশ্রয় দেবে এমন সাহস কারও নেই।

চলতে চলতে রাজ্যের সীমানা পার হয়ে এক গভীর বনের মধ্যে এল দু-ভাই। তখন বেশ রাত হয়েছে। একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিল দুজনে। বনের মধ্যে কত বিপদ। তাই দু-জনে একসঙ্গে না ঘুমিয়ে পালা করে ঘুমোবে ঠিক করল। প্রথমে জেগে পাহারা দিল রূপ। বসন্তের পালা এল তারপর। বসন্ত একে ছোটো, তার উপর সারাদিন পথ চলার কষ্টে বড়োই ক্লান্ত। কিছুক্ষণ জেগে থাকার পর আর না পেরে ঘুমিয়ে পড়ল সে। ঘুমের ঘোরে এক বিষধর সাপ এসে তার পায়ে দিল কামড়।

ঘুম ভেঙে গেলে ছোটো ভাইয়ের নীল হয়ে যাওয়া অচেতন শরীর দেখে কী হয়েছে বুঝতে পারল রূপ ভাইয়ের জন্য বড়ো কাতর হয়ে উঠল সে। তখন সবে ভোর হচ্ছে। বনের মধ্যে পাখির ডাকে জাগল প্রাণের সাড়া। শুধু বসন্তের ছোট্ট শরীরটা নিথর হয়ে পড়ে আছে গাছের তলায়। রূপের মনে হল— একমাত্র কোনো ওঝাই বসন্তের শরীর থেকে সাপের বিষ ঝেড়ে ফিরিয়ে দিতে পারে তার প্রাণ। একথা মনে হতেই ওঝার সন্ধানে বনের পথ ধরে পাগলের মতো ছুটতে লাগল রূপ।

কিছুদূর যেতেই হঠাৎ একদল লোক হই-হই করে তাকে ঘিরে ফেলল। রূপ কিছু বোঝবার আগেই সেই লোকেরা তাকে নিয়ে এল একটা হাতির কাছে। হাতিটা রূপকে দেখেই পা মুড়ে বসে পড়ল মাটির উপর। হাতির গলা থেকে শাঁখের আওয়াজের মতো গম্ভীর স্বর উঠল। রাজার ছেলে রূপ জানে— এ আওয়াজে হাতি তার আনন্দ জানায়। তারপর সেই হাতি শুঁড় তুলে অভিবাদন জানাল রূপকে। তারপর শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে তাকে তুলে নিল পিঠের উপর একেবারে মাহুতের কাছে। মাহুত দুহাত দিয়ে রূপকে ধরে যত্ন করে বসিয়ে দিল হাওদার উপর। তখন সেই লোকগুলো দারুণ উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠল। 'আমাদের রাজা'— 'আমাদের নতুন রাজার জয় হোক'— এই বলতে বলতে মিছিল করে সেই রাজ্যের রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে তুলল তাকে।

সেই দেশের রাজা সন্তানহীন অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। দেশের নিয়মমতো রাজার শূন্য সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেছে রাজার হাতি। রাজার ছেলে রূপকে চিনতে ভুল করেনি রাজার হাতি। সাপের বিষে অচেতন ভাইয়ের জন্য ওঝা খুঁজতে বেরিয়ে হঠাৎ-ই রাজা হল রূপ। কিন্তু রাজা হলেও এক মায়ের পেটের ভাইকে কি ভোলা যায়? রূপ তাই লোকজন আর ওঝা নিয়ে ছুটল সেই বনের মধ্যে। কিন্তু সেই গাছতলায় পৌঁছে হতাশ হল রূপ। গাছতলা শূন্য, খাঁ খাঁ করছে। বসন্তের কোনো চিহ্ন নেই। সারা বন তন্ন তন্ন করে খুঁজল রূপ। কোনো খোঁজ না পেয়ে হতাশ মনে শেষ পর্যন্ত ফিরে গেল নতুন রাজপ্রাসাদে।

তারপর কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। রূপ আরও বড়ো হয়েছে। তার শাসনের গুণে রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধি দ্বিগুণ বেড়ে উঠেছে। কিন্তু রূপের মনে শান্তি নেই। রাজ-কাজের অবসরে একা একা ভাইয়ের কথা ভেবে চোখের জল ঝরায় সে।

একদিন সন্ধ্যায় রূপের রাজ্যের প্রবেশপথে এসে হাজির হল এক সাধু। প্রহরীরা তখন দরজা বন্ধ করছে। অচেনা বিদেশি সাধুকে তারা কিছুতেই ঢুকতে দিল না নগরের মধ্যে। প্রহরীরা বলল—

'কদিন ধরে রাত হলেই নগরে এসে হামলা করছে জঙ্গলের এক মানুষখেকো বাঘ। তাই রাজার হুকুমে সন্ধে হলেই বন্ধ করে দেওয়া হয় নগরের সিংহদ্বার। আমরা এখন ফিরে যাচ্ছি যে যার ঘরে। কাল সকাল হলে আবার দরজা খোলা হবে। যদি বেঁচে থাক, তখনই এসো।'

এই বলে সেই সাধুকে একাকী দরজার ওপারে ফেলে রেখে সেই নির্দয় প্রহরীরা চলে গেল যে যার ঘরে।



সাধু আর কী করে। চুপচাপ সেই দরজার সামনে জেগে বসে রইল। দেশ-বিদেশে ঘুরতে হয়, তাই সাধুর সঙ্গে থাকে একটা মস্ত তরোয়াল। খোলা তরোয়াল হাতে বসে আছে সাধু। হঠাৎ বিরাট হুঙ্কার দিয়ে সেখানে এসে হাজির হল সেই মানুষখেকো বাঘ। সাধুর শরীরে ছিল শক্তি আর মনে ছিল সাহস। তরোয়ালের ঘায়ে সহজেই সেই বাঘকে মেরে ফেলল সে। সেই মরা বাঘের লেজের ডগা আর ঝাঁটার মতো গোঁফ-জোড়া কেটে নিয়ে ঝোলায় ভরল। তারপর নিশ্চিন্ত মনে এক জায়গায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল হতে প্রহরীরা এসে নগরীর সিংহদ্বার খুলেই অবাক। ভয়ঙ্কর ভয়-জাগানো সেই মানুষখেকোটা নিষ্প্রাণ দেহে পড়ে আছে দরজার সামনে। যুক্তি করে সেই মরা বাঘটাকে টেনে নিয়ে গেল রাজার কাছে। তারা নিজেরাই মেরেছে মানুষখেকোটাকে— এমন একটা গল্প বানিয়ে বলতেও দ্বিধা হল না তাদের। শুনে রাজা তো ভীষণ খুশি। প্রচুর পুরস্কার দিলেন প্রহরীদের। এমন সময় রাজায় কাছে হাজির হল সেই সাধু। সাধুর মুখটা দেখে রাজার কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হয়। তবু কিছুতেই চিনতে পারলেন না। সাধু বলল—

'শুনেছি মহারাজ নাকি সত্যি ঘটনা শুনতে ভালোবাসেন। আমার সাধ মহারাজকে আমার জীবনের সত্য ঘটনা শোনাব। শুনবেন কি?'

সিংহাসনে যেন ছবির মতো বসে আছে রূপ। নড়াচড়া করতেও ভুলে গেছে যেন। মনের মধ্যে তোলপাড় করছে একটা প্রশ্ন— কে এই সাধু? কোনো রকমে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল রাজা রূপ। সাধু শুরু করল তার গল্প।

'এক রাজার দুই ছেলে— রূপ আর বসন্ত।' এই পর্যন্ত শুনেই ভারি চঞ্চল হয়ে উঠল রূপ। তবু মনের চাঞ্চল্য দমন করে কোনো মতে স্থির হয়ে রইল। সাধু বলে চলে তার কাহিনী।—



'সাপের কামড়ে চেতনা হারিয়ে গাছতলায় পড়েছিল বসন্ত। একদল সাধু সেই পথ দিয়ে যাবার সময় তাকে দেখতে পায়। এক বৃদ্ধ সাধুর চিকিৎসায় প্রাণ ফিরে পায় বসন্ত। প্রাণ ফিরে পেয়ে সারা বন ঘুরে ঘুরে কোথাও তার দাদার দেখা পেল না সে। তখন সেই সাধুদের দলের সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে থাকে বসন্ত তার দাদার খোঁজে। এ রাজ্যের প্রহরীরা সন্ধে হয়ে যাওয়ায় বসন্তকে নগরের ভেতর ঢুকতে দিল না। বসন্ত তখন বাধ্য হয়ে সিংহদ্বারের বাইরেই রাত কাটাল। গভীর রাতে বসন্তের সামনে এল মস্ত এক মানুষখেকো বাঘ। হাতের তরোয়াল দিয়ে সেই বাঘটাকে হত্যা করল বসন্ত।

এই পর্যন্ত শুনে প্রায় চিৎকার করে উঠল রূপ—

'তুমিই কি সেই বসন্ত?'

সাধু হেসে মাথা নেড়ে বলল— 'হ্যাঁ মহারাজ।'

রূপের সারাটা শরীর আনন্দে আর আবেগে থর থর করে কাঁপতে লাগল। তবু একটা খটকা তার মনে— বাঘটা সত্যি কে মেরেছে? প্রহরীরা, না এই সাধু? তাই সে প্রশ্ন করল—

'বাঘটা যে তুমিই মেরেছ তার প্রমাণ?'

একথা শুনে বসন্ত তার ঝোলা থেকে বার করে বাঘের কাটা লেজের ডগা আর গোঁফ-জোড়াটা। সঙ্গে সঙ্গে রূপের সব সন্দেহের অবসান হয়। সিংহাসন থেকে নেমে সে সাধুবেশী বসন্তকে জড়িয়ে ধরল বুকের মধ্যে। মিলনের আনন্দে যেন অধীর হয়ে উঠল দু-ভাই। এ আনন্দের কোনো ভাষা নেই। শুধু দু-চোখ ছাপিয়ে জলের ধারা বয়ে যায়। আর সেই চোখের জলের মুকুরে একটা ছবি যেন ফুটে ওঠে— তাদের স্নেহময়ী মায়ের ছবি।

একী হল? কেন হল?



গুরুদেব উপদেশ দিচ্ছেন। তাঁকে ঘিরে বসে একমনে সেই উপদেশ শুনছে শিষ্যেরা। এর মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে গুরুদেবের এক শিষ্য এল সেখানে। সেই শিষ্য জোড়হাত করে গুরুদেবকে বলল,

'গুরুদেব, পথে আসতে আসতে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। এক সুদর্শন যুবক, পোশাক দেখে মনে হয় বুঝি কোনো রাজপুত্র হবে। তার গলায় জড়ান রয়েছে একটা মরা সাপ। দু-চোখের দৃষ্টিতে কেমন এক উদভ্রান্ত ভাব। যুবকটি শুধু বুক চাপড়ে কাঁদছে আর বলছে— একী হল? কেন হল? সারাক্ষণ তার মুখে ওই দুটি কথা ছাড়া আর কোনো কথা নেই। গুরুদেব, আপনি তো দিব্যদৃষ্টিতে সবকিছুই দেখতে পান, জানতে পারেন। দয়া করে বলুন— কীসের জন্য যুবকটির এমন দশা?'

শিষ্যের প্রশ্ন শুনে গুরুদেব মৃদু হেসে বললেন, 'যুবকটির গলায় যেটা জড়ানো আছে সেটা সাপ নয়— সাপিনী। এবার সে কেন 'কী হল' আর 'কেন হল' বলে বুক চাপড়ে কাঁদছে সে-কথাই তোমাদের বলছি, শোন—'

এক রাজার সাত রানি ছিল। কিন্তু সাত সাতটা রানি সত্ত্বেও রাজার কোনো ছেলেপুলে ছিল না। তাই রাজার মনে নেই সুখ। সব সময় কেমন যেন উদাস-উদাস ভাব। তাই দেখে রানিদেরও ভয়— মনের অ-সুখে শেষ পর্যন্ত রাজা বুঝি সংসার বিরাগী সাধু হয়ে হিমালয়েই চলে যান। রাজা চলে গেলে রানিদের কী দশা হবে? এই ভেবে ভেবে রানিদের চোখেও ঘুম নেই। তাছাড়া রাজাকে তাঁরা সবাই খুবই ভালোবাসেন। তাই রাজার অ-সুখে তাঁরাও খুবই অ-সুখী।

একদিন সাত রানি পরামর্শ করে একটা বুদ্ধি বার করলেন। তাঁরা রাজাকে খবর দিলেন— ছোটোরানির সন্তান হবে। তাই শুনে রাজার মনে আনন্দ আর ধরে না। রোজই রাজার কাছ থেকে ছোটোরানির কাছে আসে নানান উপহার। অন্য রানিরাও বাদ যান না। এই ভাবে একদিন ছোটোরানির সেই কাল্পনিক সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন এল।

রাজার কাছে খবর পাঠানো হল— ছোটোরানির একটি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে হয়েছে। রাজা রাজপুত্রের মুখ দেখবার জন্য ভীষণ অধীর হয়ে উঠলেন।

এদিকে বুদ্ধিমতী সাত রানি রাজ্যের বড়ো বড়ো ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের বশ করে রেখেছিলেন। রানিদের পরামর্শমতো তাঁরা রাজাকে বোঝালেন— রাজপুত্রের মঙ্গলের জন্য বয়স না হওয়া পর্যন্ত তার মুখ দেখা রাজার উচিত হবে না। রাজপুত্রের একটা মস্ত ফাঁড়া আছে। সেটা কেটে না যাওয়া পর্যন্ত তার মুখ দেখলে কোনো বিপদ-আপদ ঘটে যেতে পারে। রাজা আর কী করেন! নিজের ছেলের অমঙ্গল কে চায়? সুতরাং পণ্ডিতদের পরামর্শমতো বারো বছর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকেন রাজা। রোজই খবর নেন রাজপুত্রের।

রানিরাও খবর পাঠান। —'এইবার রাজপুত্র হাঁটতে শিখেছে', 'এইবার রাজপুত্র পড়াশুনো করছে' —এই রকম নিত্য-নতুন খবর। রাজা সেই সব খবর শোনেন আর আনন্দে অধীর হয়ে ভাবেন কবে বারো বছর শেষ হবে।



ক্রমে ক্রমে বারো বছর শেষ হয়ে আসে। এবারও রানিদের পরামর্শে পণ্ডিতরা বিধান দিলেন— এখনও রাজার রাজপুত্রকে দেখার সময় হয়নি। রাজপুত্রের সময় আসবে সেই বিয়ের সময়— যখন অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে করতে বসবে রাজপুত্র। নিরুপায় রাজার শুধু দিন গোনা ছাড়া আর যেন কোনো কাজ নেই।

ক্রমশ রানিদের মনগড়া আর রাজার কল্পনা দিয়ে গড়া রাজপুত্র বড়ো হয়। রাজার কাছ থেকে রানিদের মহলে রাজপুত্রের জন্য নিত্যি-নতুন উপহার আসে। রানিরাও রাজপুত্রের সম্পর্কে নানারকম কাল্পনিক খবর পাঠায় রাজার কাছে। সেই সব শুনে রাজার বুকের মধ্যে সুখ যেন উথলে ওঠে। রাজপুত্রের মুখ দেখার আশায় দিন গোনেন রাজা।

ক্রমে সেই কল্পনার রাজপুত্রের বিয়ের বয়স হয়। দেশ বিদেশের রাজারা তাঁদের সত্যিকারের রাজকন্যাদের সঙ্গে সেই কল্পনার রাজপুত্রের বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। অবশ্য সেই সব রাজা আর জানবেন কী করে আসল ব্যাপারটা!

শেষ পর্যন্ত বিয়ের দিন ঠিক হয়। রানিরা সেরা সেরা কারিগর ডাকিয়ে এনে গোপনে এক মূর্তি গড়লেন কল্পনার রাজপুত্রের। বরের সাজ-পোশাকে সাজিয়ে সেই কাঠের রাজপুত্রকে বসিয়ে দেওয়া হল চতুর্দোলার উপর। চতুর্দোলায় চেপে কাঠের রাজপুত্র বরবেশে চলল কনের বাড়ি। পেছনে পেছনে দলে দলে বরযাত্রী, বাজিকর, বাদ্যকর, গায়ক, নর্তক, আরো কত কী।

বরবেশী কাঠের রাজপুত্রের চতুর্দোলা চলেছে এক বনের উপর দিয়ে। সেই বনের মধ্যে একটা গর্তের মধ্যে থাকত এক সাপ আর সাপিনী। বরযাত্রীদের বাজনা-বাদ্যি শুনে গর্ত থেকে উঁকি মেরে সব দেখে সাপ সাপিনীকে মুচকি হেসে বলল,

'এসব বাজনা-বাদ্যি শুধুই কয়েক ঘণ্টার জন্য। ছেলের কাঠের মূর্তি দেখে দুঃখে মারা যাবেন রাজা।'

সাপেব কথা শুনে অবাক হয়ে সাপিনী শুধাল—

'কেন গো?'

সাপ তখন সাপিনীকে শোনাল কাঠের রাজপুত্রের বৃত্তান্ত। সব শুনে সাপিনী বলল,

'আহা! কাঠের রাজপুত্তুর যদি সত্যি হত, তা হলে রাজার কত আনন্দ হত!'

সাপ গম্ভীর হয়ে বলল,

'যা হবার নয় তা ভেবে লাভ কী!'

'একটা কিছু কবা যায় না গো?' সাপিনীর কথায় কাঠের রাজপুত্রের জন্য মমতা যেন উথলে উঠল।

সাপ বলল, 'একটা উপায় আছে।'

'কী সে উপায়— বল না গো!' সাপিনীর গলার স্বরে দারুণ আগ্রহ।

'আমার আত্মা যদি প্রবেশ করে রাজপুত্রেব কাঠের শরীরে, তাহলে জীবন্ত হয়ে উঠবে ওই কাঠের পুতুল। তবে যত দিন আমার আত্মা রাজপুত্রের দেহের মধ্যে থাকবে, ততদিনের জন্য আমার সর্পজীবনের ইতি।' —এই পর্যন্ত বলে সাপ থামল।

সাপেব কথা শুনে সাপিনীর ভয় হল। কাঁপা-কাঁপা গলায় সে বলল,

'সে কী?'

সাপিনীব ভয় দেখে সাপ হাসে। অভয় দিয়ে বলে,

'অবশ্য আমার এই সর্পদেহ এখানেই পড়ে থাকবে— তোমার কাছে। রাজপুত্রের দেহ ছেড়ে আমার আত্মা আবাব যখন এই দেহে প্রবেশ করবে, তখনই আমার সর্পজীবন ফিরে আসবে।'

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল— রাজা রাজপুত্রের মুখ দর্শন করার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাপ সেই কাঠের দেহ ছেড়ে ফিরে আসবে। ততক্ষণ সাপিনী পাহারা দেবে সাপের দেহটাকে। সাপ যখন দেহ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, মিনতি-মাখা স্বরে সাপিনী তাকে বলে,

'বেশি দেরি করবে না তো?'

'না না, কাজ শেষ করেই চলে আসব আমি। রাজপুত্রের বিয়ে হয়ে যাবার পর এই পথ দিয়ে যখন বরযাত্রীর দল ফিরে যাবে, তখনই কাঠের দেহ ছেড়ে তোমার কাছে আমি চলে আসব।'

এই কথা বলে সাপিনীর কাছে বিদায় নিল সাপ। সাপের আত্মা যখন সেই কাঠের রাজপুত্রের দেহের মধ্যে ঢুকল, তখন চতুর্দোলা নিয়ে বরযাত্রীর দল একেবারে বিয়ের আসরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

মহা ধুমধাম আর জাঁক-জমকের মধ্যে বিয়ে হল রাজপুত্রের। রাজা এই প্রথম তাঁর ছেলের মুখ দেখতে পেলেন। খুশিতে আনন্দে অধীর হয়ে রাজপুত্রকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে। রাজার পিতৃস্নেহের উত্তাপে যেন গলে গেল রাজপুত্রের দেহবাসী সেই সাপের মন। চারদিকের অঢেল ঐশ্বর্য আর রাজকীয় সুখের প্রাচুর্যে সাপিনীর কথা তার মন থেকে হারিয়ে যেতে থাকে।

প্রায় একমাস ধরে চলল বিয়ের উৎসব। উৎসব শেষে ফিরে চলল বর-কনে আর বরযাত্রীর দল। এদিকে সাপিনী সাপের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছে। বাজনা-বাদ্যির আওয়াজ শুনে বড়ো আশা নিয়ে গর্তের

বাইরে মুখ বাড়ায় সাপিনী। অবাক হয়ে দেখে রাজপুত্র চতুর্দোলার উপর বসে আছে। তার পাশে বসে আছে নতুন বউ। রাজপুত্রের চোখ-মুখে খুশি যেন উপচে পড়ছে। হেসে হেসে নতুন বউয়ের সঙ্গে কত কথা বলছে। সাপিনীর গর্ত পেরিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে চলে গেল বর-কনে আর বরযাত্রীর দল। কই, কথামতো সাপতো ফিরে এল না কাঠের রাজপুত্রের দেহ ছেড়ে? দুঃখে আর অভিমানে সাপিনীর চোখ ফেটে জল আসে।

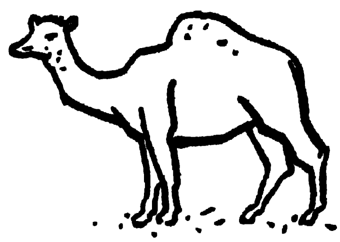


রাতের বেলায় সাপিনী গিয়ে হাজির হয় রাজপ্রাসাদে। রাজপুত্রের জন্য বাসর-ঘর সাজানো হয়েছে। সেই ঘরেই রয়েছে রাজপুত্র আর তার নতুন বউ। দুজনেই ঘুমিয়ে আছে অঘোরে। ঘুমন্ত রাজপুত্রের মুখটা খুশিতে যেন জ্বলজ্বল করছে। ঘুমন্ত দেহটা দেখেই মনে হয় সুখ যেন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে আছে সেই দেহে। নতুন জীবন পেয়ে তার আগের জীবনকে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে রাজপুত্রের দেহবাসী সাপের আত্মা। সাপিনী এখন কী করবে? দংশন করবে নাকি নতুন বউটাকে? কিন্তু রাজপুত্র যে তাহলে বড়ো দুঃখ পাবে! আর রাজপুত্রকে যদি—। শিউরে ওঠে সাপিনী। এ সব কী পাপ-চিন্তা আসছে তার মাথায়? স্বামী হয়তো তাকে ভুলে গেছে, কিন্তু সে তাকে কী করে ভুলবে? দুঃখের আগুনে তিলে তিলে দগ্ধ হতে থাকে সাপিনী। হঠাৎ মনের যন্ত্রণায় রাজপুত্রের পালঙ্কের ধারে মাটির ওপর আছড়ে পড়ে সে। নিদারুণ আক্ষেপে মাথা কুটতে থাকে বার বার।

এক সময় স্থির হয়ে আসে তার দেহটা।

ঘুম ভেঙে জেগে উঠে সাপিনীর মৃতদেহটা দেখতে পায় রাজপুত্র। অপলক দৃষ্টিতে দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফিরে আসে তার পূর্বজীবনের স্মৃতি। প্রচণ্ড হাহাকারে বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে— এ কী হল? কেন হল?

পাগল হয়ে গেল রাজপুত্র। সেই থেকে সাপিনীর মৃতদেহটা গলায় জড়িয়ে সে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়: নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে— এ কী হল? কেন হল?



রাজস্থান

এক ফোঁটা ক্ষীর



যুবক অমর সিং। দশাসই চেহারা। খেতে পারে প্রচুর, খেতে ভালোও বাসে। যাকে বলে ভোজনরসিক আর কি।

পেটুক কিন্তু ভারী লাজুক প্রকৃতির মানুষ এই অমর সিং। পেটে খিদে থাকলেও মুখ ফুটে তা কবুল করতে তার ভীষণ লজ্জা।

পেটুক। লাজুক। এছাড়া, (গোপনে বলে রাখি—) সে রাতকানাও।

এই অমর সিং আগে থেকে জানান না দিয়ে একদিন সন্ধের মুখেমুখে তার এক পুরনো বন্ধুর বাড়ি এসে হাজির! অনেক দিন পর দেখা। বন্ধুরও খুব আনন্দ। অমরের খাতিরে সেদিন রাত্রে বাড়িতে ভালো-ভালো সব খাবার রান্না করানো হল।

বন্ধুর বাড়ি আসতে অনেকটা পথ হাঁটতে হয়েছে অমরকে। রাস্তায় কোথাও কোনো খাবার মেলেনি। বাড়ি থেকে বেরিয়েছে কোন্ সাত-সকালে। খিদের চোটে তার পেটের নাড়িভুঁড়ি হজম হওয়ার জোগাড়।

রাত্রিবেলা বাড়ির সকলে একসঙ্গে খেতে বসেছে। অমর সিংহ বসেছে বন্ধুর পাশে। থালায়, রেকাবিতে, বাটিতে, জামবাটিতে নানা রকম চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। অমরের পেটের মধ্যে খিদের দৈত্যটা যেন লম্ফঝম্প শুরু করে দেয়। কিন্তু কী করবে অমর? খাবে কি? —যা লজ্জা তার! মাথা নিচু কবে দু-আঙুলের ডগায় এটা-একটু ওটা-একটু—ছুঁয়ে, জিবে ঠেকিয়ে— খেল-কী-খেল না, হাত গুটিয়ে বসেই থাকল সারাক্ষণ।

খাওয়ার পর্ব প্রায় চুকতে চলেছে, ঠিক এই সময় এক মহিলা এলেন, হাতে একটা পেল্লায় জামবাটি। সেই জামবাটিতে হাতা ডুবিয়ে তিনি সাদা-মতন কী-যেন-একটা পদ পরিবেশন করতে যাচ্ছিলেন অমরের থালায়। অমর সিং মাথা নেড়ে দু-হাতে থালাটা ঢেকে এমন একটা ভাব করতে লাগল যেন তার পেটে আর একতিলও জায়গা নেই, যে-বস্তুটা পরিবেশন করা হচ্ছে,— খেলে তার বমি হয়ে যাবে। ভদ্রমহিলা কী আর করেন! অমরকে বাদ দিয়েই তিনি অন্যান্য সকলের পাতে সেই পদটি পরিবেশন করে চলে গেলেন।

হঠাৎ পাশের থালাখানার উপর চোখ পড়ল অমরের। আরিব্বাস! এ যে ক্ষীর! ঘন চাপবাঁধা-লালচে ক্ষীরের উপর মোটা সর— ভাসছে!

অমরের জিবে জল এসে যায়। কী বোকামিটাই না সে করল! এমন অমৃততুল্য বস্তুটা নিছক বোকামির জন্যেই ফসকে গেল তো। আর মুখ চুকিয়ে লাভ কী? মহিলা চলে গেছেন। লজ্জার মাথা খেয়ে চাওয়াও চলে না আর। অমর আড়চোখে দেখে নিল, পাশের ভদ্রলোক কেমন আয়াস করে চোখে চোখে চেটে চেটে খেয়ে চলেছেন ক্ষীরটা।

কী করে একফোঁটা ক্ষীর কখন অমরের পাতে পড়ে গেছিল, হয়তো পাশের ভদ্রলোকের খাওয়ার সময় ছিটকে এসে পড়েছিল তার পাতে। অমর সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল— না, কেউ খেয়াল

করছে না, সবাই আঙুল চাটতেই ব্যস্ত। এই সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগই বলা যায়! অমর আঙুলের ডগায় ফোঁটাটা তুলে নিয়ে জিবে ঠেকায়। আঃ, যেন অমৃত! এমন জিনিস কেউ অবহেলা করে কখনো? কী আহাম্মুকিটাই না করে বসেছে সে। নিজেকে মনে মনে গালমন্দ করতে লাগল অমর।

ভোজনপর্ব শেষ। ঢেকুর তুলছে, উঠছে একে একে। হল না। জুটেও জুটল না বরাতে। মনে মনে ভীষণ আপশোস করতে করতে উঠে দাঁড়াল অমরও।

রাত্রিবেলা। দুই বন্ধু পাশাপাশি শুয়ে। বাড়ির সকলেই ঘুমুচ্ছে। নিঝ্‌ঝুম অন্ধকার। কোনো সাড়াশব্দও নেই। কেবল মাঝে-মধ্যে ধেড়ে ইঁদুরগুলোর চলাফেরার খুটখাট শব্দ, চিঁ-চিঁ চেঁচানি।



কিন্তু অমরের চোখে ঘুম নেই। বিছানায় শুয়ে খালি এপাশ আর ওপাশ করছে। পেট ভরেনি। সেই পড়ে-পাওয়া এক ফোঁটা ক্ষীর চাখার পর থেকেই খিদেটা যেন আরো চনচন করে বেড়ে উঠেছে! এখন যদি ভরতি-ভরতি এক জামবাটি পাওয়া যেত। নিশ্চয় রান্নাঘরে আছে কিছুটা— অন্তত তার ভাগের ভর্তি একবাটি।

অমর মরিয়া হয়ে বিছানার উপর উঠে বসল। ঘুমের দফা রফা। পেটে কিছু না পড়লে আর আসবে না।

রান্নাঘরটা কোথায়,— কতদূর? চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার উপর সে আবার রাতকানা। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় যদি!

শেষে খিদের জ্বালা আর সইতে না পেরে বন্ধুকে ঠেলেই তুলল অমর। বন্ধু হুড়মুড় করে উঠে বসলে অমর করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'বীর, তোমাদের রান্নাঘরটা কোন্‌খানে?'

বীর সিং অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন বল তো?'

'কথা দাও, কাউকে বলবে না', অমর সিং ফিসফিস করে বীর সিং-এর কানে কানে বলল।

বীর সিং বলল, কথা দিচ্ছি। কিন্তু রান্নাঘরের খোঁজে তোমার কী লাভ?

'বীর', আমতা আমতা করে বলল অমর, 'ওই ক্ষীরটা চেখে দেখেছ তুমি? খু-উ ব ভালো, না? আরে ভাই, আমি এমন রামবোকা যে তখন না চেখেই বলে ফেললুম— চাই না। পরে একফোঁটা চেখে দেখলাম— আহা, ক্ষীর তো নয়, যেন অমৃত। বুঝলে ভায়া, এখন একটু—ইয়ে,— বুঝতেই পারছো, —নইলে কিছুতেই ঘুম আসছে না।

বীর সিং বুঝে ফেলল, হেসে বললঃ তা, আমাকে আগে বললেই পারতে। ঠিক আছে, চল। রান্নাঘরে একটু-আধটু আছে নিশ্চয়ই।

দুই বন্ধু চুপিচুপি বিছানা থেকে নেমে এল। আগেই বলেছি, অমর রাতকানা। তার কাছে সবই যেন পাতালের অন্ধকার। সে বন্ধুর হাত ধরে হাতড়ে হাতড়ে চলতে লাগল। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে খানিকটা এগিয়েই বাঁদিকে রান্নাঘর। নিজেদের বাড়ি— বীর সিং জানে ক্ষীরের পাত্রটা কোথায় থাকতে পারে। ইঁদুর- বেড়ালে খেয়ে না যেতে পারে এইজন্যে শিকে ঝুলিয়ে রাখা হয় দুধ বা ক্ষীরের পাত্রটা।

বন্ধুকে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল বীর সিং।

অমর অন্ধকারে দুটি হাত শূন্যে তুলে ক্ষীর খুঁজে চলেছে রান্নাঘরে। বীর বলেছে, শিকেয় ঝোলানো আছে। অমর সমানে আঁতিপাতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে শিকেটা। কিন্তু অমর তো আর বেড়াল নয় যে তার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে।

কিন্তু ছিঁড়ল। ছিঁড়ল না বলে বরং বলা চলে ভাঙল। হঠাৎ অমরের হাতের ঠেলা লেগে ক্ষীরের পাত্রটা সশব্দে মাটির উপর পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেময় ছড়িয়ে গেল। অমরের গায়ে মাথায় চোখেমুখে সেই ক্ষীর পড়ে— সে এক কাণ্ড।

এমন সময়— সর্বনাশ, —পায়ের কাছে ছিল একটা বাসনের ডাঁই। অমর তা জানবে কী করে? মেরে বসেছে মোক্ষম এক লাথি। আর সেই নিঝ্‌ঝুম নিশুতি রাতে কাংস্য-পিত্তলের সমবেত ঝন্‌ঝন্‌-ধ্বনি—বাড়ির লোকের ঘুম না-ভেঙে পারে?

'কে? কে?'— বীর সিংয়ের বাবার গলা।

এই রে, ধরা পড়েই গেলাম বুঝি! অমর পড়ি-কী-মরি করে আনাড়ির মতো এদিক-ওদিক ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিল। চোখে কিস্‌সু দেখতে পাচ্ছে না। বীর সিংয়েরও কোনো সাড়াশব্দ নেই। তবে কি অবস্থা বুঝে সে-ও সটকে পড়ল?

ছুটতে ছুটতে সামনে যে ঘরটা পড়ল, অমর তার ভেতরই ঢুকে পড়ল। ওদিকে বীরের বাবা আলো-হাতে এদিক-ওদিক খোঁজাখুজি করছেন, ঘুরে ঘুরে দেখছেন। হাতের লাঠির ঠকাঠক শব্দে অমর সবই বুঝতে পারছে।

অমর মুখে কুলুপ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ নাকে এসে লাগল একটা বিদঘুটে গন্ধ। অমর বুঝতে পারল সে গোয়াল-ঘরে ঢুকে পড়েছে। আশেপাশে একপাল ভেড়া। ভাগ্যিস, ভয় পেয়েও তারা 'ম্যা-ম্যা' করে চেঁচিয়ে ওঠেনি।

এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল।

আবার চারদিক শুনশান, নিঃশব্দ। সকাল হতে কতক্ষণ বাকি কে জানে! অমর ঠায় দাঁড়িয়েই আছে।

হঠাৎ দরজায় ক্যাঁ—চ্ শব্দ। মনে হল, দুজন লোক গা মেরে, চুপিচুপি, আস্তে আস্তে পা ফেলে ভেতরে ঢুকল। কারা? ফিসফিস করে কী-সব যেন বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে! চোর-ডাকাত নয় তো? অমর বার কয়েক ঢোক গিলে পাশে পড়ে-থাকা একটা খালি বস্তার মধ্যে নিজেকে গলিয়ে নিয়ে মড়ার মতো নিঃসাড়ে পড়ে থাকল।

'সাঙ্গাত, তখন বস্তাটা রেখে গিয়েছিলাম ফাঁকা। এখন দেখছি ভেতরে কে যেন ঢুকে বসে আছে! ভেড়া-টেরাই হবে বোধহয়।' বলেই ডাকাতটা বস্তার উপর কষিয়ে দিল এক লাথি। অমরের বুকের পাঁজরটা ভেঙে-গুঁড়িয়ে যাবার উপক্রম। কিন্তু সহ্য করা ছাড়া এখন অমরের আর কীই বা করার আছে!

'যদি ভেড়াই হয়, তবে নিয়ে চল। মা-ভবানীর মন্দিরে বলি দেওয়া যাবে। জমিদার বাড়ির কাজটা নেহাত মন্দ হল না, কী বলিস? দ্যাখ না, সোনারুপোয় আমার বস্তাটা একেবারে ঠাসা। এতো 'মাল' পাওয়া গেল—মাকে পুজো দেব না?'

অমব ঠকঠক কবে কাঁপতে লাগল।

'ঠি ক আছে ওস্তাদ। তুমি ভেড়ার বস্তাটা নাও, আমি মালের বস্তাটা নিচ্ছি।'

বস্তাবন্দি হয়ে অমর চলল ডাকাতের কাঁধে। মা-ভবানীর মন্দিরে বলি দেওয়া হবে তাকে। ভয়ে অমর আধমরা হয়ে গেছে। ডাঙায়-তোলা কাতলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছে কেবল।

'মায়ের মন্দিরে এসে পড়লাম হে'— বলে বস্তাবাহী ডাকাতটা কাঁধ থেকে বস্তাটা যেই না নামাতে গেছে, অমনি এক বিকট চিৎকার— ফাঁদে আটকে পড়া জানোয়ারের মতো ভয়ঙ্কর আর্তনাদ!

সঙ্গে সঙ্গে 'ভূত!' 'ভূত!' বলে ডাকাতদের সে-কী লাফালাফি, নাচানাচি, চেঁচামেচি!

'বাবারে— গেছিরে' বলে বস্তাটা ফেলে দিয়ে বস্তাবাহী ডাকাতটা লাগাল ভোঁ-দৌড়। সঙ্গে সঙ্গে অন্য ডাকাতগুলোও 'দাঁড়ারে, দাঁড়ারে— বাঁচারে বাঁচারে' বলে লাফাতে-লাফাতে চেঁচাতে-চেঁচাতে তার পেছন পেছন— দৌড়— দৌড়— ঘোড়দৌড়।

অমর ধীরে-সুস্থে বস্তা থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়েই দেখে সামনে একটা বস্তা। বস্তাটা খুলে দেখে— শুধু সোনা, শুধু রুপো, শুধু টাকা, শুধু— বাশি রাশি ভারা ভারা—

অনেক দিন পরে বীর সিংয়ের সঙ্গে দেখা। তখন ডাকাতদের ধনসম্পদ পেয়ে অমর রীতিমতো বড়োলোক। সব শুনে বীর সিং মুচকি হেসে বললঃ 'ক্ষীব এক ফোঁটাই ভালো,— কী বল?'



বুদ্ধিমতী বধূ



চিতোরে এক ধনী ব্যবসায়ী বাস করতেন। তাঁর নাম চেতন সিং। বন্ধুদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে তিনি একটি চমৎকার বাড়ি করেছিলেন। সেই বাড়িতে তিনি এক ছেলে আর তিন মেয়ে নিয়ে বাস করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিল না। তিনি মারা গিয়েছিলেন আগেই।

ছেলে বুধন সিং সবার বড়ো। তার বিয়ের বয়স হয়েছিল। মেয়েরা ছোটো। সংসারটা বড়ো অগোছালো। একটা বউ আনা দবকার। তিনি ছেলের বিয়ে দিতে চান। তাঁর ইচ্ছার কথা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে বড়ো বড়ো ঘর থেকে সম্বন্ধ আসতে লাগল। সবাই মেয়ে দিতে চায়। এ পরিবারে মেয়ে এলে সে সুখে থাকবে। তাঁদেরও সুবিধা হবে। বিপদে-আপদে মেয়ের বড়োলোক শ্বশুরের কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে। তাছাড়া মান বাড়বে। এই-সব ভেবে অনেকেই তাঁর ছেলের সঙ্গে মেয়েব বিয়ে দিতে চাইলেন।

চেতন সিং নিজে অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। কিন্তু কাউকেই তাঁর পছন্দ হয়নি। কোন্ ঘরের মেয়ে, বড়ো না ছোটো, তা তিনি বিচার করতে চাননি। জাত নিয়ে তাঁর কোনো বালাই ছিল না। এমন কী, মেয়ের রূপ বা তার বাবার টাকাকড়ি আছে কী না সে খোঁজও নেননি। দরকার কী। জাত বা রূপ নিয়ে কি কেউ ধুয়ে খাবেন? আর বরপণ নিয়েই বা কী হবে? তাঁব কি টাকার অভাব? ছেলের বিয়ে দেবেন, বেচাকেনা করলে তবেই তো টাকাকড়ির কথা ওঠে। তিনি কি ছেলে বেচছেন? বিয়ে কি দোকানদারি? তা নয়, তিনি চাইছেন একটি কমবয়সি বুদ্ধিমতী মেয়ে। গরিব ঘরের হলেও আপত্তি নেই।

কিন্তু মেয়ের বুদ্ধি তিনি যাচাই করে নেবেন। দিন ঠিক হল। মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বাপেরা এলেন। বাপেতে মেয়েতে বাড়ি উপচে যায় আর কী। মেয়েকে একটিমাত্র প্রশ্ন করবেন চেতন সিং। যে মেয়ে সঠিক উত্তর দিতে পারবে, তাকেই ছেলের বউ করবেন। কিন্তু কী সেই প্রশ্ন? ভেবে ভেবে হিমসিম খেয়ে গেছেন বাপেরা, মেয়েরা তো দিশাহারা। তবু সবাই এসে জড়ো হয়েছেন চেতন সিংয়ের বাড়িতে। যদি ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে!

শুরু হল যাচাই-পর্ব। প্রথমে যে মেয়েটিকে ডাকা হল, সে বেশ লক্ষ্মী-লক্ষ্মী, ফর্সা, ভয়ে বুকটা টিবটিব করছিল তার। চেতন সিংকে নমস্কার করে সে দাঁড়িয়ে রইল। চেতন সিং বললেন, আরে, বসো। আচ্ছা, বল তো, ছয় ঋতুর মধ্যে কোন্ ঋতু তোমার পছন্দ?

'ঋতু?'

প্রশ্নের ধরনে ঘাবড়ে গেল মেয়েটি। এরকম সাদামাটা প্রশ্ন কেউ করে নাকি? অন্য ধরনের কত কী প্রশ্ন করে বরকর্তারা। আগে যারা মেয়ে দেখতে এসেছে, তারা কেউ এমন উদ্ভট প্রশ্ন করেনি। রাঁধতে জানে কিনা, গান গাইতে পারে কিনা, কতদূর পড়েছে— এসব জিজ্ঞাসার পর উঠে দাঁড়াতে বলেছে, কেউ মেপে দেখার জন্যে, হাঁটতে বলেছে পায়ে খুঁত আছে কিনা দেখতে, কেউ কেউ আবার চুল খুলতে বলেছে, কতখানি লম্বা

দেখবে। ইনি সে-সব কিছুই না করে দুম করে এমন একটা প্রশ্ন করলেন যার জন্যে সে মোটেই তৈরি ছিল না। তবু সামলে নিয়ে মেয়েটি উত্তর দিলে, আমার পছন্দ শীত। কারণ তখন গরম পোশাক পরা যায়। তাতে নিজেকে বেশ স্বাস্থ্যবতী আর সুখী মনে হয়। আর খেতে পারা যায় বেশি। রাত বড়ো হয়। কম্বল ঢেকে ঘুমনো যায় আরামে—'

চেতন সিং ঘাড় বাঁকালেন,

'হয়নি—'

দ্বিতীয় মেয়েটিকে তিনি সেই একই প্রশ্ন করলেন। 'বল তো কোন্ ঋতু তোমার পছন্দ?'

আগের মেয়েটি ফিরে গিয়ে প্রশ্নটি ফাঁস করে দিয়েছিল। অভিভাবকেরা শুনে খানিক আশ্চর্যই হয়েছিল। কী রকম বেয়াড়া প্রশ্ন রে বাবা! মাথা নেই, মুণ্ডু নেই, এ রকম বোকা-বানানো প্রশ্নের কোনো মানে হয়? চেতন সিং-এর মাথার ঠিক আছে তো! অভিভাবকেরা বেশ বিরক্ত। কিন্তু নিরুপায়। কন্যাদায় বলে কথা! ছেলের বাবা মেয়েকে বাজিয়ে নেবেন বই-কি।

দ্বিতীয় মেয়েটি তৈরি হয়েই ছিল। সে চটপট উত্তর দিলেঃ

'বর্ষা ঋতু। বাড়ির টিনের ছাদের উপর বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটাব ঝমাঝম শব্দ শুনতে আমি ভীষণ ভালোবাসি। বৃষ্টি হলে ধরণী শীতল হয়। চারদিক সজীব আর সবুজ হয়ে ওঠে। সবজিব বাগানের দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। বর্ষাই ঋতুরাণী।'

'বেশ। তুমি এস।' তিনি সেইভাবে ঘাড় নাড়লেন। হযনি।

তিন নম্বর মেয়েটি তড়বড়ে। দেখতে সুন্দর। পোশাকও তেমনি। সে ঘরে ঢুকেই বললে, 'গরম—গরম কালই আমার পছন্দ। তখন শীত নেই, বর্ষাকালের মতো কাদা জলে পথঘাট প্যাচ-প্যাচ করে না, আরামে যেখানে খুশি যাওয়া যায়। হালকা পোশাকে শরীর ঝরঝরে থাকে, মন খুশিতে ভরে ওঠে। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করা যায়, কত আরাম'—

চেতন সিং ঘাড় নাড়লেন। তাঁকে খুশি মনে হল না।

চতুর্থ কন্যাটি একটি বড়ো লোকের আদুরে মেয়ে। বেঢপ মোটা। ঘরে ঢুকল থপ্ থপ্ করে। ও-ঘর থেকে এ-ঘরে আসতেই যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। ঘরে ঢুকেই গদির আসনে ধপ করে বসে পড়ল। হাত-পাখা ছিল, সেটা জোরে-জোরে চালিয়ে হাওয়া খেল খানিকক্ষণ। তারপর বললে ঃ

'কী যেন আপনার প্রশ্নটা? হ্যাঁ, ছয় ঋতুর মধ্যে কোন্ ঋতু আমার পছন্দ, তাই না? এ আবার একটা প্রশ্ন হল! ঋতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল বসন্ত। তখন ফুল ফোটে, কত ফল হয়। পাখি গান গায়। কী সুন্দর বাতাস বয়। তাই তো বসন্তকে ঋতুরাজ বলে!'

'বেশ। তুমি আসতে পারো।' তিনি খুশি হন নি।

এমনি করে সারাদিন কনে পছন্দ করার পালা চলল। মেয়েদের আর অভিভাবকদের দফায় দফায় আপ্যায়ন করা হল। দুপুরে আহারের ঢালাও ব্যবস্থা ছিল। আহারের পর দুঘণ্টা বিরতি। জায়গা প্রচুর। আলাদা-আলাদা ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সবাই বিশ্রাম নিলেন। তারপর আবার শুরু হল কনে পছন্দ করার পালা।

চেতন সিং-এর সেই একই প্রশ্নঃ

'ছয় ঋতুর মধ্যে কোন্ ঋতু তোমার পছন্দ?'

এখন আর কেউ ঘাবড়ে যায় না। প্রশ্নটা তো সকলেই জেনে গেছে। বাকি মেয়েরা নিজের নিজের উত্তরটা

যেন মুখস্থ করে রেখেছিল। প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে লাগল। বেশির ভাগ মেয়েই বসন্ত ঋতু বললে। শীত বাদ গেল না। গ্রীষ্ম বললে কম মেয়ে। বর্ষা অনেকেই। শরৎ পছন্দ করল বাকি মেয়েরা। তারা আনন্দের সঙ্গে বললে 'শরৎ পুজোর ঋতু', তখন আকাশে নানা রঙের মেঘ ঝলমল করে। নতুন পোশাক পরে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘোরা যায়। অন্য ঋতুর চেয়ে এই ঋতুটাই সবচেয়ে ভালো।'



চেতন সিং সব মেয়ের জবাবই শুনলেন। অভিভাবকেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন— কার মেয়েকে তাঁর পছন্দ হয়েছে জানবার জন্যে তাঁরা বেশ চঞ্চল। চেতন সিং কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর গিয়ে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি— আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর কোনো মেয়েই দিতে পারেনি। আমাকে আবার নতুন করে ছেলের জন্যে কনে খুঁজতে হবে—'

অভিভাবকেরা অবাক হয়ে গেলেন তাঁর কথা শুনে। একজনের উত্তরও ঠিক হয়নি তা কি হতে পারে? মাত্র ছ'টা ঋতু। আর এত মেয়ে? তাজ্জব ব্যাপার! তাঁরা সকলে বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন।

হল না। কাউকেই পছন্দ হল না চেতন সিংয়ের। এরকম মেয়ে তাঁর চলবে না। চেতন সিং আবার কনে খুঁজতে বেরুলেন। ঘুরতে ঘুরতে সেদিন গিয়ে হাজির হলেন এক পুরনো বন্ধুর বাসায়। বন্ধুটি গরিব, বাসা এক সরু গলির মধ্যে একটা ভাঙা বাড়িতে। দিন আনে দিন খায়। কোনো মতে সংসার চলে এই আর কী।

অনেকদিন পরে ধনী বন্ধুকে দেখে দীনদয়াল সিং তো ভীষণ অবাক। নড়বড়ে চৌকি, মাথার কাছে ময়লা বিছানা গুটোনো। দিনের বেলাতেও আলো ঢোকে না ঘরে। চৌকি পরিষ্কার করে তার উপর আসন পেতে দিয়ে করুণ মুখে দিনদয়াল বললে, 'চেতন, তোমাকে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার মতো গরিবের ঘরে তোমার পায়ের ধুলো পড়ল এ আমার ভাগ্য। বলো, তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি?'

চেতন সিং বললেন, 'শুনেছি তোমার একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে। তাকে একবার দেখব। ছেলের বিয়ের জন্যে মেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছি—'

'তুমি তো রাজকন্যা পেতে পারো বন্ধু।' দীনদয়াল বললে, 'আমার মেয়ে কি তোমার ছেলের উপযুক্ত হবে?'

'সে আমি বুঝব। তাকে আসতে বলো—'

কিছুক্ষণ পরে সুশীলা এল। সাধারণ সাজগোজ। দেখতে মোটামুটি। চেতন সিংকে নমস্কার করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চেতন সিং আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে নিলেন। ছেলের সঙ্গে মাননসই হবে। এখন তাঁব প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। বেশ মিষ্টি স্বরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, মা, বল তো, ছয় ঋতুর মধ্যে কোন্ ঋতু তোমার পছন্দ?'

সুশীলা বলল, 'দেখুন, ছয় ঋতু হল প্রকৃতির আদরের ছয় কন্যা। তাদের রূপ ও গুণের তুলনা নেই। এক-এক ঋতুর এক-এক রকম রূপ আর এক-এক রকম গুণ। তাদের প্রত্যেকেরই রূপে-গুণে মুগ্ধ মানুষ আলাদা করে বিচার করা যায় না— তাই আমি ছ'টি ঋতুই পছন্দ করি।'

'চমৎকার।' চেতন সিং আনন্দে বলে উঠলেন, 'এমন সুন্দর উত্তর কোনো মেয়েই দিতে পারেনি। আমার উত্তরের সঙ্গে মিলে গেছে। দীনদয়াল, আমি তোমার মেয়েকেই আমার ছেলের বউ করব। দিন ঠিক করো। বিয়ের সব খরচ আমার।'

দীনদয়াল ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

চেতন সিং তার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'কিচ্ছু ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তো আছি। ছেলেকে নিয়ে বিয়ের দিন আসব। এখন চলি—'

বেশ জাঁক করেই ছেলের বিয়ে দিলেন চেতন সিং। সুশীলা এল তাঁর বাড়িতে ছেলের বউ হয়ে। সুখেই দিন কাটছিল। ঝি-চাকরের হাতে সংসারের ভার যেমন ছিল তেমনিই রইল— সুশীলা শুধু দেখাশোনা করত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে তার নজর ছিল খুব; আর রান্নার সময় একটু তদারকি করত,— দু একটা বিশেষ পদ নিজে রাঁধত। স্বামী আর শ্বশুরের সেই রান্না খুব ভালো লাগত।

এইটুকু কাজ ছাড়া সুশীলার হাতে সময় থাকত অঢেল। খেলার বয়স তার চলে যায়নি। রোজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তার সঙ্গে খেলতে আসত বড়োলোক প্রতিবেশীর সমবয়সি মেয়েরা— তারা কেউ বউ, কারো বা বিয়ের কথা চলছে। পাঁচটা কড়ি নিয়ে 'পাঞ্চা' খেলত সকলে। মারওয়ারের ঘরে ঘরে চালু ছিল খেলাটা। বড়োলোকের বাড়িতে কড়ির বদলে সোনার গোল গোল পুরু চাকতি দিয়ে খেলা হত বেশি। টাকার মতন গড়ন চাকতিগুলোর। একদিন সারাটা দুপুর খেলা চলল। এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল সবাই। খেলা ভেঙে গেল। প্রতিবেশিনীরা চলে যাবার পর সুশীলা দেখল চাকতিগুলো পড়ে রয়েছে। সে কুড়িয়ে নিল। টাকা রাখার ছোট্ট একটা থলি ছিল তার। চাকতিগুলো তার ভেতরে পুরে কোমরে গুঁজে রাখল।

সেইদিনই, সন্ধেবেলা শোনা গেল গাঁয়ে ডাকাত পড়বে। মাঝে মাঝেই এরকম হয়। ওরা আসে, দলে অনেক ডাকাত থাকে, মশাল হাতে হই-হই করে ঢুকে পড়ে গাঁয়ে। সামনে যা পায় তুলে নিয়ে চলে যায়। বাধা দিলে বিপদ। তাদের কাছে লাঠি ছোরা ভোজালি সবই থাকে। ডাকাতরা আসছে শুনে চেতন সিং পরিবারের সবাইকে ডেকে বললেন, 'দেখ, বিপদ আসার আগেই সাবধান হওয়া ভালো। বলা যায় না, ওরা আমাদের বাড়িতেও ঢুকতে পারে। তোমাদের কাছে সোনাদানা যা আছে, সব আমাকে দাও, আমি সেগুলো লোহার সিন্দুকের মধ্যে ঢুকিয়ে গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখি সহজে যেন নাগাল না পায়—'

মেয়েরা সব অলংকার এনে চেতনের হাতে তুলে দিলে। কিন্তু সুশীলা তা করলে না। বউমার আচরণে চেতন সিং খানিকটা অবাক হলেন বইকী।

'কী হল?' তিনি বললেন, 'তুমি অলংকারগুলো আমাকে না দিয়ে তোমার থলিতে পুরছো কেন?'

সুশীলা অনুনয় করে বললে, 'বাবা, এগুলো আমিই সঙ্গে রাখব—'

'সে কী! পথে যদি ডাকাতের হাতে পড়ো?'

সুশীলা বললে, 'এক ডাকাতের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে যদি আর-এক ডাকাতের পাল্লায় পড়ি। তাহলে বুঝতে হবে আমাদের ভাগ্য খুবই খারাপ। আমার মনে হয় না এ-রকম কিছু ঘটবে—'

'ঠিক আছে। চল, এবার বেরিয়ে পড়ি।'

তিনটি তেজি ঘোড়া সাজ পরে তৈরিই ছিল। বাপ-ছেলে এক-ঘোড়ায়, সুশীলা ও এক মেয়ে দ্বিতীয় ঘোড়ায়, তৃতীয় ঘোড়ায় বাকি দুই মেয়ে। সকলেই ঘোড়া ছোটাতে ওস্তাদ। তিন ঘোড়া ছুটল টগবগিয়ে রাতের অন্ধকারে। সারা রাত ঘোড়া ছুটল। সকালবেলা তারা এমন এক জায়গায় এসে পৌছুল যেখানে বাড়ি-ঘর নেই, ফাঁকা জায়গা। শুধু একটা ছোটো সরাইখানা চোখে পড়ল। মারওয়ার অনেক পিছনে ফেলে এসেছে তারা, ডাকাতের ভয় আর নেই, কিন্তু গন্তব্যস্থল এখনো বেশ খানিকটা দূরে। তারা তখন এত ক্লান্ত যে সরাইখানায় আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। সরাইখানাটাও তেমনি। মাথা গোঁজবার জায়গা আছে বটে, কিন্তু পেটে দেবার মতন দানাপানি বিশেষ নেই। খাবার যা আছে তা মুখে দেওয়া যায় না। অনেকদিনের বাসি।



এই এক অসুবিধে দেখা দিল। খাবার তো চাই। মেয়েগুলো খিদেয় একেবারে নেতিয়ে পড়েছে।

ঘোড়া তিনটেকে ঘাস আর পুকুরের জল খাওয়ানো হল। কিন্তু নিজেদের জন্যে খাবার কই? তাঁরা কী খাবেন?

সরাইখানার বুড়ো মালিক বললে, 'শহর এখান থেকে বেশি দূরে নয়। ঘোড়া ছুটিয়ে গেলে আধ ঘণ্টার পথ। সেখান থেকে খাবার কিনে আনতে পারেন। টাটকা ফলও পাওয়া যাবে।'

পরামর্শটি মনে ধরল চেতন সিং-এর। কিন্তু টাকা? টাকা কই? এ তো বিভুঁই! কেই-বা তাঁকে চেনে। কেনই-বা ধার দেবে? অথৈ জলে পড়ে গেলেন তিনি।

'বাছারা, তোমাদের কারো কাছে সোনা-দানা কিছু আছে?'

ছেলেমেয়েরা মুখ নিচু করে রইল। বৃথাই জিজ্ঞেস করা। তিনি নিজেই তো সব সোনা ও অলংকার তুলে রেখে এসেছেন লোহার সিন্দুকে ডাকাতদের ভয়ে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন একেবারে খালি হাতে। এখন উপায়?

'বাবা, আমি দিচ্ছি।'—সুশীলা তার থলি থেকে একটা মোটা সোনার পাত বার করে দিলে, 'এই নিন। এটা বিক্রি করে আপনার ইচ্ছামতন খাবার কিনে আনুন—'

'বাঁচালে মা।'

চেতন সিং তখনই ঘোড়ায় চড়ে শহরের দিকে রওনা হলেন। ঢুকে এক রত্ন-ব্যবসায়ীর দোকান দেখতে পেলেন। দোকানের একদিকে রত্ন সাজানো আছে থরে থরে, অন্যদিকে রাশি রাশি সোনার অলংকার। মস্ত দোকান। ছিমছাম। দোকানে যে লোকটি বসে আছে সে কিন্তু অতিশয় ধূর্ত। তার একটা অন্য পরিচয়ও আছে। শহরের লোক তাকে চেনে ঠগ বলে। সে নাকি লোক ঠকিয়েই এত বড়ো কারবার ফেঁদেছে, মস্ত বাড়ি করেছে। ওর কাছে কেনা-বেচা করতে যাওয়া মানেই ঠকে আসা।

চেতন সিং এসব কথা কী করে জানবেন? তিনি তো সবে শহরে পা দিয়েছেন। ঝকঝকে দোকান দেখে ঢুকে পড়েছেন। মালিক তাঁকে দেখে আপ্যায়নে গলে গেল, 'আসুন আসুন শেঠজি, কৃপা করে বসুন। বলুন, আপনার সেবার জন্যে কী করতে পারি?'

চেতন সিং বললেন, 'দেখুন তো এ জিনিসটা, কী রকম দাম হতে পারে—'

'এটা?' সোনার পাত হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল চতুর লোকটি। 'ঠিক সোনার মতন বটে। কে আপনাকে দিয়েছে? এটা সোনা নয়। এর দাম কানাকড়িও হবে না।'

'বলেন কী?' চেতন সিং-এর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল ঃ 'তাহলে এটাকে আর বয়ে নিয়ে যাই কেন তবে। থাক্, আপনার কাছে। টাকার দরকার ছিল বলেই ওটা নিয়ে বেরিয়েছিলুম। এখানে নতুন এসেছি। এখন কার কাছেই বা ধার পাই! অথচ খাবার কিনে নিয়ে যেতে না পারলে ছেলেমেয়েগুলো না খেয়ে থাকবে—'

'আ-হা রে।' দোকানের মালিক তাঁর দুঃখে গলে যায় ঃ 'আমাদের দেশে এসে আপনার ছেলেমেয়েরা না-খেয়ে থাকবে, তা কখনও হয়? আপনি এই-যে নকল সোনার পাতটা আমাকে দিলেন, যত কমই হোক তার একটা দাম তো আছে। তাছাড়া বিনা-দামে আমি নেব কেন? আমি একজন সৎ ব্যবসায়ী, সোনা কেনা-বেচা করাই আমার ব্যবসা। সোনা না-হলেও এটা ধাতু তো বটে। এর যা দাম হতে পারে, তাই আপনাকে দিচ্ছি। এই নিন—'

সে পাঁচটি রুপোর টাকা দিলে। চেতন সিং অগত্যা তাই নিলেন। বাজার থেকে খাবার আর ফল কিনে সরাইখানার দিকে রওনা হলেন।

সকলে একসঙ্গে বসে খাবার খেল।

চেতন সিং বললেন, 'বউমা, এ বেলার খাওয়া তো মিটল, ওবেলার জন্যে কী করা যায় বলো তো?'

সুশীলা খুব অবাক হল কথা শুনে!

সে বললে, 'আপনি কী বলছেন বাবা! এক বেলার খাবার কিনতেই সব টাকা ফুরিয়ে গেল?'

'বেটি, ওটা বিক্রি করে মোটে পাঁচটা রুপোর টাকা পেয়েছিলাম। তা দিয়ে কত আর খাবার কেনা যায়—'

'মোটে পাঁচ টাকা! কী বলছেন আপনি?'

বিস্ময়ে হাবুডুবু খায় সুশীলা।

'হ্যাঁ মা।' চেতন সিং বললেন, 'বাজারে মস্ত সোনার দোকান। মালিক ওটা দেখে বললে, নকল সোনার পাত। পাঁচ টাকার বেশি দাম হয় না—'

'নকল সোনার পাত!—আশ্চর্য!' সুশীলা বললে, 'আমার কাছে আরও একটা পাত আছে। ও বেলার খাবারের জন্যে আপনার ছেলেকে সেই পাত দিয়ে বাজারে পাঠাচ্ছি, দেখি কী হয়। আপনি আরাম করুন।'

সুশীলা তার স্বামী বুধন সিংকে পাঠাল বাজারে। তবে পাতের গায়ে খুব ছোট্ট একটা চিহ্ন দিয়ে রাখল। বুধন সিং ঘোড়া ছুটিয়ে বাজারে এল। সেই একই ঝকঝকে দোকানটিতে ঢুকল। সে-ও ঠিক বাপের মতোই

ব্যবহার পেল দোকানের মালিকের কাছে। পাতটি খুব মনোযোগ দিয়ে উলটে-পালটে দেখল দোকানের মালিক। আর সেই কথাগুলোই সে বললে যা সে চেতন সিংকে বলেছিল। তার বলার ভঙ্গিটি এত ভালো যে তার কথায় বুধন সিং-এর একটুও অবিশ্বাস হল না। পাতটি রেখে মালিক তাকে পাঁচ টাকা দিলে। বুধন সিং ওই পাঁচ টাকায় রাতের খাবার কিনে সরাইখানায় ফিরে এল। বউকে সে ধমক দিয়ে বললে, 'কী-সব আজেবাজে জিনিস তোমার সাধের থলিতে ভরে এনেছো— পাঁচ টাকার বেশি যার দাম হয় না! ফেলে দাও লোহা-লক্কড়গুলো—'

'লোহা-লক্কড়! তাই বুঝিয়েছে বুঝি তোমাকে?' সুশীলা বললে, 'ঠিক আছে। কাল সকালে আমি বাজারে যাব। বুঝিয়ে আসব, সত্যি ওগুলো লোহা-লক্কড় কিনা—'

'তাই যেও।' বুধন সিং বললে, 'নিজের বোকামিটা তখনই ধরা পড়বে।'

পরের দিন সকালে শহরে যাবার জন্যে সুশীলা তৈরি হল। পোশাক একেবারে পালটে ফেলল। ছেলেদের মতন আঁটোসাঁটো চোস্ত আর লম্বা চুড়িদার পাঞ্জাবি পরল। তার উপর চমৎকার কাজ-করা ঝোলানো কোট, চুল-ঢাকা সুন্দর একটি পাগড়ি। দেখে মনে হল ঠিক যেন এক রাজপুত্তুর।

তেজি ঘোড়ায় চড়ে সে চলল শহরের দিকে। দোকানটা চিনতে তারও ভুল হল না। ঘোড়া থেকে নেমে সে গটগট করে ঢুকল দোকানে। চেহারা আর চাল-চলন দেখে দোকানদার ভাবল কোনো রাজ্যের রাজকুমারই



বা হবেন ইনি। তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করল দোকানদার। বসতে অনুরোধ করল। তরুণের জমকালো পোশাক-পরা সুশীলা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে গদির আসনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কোমরে হাত দিয়ে। গলার স্বর পালটে পুরুষালি ঢঙে সে বললে, 'এখন বসব না। খুব তাড়া আছে। আমি কিছু সোনার মুদ্রা কিনতে চাই। আপনার কাছে কি খাঁটি সোনার মুদ্রা আছে?'

'আছে। একেবারে খাঁটি সোনার মুদ্রা। কতগুলো চাই আপনার? দাঁড়ান দেখাচ্ছি—'

দোকানদার যখন সিন্দুক খুলে বাক্স খুঁজছে, সুশীলা তখন দোকানের ভেতরটি খুঁটে খুঁটে দেখছিল। ঝলমল করছে সব। শো-কেসে সারি সারি মুক্তো, হিরে, চুনি, পান্না, সোনার গয়না। হঠাৎ তার বুকের ভেতরটা দপদপিয়ে উঠল। একী দেখছে সে? চিনতে ভুল হয়নি। লম্বা কাচের বাক্সে শোয়ানো রয়েছে তারই চিহ্ন-করা সোনার পাত দুটি। পরপর দুটি কাচের বাক্সে দুটি সোনার পাত। একটি দিয়েছিল বাবাকে, অন্যটি স্বামীকে। দামি মনিরত্নের পাশে সে দুটিও শোভা পাচ্ছে। —পাঁচ টাকা করে দাম! নকল সোনা! লোহা-লক্কড়!

আরও খুঁটিয়ে দেখতে যাচ্ছিল সে, কাশির শব্দে ফিরে তাকাল। খাঁটি সোনার মুদ্রায় ভর্তি বাক্সটি খুলে তার সামনে মেলে ধরেছে দোকানদার।

'এই দেখুন হুজুর, আপনি যা চাইছেন, খাঁটি সোনার মুদ্রা—'

রাজকুমার-বেশী সুশীলা অবহেলায় ঝকঝকে মুদ্রাগুলির দিকে তাকাল, যেন এসব তার কতই দেখা আছে। তার মধ্যে থেকে কয়েকটি তুলে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। এক ফাঁকে তিনটি মুদ্রার গায়ে বিন্দুর মতোছোটো লাল রঙ লাগিয়ে দিলে।

'হুঁ। ভালোই। তা দাম কী রকম?'

তার দামি পোশাক আর সুন্দর চেহারা দেখে দোকানদারের আগেই মনে হয়েছিল এই খরিদ্দারটি রাজকুমার না হয়ে যায় না। তার উপর হেলাফেলা করে মুদ্রাগুলি নাড়াচাড়া করতে দেখে তার সেই ধারণা আরও পাকা হয়ে যায়। এমন খরিদ্দারের কাছে দাম একটু বাড়িয়েই বলা যেতে পারে। এই ভেবে সে এক-একটি মুদ্রার জন্যে মোটা টাকা দাম হাঁকল।

'আপনি কি এই দামেই বিক্রি করেন?' সুশীলা ধীর গলায় বললে, 'বড্ড কম মনে হচ্ছে—'

'ইয়ে— আজ্ঞে তা একটু কম হল বটে।' দোকানদার বললে, 'কিন্তু আমরা হলুম গিয়ে বনেদি কারবারি, এ তল্লাটে আমাদের জুড়ি আর কেউ নেই। খদ্দের ঠকানো আমাদের রীতি নয়। কেনাবেচা চলে একই দামে। তাই ঠিক কী দাম হওয়া উচিত তাই বলেছি।'

'বেশ। ভালো কথা। শুনে সুখী হলুম।' সুশীলা বললে, 'আচ্ছা, আমার এই তিনটি মুদ্রা একটু দেখুন তো—'

সে তিনটি সোনার মুদ্রা কোটের পকেট থেকে বার করল।

চতুর দোকানদার ওর মতলব খানিক আন্দাজ করতে পেরেছে। সে সাবধান হল। যাচাই করার ভান করে নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, 'এগুলো ঠিক খাঁটি জিনিস নয়—'

'আপনি কি ঠিক বলছেন?'

'বাঃ এতদিন কারবার করছি, কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা নকল তা চিনব না?'

'কিন্তু নকল জিনিস আমি সঙ্গে রাখি না।' সুশীলা বেশ গম্ভীর স্বরে বললে, 'যদি নকল হয়, তাহলে এগুলো আপনাকে এমনি দিয়ে দোব। আপনার পাশের দোকানদারকে ডাকুন তো—'

দোকানদার বিব্রত বোধ করল, কিন্তু পাশের দোকানদারকে ডাকতেও বাধ্য হল। দোকানদার এল। সে যাচাই করে বললে, 'হ্যাঁ, এগুলো খাঁটি। আর দাম ওই একই।'

'তাহলে যে দাম বলেছেন,' দ্বিতীয় দোকানদার চলে যাবার পর, সুশীলা আদেশের স্বরে বললে 'সেই দাম নিন। বার করুন টাকা—'

অগত্যা সেই বেশি টাকা দিয়েই মুদ্রা তিনটি কিনতে বাধ্য হল দোকানদার।

'ওই কাচের বাক্সে যে তিনটে সোনার টাকা আছে,' সুশীলা তেমনি চড়াসুরে বললে, 'ওগুলো আমার।'

'তার মানে? কী করে একথা বলছেন?'

সুশীলা বললে, 'মুদ্রা তিনটি বার করলেই বুঝতে পারবেন। আমার চিহ্ন দেওয়া আছে। লাল ফুটকি—'

'তাই নাকি?' মালিক মুদ্রা তিনটি বার করল। দেখল, ওর কথা সত্যি। লাল ফুটকি আছে।

'আমার জিনিস আরও রয়েছে আপনার কাছে। ওই সোনার পাত দুটো দেখি—'

'ও-দুটোও আপনার নাকি?' মালিক ব্যঙ্গের সুরে বললে।

'নিশ্চয়—'

'কী করে বলছেন? প্রমাণ কী?'

'যেভাবে আগের তিনটে প্রমাণ করলুম। চিহ্ন আছে। দেখলেই বুঝতে পারবেন। ও দুটো আপনি পেয়েছেন আমার পরিবারের দুজনের কাছ থেকে। একজন এসেছিল কাল সকালে, আর একজন বিকেলে। তাদের আপনি ঠকিয়েছেন। আপনার জালিয়াতি ধরা পড়ে গেছে। ওগুলো যদি ফেরত না দেন, তাহলে এক্ষুনি আমি কাজির কাছে যাব। আপনি যাতে জালিয়াতির সাজা পান, তাই করা হবে। আর জালিয়াতির সাজা মানে জানেন তো? মেরে ফেলে গাছের ডালে টাঙিয়ে রাখা হয়—'

কাজির কাছে যাবে শুনে মালিক ভয় পায়। কাঁপতে থাকে। সুশীলা আড়চোখে তা দেখল। খুশি হল মনে মনে। ওষুধ ধরেছে।

সুশীলা বললে, 'তাহলে কাজির কাছেই যাই—'

মালিক দুহাত জোড় করে করুণ স্বরে তাড়াতাড়ি বললে, 'না না, ও-কাজ করবেন না। আমি আপনার সোনার পাত আর সোনার টাকা তিনটি ফেরত দিচ্ছি।'

সে বাক্স খুলে ওগুলো ফেরত দিলে।

'সব ব্যাপারটা এখানেই মিটছে না।' সুশীলা কোটের এক পকেটে পাত দুটো রেখে, অন্য পকেট থেকে সোনার দুটো টাকা বার করে, মোট পাঁচটা, মালিকের সামনে ধরল : 'এগুলো বিক্রি করব। আপনি আগের দামই দিন—'

মালিক ঢোঁক গেলে। তার গলা শুকিয়ে কাঠ।

'হুজুর, মারা যাব। অত কাঁচা টাকা আমার কাছে নেই। আপনি দয়া করে অন্য দোকানে যান—'

'কেন যাব?' সুশীলা ফের চড়া সুরে বললে, 'আপনার সঙ্গে দর ঠিক হয়েছে, আপনিই দেবেন। বাজারের মধ্যে সেরা বনেদি দোকান, এসব কথা তো আপনি নিজেই বলেছেন। সিন্দুক খুলুন, আমি দেখতে চাই কাঁচা টাকা আছে কিনা। নইলে আমাকে কাজির কাছেই যেতে হবে, মনে রাখবেন। তার বিচারে কী সাজা হবে, তা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে? পঞ্চাশ ঘা বেত খেতে হবে বাজারের লোকের সামনে। ঠিক করুন, কোন্‌টা চান। আপনি সিন্দুক খুলবেন নাকি আমি কাজির কাছে যাব?'

মালিক কাঁপতে কাঁপতে সিন্দুক খুলল। দেখা গেল, সিন্দুকভর্তি কাঁচা টাকা। ঝলমল করে উঠল সকালের রোদে।

'ওই তো! দিন—'

মালিক গুনতে বসল। বড়ো একটা থলি ভর্তি হয়ে গেল কাঁচা টাকায়। সে থলির মুখটা বেঁধে সেটা সুশীলার হাতে দিল। সুশীলা চলল বাজারের ভেতরে। সারি সারি দোকান। সুশীলা নানা-রকম খাবার কিনল। ফলের বাজারে গিয়ে ফল কিনল এক ঝুড়ি। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এল সরাইখানায়।

'সাবাস বেটি!' চেতন সিং তার কাহিনী শুনে দারুণ খুশি ঃ 'বুদ্ধিতে তুই আমাকে, আমার ছেলেকেও টেক্কা দিয়েছিস। তোর বুদ্ধির তুলনা হয় না। তুই আমার সংসারের মা-লক্ষ্মী। এসব টাকা তোর। তুই ইচ্ছামতো খরচ করিস। আমি জানি তুই কখনও বাজে খরচ করবি না—'

সুশীলা বললে, 'বাবা, একটা কথা বলব?'

'বল মা—'

সুশীলা তখন বললে, 'আমরা ফিরে না-গিয়ে এখানেই তো থাকতে পারি। চিতোরে আমাদের বাড়িতে অনেক টাকা আর সম্পত্তি আছে। তার কিছু খরচ করে এখানে আমরা একটা বাড়ি করতে পারি। আস্তে আস্তে সব জিনিস ওখান থেকেআনা যাবে। আর আপনি তো ব্যবসা ভালোই বোঝেন। আপনি আর আপনাব ছেলে দুজনে মিলে ব্যবসা শুরু করলে দিনগুলো বেশ সুখেই কাটবে। ডাকাত-দলের ভয়ে যেখানে-সেখানে ছুটোছুটি করতে হবে না।'

'চমৎকার বুদ্ধি দিয়েছিস, মা।' চেতন সিং আবার তারিফ করলেন ঃ 'তাই হবে, মা। এবার থেকে সব কাজে তোর কাছেই বুদ্ধি নেব। এখন চল্, খেতে বসি—'

সকলে মনের আনন্দে খেতে বসল।



একজন খাঁটি রাজপুত



রাজস্থানের এক রাজার ছেলে বিজয় সিং। তার বিয়ে হয়েছে, এক ছেলে। বিজয় সিং খুব সাহসী আর উচিত-বলিয়ে। ছোটো-বড়ো সকলের সঙ্গেই তার একরকম ব্যবহার। মুখের উপর সত্যি কথা বলতে কখনো সে পিছপা হত না।

এই কারণে রাজা তার উপর ভীষণ বিরক্ত। রাজার কাছের লোক যারা, মন্ত্রী বা সেনাপতি, তারা ঠিক সোজাসুজি না-হলেও পাকে-প্রকারে রাজকুমারের আচরণের কথা তুলতেন রাজার কানে। মন্ত্রীর কী কাজ, সেনাপতি সৈন্যদের ঠিকমতো তৈরি করছেন কিনা— এসব ব্যাপারে তার নাক-গলানো কেন? এমন কী কোনো কাজে কেউ সামান্য ভুল করলে, বিজয় সিং তাকে এমন ধমক দিত যে সে বেচারির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যেত। সব জায়গায় সে টো টো করে ঘুরে বেড়াত, যার-তার বাড়িতে ঢুকে পড়ত, কারো কোনো অভাব-অভিযোগ থাকলে সে সব মিটিয়ে দিত।

'তাঁকে সকলেই ভালোবাসে, আমরাও ভালোবাসি', মন্ত্রী বলেন, 'কিন্তু মুশকিল বাধিয়েছে তাঁর চোটপাট আর কথাবার্তা। দুমদাম কথা শুনিয়ে দেন। ছোটো বা বড়ো এসব তিনি গেরাহ্যি করেন না। ফলে আমাদের মান থাকে না—'

'বিজয় সিং, শোনো।'

রাজা ছেলেকে একদিন ডাকলেন।

'বলুন—'

বিজয় সিং রাজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

'আমি তোমার সম্বন্ধে নানান অভিযোগ শুনছি—'

'কী রকম অভিযোগ?'

'ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে শুনেছি তুমি সকলের মুখের উপর কথা বল। রাজার ছেলে বলে তুমি অপরকে ছোটো করবে এটা তো ঠিক নয়—'

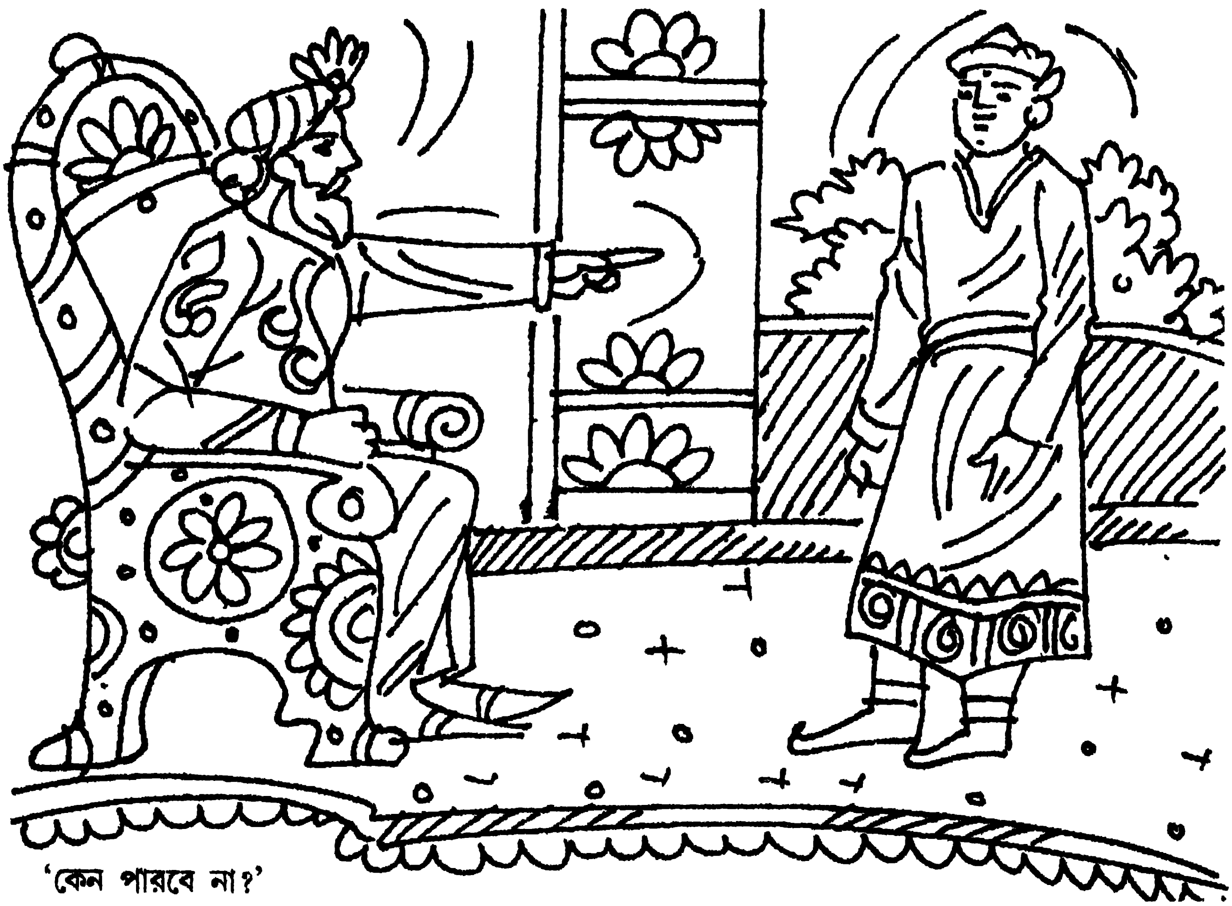
'বাবা, বুঝতে পেরেছি কারা তোমার কাছে অভিযোগ করেছে। ওরা অসাধু রাজপুত। মিথ্যেবাদী। ওরাই রাজ্যের সর্বনাশ করবে। বাবা, আমি মিথ্যা কথা একদম সহ্য করতে পারি না। রাজপুতদের জবান তো একটাই। তাই না বাবা?'

রাজা বললেন, 'তুমি ঠিক কথাই বলেছ। রাজপুতদের জবান একটাই হওয়া উচিত। কিন্তু বিজয়, এ রাজ্যের রাজা আমি, আমাকে ডিঙিয়ে মন্ত্রী বা সেনাপতির কাছে কাজের হিসাব চাওয়া তোমার বাড়াবাড়ি। এটা আমি পছন্দ করি না—'

'মন্ত্রী কী করেন, জানো বাবা? আফিং খেয়ে সারাদিন ঝিমোন। আর সেনাপতি? তিনি তো টো-টো করে বেড়ান। তাই ওঁদের কাছে কাজের হিসেব চেয়েছিলাম। মন্ত্রী আর সেনাপতি হচ্ছেন রাজার সবচেয়ে বড়ো সহায়। একজন বুদ্ধি দেবেন, আর একজন শক্তি। দেখেশুনে আমার মনে হয়েছে ওঁরা কাজে অবহেলা করছেন, তাই—'

রাজামশাই তার কথা শেষ হতে দিলেন না। বেশ রেগে গেলেন। ছেলের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'খবরদার, আমার সামনে তুমি ওঁদের সমালোচনা করবে না। এ হল বেয়াদপি। তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। রাজ্যে শান্তি রয়েছে, তুমিই অশান্তি ডেকে আনছো। ওঁরা মনে দুঃখ পেয়েছেন। তোমার উচিত ওঁদের কাছে ক্ষমা চাওয়া। কাল যখন দরবার বসবে, তুমি ওঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে।'

'আমি তা পারব না, বাবা।' বিজয় সিং বললে, 'এমন আদেশ তুমি আমাকে কোরো না—'



'কেন পারবে না?'

'সেরকম লোক ওঁরা নন—'

'ফের ওভাবে কথা বলছো? আমার আদেশ, তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে এবং কালই—

'বাবা, অসম্ভব।'

'তুমি আমার আদেশ মানছ না, এত সাহস?' রাজা মশাই রাগে একেবারে টং হয়ে গেলেন। চিৎকার করে বললে, 'এমন অবাধ্য ছেলের এ রাজ্যে থাকার কোনো অধিকার নেই। এখনই বেরিয়ে যাও। তোমাকে আমি ত্যাজ্যপুত্তুর করলাম। শুনতে পেয়েছ, আমি কী বলছি? আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না—'

'তাই হোক, বাবা। আমি চলে যাচ্ছি।'

বিজয় সিং ছেলে আর বউকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে কিছুই নিল না। দীর্ঘ পরিক্রমায় সে সারাদিন হেঁটেছে আর রাত হলে কারো বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। যখন যা জুটেছে তাই একটুখানি নিজে খেয়েছে, বাকিটা ছেলে আর বউকে দিয়েছে। দেশের লোকেরা সেকালে খুবই অতিথির সেবা করত। অতিথিকে বাড়িতে থাকতে দেওয়া আর খেতে দেওয়া তারা পুণ্য কাজ বলে মনে করত। বিজয় সব সময় অতিথির মতো থাকত না। চাষিদের বাড়িতে গিয়ে উঠলে সে তাদের চাষের কাজে লেগে যেত। মাটি কোপাত, ফসল তুলে আনত। এজন্য নিজেকে একটুও ছোটো মনে করত না। রাজকুমারী যমুনা চাষির বউয়ের রান্নার কাজে হাত লাগাত, এটা-সেটা এগিয়ে দিত। উনুন ধরাতে গিয়ে ফুঁ দিতে দিতে তার চোখ-মুখ লাল হয়ে যেত। তবু সেই কাজেই সে আনন্দ পেত। ছেলে জয় সিং খুবই ছোটো, ছ-বছর বয়স, টুকটুকে ফর্সা, মা-বাবার নয়নের মণি। সে চাষির সমবয়সি ছেলের সঙ্গে দাপিয়ে খেলা করত। পাড়ার ছেলেরাও এসে জুটত খেলতে। ওরও দিন কেটে যেত আনন্দে।

বিজয় সিং এক জায়গাতে বেশিদিন থাকত না। বেরিয়ে পড়ত আবার। এইভাবে যেতে যেতে তারা একদিন জয়সলমীরে পৌঁছুল। ভারী সুন্দর লাগল জায়গাটি। দিনের বেলা হইহই করে কাটল। বেলা যত পড়ে আসছিল ততই ভাবনা বাড়ছিল। কোথায় যাবে? রাস্তা একেবারে ফাঁকা। আর সেজন্যেই জয়সিং মনের আনন্দে ছুটে ছুটে খেলা করছিল পথের উপর। হঠাৎ একটা ঘোড়া এসে দাঁড়াল তার সামনে। ভয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল। বিজয় সিং ছিল একটু দূরে, সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ছেলেকে কোলে তুলে নিল।

ঘোড়ার লাগাম টেনে সওয়ার হয়ে বসেছিলেন যিনি, তিনি জয়সলমীরের রাজা। পিছনে তাঁর সৈন্য। শিকার করে ফিরছিলেন। বাপ-ছেলের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। যেন দেবদূত। বউটিও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন অপ্সরী। ভারী ভালো লাগল তাঁর।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তোমরা?'

'পথিক—'

'কিন্তু এখানে তো কোনো আশ্রয় পাবে না। বাড়ি-ঘর নেই। ফাঁকা জায়গা।'

'আজকের রাতটা পথেই কাটাব। কাল সকালে কোথাও আশ্রয়ের খোঁজ করব—'

'কিন্তু এখানে যে জানোয়ারের আসা-যাওয়া আছে। তোমার ভয় করবে না?'

'আমি ভয় পাই না—'

'অপদেবতারা রাতের বেলা খেলা করতে আসে।'

বিজয় সিং বললে, 'আমি তাদের সঙ্গে খেলা করব—'

'বটে!' রাজা বললেন, ' তোমরা আমার সঙ্গে প্রাসাদে চল। আশ্রয় পাবে। আমি এখানকার রাজা।'

তিনি জয়সিংকে তুলে নিলেন নিজের ঘোড়ায়। আর, এক সৈন্য তার ঘোড়া ছেড়ে দিলে বিজয় সিং ও যমুনার জন্যে। সৈন্যটি অন্য একজনের ঘোড়ায় চড়ল।

সকলে প্রাসাদে গিয়ে পৌঁছুল।

সে-রাত্রে কোনো কথা হল না। রাজা ওদের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা শুয়ে পড়ল। রাজা নিজের মহলে চলে গেলেন।

সকালবেলা রাজা ডেকে পাঠালেন। বিজয় সিং এল।

'কী নাম তোমার?'

রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

'বিজয় সিং—'

সে উত্তর দিলে।

'বাবার নাম?'

'দুর্জয় সিং—'

'মানে—রাজা দুর্জয় সিং?' তিনি আনন্দে বলে উঠলেন, 'তোমাকে তাই রাজকুমার বলে মনে হচ্ছিল। দুর্জয় সিং-এর সঙ্গে আমার অনেকদিনের বন্ধুত্ব। তুমি আমার বন্ধুর ছেলে। বাঃ বেশ হল। দেখ বিজয়, তুমি যখন আমার কাছে এসেই পড়েছ, এখানেই থাকো। যতদিন খুশি নিজেদের বাড়ি মনে করেই থাকো। কোনো সংকোচ কোরো না—'

'আজ্ঞে, মনে করতেই হচ্ছে।' বিজয় সিং বলল, 'চুপচাপ বসে থাকা আমার পোষায় না। আমি কাজ চাই। এমন কাজ যাতে সাহস দরকার। এমন-কী মরে যাবার ভয়ও আছে। দিতে পারেন সেই রকম কাজ?'

'পারি। কিন্তু বড্ড দুঃসাহস হয়ে যাচ্ছে না?'

'তা হোক। এ রকম কাজই আমি চাই। আর তার জন্যে প্রতিদিন এক হাজার টাকা আমাকে দিতে হবে—'

'বেশ তাই পাবে। এক নয় দু হাজার টাকা পাবে প্রতিদিন। আমার দাদুভাইকে একটু ডেকে দাও তো? তোমার ছেলেটি ভারি সুন্দর দেখতে। ওকে একটু আদর করব।'

জয় সিং এল। রাজা তার হাতে একশোটি মোহর দিয়ে আদর করলেন, 'বেঁচে থাকো দাদুভাই। একশো বছর পরমায়ু হোক তোমার—'

প্রতিদিন দুহাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে এক অতিথিকে, হোক সে বন্ধুর ছেলে, বসে-বসে এই টাকা সে পাচ্ছে— এসব ভালো চোখে দেখল না দরবারের মানী লোকেরা। তাদের ফিসফিসানিতে রাজা কান দিলেন না। তিনি বুঝতে পেরেছেন কোনখানে ওদের লেগেছে। ঈর্ষা ছাড়া আর-কী। তাঁর ভাঁড়ারে অনেক টাকা, দশ পুরুষ ধরে ঢালাও খরচ করলেও শেষ হবে না। তা থেকে বন্ধুর ছেলেকে রোজ দু-হাজার টাকা দিলে তা নদী থেকে এক ঘটি করে জল তোলার মতো ব্যাপারই হবে। যা-খুশি বলুক গে ওরা।

তিনি যেমন টাকা দিতে আদেশ করেছিলেন কোষাগারের রক্ষককে, সে তা পালন করে যেতে লাগল।

দিন কাটছিল। রাজার সুশাসনে কোথাও কোনো অশান্তি নেই। প্রজাদের উপর তাঁর সুনজর আছে। দরবারে রোজ প্রজাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। কারো কোনো অভাব বা অভিযোগ থাকলে তিনি তা মিটিয়ে দেন। অভাবী প্রজাদের দান করেন। অতিথি এলে যত্ন করেন। গাইয়ে বা ছবি-আঁকিয়ের গুণের পরিচয় পেলে সাদরে দরবারে ঠাঁই দেন। বেকার নেই। ভিখিরি নেই। সকলেই আছে মনের সুখে।

শুধু বিজয় সিং মনের মতন কাজ না পেয়ে বেকার বসে আছে। বউ যমুনা আর ছেলে জয়সিংকে নিয়ে তার দিন কাটে। আর, রোজ পায় দু-হাজার টাকা। তার নিজেরই ভালো লাগে না। রোজ রোজ বসে বসে অন্যের টাকা আত্মসাৎ করতে কারো ভালো লাগে?

বিজয় সিং ভাবছিল সে টাকা নেওয়া বন্ধ করবে কিনা। এমন সময় ঘটল সেই অদ্ভুত ঘটনাটা।

সকালবেলা রাজা বিজয়কে বলেছিলেন, 'অনেকদিন তুমি বাড়ি-ছাড়া, তোমার বাড়ি যেতে ইচ্ছা করে না? অবশ্য আমি খবর পেয়েছি তোমার বাবা ভালোই আছেন—'

'তবে আর কী।' বিজয় সিং বলেছিল, 'আমার বাড়ি যাবার দরকার নেই। বাবার জন্যে মন কেমন করে বটে, তবে আপনাকে তো বলেছি— তিনি আমাকে ত্যাজ্যপুত্তুর করেছেন, বাড়ি গেলে তিনি খুশি না-ও

হতে পারেন। তাছাড়া আপনার অনেক নুন খেয়েছি, বিনিময়ে আপনার জন্যে কিছু করতে না পারলে আমি শান্তি পাব না। সুযোগ পেলে আমি আমার যোগ্যতা প্রমাণ করতে কার্পণ্য করব না একটুও। সেই সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করে আছি আমি।'

'দেখা যাক কবে সে-সুযোগ আসে—'

বিকেল থেকেই আকাশে মেঘ জমেছিল। ভীষণ গুমসানি। সন্ধের পর সারা আকাশ জুড়ে মেঘের আনাগোনা। কালো কালো জমাট-বাঁধা মেঘ। আর, কী গর্জন! কানে যেন তালা লেগে যায়। সাঁই সাঁই করে ঝড় উঠল। গুড় গুড় করে মেঘ ডাকল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। বড়ো বড়ো ফোঁটায় নামল বৃষ্টি। ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টির দাপটে কত গাছ ভেঙে পড়ল। কত বাড়ির ছাদ গেল ধসে। চালা গেল উড়ে। ঠাসা অন্ধকাব। কোথ্‌থাও কিচ্ছু দেখা যায় না। মনে হল পৃথিবী বুঝি রসাতলে যাবে।

রাজা আর বিজয় সিং প্রাসাদের ভেতরে খোলা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখছিলেন। দুজনেই চুপচাপ। হঠাৎ রাজা বললেন, 'বিজয় সিং শুনতে পাচ্ছো?'

'হ্যাঁ মহারাজ—'

রাজা বললেন, 'ভালো করে শোনো তো। পূব দিকের দরজা থেকে গান ভেসে আসছে আর পশ্চিম দিকের দরজা থেকে কান্না। তাই না কি?'

'হ্যাঁ মহাবাজ—'

রাজা বললেন, 'ভারী আশ্চর্য! এই ভীষণ ঝড-জলের রাতে কেউ যখন বাইরে নেই, কারা ওরা? কোথা থেকে এল? এক দ্বারে গান— অন্য দ্বারে কান্নাই-বা কেন? বিজয় সিং তুমি কিছু বুঝতে পারছ?'

'আজ্ঞে না, মহারাজ—'

বাজা বললেন, 'তাহলে ব্যাপারটা তো জানতে হয়। আমাকে ভাবনায় ফেলছে। আমার রাজ্যে, একেবারে আমাব প্রাসাদের গায়ে, এরকম রহস্যময় ঘটনা ঘটছে, অথচ আমি তার কারণ জানব না— তা কি হতে পারে? বিজয় সিং, এবার তোমাকে তোমার মনের মতন কাজ দিচ্ছি। যাও, দেখে এস তো ব্যাপারটা কী।'

'এখনই যাচ্ছি মহারাজ—'

বিজয় সিং বেরিয়ে পড়ল। রাজা ভাবলেন, ছেলেটা মুখেই সাহসের বড়াই করে, সে নাকি মরতেও ভয় পায় না। কী ভীষণ দুর্যোগ আর ভয়ানক অন্ধকার আজকের রাতটা। প্রাসাদ থেকে সে কি আদৌ বাইরে বেরুল? নাকি ঘরের মধ্যে পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছে? রাজা পথে বেরুলেন।

রাজার নিজের ঘরের বাইরে সব সময় দুজন প্রহরী থাকে। রাজা তাদের বললেন, 'এখানে অন্য দুজন প্রহরী বসিয়ে, তোমরা যাও তো, পুব-পশ্চিম দ্বারে কারা এসেছে দেখে এস। কাল সকালে আমাকে তা জানাবে—'

বলে তিনি এগিয়ে গেলেন। একবার বিদ্যুৎ চমকাল। দেখতে পেলেন বিজয় সিং অনেকটা এগিয়ে, পুব-দরজার কাছাকাছি, যেখানে স্বর্গের দেবীর মতন অনেক রমণী একসঙ্গে বসে গান গাইছে। তিনি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওকে ধরে ফেললেন। পাছে দেখা হয়ে যায়, তিনি একটু দূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলেন। কান খাড়া করে রাখলেন।

শুনতে পেলেন, বিজয় সিং একজনকে প্রশ্ন করছে : 'এই ভীষণ রাতে ঝড়জল মাথায় নিয়ে গান গাইতে তোমাদের কষ্ট হচ্ছে না?'

'ঝড়জল? কই আমাদের গায়ে তো লাগছে না!' সেই দেবী মধুর হেসে বললে, 'আর কষ্ট। কষ্ট হবে কেন? আমরা তো স্বর্গ থেকে আসছি—'

'স্বর্গ থেকে। বেশ।' বিজয় সিং বললে, 'কিন্তু এখানে কেন? আর গান গাইবার কারণই বা কী? তোমরা গাইছ আনন্দের গান। কত ধরনের গান আছে, সেসব গান বাদ দিয়ে তোমরা আনন্দের গান গাইছ কেন?'

'এখানে না এসে কোথায় যাব? এটাই তো ঠিক জায়গা!' দেবী বললে, 'আর আনন্দের গান গাইছি, আমাদের খুব আনন্দ হয়েছে, তাই—'

'কারণ?'

'কেউ জানে না, কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয় শুধু আমরা ছাড়া', দেবী বললে, 'কাল ভোরে তোমাদের রাজা মারা যাবেন। তাঁর মতন মহৎ রাজাকে আমরা পথ দেখিয়ে স্বর্গে নিয়ে যাব, তাঁর সঙ্গে গল্প করতে পারব। এজন্যেই আমরা আনন্দের গান গাইছি—'

রাজা আড়াল থেকে ওদের কথা শুনলেন। কিন্তু টুঁ শব্দটি করলেন না। ঝড়জল সমানে চলছিল।

'তোমাদের কথা শুনলাম।' বিজয় বললে, 'দেখিগে ওরা কাঁদছে কেন?'

বিজয় সিং চলল পশ্চিম দিকের দরজার কাছে। রাজা তাকে অনুসরণ করলেন। তাঁর কৌতূহল বেড়েই চলেছে। ভারী আশ্চর্য ব্যাপার তো! কাল ভোরে তিনি মারা যাবেন, অথচ তার আভাসমাত্র নেই। তাঁর কোনো রোগ নেই, সুস্থ মানুষ। শত্রু নেই যে তাঁকে কেউ পেছন থেকে ছুরি মেরে হত্যা করবে। অথচ তিনি নাকি মারা যাবেন! অবিশ্বাস করা যায় না, কেননা স্বর্গের দেবীরা বলছেন। শুধু তাই নয়, মারা যাবার পর তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্যে দরজার কাছে অপেক্ষা করছে দেবীরা— আনন্দের গান গাইছে সব সখী মিলে।

তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল বটে, তবু আরও কী ঘটে দেখার জন্যে তিনি বিজয় সিং-এর পেছন-পেছন গোপনে ওদিককার দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। এরাও স্বর্গ থেকে এসেছে নিশ্চয়। কারণ ঝড়জল এদেরও টলাতে পারেনি। গা একেবারে শুকনো। এরা কাঁদছিল একসঙ্গে। এদের কান্না শুনলে চোখে জল ধরে রাখা যায় না। এত করুণ সুর!

'দেবী, তোমরা কাঁদছো কেন?' বিজয় সিং জিজ্ঞাসা করল।

'কাঁদব না?' ওদের মধ্যে একজন মুখ তুলে জল-ভরা চোখে বললে, 'জানো, কত বড়ো একজন মানুষ কাল ভোরে ইহলোক ছেড়ে চলে যাবেন? তিনি এদেশের রাজা। আর, আমি হলুম তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী। তাঁর জন্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তাই আমি সখীদের নিয়ে কাঁদছি—'

'আপনি তাঁকে এত ভালোবাসেন?'

'তিনি যে সকলের ভালোবাসা পাওয়ার মতোই মানুষ।' ভাগ্যদেবী বললেন, 'আমরা স্বর্গের দেব-দেবীরা তাঁকে ভালোবাসি, ইহলোকের মানুষেরা ভালোবাসে। তাঁর নামে কোনো অপবাদ নেই। সকলের ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন। খুব উঁচু মনের মানুষ। তাঁর জন্যে যদি না কাঁদি, তবে কার জন্যে কাঁদব? তাঁর চলে যাওয়া মানেই তো আমারও চলে যাওয়া। তিনি চলে যাওয়ার পর এ দেশের কী দশা হবে বল তো? কে সামলাবে? ঘরে-বাইরে তখন হাহাকার পড়ে যাবে না?'—

বিজয় সিং একটুক্ষণ ভাবল।

সে বলল, 'রাজার বয়স এমন কিছু বেশি হয়নি যে, তাঁকে এখনই মরতে হবে। তিনি আরও অনেকদিন বাঁচতে পারেন। দেবী, এমন কোনো উপায় নেই যাতে ওঁকে বাঁচানো যায়?'

দেবী বললে, 'একটা উপায় আছে। কিন্তু সে বড়ো কঠিন উপায়।'

'কী সেটা?' বিজয় সিং ব্যগ্র হয়ে বললে, 'যত কঠিন হোক আমি তা পালন করব। তুমি বল—'

'বলছি।' ভাগ্যের দেবী বলে, 'রাজার রক্তের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন একটি ছেলে চাই। তেমন কাউকে আজ রাত্তিরের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবে কি? ভোর হয়ে গেলে চলবে না কিন্তু।'

'আমি রাজপুত্র।' বিজয় সিং বললে, 'আমারই একটি ছেলে আছে—'

'তাকে উৎসর্গ করতে হবে। বলি দিতে হবে। পারবে কি?'

'কথা যখন দিয়েছি, পারব বইকী। আমার জবান একটাই। আমি রাজপুত—''

'তাহলে শিগগির তোমার ছেলেকে নিয়ে এস।'

'একটু সময় চাই। ওকে ঘুম থেকে জাগাতে হবে। আর, ওর মায়ের অনুমতিও নিতে হবে। অবিশ্যি ওর মা নিশ্চয়ই অনুমতি দেবে, কেননা সেও এক রাজপুতের বউ। দেবী, একটু অপেক্ষা করো, আমি যাব আর আসব—'

'এস।'

রাজা সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। দেবী এবং বিজয় সিংয়ের কথোপকথন শুনে তিনি একেবারে থ' হয়ে গিয়েছিলেন। সত্যিই বড়ো কঠিন কাজ। বিজয় সিং কি পারবে? অমন ফুটফুটে দেবশিশুর মতন সুন্দর ছেলেটিকে বাপ হয়ে নিজের হাতে বধ করা কি সহজ? তিনিও তো ছেলেটিকে ভীষণ ভালোবাসেন। একশো মোহর দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'দাদুভাই, একশো বছর পরমায়ু হোক তোমার।' সেই আশীর্বাদ যে ব্যর্থ হয়ে যায়! হে ঈশ্বর, বিজয় সিং যেন তার ছেলেকে না নিয়ে আসে। তিনি প্রার্থনা করলেন মনে মনে।

বিজয় সিং প্রাসাদে ফিরে গিয়ে তার ছেলের ঘুম ভাঙাল। চোখ রগড়ে সে বিছানায় উঠে বসল। ডাকাডাকিতে যমুনারও ঘুম ভেঙে গেছে, সে অবাক চোখে স্বামীর মুখের পানে তাকাল। যমুনা বললে, 'এই ঝড়-জলের রাতে জয়সিংকে জাগালে কেন? বেচারি অঘোরে ঘুমুচ্ছিল—'

'যমুনা, তোমাকে খুব শক্ত হতে হবে।'

'কেন বল তো?' যমুনা স্বামীর আচরণের মানে খুঁজে পাচ্ছিল না।

'রাজার ভীষণ বিপদ—'

'আমাদের রাজার?'

'হ্যাঁ—'

'কীসের বিপদ? কী হয়েছে?'

'ওই কান্না শুনতে পাচ্ছো? একদল দেবী কাঁদছে—'

'সে আবার কী? দেবীরা কাঁদবে কেন?'

'আজ রাত্তিরের ঘটনা তাই। শোনো, কাল ভোরে আমাদের দয়ালু রাজা মারা যাবেন বলে স্বর্গের ওই দেবীরা এসেছে শোক জানাতে—'

'সে কী! রাজা মারা যাবেন?'

'হ্যাঁ। আর, ওই শোনো, গান গাইছে আর একদল দেবী। ওরা রাজাকে গান শোনাতে শোনাতে স্বর্গে নিয়ে যাবে—'

'আমি যে বিশ্বাসই করতে পারছি না রাজা মারা যাবেন। ওগো, আমাদের রাজাকে কি কোনোমতেই বাঁচানো যায় না?'

বিজয় সিং বলে, 'হ্যাঁ, সেই জন্যেই আমি জয় সিংকে জাগিয়েছি—'

'জয় সিং-এর সঙ্গে রাজার মরণ-বাঁচনের সম্পর্ক কী?'

যমুনা অবাক হয়ে যায়।

বিজয় সিং বললে, 'তোমাকে শক্ত হতে বলেছি এই জন্যে। বলতে অবশ্য আমারও বুক ভেঙে যাচ্ছে। জয় সিংকে উৎসর্গ না করলে রাজাকে বাঁচানো যাবে না। তাই ওকে নিতে এসেছি। তুমি অনুমতি দাও—'

শুনে যমুনা একেবারে পাথর হয়ে গেল। কথা বলতে পারল না কিছুক্ষণ। তার শরীর থর থর করে কাঁপছিল। দু-চোখ জলে ভরে গেছে। সে ধীরে ধীরে বললে, 'তুমি কথা দিয়েছ?'

তার গলা কাঁপছিল।

'হ্যাঁ যমুনা, আমি কথা দিয়েছি—'

'বেশ। তাহলে নিয়ে যাও ওকে। আমি বাধা দেব না।' যমুনা বললে, 'কিন্তু আমার একটা প্রার্থনা আছে। বল, রাখবে?'

বিজয় সিং বললে, 'যমুনা, তোমার কোন কথাটা আমি রাখিনি? তুমি আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। বল, কী চাও? নিশ্চয় রাখব—'

'কথা দিচ্ছ?'

'দিচ্ছি—'

'জয় সিংকে বধ করার সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমাকেও বধ করবে। করতে হবে। তুমি কথা দিয়েছ।'

বিজয় সিংয়ের বুক যেন ফেটে গেল। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'যমুনা, তুমি কী বলছ! দোহাই আমাকে এত বড়ো সাজা দিও না—'

যমুনা শান্ত স্বরে বললে, 'তুমি কথা দিয়েছ।'

তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'বেশ। তাই হবে দেরি হয়ে যাচ্ছে। চল—'

বিজয় সিং ছেলেকে নিয়ে এগিয়ে গেল। যমুনা চলল পেছন পেছন। অল্পক্ষণের মধ্যে ওরা ভাগ্যদেবীর কাছে পৌঁছুল।

ভাগ্যদেবী ওদের দেখে বললে, 'বাঃ, খুব তাড়াতাড়ি এসে গেছ তো! নাও দেরি কোরো না। শুরু করে দাও। ভোর হয়ে আসছে—'

বিজয় সিংয়ের হাত একটুও কাঁপল না। সে মন শক্ত করে ফেলেছে। কৃপাণ তার কোমরেই বাঁধা ছিল। সে কৃপাণ বার করল। বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। মেঘ ডাকল কড়্ কড়্ শব্দে। ঝাঁপিয়ে এল ঝড়। জয় সিং-এর কচি মাথাটা মুহূর্তে দুখানা হয়ে গেল।

'আহ্—! হে ঈশ্বর—! আমাকে অন্ধ করে দাও—!'

আড়াল থেকে রাজা সবই দেখছিলেন। তাঁর হৃদয় ভেঙে একেবারে খান খান হয়ে গেল। দর দর করে দু-চোখ বেয়ে জল নেমে এসেছে। এ দৃশ্য সহ্য করতে পারছিলেন না তিনি। হঠাৎ দু-হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে উঠলেন। মেঘের ডাকে তাঁর গলা শোনা গেল না।

তিনি আবার যখন মুখ তুললেন, দেখে শিউরে উঠলেন,— বিজয় সিং কৃপাণ তুলেছে তার বউ যমুনার মাথার উপর। যমুনা জোড়হাতে হাঁটু ভেঙে মাথা সোজা করে বসে আছে।

'না! না! না!' চিৎকার করতে গেলেন রাজা। কিন্তু তাঁর গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। গলার ভেতরে কান্না দলা পাকিয়ে গেছে।



বিজয় সিংয়ের কৃপাণ নেমে আসছে যমুনার শিরে। হঠাৎ ভাগ্যদেবী চিৎকার করে বলে উঠলে, 'বৎস, থামো। কৃপাণ নামাও। তুমি কথা রেখেছ। আমি এতেই খুশি! দেখ, স্বর্গের দেবতারা ঝড়বৃষ্টি থামিয়ে দিয়েছেন তোমার এই অপূর্ব আত্মত্যাগ দেখে। ধন্য তুমি। তোমার জন্যে রাজা রক্ষা পেলেন। আমাদের বরে তাঁর পরমায়ু আরও পঞ্চাশ বছর বেড়ে গেল।'

যমুনা উঠে দাঁড়িয়েছে। ছেলের শোকে তার চোখ ছলছল করছিল। তবু সে বললে, 'আমাদের রাজাকে বাঁচানো গেছে, এ বড়ো আনন্দের কথা। তাঁর জয় হোক—'

'জয়' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার গলা কেঁপে যায়। ছেলের কথা মনে পড়ে গেছে। সে গোপনে চোখের জল মুছল।

ভাগ্যদেবী তা দেখতে পেলে। বুঝতে পারলে যমুনার ব্যথা কোথায়? ছেলেকে সে ভুলতে পারছে না।

ভাগ্যদেবী বললে, 'মা হয়ে তুমি যে ত্যাগ স্বীকার করেছ তার তুলনা নেই। তোমার নয়নের মণিকে আমরা কেড়ে নিয়েছি। দেখলুম, তুমি তা সইতে পার কিনা। হ্যাঁ, তুমি খাঁটি রাজপুত-মাতা। আমি খুশি হয়েছি। তাই তোমার ছেলেকে আমি ফিরিয়ে দেব। এই দেখো—'

ভাগ্যদেবী জয়সিংহের ধড় আর মাথা এক করে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল সে। 'মা মা' বলে মায়ের কাছে ছুটে গেল। যমুনা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

রাজা দেখলেন। তিনি আনন্দে চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না।

ওদিকে গান থেমে গিয়েছে। এদিকে কান্না-বন্ধ। ভোর হয়ে আসছিল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। স্বর্গের দেবীরা চলে গেল। বিজয় সিং আর যমুনা ছেলের হাত ধরে প্রাসাদে ফিরল। রাজা ফিরলেন তেমনি লুকিয়ে। রাজার ঘরের সামনে প্রহরী বদল হয়েছে। আগের প্রহরী দু-জন ফিরে এসেছে। তারা ঝড়জলে বাইরে যায়নি। ফাঁকা একটা ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে।

বেলা হল।

রাজা সেই প্রহরী দু-জনকে ডাকালেন।

'বল, কাল রাত্তিরে তোমরা কী দেখেছ?'

'কিছু না মহারাজ—'

এক প্রহরী বললে।

'গান শুনতে পাওনি?'

'না মহারাজা—'

'কান্না?'

'না মহারাজ—'

'মিথ্যে কথা।' রাজা রেগে গেলেন, 'আমি নিজের কানে গান আর কান্না শুনেছি। তোমরা সাজা পাবে—

তিনি প্রহরীদের সর্দারকে আদেশ দিলেন — 'ওদের দু-জনকে বাজারের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে পঞ্চাশ ঘা করে বেত মারা হোক।'

তারপর ডাকলেন বিজয় সিংকে।

জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল রাতে তুমি কী দেখেছ?'

'আজ্ঞে মহারাজ,' বিজয় সিং বললে, 'গান আর কান্না দুই-ই আমি শুনেছি। এক রমণী পোষা হরিণ হারিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদছিল—'

'আর গান?'

'রমণীর সঙ্গে বাড়ির লোকেরা ছিল।' বিজয় সিং বললে, 'তারা একসঙ্গে গান গাইছিল। ওই গান হরিণটি খুব ভালোবাসত। গান শুনতে পেয়ে সে যদি ফিরে আসে—'

'বিজয় সিং, তুমি মিছে কথা বলছ। তোমার কথা সত্য নয়। আমি সব জানি।'

দরবারের সেই-সব লোক যারা বিজয় সিংকে পছন্দ করত না, তারা খুশিতে উপচে পড়ল। মিছে কথা বলার জন্যে বিজয় সিংয়ের নিশ্চয়ই সাজা হবে। বাজারে নিয়ে গিয়ে পঞ্চাশ ঘা বেত লাগানো হবে। উচিত শিক্ষা হবে বাছাধনের। রোজ দু-হাজার করে টাকা নেওয়া বেরুবে তখন।

'বিজয়, তোমার অসাধারণ কীর্তির কথা তুমি গোপন করতে চাইছ। সেজন্য সাজা তুমি অবশ্যই পাবে। আমিই দেব সেই সাজা—'

দরবার একেবারে চুপ।

বিজয় সিং বললে, 'আপনার দেওয়া সাজা আমি মাথা পেতে নেব—'

'তার আগে', রাজা বললেন, 'দরবারের সকলের শোনা দরকার কাল রাত্তিরে ঠিক-ঠিক কী ঘটেছিল। সে এক আজব কাণ্ড। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না—'

'বলুন মহারাজ। আমরা শুনতে চাই।'

দরবারের সবাই হই-হই করে উঠল রহস্যের গন্ধ পেয়ে।

'শুনুন।' রাজা বললেন, 'আমি বিজয় সিংকে পাঠিয়েছিলাম রাজপ্রাসাদের দ্বারে কারা গান গাইছে, আর কারা কাঁদছে জেনে আসতে। ও-রকম ভীষণ ঝড়ের রাতে বিজয় সিং যাবে কিনা দেখবার জন্যে আমিও গিয়েছিলাম তার পেছনে পেছনে লুকিয়ে। যারা গান গাইছিল তারা বললে, রাত পোহালে আমি মারা যাব।

তারা স্বর্গ থেকে এসেছে আমাকে গান শোনাতে শোনাতে নিয়ে যাবে বলে। শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেল—'

'তারপর মহারাজ—'

'দেখতেই পাচ্ছো আজ সকালেও আমি মরিনি, বেঁচে আছি।' রাজা বললেন, 'আমার এই বেঁচে থাকাটাই এক আশ্চর্য ব্যাপার। এজন্যে যে পরিমাণ খেসারত দিতে হয়েছে বিজয়কে, তা ভাবা যায় না—'

'আমাদের রাজার বাঁচার জন্যে আমরাও যে-কোনো খেসারত দিতে পারি।'

'কে বললে একথা?'

রাজা দরবারের দিকে তাকালেন।

'আজ্ঞে আমি—'

এক মন্ত্রী। বিজয় সিংকে যে একেবারে দেখতে পারে না।

'আপনার ছেলে আছে?'

'আজ্ঞে, এই তো।' মন্ত্রী বললে, 'আমার সঙ্গেই দরবারে এসেছে—'

'ওকে নিয়ে আমার সামনে আসুন।'

মন্ত্রী ছেলেকে নিয়ে রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। দরবারের লোকেরা ঠিক বুঝতে পারছিল না রাজা কী করতে চান। তারা চুপচাপ দেখছিল। তবে একটা-কিছু যে ঘটতে যাচ্ছে, তা অনুমান করেছিল।

রাজা বললেন, 'আপনার কৃপাণ বার করুন—'

'আজ্ঞে কৃপাণ!' মন্ত্রী মশায় ভড়কে যানঃ 'কৃপাণ বার করব কেন? এখানে কাকে কৃপাণ দিয়ে মারতে হবে?'

রাজা ভীষণ গম্ভীরঃ 'আপনার ছেলেকে—'

'আমাব ছেলেকে!' মন্ত্রী চমকে গেলেনঃ কী বলছেন আপনি?'

'তাহলেই আমি বাঁচব। আমাকে বাঁচাতে হলে আপনার ছেলেকে বধ করতে হবে। আর, তা করবেন আপনি নিজে—'

'মহারাজ, এ অসম্ভব। কেউ কি তা পাবে ‹ বাপ হয়ে নিজের ছেলেকে—'

'আপনি পাববেন?'

'মহারাজ, মাপ করবেন। আমি পারব না—'

'কিন্তু একজন পারে।'

'কে সে? আমরা তাকে মাথায় করে রাখব। সে মানুষ নয়, দেবতা—'

'হ্যাঁ, সে দেবতাই। তাহলে শুনুন কাহিনীর শেষ পর্ব।'

রাজা বলতে লাগলেনঃ

'গানের ব্যাপারটা তো বোঝা গেল। বিজয় সিং এবার গেল কান্নার কারণ খুঁজতে। আমিও তাকে গোপনে অনুসরণ করছি। গিয়ে শুনি দেবীরা কাঁদছে আমারই শোকে। আমি মারা যাব, তাই।'

দরবারের সকলে একসঙ্গে বলে উঠলঃ 'আমরা ভাবতে পারি না আপনি নেই। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন বিশাল বট গাছের মতন, আমরা তার ছায়ায় বাস করছি নিবাপদে। আপনার সুশাসনে এ দেশ অমরাবতী হয়ে আছে। আমরা আপনাকে হারাতে চাই না। মহারাজ, ভাগ্যদেবী আপনাকে এত ভালোবাসেন, তিনি কি কোনো প্রতিকারের কথা বলেননি?'

'বলেছিলেন। আর সেইটাই আপনাদের শোনাচ্ছি।' রাজা বললেন, 'বিজয় সিং প্রতিকারের কথা জানতে চাইল। ভাগ্যদেবী বললেন, প্রতিকার একটা আছে। দেহে রাজরক্ত আছে এমন একটা ছেলে তাঁর আজই চাই। আর তাকে নিজের হাতে বলি দেবে তার বাবা। এ না-হলে যম রাজাকে ছাড়বে না। বুঝে দেখুন কী কঠিন কাজ—'

দরবারের সকলে ঘাড় নাড়ল।

'সত্যিই খুব কঠিন কাজ—'

রাজা বললেন, 'অথচ সেই কাজ করল আপনাদের অনেকের অপ্রিয় বিজয় সিং। সে তার ছেলেকে নিয়ে এল। আমারই সামনে সে নিজের ছেলেকে বধ করল। বুঝে দেখুন, দরবারের কেউ যা করতে পারে না, বিজয় সিং তা পারে। দেবীর আশীর্বাদে আমি ফিরে পেলাম একশো বছরের পরমায়ু। আর বিজয় সিং ফিরে পেল তার ছেলে।'

'ধন্য। ধন্য বিজয় সিং—'

সকলে তার প্রশংসায় আনন্দ প্রকাশ করল।

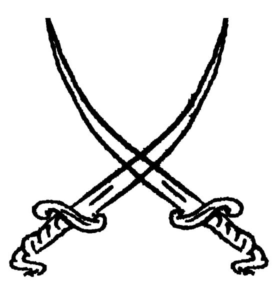
'এবার সাজা দেওয়ার পালা।' রাজা বললেন, 'বলুন, বিজয় সিংকে কোন্ সাজা দেওয়া যায়?'

'ওর প্রতিদিনের বেতন দশ হাজার টাকা হোক—'

দরবার জানাল।

'তাতেও কি ওব কাছে আমার ঋণের শোধ হয়?' রাজা বললেন, 'আমার সব দিলেও সে ঋণশোধ হবে না। বিজয় সিং আমার ছেলে হয়ে থাকবে। এবার থেকে সে এদেশ শাসন করবে। আমি গোটা দেশটাই ওকে দিলাম। মনে হয়, আমার চেয়ে ভালোভাবে সে-ই দেশ-শাসন করতে পারবে। আমি ঘোষণা কবছি, বিজয় সিং আজ থেকে এদেশের নতুন রাজা। আপনারা ওকে আশীর্বাদ করুন—'

দরবারের সবাই আবার 'ধন্য ধন্য' কবে উঠল।



সাহসী মেয়ে



চিতোরের রাজকুমার বেরিয়েছিল শিকারে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে সারাদিন ছুটোছুটি করেও একটাও শিকার জুটল না। হতাশ হয়ে রাজকুমার ফিরে আসছিল সঙ্গীদের নিয়ে। হঠাৎ এক সঙ্গী চিৎকার করে উঠল, 'ওই কে, ওই কে—'

একটা বুনো শুয়োর।

ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে ধাওয়া করল বুনো শুয়োরটার পেছনে পেছনে। কিন্তু তিন-চার হাত উঁচু ভুট্টার খেতের মধ্যে ঢুকে কোথায় যে লুকিয়ে পড়ল শুয়োরটা, বোঝা গেল না।

একজন গাছে উঠে চারদিক খুঁজতে লাগল। চোখে পড়ল শুয়োরের পায়ের ছাপ। গাছ থেকে নেমে সে দেখিয়ে দিল শুয়োরটা কোন্ দিকে গেছে। তখন গাছের গোড়ায় ঘোড়াগুলোকে বেঁধে সবাই চলল ভুট্টা খেতের মধ্যে দিয়ে। এতগুলো লোকের চলাচলে ভুট্টার খেত তছনছ হয়ে যাচ্ছিল।

খেতের মাঝামাঝি একটুখানি ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়েছিল একটি কিশোরী। তার হাতে একটা লাঠি। সে খেত পাহারা দিচ্ছিল। বেশ রাগের সঙ্গেই সে বললে, 'কী আক্কেল তোমাদের! এত কষ্ট করে আমরা ভুট্টা বুনেছি, তোমরা তা নষ্ট করছ? খেতের ভেতর দিয়ে তোমরা যাচ্ছই বা কেন? খেত তো যাওয়া-আসার রাস্তা নয়—'

'এদিকে একটা বুনো শুয়োর ঢুকেছে', ওদের মধ্যে একজন বললে, 'আমরা তার সন্ধানে যাচ্ছিলাম। তোমার খেতের ক্ষতি করার ইচ্ছে আমাদের নেই।'

'বুনো শুয়োর ঢুকেছে?' মেয়েটি চকিত হল। 'কোন্ দিকে গেছে?'

'মনে হয় কাছাকাছি আছে—'

'তোমরা অপেক্ষা করো।' মেয়েটি বলে, 'আমি আসছি।'

বলে মেয়েটি হনহন করে খেতের মধ্যে ঢুকে গেল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। খানিক পরে ওরা দেখল মেয়েটি কী একটা টানতে টানতে ফিরে আসছে। সে কাছে এল। বললে, 'এই নাও, আর এস না এদিকে। অনেক কষ্টে খেত করেছি—'

মরা বুনো শুয়োরটা সে ফেলে দিল ওদের সামনে। ওরা হইচই করতে করতে সেই গাছের গোড়ায় ফিরে এল। সেখানে আগুন জ্বালল। আগুনে ঝলসে নিল শুয়োরটা। খিদে পেয়েছিল খুব। ওরা মহানন্দে ভোজ করল। খাওয়া যখন শেষ হয়েছে, চমকে গেল একটা ঘোড়ার কাতর চিৎকারে। তার হাঁটুতে পাথরের চাঁই দিয়ে আঘাত করেছে কেউ। এত জোরে লেগেছে যে ঘোড়াটা আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল মাটিতে, আর নিথর হয়ে গেল।

রাজপুত্রদের কাছে ঘোড়া হল প্রাণ। খেপে গেল সবাই। কে এ কাজ করল?

দেখতে পেল সেই মেয়েটিই ছুটে আসছে তাদের দিকে। তাহলে এ-কাজ ও-ই করেছে? কিন্তু কী করে সম্ভব? লাঠি দিয়ে বুনো শুয়োরটা মারল, আবার পাথরের ঢিল ছুঁড়ে ঘোড়াটাকেও মারল। এত শক্তি ও পেল কোথায়? আশ্চর্য তো!

রাজকুমার কড়া-চোখে তাকাল তার দিকে।

মেয়েটি কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'মাপ করুন, হুজুর। খেতের মধ্যে হরিণ ঢুকেছিল, তাকে মারতে গিয়ে তাগ ফসকে আপনার ঘোড়ার পায়ে লেগে গেছে। আমি দুঃখিত।'

'তোমার টিপে দারুণ জোর।' রাজকুমার বললে, 'আচ্ছা তোমায় ক্ষমা করলুম—'

মেয়েটিকে দেখতে সুশ্রী। ঝকঝকে চোখ। নিটোল স্বাস্থ্য। দারুণ তেজি। সাহসী।



ওরা ঘোড়ায় চড়ে ধীরে ধীরে প্রাসাদে ফিরছিল। পথে মেয়েটির সঙ্গে আবার দেখা। সে মাথায় দুধের ভাঁড় চাপিয়ে দু-হাতে দুটো মোষকে দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সঙ্গীদের মধ্যে একজন ভাবল, মেয়েটি বারে বারে তাদের টক্কর দিয়েছে, এবার ওকে একটু সমঝে দেওয়া যাক। মোষ দুটোকে ভড়কে দেবার জন্যে সে যেই কাছে এসেছে, মেয়েটি কম-বয়সি মোষটিকে ছেড়ে দিলে ঘোড়ার ঠিক সামনে। ঘোড়াটাই গেল ভড়কে। সে ঝটকা মেরে দু-পা উঁচুতে তুলে ফেলল। সওয়ার গেল পড়ে। মেয়েটি মোষের দড়ি টেনে নিয়ে আগের মতন চলতে লাগল। যেন কিছুই ঘটেনি।

রাজকুমার তার বুদ্ধি, সাহস ও কৌশল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। চুপচাপ ফিরে এল প্রাসাদে। সারারাত ভাবল। পরদিন সঙ্গী নিয়ে হাজির হল মেয়েটির বাড়িতে। ওর বাবার সঙ্গে দেখা হল। সঙ্গী জানাল রাজকুমার তার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। এ রকম কত রাজপুতই তো আসে তার মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে। ওর বাপ গায়ে মাখে না। মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে নাকি? সে পরিষ্কার বলে দিলে, 'আমি এখন মেয়ের বিয়ে দেব না।'

বলে ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে।

মেয়ের মা কিন্তু জানালা দিয়ে দেখে ফেলেছে রাজকুমার দাঁড়িয়ে আছে একটু তফাতে। সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে বললে, 'আরে, তুমি করলে কী? চিতোরের রাজকুমার বিয়ে করতে চাইছে আমাদের মেয়েকে। তার কত ভাগ্য! শিগগির রাজকুমারকে ঘরে এনে বসাও—'

বাপ এতটা বুঝতে পারেনি। সে তাড়াতাড়ি রাজকুমারকে সম্মান জানিয়ে ঘরে এনে বসাল। নিজের আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বললে, 'আমরা এ বিয়েতে রাজি। আমার মেয়ের কী সৌভাগ্য!'

সৌভাগ্য অবশ্য চিতোরেরও। কেননা এদেরই ছেলে বীর হাম্বীরই তুর্কীদের শাসন থেকে মুক্ত করেছিল চিতোরকে।

পাঁচ চাষি



পাঁচ ঘর চাষি। পাশাপাশি থাকত। খানিক দূরে ওদের জমি। একসঙ্গে চাষ করত। ফসল তুলত। গোলায় নিয়ে যেত। খুব খাটত।

বর্ষা নামছে। আকাশের অবস্থা ভালো নয়। মাঠে কাজ করতে করতে ওরা মাঝে মাঝে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকায় আর হাত চালায়।

শুরু হল ঝড়। অন্ধকার হয়ে এল চারদিক। গুড় গুড় করে মেঘ ডাকল। আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের ঝলকানি। নেমে এল তুমুল বৃষ্টি।

ওরা মাঠ ছেড়ে উঠে পড়ল। দৌড়ে আশ্রয় নিল তেঁতুল গাছের তলায়। কতক্ষণই-বা মাথা বাঁচল। ওপর থেকে বড়ো বড়ো ফোঁটা পড়তে লাগল। আর সোঁ সোঁ বাতাসের ঝাপটা। সারা শরীর ভিজে ঢোল।

মেঘের ডাক। বিদ্যুতের চমক। বাজ পড়ার শব্দ।

'সাংঘাতিক কাণ্ড!' একজন বললে, 'এই রকম বাজপড়া বৃষ্টির মধ্যে গাছের তলায় দাঁড়ানো ঠিক নয়—'

'তাহলে কী করা যায়?' দ্বিতীয় চাষি ঠাণ্ডায় কাঁপছিল। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে।

'এই সমস্যাটাই এখন আমাদের সমাধান করতে হবে।'

প্রথম চাষি বলল, 'ব্যাপারটা বুঝে দেখ। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঠিক আমাদের মাথার উপর। এর মানে বুঝতে পারছ কি?'

'তুমি কী বলতে চাও?'— তৃতীয় চাষির দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে ঠাণ্ডা হাওয়ায় আর বৃষ্টির ঝাপটায়।

'বলব আর কী।' প্রথম চাষি বুঝদারের মতন বললে, 'বুঝতে পারছ না এটা কীসের ইঙ্গিত? ওই বাজ পড়বে আমাদের কারো মাথায় আর আমাদের সকলকে হতে হবে মৃত্যুর শিকার—'

'বলো কী!' চতুর্থ চাষি কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল।

'কিন্তু কে সে?' পঞ্চম চাষির গলায় জোর ফুটল না, ভয়ে সে জড়োসড়ো।

'কী করে বলব?' প্রথম চাষি বলে, 'তবে আমাদের মধ্যেই কেউ একজন। আর সে আছে বলেই আমাদের চারজনকেও মরতে হবে—'

'না। না। না। তা কেন হবে?' সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল: 'সে চলে যাক। আমরা এখানে থাকি—'

'কিন্তু কে যাবে? তুমি?'

'না—'

'তুমি?'

'না—'

প্রথম চাষি বললে, 'কেউই যেতে চাইবে না। আমিও না। তাহলে এক কাজ করা যাক। মাঠের ওপারে যে পিপুল গাছটা আছে, এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে, একজন করে ওই গাছটা পর্যন্ত যাবে আর ফিরে আসবে। বাজ সাধারণত ফাঁকা জায়গায় পড়ে। এইভাবেই আমরা রক্ষা পেতে পারি। রাজি?'

'অগত্যা।'

সকলে মাথা চুলকাল। ঢোঁক গিলল। কিন্তু কে আগে যাবে?

প্রথম চাষি বললে, 'আমি যাচ্ছি—'

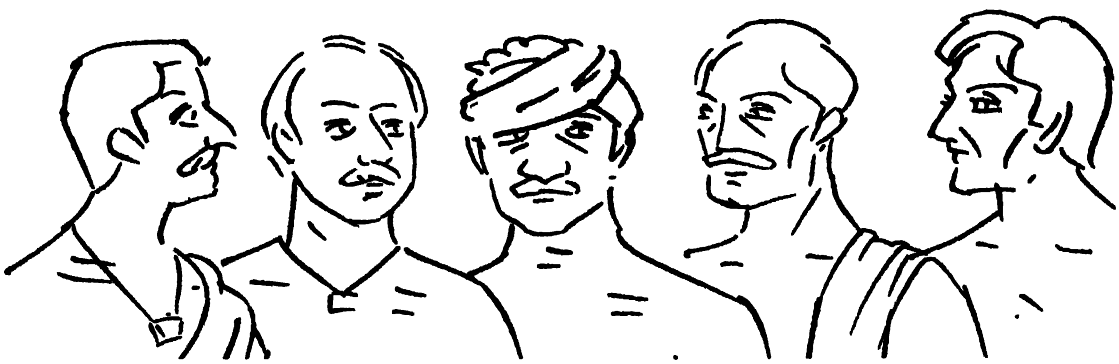
সাহস করে বললে বটে, কিন্তু সে ভীষণ কাঁপছিল।

'কই, যাও—'

তারই প্রস্তাব। অতএব তাকেই পা বাড়াতে হল। সে মাঠ পেরিয়ে গেল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। কড় কড় শব্দ। সে ফিরে এল।

এবার দ্বিতীয় চাষির পালা। তারও ওই একই অবস্থা। কাঁপতে কাঁপতে গেল আর কাঁপতে কাঁপতে ফিরল। তৃতীয় ও চতুর্থ চাষিও তাই। সবশেষে পঞ্চম চাষির পালা। আগের চারজন নিরাপদে ফিরে আসা মানেই পঞ্চম জন হল সেই ব্যক্তি —যার মাথায় অবধারিত বাজ পড়বে। বেচারি ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। তার শরীর শিথিল হয়ে গেছে। সে হাপুস নয়নে কাঁদছিল।

'এবার তুমি। কই, ওঠো, তোমাকে যেতে হবে—'



সে হাঁটুতে জোর না পেয়ে বসে পড়েছিল। ওরা তার হাত ধরে টানল।

'আমাকে ছেড়ে দাও ভাই।' সে করুণ সুরে বললে, 'আমি তোমাদের মধ্যে থাকব—'

'কক্‌খনো না। তোমাকে যেতেই হবে।' ওরা সাপের মতন একযোগে হিসিয়ে উঠল, 'তোমার জন্যে আমরা চারজনে মরতে পারি না। ওঠো। ওঠো বলছি।'

'আমার বুড়ি মা আছে। বউ আছে। চারটি ছেলেমেয়ে।' কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'আমি মরে গেলে ওদের দেখার কেউ থাকবে না। ওরা পথে বসবে। আমাকে দয়া করো—'

'তা হয় না। তোমার জন্যে আমরা চারজনই মরতে পারি না। আমাদেরও সংসার আছে। মা আছে। ছেলেমেয়ে আছে। কী হল? যাচ্ছো না কেন?'

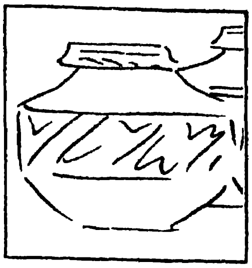
ওরা ঠেলতে লাগল। ঠেলে নামিয়ে দিলে মাঠে। তার পায়ে জোর ছিল না। সে খানিক দূর গিয়ে মাটিতে বসে পড়ল।

কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকল। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল। তারপর ভীষণ শব্দে বাজ পড়ল। তেঁতুল গাছের মাথার উপর পড়ে মাটির নীচে চলে গেল বাজটা। এক পলকমাত্র দেখেছিল পঞ্চম চাষি। বাজ তেঁতুল গাছকে ঝলসে, তার নীচে দাঁড়ানো চারজনকে খতম করে গেছে।

পঞ্চম চাষি মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। প্রবল বৃষ্টিতে তার সারা শরীর ভেসে যাচ্ছে। তার বুঝি হুঁশ নেই। এ কী হল?

একেই কি বলে ললাটলিপি!

তিনটি ঘড়া



অজিত সিং-এর বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। সে বড়ো গরিব। দিন আনে দিন খায়। পয়সা যেটুকু বাঁচে, মাটিব নীচে পুঁতে রাখে। তার আশা, এভাবে জমাতে থাকলে পরে অনেক টাকা হবে। রোজ সে তাই করত।

দশ বছর পরে সে দেখল, যে পরিমাণ টাকা জমেছে তা তার আশার চেয়েও বেশি। ভাবল, এবার একটা কিছু করতে হবে। নিজের ছোটো জমিটা বিক্রি করে দিলে। সেই টাকা আর জমানো-টাকা দিয়ে সে একটা বড়ো জমি কিনল। শুধু জমি কিনলেই তো হবে না, চাষের জন্যে বলদ চাই। কিছুদিন অপেক্ষা করল। মস্ত বড়ো মেলা হয় নদীর ধারে। সেখানে নানা জাতেব গোরু-বিক্রির হাট বসে। অজিত সিং দেখেশুনে কয়েকটা বলদ কিনল। তাদের দিয়ে মাঠ চাষ করল। বীজ পুঁতল। মাঠে প্রচুর ধান হল। সে-সব বিক্রি করে অঢেল টাকা পেল।

এই ভাবে তার ভাগ্য ফিরল।

অজিত সিং-এব তিন ছেলে। তারা সবে কৈশোর ডিঙিয়েছে। তিনজনের মধ্যে দারুণ ভাব-ভালোবাসা। তাদেব দেখে ভাবাই যায় না যে, তারা কোনোদিন আলাদা হতে পারে। যাকে বলে হরিহর-আত্মা।

অজিত সিং-এর এখন বয়স হয়েছে। বুড়ো হয়ে গেছে। সংসারে সে অনেক দেখেছে। ছেলেদের এই ভাব-ভালোবাসা পরে না-ও থাকতে পারে। তখনকার কথা ভেবে বাপ একদিন তিন ছেলেকে ডাকল।

'দেখ বাছারা', অজিত সিং তাদের বললে, 'তোমরা আমার বড়ো আদরের সন্তান। তোমাদের আমি দু-একটা কথা বলতে চাই—'

'বলুন বাবা।' —ছেলেরা বিনীতভাবে বললে।

'আমার বয়স হয়েছে', অজিত সিং বললে, 'বেশিদিন বাঁচব না। তোমাদের কথা ভেবে আমি আমার সম্পত্তি সমান তিনভাগে ভাগ করে এই ঘরে,— আমি যেখানে শুই, ঠিক তার নীচে মাটির তলায় তিনটি ঘড়ায় ভরে পুঁতে রেখেছি। আমার অবর্তমানে তোমরা ভাগ করে নিও—'

অজিত সিং তারপরও কিছুকাল বেঁচেছিল। তার মৃত্যুর পর ছেলে তিনজন খুবই খাটাখাটনি করত। তা থেকে যা উপায় হত সে-সব এক জায়গাতেই রাখত, আর দরকার মতন যার যেমন ইচ্ছে খরচ করত। বেশ হেসে-খেলেই দিন কাটাত তারা।

এরপর তিন ভাই বিয়ে করল। তিন বউ এল। তাদের ছেলে-মেয়ে হল। সংসার বেড়ে গেল। সংসারে ঝগড়াঝাটি এবং নানারকম অশান্তি দেখা দিল। ব্যাপারটা এভাবে চলতে দেওয়া ঠিক নয়। বড়োভাই ভাবল।

তারপর দুভাইকে ডেকে সে বললে, 'ঝামেলা দিন-দিন বেড়েই চলেছে। তার চেয়ে আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়াই ভালো। তোমরা কী বল?'

তারা বললে, 'আমরাও তাই ভাবছিলাম—'

সবাই যখন আলাদা হয়ে যাচ্ছে, তখন বাপের সম্পত্তিও আলাদ করা দরকার। তারা বাপের শোবার ঘরের মেঝে খুঁড়ে তিন আকারের তিনটি ঘড়া পেল। বড়ো, মাঝারি আর ছোটো। তিন ভাইয়ের বয়স অনুযায়ী তিনটি ঘড়া। কার কোন্ ঘড়া, ওদের বুঝতে অসুবিধে হল না।

বড়ো ঘড়ায় মাটি ভর্তি, মাঝারি ঘড়ায় হাড়, আর ছোটো ঘড়ায় কয়লা।

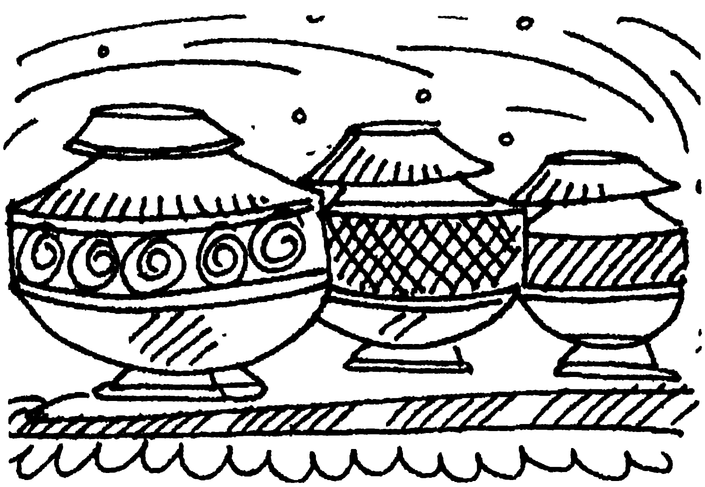
দেখে, তিনভাই হতভম্ব। এ আবার কী! তিন ভাই খুবই হতাশ হল।

'বাবা নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে রসিকতা করেননি!' বড়োভাই বললে, 'অবশ্যই এর কোনো মানে আছে। আমরা ঠিক ধরতে পারছি না—'

'গাঁয়ের মোড়লের কাছে গেলে কেমন হয়? উনি তো গাঁয়ের কত সমস্যার সমাধান করে দেন—'

'তাই চল। দেখি উনি কী বলেন—'

মোড়লমশাই আসর জাঁকিয়ে বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে অনেক লোক। তিনভাই গিয়ে তাদের সমস্যার কথা বললে।



সব কথা শুনে মোড়লমশাই মাথা চুলকাতে লাগলেন। কলকের আগুন নিবে গিয়েছিল, তবু তিনি ঘন ঘন হুঁকো টানতে লাগলেন। এ রকম কঠিন সমস্যায় তাঁকে কখনও পড়তে হয়নি। গাঁয়ের লোকেরাও সমাধানেব কোনো ইঙ্গিত দিতে পারল না।

তিনভাই তখন শহরে চলে গেল। শহরে গিয়ে তারা খুঁজতে লাগল সেই লোককে— যে নাকি এই ধাঁধার উত্তর দিতে পারবে। এখন তাদের মনে হচ্ছে, এটা একটা ধাঁধাই।

তারা একজনের কাছে শুনল, শহরের একেবারে শেষে এক সাধু আছেন যিনি অনেক কঠিন ধাঁধার উত্তর দিয়ে থাকেন। তারা তাই সাধুর কাছে গিয়ে হাজির হল। তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করল।

সাধু বললেন, 'বেটা, কী চাও?'

বড়োভাই বললে, 'সাধুজি, আমাদের জন্যে তিনটে ঘড়া রেখে বাবা মারা গেছেন। বলে গেছেন, ওই হল তাঁর সম্পত্তি, আমরা তিনভাই যেন ভাগ করে নিই—,

'ভালোই তো! তিনজনের তিনটে ঘড়া। এর মধ্যে সমস্যা কোথায়?'

'সমস্যা হল', বড়োভাই বললে, 'বড়ো ঘড়ায় আছে মাটি, মাঝারিতে হাড় আর ছোটোটিতে কয়লা। এর মানে কী?

'খুবই সহজ।' সাধুজি বললেন, 'বড়ো ছেলেকে তিনি দিয়েছেন মাটি— মানে মাঠ, সে চাষ করবে। মেজো ছেলে পেয়েছে হাড়— মানে সে পশুপালন করবে। আর ছোটো ছেলের ভাগ্যে জুটেছে কয়লা— মানে বাপের সমস্ত সোনা। বুঝতে পারলে?'

'বুঝেছি।'

সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তিন ভাই হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরল।



মহারাষ্ট্র

সতী গোদাবরী



শিবাজীর জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভাজীব বয়স তখন সতেরো। লম্বা, সুদর্শন, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা শম্ভাজীর। ইতিমধ্যেই তার পিতা শিবাজী 'ধর্ম ও গো-ব্রাহ্মণের রক্ষক ছত্রপতি মহারাজ' নামে সর্বত্র পরিচিত ও বিখ্যাত হয়ে গেছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর অভিষেকের উদ্যোগ চলছে।

এইজন্যেই রাজা ও তাঁর রানি, রাজমাতা জিজাবাঈ, রাজপুত্র ও তাদের স্ত্রী এবং রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ রায়গড় দুর্গের মধ্যে বাস করছেন।

কিন্তু বাজপুত্র শম্ভাজী পিতার অভিষেকের ব্যাপারে তেমন একটা ঔৎসুক্য বা আগ্রহ প্রকাশ করছে না: এ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছে, তেমন লক্ষণও প্রকাশ পাচ্ছে না তার আচবণে।

সে প্রত্যহ অশ্বারোহণের অছিলায় দুর্গ থেকে বের হয়ে যায় এবং সাবাটা দিন কাটিয়ে আসে বাইরে। ক্রমে ক্রমে তার এই অনুপস্থিতি শিবাজী এবং তাঁর সভাসদদের চোখেও ধরা পড়ল। প্রজারাও তার সম্পর্কে নানাবকম কানাঘুঁষো শুরু করে দিল। একদিন কোঙ্কণ জেলার রত্নগিরি নগরের গঙ্গাধর শাস্ত্রী নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁব পুত্রবধূ গোদাবরীকে সঙ্গে করে তার স্বামীর কর্মস্থল রায়গড়ের কাছাকাছি একটি নগরেব উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন; উদ্দেশ্য—পুত্রবধূকে স্বামীর কাছে পৌছে দেওয়া। ইতিপূর্বেই ওই অঞ্চলে অপূর্ব সুন্দরী ও ধর্মশীলা নারী হিসাবে গোদাবরীর খ্যাতি খুবই ছড়িয়ে পড়েছিল।

সম্প্রতি গোদাবরী বয়ঃপ্রাপ্তা হয়েছে। এই প্রথম তাকে তার স্বামীর কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সেই সময় দুর্গে ফেরার পথে শম্ভাজী মত্ত অবস্থায় ওই দলটিকে দেখতে পায়। তাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য দলটির কাছে আসে এবং ওই অসামান্য রূপবতী তরুণী বধূর রূপে ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় এবং নিজের রাজকীয় পরিচয়, পিতার মর্যাদা ও আত্মসম্মান সবকিছু বিস্মৃত হয়ে শাস্ত্রীজি এবং তাঁর লোকজনকে আক্রমণ করে বসে। যেহেতু সে সশস্ত্র, সেহেতু সে সহজেই তাদের পরাভূত করে এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

রায়গড় থেকে একটু দূরে পানে ও পান্ধেরির সীমান্তে সিঙ্গানা নামে শিবাজীর একটা কেল্লা ছিল। ওই কেল্লার পাশেই ছিল একটি পার্বত্য গুহা। শিবাজীর রাজত্বকালে গুহাটি কয়েদখানা হিসাবে ব্যবহার করা হত; সেইজন্যে গুহাটিতে একটা শক্তপোক্ত লৌহদরজাও ছিল।

শম্ভাজী গোদাবরীকে সেই গুহার মধ্যে বন্দি করে রাখল। গোদাবরীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে একজন পরিচারিকা নিযুক্ত করা হল, এবং গুহাটি পাহারা দেবার জন্যে দুজন সশস্ত্র প্রহরীরও ব্যবস্থা করা হল।

প্রত্যেকদিনই শম্ভাজী সেই গুহায় গিয়ে তাকে বিয়ে করার জন্য গোদাবরীকে নানাভাবে প্ররোচিত করত। প্রত্যেকবারই উত্তরে গোদাবরী বলত : 'আমি বিবাহিতা; আপনি আমার ভাইয়ের মতো। কাজেই আমাকে হয় আমার বাবা, না হয় আমার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিন।'

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল, কিন্তু শম্ভাজী আশা ছাড়ল না। তখনো তার বিশ্বাস, একদিন সে গোদাবরীর মন জয় করতে পারবে। ক্রমে ক্রমে খবরটা সর্বত্র চাওড় হয়ে গেল এবং তা জিজামাতা ও শিবাজীর কানেও পৌঁছল।

জিজামাতা তৎক্ষণাৎ নাতিকে ডাকিয়ে আনলেন এবং সরাসরি স্পষ্ট ভাষায় তাকে বললেনঃ 'আমরা তোমার জন্য খুবই লজ্জিত। তুমি তোমার বাবার সুনাম মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছ। ধিক্ তোমাকে! আমাকে বলো— মেয়েটি কে? কেন তার উপর অত্যাচার করছ?'

শম্ভাজী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল, একটি কথারও জবাব দিল না। শিবাজী তাঁর মায়ের পাশেই বসে ছিলেন; তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন ঃ 'আমি নিজেকে গো-ব্রাহ্মণের রক্ষাকর্তা বলে প্রচার করি; আর তুমি কিনা আমার ছেলে হয়ে, মারাঠা রাজ্যের ভাবী সম্রাট হয়ে একটি নিষ্পাপ বিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যার ধর্ম নষ্ট করতে উদ্যোগী হয়েছ? যাও, আমার সামনে থেকে বেরিয়ে যাও।'

কিন্তু শম্ভাজী নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়েই রইল।

পরদিন শিবাজী তাঁর দুজন ভৃত্যকে সেই পার্বত্য গুহায় পাঠিয়ে গোদাবরীকে আনালেন। গোদাবরী রাজপ্রাসাদে এলে জিজামাতা এবং শিবাজী দুজনেই তার পা ছুঁয়ে তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

মহান ও বিখ্যাত মারাঠাবীর এবং রাজমাতা জিজাবাঈ বয়সে অনেক জ্যেষ্ঠ হয়েও তাঁর প্রতি এমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করায় গোদাবরী কিছুক্ষণের জন্য ভীষণ অপ্রতিভ এবং অভিভূত হয়ে পড়ল। তাঁর অবস্থা দেখে জিজামাতা বললেন ঃ

'মা, এরাজ্য গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষাকারী শিবাজীর রাজ্য; এবং তুমি একজন ব্রাহ্মণ-সতী, বয়সে ছোটো হলেও আমাদের প্রণম্য।'

তারপর জিজামাতা শম্ভাজীকে ডাকিয়ে আনলেন এবং দৃঢ়স্বরে আদেশ করলেনঃ 'তুমি এই সতী নারীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করো। কেবল এইভাবেই তোমার পাপের কিছুটা স্খলন হতে পারে।'

একটুক্ষণের দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর শম্ভাজী গোদাবরীর পা স্পর্শ করলে, গোদাবরীর মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল। সে বলল ঃ

'তুমি এখন থেকে আমার ভাই।'

পরদিন সকালে অপ্রত্যাশিতভাবে গোদাবরী জিজামাতাকে বললঃ 'রাজমাতা, আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে। অনুগ্রহ করে আপনি আমার জন্য একটি চিতা প্রস্তুত করতে আদেশ দিন। আমি 'সতী' হতে চাই।'

জিজাবাঈ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি শিবাজী, শম্ভাজী এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ডাকিয়ে আনলেন এবং তাঁদের কাছে গোদাবরীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। তা শুনে তাঁরা সকলেই অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। গোদাবরীকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

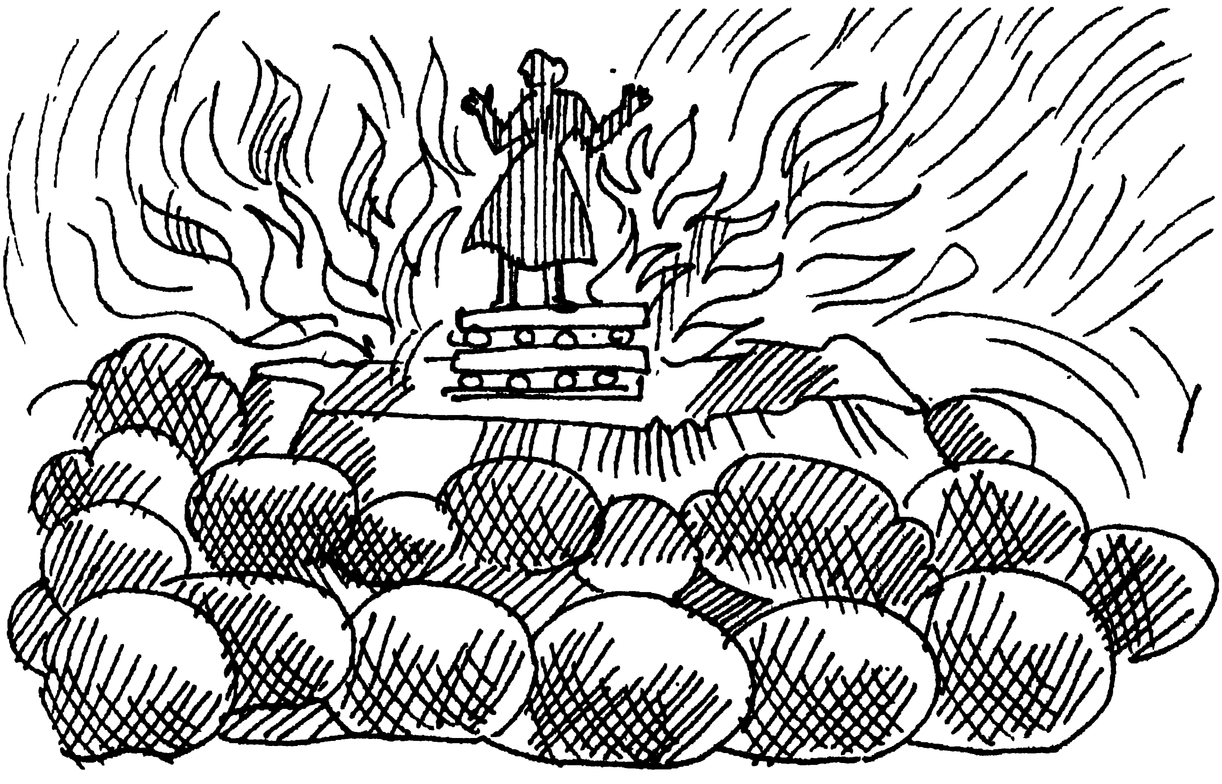
'মা, আমি তোমাকে স্বামীগৃহে পাঠিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ করছি। বল, তুমি কার কাছে যেতে চাও,— তোমার পিতার কাছে, নাকি— স্বামীর কাছে? আমার পুত্র তোমার প্রতি যে অন্যায় করেছে, আমরা সকলে মিলে তার প্রতিকার করতে চাই। আমি তোমার শ্বশুর ও স্বামীকে বুঝিয়ে বলব যে, তোমার ধর্ম ও সতীত্ব অক্ষুণ্ণ আছে,— তুমি গঙ্গার মতোই পবিত্র।'

'কিন্তু এখন তা আর কী করে সম্ভব?' গোদাবরী বললঃ সীতা সতীত্ব-পরীক্ষার জন্য অগ্নিপ্রবেশ করেছিলেন; তবুও সমাজ তাঁর চরিত্র সম্পর্কে কখনো নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারে নি। তাঁর তুলনায় আমি তো খুবই নগণ্যা।

সুতরাং চিতায় আত্মবিসর্জন দেওয়া ছাড়া আমার সতীত্ব প্রমাণ করার আর কোনো উপায় নেই। কাজেই মহারাজ, আমার জন্য চিতা প্রস্তুত করতে আদেশ দিন।

গোদাবরী যখন এই সব কথা বলছিল, তখন এক আশ্চর্য অপার্থিব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তার মুখ।

সকলেই বুঝতে পারলেন, গোদাবরীকে তার প্রতিজ্ঞা থেকে এক বিন্দুও টলানো যাবে না। তখন অনন্যোপায় হয়ে শিবাজী তাঁর অনুচরদের একটি চিতা প্রস্তুত করতে আদেশ দিলেন। অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিও সম্পন্ন হল। জিজামাতা রাজপরিবারের অন্যান্য নারীদের সঙ্গে গোদাবরীকে নিয়ে পালকিতে চেপে গিয়ে পৌঁছলেন চিতাস্থলীতে। শম্ভাজী স্বয়ং বাহকদের একজন হয়ে সেই পালকি কাঁধে বহন করে নিয়ে গেল।

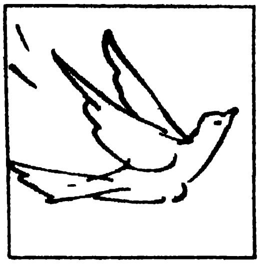


সতীর চিতা প্রস্তুত হল। চিতার সন্নিকটে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে গোদাবরী তার সমস্ত অলঙ্কার উপস্থিত নারীদের মধ্যে বিতরণ করল। সকলে তাকে প্রণাম করল। সেও তাদের সকলকে আশীর্বাদ করল; মারাঠারাজের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করল, এবং ধাপে ধাপে চন্দন কাঠের চিতার উপর আরোহণ করে বলল: 'তিন দিন পরে এই শিলাখণ্ডের নিম্নদেশ থেকে নির্গত হবেন দেবী গঙ্গা, আর সেই হবে আমার সতীত্বের প্রমাণ।'

চিতা জ্বলে উঠল। তার লেলিহান রক্তিম শিখা উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল ঊর্ধ্বে এবং একসময় গোদাবরীর পবিত্র আত্মাটিকে নিয়ে বিলীন হয়ে গেল সুদূর নীলিমায়।

তিনশো বছর আগে ওয়াধিতে নির্মাণ করা হয়েছিল একটি কালো পাথরের সমাধি। সেই সমাধিটি আজও বিদ্যমান। স্থানীয় লোকেরা এটিকে বলে থাকে— সতী গোদাবরীর সমাধি।

পাখিদের কেন ঘর নেই



রাজা রিসাল এবং তাঁর সুন্দরী রানি একটি ছোট্ট রাজ্য শাসন করতেন।

একদিন রাজা আর রানি রাজপ্রাসাদ থেকে কিছুদূরে তাঁদের প্রমোদ-উদ্যানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় একটা গাছের উপর বসে-থাকা একজোড়া পাখি তাঁদের নজরে পড়ল।

'কী পাখি ওরা?' তাঁরা পরস্পর পবস্পরকে জিজ্ঞাসা করলেন।

রাজা বললেন ঃ 'ওরা ঈগল'।

'না, ওরা বুনোহাঁস,' রানি বললেন।

এই নিয়ে দুজনের মধ্যে বিতর্ক চলল অনেকক্ষণ, কিন্তু কোনো মীমাংসাতেই পৌঁছনো গেল না। রাজা বা রানি কেউ কারো রায়ই মেনে নিতে রাজি হলেন না। শেষে তাঁরা বাজি ধরলেন।

উত্তেজিতভাবে রাজা বললেনঃ

'যদি প্রমাণ হয় ওরা ঈগল নয়,— আমি বারোখানা গ্রাম ঘুরে ঘুরে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো জোগাড় করে কাপড় বানিয়ে, তা-ই পরে রাজ্য ছেড়ে চলে যাব।'

রানিও খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন ঃ

'যদি প্রমাণ হয় ওরা বুনোহাঁস নয়,— আমিও বারোখানা গ্রাম ঘুরে ঘুরে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো জোগাড় করে শাড়ি বানিয়ে, সেটা পরেই রাজ্য ছেড়ে চলে যাব।'

পরদিন রাজপ্রাসাদ থেকে চারজন— দুজন রাজার, দুজন রানির বিশ্বস্ত পরিচারককে সেই বাগানে যেতে বলা হল। সেখানে গিয়ে তারা খোদ পাখি দুটোর সঙ্গে কথা বলেই জেনে আসবে— তারা ঈগল না বুনোহাঁস।

'ভাই এবং বোনটি, তোমরা কী পাখি?' তারা গিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

পাখিরা জবাব দিলঃ 'আমরা বুনোহাঁস।'

রানি জিতে গেলেন। তাঁর পরিচারক দুজন খোশমেজাজে মন্থরবেগে হাঁটতে শুরু করে দিল; ওদিকে রাজার পরিচারক দুজন হতাশায় মুষড়ে পড়েছে, তারা আর চলতেই পারে না।

চলতে চলতে পথে রানির পরিচারক দুজন ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল, দেখল— তাদের সমস্ত খাবার শেষ হয়ে গেছে। খিদের কষ্ট সইতে না পেরে তারা রাজার পরিচারকদের কাছে কিছু খাবার প্রার্থনা করল। তখন তারা বলল ঃ

'এক শর্তে আমরা তোমাদের খাবার দিতে পারি। রাজসভায় গিয়ে তোমরা যদি বলো পাখি দুটো ঈগল, বুনোহাঁস নয়— তাহলে আমাদের কাছে যত খাবার আছে, সব তোমাদের দিয়ে দেব।'

'তোমরা যেরকম বলতে বলছ, সেইরকমই বলব,'—রানির পরিচারক দুজন উত্তর দিল।

তারপর চারজন পরিচারকই রাজসভায় গিয়ে জানালেন ঃ পাখিদুটো ছিল ঈগল।

রাজার জয় হয়েছে। তখন তিনি রানিকে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করতে আদেশ দিলেন। রানি, তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য, রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। বারোখানা গাঁয়ে ঘুরে ছেঁড়া কাপড় ভিক্ষে করে তা-ই দিয়ে একটা শাড়ি তৈরি করিয়ে, সেইটে পরেই যাত্রা করলেন বনের উদ্দেশ্যে।

যখন রানি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। বনে এমনিতেই খাবার জোটে না। এই ছোট্ট শিশুটি জন্ম নেওয়ার পর রানির কষ্ট আরো বেড়ে গেল।



বারো বছর কেটে গেল।

একদিন এক শিকারী বনের সেই অংশে শিকার করতে এলেন। একসময় তিনি দারুণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন, কিন্তু কাছাকাছি কোনো ঝরনা বা নদী তাঁর নজরে পড়ল না। হঠাৎ সেই বিজন অরণ্যের মধ্যে একটি গাছের নীচে রানিকে বসে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়ে তিনি ভাবতে লাগলেনঃ এমন পরমা সুন্দরী নারী একাকী এখানে বাস করেন কী ভাবে? তিনি যখন রানির কাছে এক পাত্র জল প্রার্থনা করলেন, তখন রানি একটা কুঁড়ের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে তাঁকে বললেন ঃ

'ওখানে আমার ছেলে আছে। আপনি গেলে সে-ই আপনাকে জল দেবে।'

শিকারি সেই কুঁড়েয় গেলেন। সেখানে একটি বালককে দেখে তিনি তার কাছে তৃষ্ণার জল প্রার্থনা করলেন। কিন্তু বালকটি বলল ঃ

'আমাদের কেউ নেই, আমরা অনাথ। আমি আপনাকে এক শর্তে জল দিতে পারি যে, আপনি এখান থেকে আমাদের আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন।'

শিকারি সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হলেন, কেননা তিনি একজন ধনী জমিদার, এবং এই বালক ও তার মায়ের উপর তাঁর ভারী মায়া পড়ে গিয়েছিল।

তারপর সেই বালক মুখে বিড়বিড় করে কীসব উচ্চারণ করল এবং তার ডান পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে একটা জলের ফোয়ারা মাটি ভেদ করে উপরে উঠে এল। শিকারি সেই ফোয়ারার জল পান করে তৃষ্ণা নিবৃত্ত করলেন। তারপর তিনি মা ছেলে দুজনকেই নিজের গাঁয়ে নিয়ে এলেন।

গ্রামবাসীরা দেখল তাদের প্রভু এক সুন্দরী নারী এবং একটি সুন্দর বালককে সঙ্গে করে গ্রামে আসছেন। এই দেখে তারা খুব খুশি হয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল ঃ

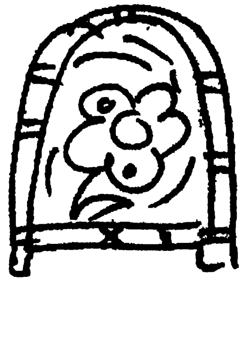
'মালিক, বন থেকে একটি পরীকে নিয়ে এসেছেন।' তারা সকলে সসম্মানে রানি এবং বালকটিকে অভ্যর্থনা জানাল।

জমিদার রানি এবং তাঁর পুত্রের জন্য একটি ছোট্ট রাজপ্রাসাদ বানিয়ে দিলেন। কিন্তু রানির কপালে এ-সুখও স্থায়ী হল না। তিনি অসুখে পড়লেন। মরার আগে পাখিদের অভিশাপ দিয়ে তিনি বললেন ঃ

'তোমরা আমাকে গৃহচ্যুত করেছিলে, আমাকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটে বেড়াতে বাধ্য করেছিলে। তাই, আমি অভিশাপ দিচ্ছি ঃ তোমরাও কখনো সুখে-শান্তিতে গৃহে বাস করতে পারবে না, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হবে তোমাদেরও।'

সেই থেকে পাখিরা নিরাশ্রয় ও গৃহহীন। তাদের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় উড়ে এবং ঘুরে বেড়াতে হয়।

তারা নির্দোষ। তবু ভাগ্যের ফেরে তাদের চিরকাল এই নিদারুণ অভিশাপ বয়ে বেড়াতে হয়। নির্দোষের এহেন শাস্তি বড়োই দুঃখজনক।



ভীলদের সৃষ্টিকাহিনী



ভীলদের ঈশ্বর 'ভগবান' পৃথিবী সৃষ্টি করেন এবং তারপর সৃষ্টি করেন দুটি মানুষ— একটি পুরুষ, একটি নারী।

আগে সেই পুরুষ আর নারী ভাইবোনের মতো একসাথে পরম সুখে বাস করত। তারা ছিল খুব দয়ালু; পশুপাখিদের উপরেও তাদের স্নেহ ছিল অগাধ।

প্রত্যেকদিন ভাইটি বেরিয়ে যেত কাজে। তখন বোনটি জল আনতে যেত নদীতে। নদীতে যাওয়ার সময় সে সঙ্গে নিয়ে যেত খানিকটা ভাত, সেই ভাত খেতে দিত জলের মাছেদের।

এই ভাবেই অনেককাল কেটে গেল।

মাছ-রানি 'রো' মেয়েটির মহত্ত্বে খুব মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই একদিন সে বলল :

'কুমারী, তুমি কী পুরস্কার চাও? যদি বিশেষ কোনো জিনিসের কথা ভেবে থাকো,— আমাকে বল। আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব।'

'কিন্তু আমি এবিষয়ে কিছুই যে ভাবিনি!'— মেয়েটি জবাব দিল।

তখন মাছ-রানি তাকে বলল : 'বন্যা এবং বৃষ্টিতে শীঘ্রিই পৃথিবীটা উলটে যাবে। তোমার ভাইকে একটা খাঁচা তৈবি করতে বল। যখন বৃষ্টি শুরু হবে, তুমি আর তোমার ভাই সঙ্গে সঙ্গে সেই খাঁচাটার মধ্যে ঢুকে পড়বে। কিছু বীজ ও জল সঙ্গে নেবে। একটা মোরগকেও সঙ্গে নিতে ভুলো না যেন।'

খুব অল্প দিনের মধ্যেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল,—প্রথমে আস্তে আস্তে, পরে জোরে জোরে—মুষলধারে। অবিশ্রান্ত বর্ষণে স্বর্গ ও পৃথিবী যেন একাকার হয়ে গেল।

ভাই এবং বোনটি আগেভাগেই তাদের খাঁচাটির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। অনেকদিন সেই খাঁচাটা তাদের দুজনকে নিয়ে জলের উপর কেবলই ভেসে বেড়াতে লাগাল। মাছরানির কথামতো বোনটি কিছু বীজ, জল এবং একটি মোরগকে সঙ্গে নিতে একটুও ভুল করেনি।

অবশেষে একদিন বৃষ্টি থেমে গেল। বন্যার তোড় কমে এল। খাঁচাটাও একটা বিরাট পাথরের গায়ে ঠেকে থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই মোরগটা 'কোকর-কোঁ' করে চেঁচিয়ে ডেকে উঠল।

তখন তাদের কানে গেল, ভগবান বলছেন—

'আমি পৃথিবীটা উলটে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখনো কেউ বেঁচে আছে নাকি? মোরগের ডাক শুনে আমার তো সেই কথাই মনে হচ্ছে।'

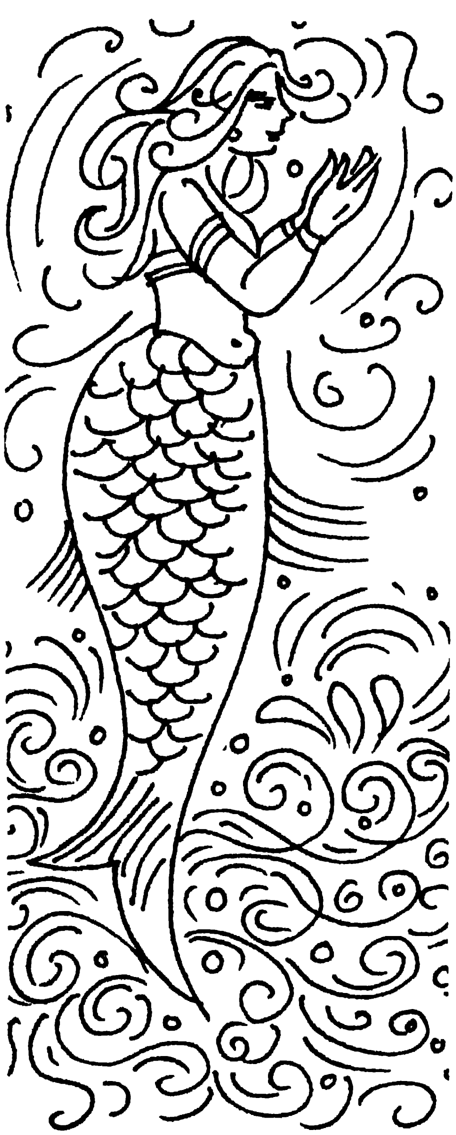
ভগবান নিজে খোঁজে বেরুলেন। হঠাৎ খাঁচাটা দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন :

'ভেতরে কেউ আছো?'

মেয়েটি জবাব দিল : 'আমরা আছি— আমি আর আমার ভাই।'

ভগবান দেখতে পেলেন সবল স্বাস্থ্যবান একজোড়া যুবক যুবতি খাঁচাটার মধ্যে লুকিয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

'আমি গোটা পৃথিবীটা ধ্বংস করেছি। প্রলয় সম্পর্কে আগেভাগে কে তোমাদের সাবধান করে দিয়েছিল এবং খাঁচা বানানোর বুদ্ধিই বা দিয়েছিল কে?'



মেয়েটি জবাব দিল ঃ 'রো' মাছ আমাদের এইরকম আদেশ দিয়েছিল।'

ভগবান মাছ-রানিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'তুমিই এই দুজনকে খাঁচা বানানোর বুদ্ধি দিয়েছিলে?'

প্রতিবাদের সুরে মাছ-রানি বলল ঃ না, হে পরম পিতা, আমি না।'

তখন ঈশ্বর যেই তাকে মারতে শুরু করলেন, তখন সে কাঁদতে কাঁদতে স্বীকার করে বসল এবং বলল ঃ 'হ্যাঁ, পিতা, আমিই বলেছিলাম।'

ভগবান ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি বললেন ঃ

'যদি তুমি সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে, তোমাকে কোনোরকম শাস্তি পেতে হত না। কিন্তু তা তুমি কর নি, তাই শাস্তিই তোমার প্রাপ্য।'

এই বলে তিনি মাছ-রানির জিবটা কেটে নিয়ে সেটা জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেললেন। সেই থেকেই রো-মাছের জিব নেই।

তারপর ভগবান সেই যুবক ও যুবতিটির দিকে তাকালেন এবং তাদের প্রতি প্রসন্ন হলেন। তারপর তিনি মেয়েটির মুখ ঘুরিয়ে দিলেন— পূর্বদিকে এবং ছেলেটির মুখ—পশ্চিম দিকে। আবাব দুজনেরই মুখ ঘুরিয়ে তাদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলেন।

তারপর তিনি পুরুষটিকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

'ও কে?'

পুরুষটি মেয়েটিব দিকে চাইল, একটা অদ্ভুত অনুভূতি ছড়িয়ে গেল তার চেতনায়। সে জবাব দিল ঃ

'ও আমার স্ত্রী।'

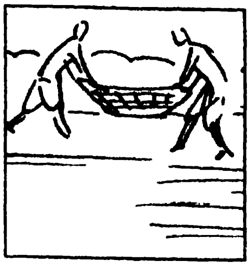
'ও কে?' তিনি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে-ও একটা অদ্ভুত অনুভূতির আবেশে বলে উঠল ঃ

'ও আমার স্বামী।'

ভগবান এইভাবে স্বামী-স্ত্রী সৃষ্টি করলেন।

সেই দম্পতিরই সন্তান সমগ্র মানবজাতি।

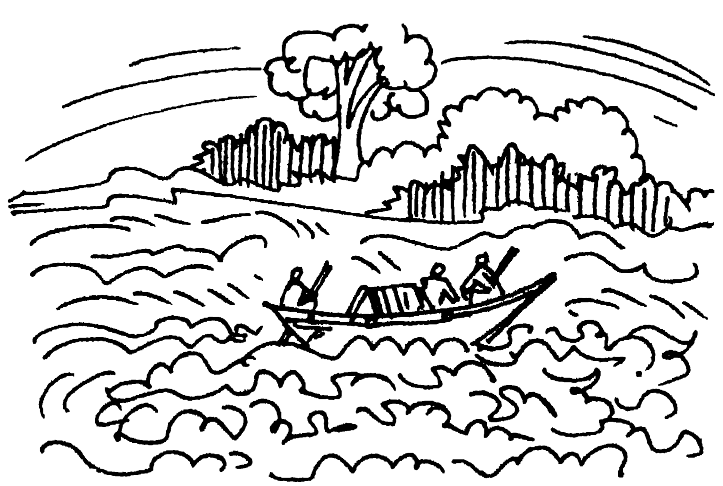
মৃত্যুভয়



জেলেদের গ্রাম। সমুদ্রের উপকূলে বাঁশ দিয়ে তৈরি-করা ছোটো ছোটো কুঁড়েঘরে অনেকগুলি পরিবারের বাস। কোন্ মান্ধাতার আমল থেকে কত যুগ ধরে এখানে বাস করছে তারা, কেউ বলতে পারে না। তাদের বাপ-ঠাকুর্দারা এখানে বাস করেছে। বাপ-ঠাকুর্দাদের বাপ-ঠাকুর্দারা-এখানে বাস করেছে। একই জায়গায় একই ভাবে। এইভাবে কেটে গেছে অনেক প্রজন্ম।

প্রত্যেকদিন যখন বিকেলের আকাশে সূর্যের রক্তিম আলোগুলি আলসের মতো খেলা করে, সেই সময় তারা ছোটো ছোটো নৌকাগুলো ভাসিয়ে দেয় সমুদ্রে, এবং যতক্ষণ-না চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে, ততক্ষণ বেয়ে যেতে থাকে। তারপর একসময় সমুদ্রজলে ছড়িয়ে দেয় জালগুলো; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত-না পূবেব আকাশ আবাব বঙিন আলোয় ভরে ওঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত নৌকার উপব ঠায় বসে থাকে, বসে থাকে আর গান গায়। এই গানগুলো তাদের বাপ-ঠাকুর্দারা গাইত, তারাও গায়। মুখে মুখে শোনা, মনে মনে গাঁথা, পুরনো— অতি পরিচিত এই সব গান। তারপর আস্তে আস্তে গুটিয়ে নেয় জালগুলো এবং নৌকাগুলোর মুখ ফিরিয়ে দেয় তীরের দিকে।

এইভাবে প্রত্যহ তারা কঠোর পরিশ্রম করে। ঝুঁকি নিয়ে মাছ ধরে। সেই সব মাছ বিক্রি হয় নিকটবর্তী গ্রাম ও শহরগুলিতে।



নতুন নতুন মৎস্যক্ষেত্র আবিষ্কারের নেশায় কখনো কখনো তারা ঢুকে পড়ে গভীর সমুদ্রে। কোনো কোনো নৌকা ডুবে যায়। কখনো কখনো ঝড়ের মধ্যে পড়ে যাত্রীসহ কোনো কোনো নৌকা যায় হারিয়ে। উপকূলবর্তী কুঁড়েগুলোয় সেই খবর পৌঁছনোমাত্র কান্না আর হাহাকারে ভরে যায় আকাশ ও বাতাস। কিন্তু এই কান্না ও হাহাকার কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সমুদ্রের দূরপ্রসারী তরঙ্গমালার আহ্বানে জেলেদের ধমনীর রক্ত আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। সমুদ্রের এই আহ্বান অবহেলা বা অগ্রাহ্য করার কোনো ক্ষমতাই নেই তাদের। তাই আবার তারা সমুদ্রের বুকে ভাসিয়ে দেয় নৌকা।

আন্তনিও এইভাবেই একদিন হারিয়েছিল তার বাবাকে। প্রতিবেশী মৎস্যজীবীরা মায়ের কাছে এসে খবরটা

দিয়ে গিয়েছিল। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ঢেউয়ের আঘাতে উলটে গিয়েছিল তার বাবার নৌকাটা, বাবা ডুবে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে, কোনোরকমে বাবার সতীর্থ মৎস্যজীবীরা তীরে টেনে নিয়ে আসতে পেরেছিল ছোট্ট নৌকাটা।

আন্তনিও এবং তার মা অনেকক্ষণ ধরে চিৎকার করে কেঁদেছিল বাবার জন্য। কিন্তু পরের দিনই তাকে নৌকাটা সারাতে দিয়ে আসতে হয়েছিল সারাইকারীদের কাছে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে সেই নৌকাটা নিয়েই মাছ ধরার জন্য অন্যান্য জেলেদের সঙ্গে সমুদ্রে পাড়ি জমাতে হয়েছিল তাকেই।

সেদিন বিকেলবেলা আন্তনিও একটা জাল কেনার জন্য বাজারে যাচ্ছিল। পথে জমিদারের ছেলের সঙ্গে দেখা।

আন্তনিও-র সঙ্গে জমিদারের ছেলের অনেকদিন ধরেই আলাপ-পরিচয়, পথেঘাটে দেখা হলেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে।

জমিদারের ছেলে আন্তনিওকে জিজ্ঞাসা করল ঃ 'কী, জাল কিনতে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। কালই আবার সমুদ্রে মাছ ধবতে বেরুচ্ছি কি না। তুমি আসবে?'



'কী? সমুদ্রে—মাছ ধরতে? না, বাবা। আমার ভীষণ ভয় করে।'

'ভয়? কীসের ভয়?'

'অবশ্যই সমুদ্রের ভয়। আমি শুনেছি মাত্র এক সপ্তাহ আগে তোমার বাবা সমুদ্রে ডুবে মারা গেছেন।

'তাতে কী?'

'এরপর সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে তোমার ভয় করছে না?'

'তা কেন করবে? আমি মৎস্যজীবীর সন্তান। মৎস্যজীবীরা সমুদ্রকে ভয় পায় না।'

'আচ্ছা বলো তো, তোমার ঠাকুর্দা কী করতেন?'

'তিনিও মৎস্যজীবী ছিলেন— মাছ ধরতেন।'



'কীভাবে তিনি মারা গিয়েছিলেন?'

'সমুদ্রে ঝড়ের মধ্যে পড়ে তাঁর নৌকা ডুবে যায়। তারপর আর তিনি ফিরে আসেন নি।'

'তোমার বাবা?' বিস্মিত হয়ে জমিদাব-পুত্র জিজ্ঞাসা করে।

'তিনিও সমুদ্রেই মারা গেছেন। তবে ঠাকুর্দার চেয়ে তিনি আরো দুঃসাহসী ছিলেন। তিনি পূর্ব-উপকুলের কলম্বো ছাড়িয়েও অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতেন। ডুবুরি ছিলেন তো, —সমুদ্রে ডুব দিয়ে মুক্তা সংগ্রহ করতেন। সেই তিনিও সমুদ্রে ডুবে গেলেন আর উঠে এলেন না।'

'আশ্চর্য! তোমবা কীরকম মানুষ হে? সব সময় সমুদ্রেই ডুবে মরছ তোমরা, তবু বারবার সেই সমুদ্রেই যেতে চাও?' —জমিদারপুত্র সবিস্ময়ে বলল।

আন্তনিও জমিদার-পুত্রের আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে জরিপ করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল ঃ

'আমি শুনলাম সম্প্রতি তোমার ঠাকুর্দার নাকি মৃত্যু হয়েছে। কোথায় মৃত্যু হয়েছিল তাঁর?'

'বাড়িতে ঘুমের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স হয়েছিল তো! যখন চাকরেরা তাঁকে ঘুম থেকে তুলতে যায়, দেখে— তিনি মারা গেছেন।'

'এবং তোমার প্রপিতামহ?'

'তিনিও খুব বুড়ো হয়েছিলেন এবং ঘরের মধ্যে জ্বরে ভুগেই তিনি মারা যান।'

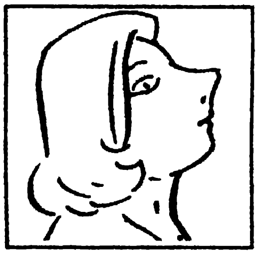
'এবং তোমার বৃদ্ধ-প্রপিতামহ?'

'শুনেছি তিনি অনেকদিন ধরে ভুগছিলেন; তাঁরও মৃত্যু হয়েছিল বাড়িতেই।'

'হায় ঈশ্বর! তাঁরা সকলেই বাড়িতে মারা গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তুমি সেই বাড়িতেই থাক? তোমার ভয় করে না?'

এই কথা শুনে জমিদার-পুত্র করুণ মুখে আন্তনিও-র দিকে চেয়ে থাকল।

পাঁচ কারিগর



একদা এক শহরে পাঁচ বন্ধু বাস করত। সবাই যুবক। তাদের মধ্যে প্রথম জন হল ছুতোর, দ্বিতীয় জন তাঁতি, তৃতীয় জন স্যাকরা, চতুর্থ জন শাঁখারি এবং পঞ্চম জন বামুন।

সেই শহরে রুজি-রোজগার তেমন ভালো হচ্ছিল না বলে সেই পাঁচ কারিগর-বন্ধু নিজের নিজের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়ল পথে— কোনো নতুন জায়গায় গিয়ে যদি ভাগ্য ফেরানো যায়— এই আশায়।

সন্ধেবেলা তারা এসে পৌঁছল এক গভীর বনে। বনের পথ এত অন্ধকার যে চেনা যায় না। কাছেই একটা ছোট্টো নদী। নদীর ধারে একটা বিশাল অশ্বত্থ গাছ। ঠাণ্ডা মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে। ধীরে ধীরে আকাশে উঠছে পূর্ণিমার চাঁদ। জায়গাটা সত্যিই মনোরম।

ঠিক হল, ওই গাছের ডালের উপর শুয়ে-ঘুমিয়েই একটা রাত পার করে দেবে তারা।

সারাদিন হাঁটাহাঁটিতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সবাই। ঘুমে চোখ ভেঙে আসছিল।

এক বন্ধু বলল : 'আমরা সবাই যদি একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ি, হঠাৎ বাঘ-টাঘ এসে আমাদের কাউকে তুলে নিয়ে যায়— তখন কী হবে?'

কথাটা শুনে সকলেই মহা ভাবনায় পড়ে গেল।

তখন বামুন বলল : আমাদের মধ্যে এক একজনকে পালা করে জেগে পাহারা দিতে হবে, তবেই আমরা সকলে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারব,— নচেৎ এই পাণ্ডববর্জিত বনে-জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুকের পেটে যাওয়া এমন আর বিচিত্র কী!

সবাই প্রস্তাবটা মেনে নিল।

কিন্তু সমস্যা হল : কে কার পরে পাহারা দেবে— প্রথমে কে দেবে, শেষেই বা কে দেবে?

বামুনমশাই-ই বিধান দিল, বলল : সর্বপ্রথম ছুতোর, তারপর তাঁতি, তারপর স্যাকরা, তারপর শাঁখারি এবং সবশেষে সে নিজে পাহারা দেবে।

তখন ছুতোর বাদে আর চারজন শুয়ে পড়ল।

ঝিরঝির করে বাতাস দিচ্ছে। চাঁদের আলো ক্রমশ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। নদীর জলের কলকল শব্দে ভেসে আসছে। ছুতোর মনে মনে ভাবল : চুপচাপ বসে বসে কতক্ষণ আর জেগে থাকা যায়? হঠাৎ ঘুমিয়েই পড়ি যদি—! তাহলে—? ভাবতেও তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। একটা কাজ করা যেতে পারে। সব যন্ত্রপাতিই যখন সঙ্গে আছে, তখন শুধু শুধু বসে না থেকে কাঠ দিয়ে একটি যুবতি মেয়ের মূর্তি তৈরি করে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

সুতরাং আর দেরি না করে সে তার যন্ত্রপাতি নিয়ে নীচে নেমে এল। একটা বড়ো আকারের কাঠ ফেঁড়ে, মাপজোক করে নিবিষ্ট মনে মূর্তি তৈরির কাজে লেগে গেল। দেখতে দেখতে এক সময় মূর্তি তৈরি শেষ হয়েও গেল। অপূর্ব, সুন্দর সেই নারী মূর্তি! নিজের সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখে নিজেই সে চোখ ফেরাতে পারে না। আনন্দে ভরে উঠল তার মন। ধীরে ধীরে অশ্বত্থ গাছের গায়ে মূর্তিটি ঠেস দিয়ে রেখে, তাঁতির ঘুম ভাঙিয়ে তাকে পাহারা দিতে বলে অতঃপর সে শুয়ে পড়ে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ডুবে যায় গভীর ঘুমে।



জেগে চোখ মুছতে মুছতে তাঁতি গাছ থেকে নীচে নেমে এল। খানিকটা এগিয়ে যেতেই তার চোখে পড়ল ছুতোরের তৈরি-করা অপূর্ব নারীমূর্তিটি। সে সোল্লাসে বলে উঠল ঃ 'আহা, কী চমৎকার, কী সুন্দর মূর্তিটি! ছুতোর-ব্যাটার হাতে যেন জাদু আছে!... কিন্তু মূর্তিটির পরনে যে কিছুই নেই— একেবারে ন্যাংটা? ওকে কাপড় পরানো দরকার।' এই কথা ভেবে সে তার যন্ত্রপাতি দিয়ে, মাকড়সার জালের উপর সুন্দর-সুন্দর কারুকাজ করে, তাই দিয়ে চমৎকার একজোড়া শাড়ি আর চেলি বানিয়ে ফেলল। তারপর সেই শাড়ি আর চেলি পরিয়ে মূর্তিটিকে আবার অশ্বত্থ গাছের গায়ে ঠেসিয়ে রেখে, স্যাকরাকে জাগিয়ে সে তার জায়গাতে শুয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে-পড়ল।

স্যাকরাও, অন্য দুই বন্ধুর মতো সেই দারুমূর্তির সৌন্দর্য দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। কিন্তু তার খেদ এই যে, মূর্তিটার গায়ে কোনো অলঙ্কার নেই। সেইজন্য সে তার যন্ত্রপাতি বের করে অল্পক্ষণের মধ্যে

নতুন ধরনের নকশা-করা অনেকগুলো গয়না তৈরি করে ফেলল। তারপর পরম আদরে সেই গয়নাগুলো দিয়ে মূর্তিটাকে সাজিয়ে, অপলক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। —আহা, কী রূপ! — যেন স্বর্গের অপ্সরা নেমে এসেছে মর্তে!

এবার তারই ঘুমনোর পালা। তাই সে শাঁখারিকে জাগিয়ে তাকে পাহারা দিতে হুকুম করে নির্দিষ্ট জায়গাতে গিয়ে শুল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

চাঁদ এখন মাথার উপরে। যখন শাঁখারি সেই চমৎকার মূর্তিটি দেখতে পেল, সে-ও বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল ঃ 'কী সুন্দর। কী জীবন্ত! কিন্তু হায়! ওর কপালে কুমকুম নেই, গলায় মঙ্গলসূত্র নেই, নরম হাতে নেই শাঁখা। এসব ছাড়া ভারতীয় নারীর মাধুর্য ফোটে না।' মনে মনে এই কথা বলে সে এক জোড়া শাঁখা ও একটি মঙ্গলসূত্র তৈরি করে সেই মূর্তিটির হাতে ও গলায় পরিয়ে দিল। তা তো হল। কিন্তু এখন কুমকুম পাওয়া যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে ছুরি দিয়ে নিজের আঙুল কেটে রক্ত বের করে সেই রক্ত দিয়ে সে মূর্তিটির কপালে একটা টিপ এঁকে দিল। তারপর সেটিকে গাছের গায়ে ঠেসিয়ে রেখে নিজের জায়গায় শুতে গেল।

এবার বামুনের জাগার পালা। ভোর হতে আর দেরি নেই দেখে প্রথমে বামুন গেল নদীতে। স্নান সেরে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে আগের জায়গায় ফিরে এল। হঠাৎ তার নজর পড়ল মূর্তির উপর। এগিয়ে গিয়ে সেও উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ঃ 'আহা, কী সুন্দর! এ সৌন্দর্যের বোধ হয় কোনো তুলনাই হয় না। কিন্তু হায়, ওর প্রাণ কোথায়? প্রাণ ছাড়া সৌন্দর্যের দাম কী?' এই কথা ভাবতে ভাবতে সে মূর্তিটাকে, পাথরের উপর দাঁড় করিয়ে একভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল এবং মূর্তির গায়ে জলের ছিটে দিতে লাগল। ক্রমশ সকাল হয়ে এল। হঠাৎ বাতাসে কীসের যেন একটা সাড়া পড়ে গেল, এবং মূর্তিটিও যেন জীবন লাভ করল।

বাইশ বছর বয়সের সেই সুন্দরী যুবতির স্বর্গীয় সৌন্দর্যে সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। কিছুতেই সে অন্যদিকে আর চোখ ফেরাতে পারে না।

প্রায় সকাল হয়ে এসেছে। চারবন্ধু একে একে ঘুম থেকে জেগে উঠল। যুবতিকে দেখে সবাই চাইল ওকে বিয়ে করতে। ক্রমে ওদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল ঝগড়া। যুবতি কোনো কথা না বলে মুচকি হেসে ওদের ঝগড়া উপভোগ করতে লাগল।

ছুতোর ভুরু তুলে, শূন্যে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে রাগের সঙ্গে বলল ঃ দ্যাখো, মূর্তিটা বানানোর চিন্তা প্রথম গজিয়েছিল আমার মগজেই। মূর্তিও বানিয়েছি আমি। সুতরাং ওকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার অধিকার সকলের চেয়ে আমারই বেশি।

ঘুঁষি বাগিয়ে তাঁতি বলল ঃ তুমি মূর্তিটা বানিয়েছ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ও ছিল উলঙ্গ। আমিই ওকে কাপড় পরিয়েছি। কাজেই ওকে বিয়ে করার অধিকার আমারই আছে।

স্যাকরা তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে যুবতির সামনে গিয়ে দাঁড়াল, বলল ঃ তুমি ওকে কাপড় পরিয়েছ, বেশ করেছ। কিন্তু অলঙ্কার ছাড়া কোনো নারীকে কল্পনা করা যায়? ওকে অলঙ্কারে সাজিয়েছি আমিই। সুতরাং আমি ছাড়া ওকে বিয়ে করার অধিকার আর কারই বা আছে?

শাঁখারি রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল ঃ 'আমি ওর হাতে শাঁখা, গলায় মঙ্গলসূত্র এবং কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিয়েছি। সুতরাং ওকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার আমার দাবিই সর্বাগ্রগণ্য।'

তখন বামুন ক্ষুব্ধস্বরে বলল ঃ 'তোমরা সকলেই বোকা। কে কী করেছ তাই নিয়ে সবাই তো খুব বাগাড়ম্বর করছ। বলি, ওকে প্রাণটা দিল কে? ও যদি একটা কাঠের পুতুলই থাকত, তাহলে তোমরা কি ওকে বিয়ে করতে চাইতে? সুতরাং ন্যায়ত ও আমারই প্রাপ্য।'

এইভাবে পাঁচ বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া চলতে লাগল। কেউ কারো দাবি ছাড়বে না। সবারই 'যুদ্ধং দেহি' ভাব।

হঠাৎ এক ঝলক বিদ্যুৎ বয়ে গেল সেই বনে এবং ভয়ঙ্কর ঝড়ে বনের সব গাছপালা উঠল মড়মড়িয়ে। ঝড় থেমে যেতেই তারা দেখতে পেল ঃ এক চাষি তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। তারা ভাবল ঃ নিশ্চয় ঈশ্বরই এই চাষিকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তখন সব্বাই ছুটে গেল সেই চাষির কাছে।

চাষি একটা পাথরের চাঁইয়ের উপর বসল এবং পাঁচ বন্ধুকে তার সামনে এসে বসতে আদেশ করল।

তারপর পাঁচ বন্ধুর দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল ঃ

'তোমবা কী নিয়ে কলহ করছ?'

তখন তারা সমস্ত গল্পটা বর্ণনা করে শোনাল চাষিকে।

সব শুনে চাষি সর্বপ্রথম ছুতোরের দিকে ঘুরে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করল ঃ



'বেশ, ছুতোর-ভায়া, তুমি মূর্তিটা তৈরি করেছ। প্রকৃতপক্ষে তোমার কাজটা কী ছিল?'

ছুতোর বলল ঃ 'আমিই মূর্তিটাকে আকার দিয়েছি।'

'বেশ, যে জন্মদান করে, তার সঙ্গে জাতকের সম্পর্ক কী?' —চাষি জিজ্ঞাসা করল।

'জন্মদাতা জাতকের পিতা।'

'তাহলে তুমি ওই যুবতির পিতা, তাই নয় কি?

'হ্যাঁ, মশাই।' ভোঁতা মুখে ছুতোর বলল।

তারপর চাষি তাঁতির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল ঃ

'বেশ, ভালোমানুষটি, তুমি এই মেয়েটিকে শাড়ি আর চেলি পরিয়েছিলে। এর অর্থ কী?'

'মশাই, আমি ওর ধর্ম রক্ষা করেছি।'

'ঠিক আছে। যে নারীর ধর্ম রক্ষা করে, তার সঙ্গে ওই নারীর সম্পর্ক কী?'

'ভাই-বোনের সম্পর্ক।'

'সুতরাং তুমি ওর ভাই।'— চাষি বলল।

এবার চাষি স্যাকরার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল ঃ

'বিয়ের সময় মামা ভাগ্নীকে কী দিয়ে সাজিয়ে সম্প্রদান করে?

স্যাকরা জবাব দিল ঃ 'গয়নাপত্র দিয়ে সাজিয়ে।'

'তাহলে তুমিই যখন ওকে গয়নাপত্র দিয়ে সাজিয়েছ, তখন তুমি ওর কে হচ্ছ!'

'মামা।'—স্যাকরা জবাব দেয়।

এরপর চাষি শাঁখারিকে জিজ্ঞাসা করল ঃ

'বর বিয়ের সময় কনেকে কী দেয়?'

শাঁখারি বলল ঃ 'হাতে শাঁখা, গলায় মঙ্গলসূত্র এবং কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেয়।'

বামুন দেখল, চাষির রায় ক্রমে শাঁখারির অনুকূলেই যেতে বসেছে।

সে বিরক্ত হয়ে বলল ঃ 'মশাই, মূর্তিটা ছিল নিষ্প্রাণ। আমিই ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছি, তা ভুলে যাবেন না।'

'শান্ত হও, বাছা, শান্ত হও,' চাষি বলল ঃ 'ব্রাহ্মণ-সন্তানকে অশান্ত হতে নেই। ঠিক আছে। জানলাম— তুমিই ওকে প্রাণ দিয়েছ। কিন্তু প্রাণ দেওয়ার প্রকৃত অর্থ কী, তা বলো দেখি?'

'প্রাণদানের প্রকৃত অর্থ চেতনা বা জ্ঞানদান।'—ব্রাহ্মণপুত্র বলল।

'যে জ্ঞানদান করে, সে ওই মেয়েটির কে হতে পারে?' —চাষি জিজ্ঞাসা করল।

'গুরু'। ব্রাহ্মণপুত্র জবাব দিল।

চাষি রায় দিয়ে বলল ঃ 'যেহেতু শাঁখারিপুত্র ওই মেয়েটির হাতে শাঁখা, গলায় মঙ্গলসূত্র ও কপালে টিপ পরিয়ে দিয়েছে, সেহেতু ওই মেয়েটির যথার্থ স্বামী।'

চাষির বিচারশক্তি দেখে চার বন্ধুই খুব বিস্মিত হল এবং তার রায়ই তারা মেনে নিল। সবাই আভূমি নত হয়ে তাকে প্রণাম করল। প্রণামান্তে মাথা তুলতেই দেখতে পেল চাষি ইতিমধ্যে কখন অন্তর্ধান করেছে।



ভূতের জন্মলাভ



উপজাতীয়দের একটি গ্রাম।

সেই গ্রামে বাস করত এক বৃদ্ধ গোঁদ-দম্পতি। বৃদ্ধা মোটমাট সাতখানা 'ভাকরি' তৈরি করেছিল। কিন্তু কে ক-খানা খাবে, তা-ই নিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে বেধে গেল তুমুল ঝগড়া।

স্ত্রী বলল ঃ এগুলো আমি বানিয়েছি, কাজেই বেশিটা আমার প্রাপ্য।

কিন্তু স্বামী বলল ঃ আমার পয়সাতেই এগুলো কেনা হয়েছে, কাজেই বেশিটা আমারই প্রাপ্য।

দুজনের মধ্যে এই নিয়ে এত বচসা হল যে, শেষমেশ দুজনেই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। নৈশ আহার না খেয়েই তাবা দুজনে চোখ বুঁজে শুয়ে থাকল।

মাঝরাতে বৃদ্ধ উঠে বসে বৃদ্ধাকে বলল ঃ এসো, একটা শর্ত করা যাক। এরপর যে আগে কথা বলবে, সে পাবে তিনখানা, আর যে ততক্ষণ চুপ করে থাকবে সে পাবে বাকি চারখানা।

বৃদ্ধা বৃদ্ধের শর্ত মেনে নিল এবং আবার মুখটি বুঁজে শুয়ে পডল।

বাত্রে কেউ একটা কথাও বলল না। সকাল হল। তবু কেউ কথা বলল না। গোটা দিন এবং বাত্রি কেটে গেল। তবু দুজনে বোবা হয়ে থাকল। পর পর দুটো দিন কেটে গেল। কিন্তু কোনো সাড়া-শব্দ নেই। গোটা বাড়িটা দুদিন ধরে নিস্তব্ধ, খাঁ-খাঁ। পাড়ার লোকেরা ভারি অবাক হল।

তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল ঃ বুড়ো-বুড়ির হল কী?

মনে নানারকম সন্দেহ হতে তারা তাদের বাড়ি এল। দরজা বন্ধ ছিল। তারা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকল। দেখল ঃ বুড়ো-বুড়ি দুজনেই মেঝের উপর পড়ে আছে, — চোখ-বোঁজা অবস্থায়। দুদিনের উপবাসে তাদের মুখ শুকনো, শরীর ভীষণ কাহিল।

প্রতিবেশীরা বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে গেল এবং জিজ্ঞাসা করল ঃ দাদু, কী হল আপনাদের?

কোনো জবাব নেই।

তখন তারা বৃদ্ধার কাছে গেল এবং জিজ্ঞাসা করল, 'দিদিমা, আপনারা কথা বলছেন না কেন?'

জবাব তো নেইই, এমন কী নট-নড়ন নট-চড়ন।

সুতরাং প্রতিবেশীরা ধরে নিল বুড়ো-বুড়ি দুজনেই পটল তুলেছে।

তখন বুড়ো-বুড়ির সৎকারের জন্য তারা একটা খাটিয়া কিনে আনল, তারপর দুজনকে তার উপব শুইয়ে নিয়ে গেল কবরখানায়। তখনো পর্যন্ত দুজনের কেউ টুঁ শব্দটিও করল না। কিন্তু যখন খাটিয়াটা কবরের মধ্যে নামানো হচ্ছে, তখন বুড়ি চিঁ চিঁ শব্দ কবে ক্ষীণ স্বরে বলল ঃ

'বেশ, আমি তিনখানা খাব, তুমি চারখানাই খেয়ো।'

হঠাৎ যেন বোমা ফাটল। সেই সাতজন শববাহক বুড়ির এই কথা শোনামাত্র ভেবে বসল ঃ বুড়ো-বুড়ি নিশ্চয়ই ভূত হয়ে গেছে। তারা তাদের সাতজনকেই খেতে চাচ্ছে।

তখন ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে খাটিয়াটা ফেলে প্রাণের ভয়ে পড়ি-কী-মরি করে তার ছুটতে লাগল।

প্রতিবেশীদের কাণ্ড দেখে বুড়ো-বুড়ি তো ভীষণ অবাক! বাঁদরগুলোর মাথার গণ্ডগোল আছে নাকি? খাটিয়া করে বয়ে এনে কবরের গর্তের মধ্যে এভাবে ফেলে চলে গেল— এ কী ধরনের রসিকতা! তখন বুড়ো-বুড়ি নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে দুজনে একযোগে কবরের ভেতর থেকে উঠে এসে, সেই সাতজন প্রতিবেশীর পিছু ধাওয়া করল। প্রতিবেশীরা যত ছোটে, বুড়ো-বুড়িও তত ছোটে।



ইতিমধ্যে সেই সাত প্রতিবেশী ছুটতে ছুটতে থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে ঘটনাটা নথিবদ্ধ করাল। পুলিশ ইনসপেক্টার কয়েকজন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সরজমিনে তদন্ত করার জন্য ঘটনাস্থলে যাত্রা করলেন। কিন্তু কয়েক পা যেতে-না-যেতেই তাঁদের চোখে পড়ল ঃ সেই বৃদ্ধ গোঁদ-দম্পতি তাদের দিকেই সবেগে ধেয়ে আসছে। পুলিশও তো মানুষ! সুতরাং, একজোড়া জ্যান্ত ভূতকে দৌড়ে আসতে দেখে তারা কোন্ সাহসে আর সামনের দিকে এগোয়? তারাও সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবাউট টার্ন হয়ে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' এই মন্ত্র জপতে জপতে পরস্পরের মধ্যে রীতিমতো দৌড়-প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল।

ছুটতে ছুটতে তারা গেল তাদের রাজার কাছে এবং রাজাকে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করে শোনাল। পুলিশদের মুখে ভূতদম্পতির অভিযানের কাহিনী শুনে রাজার বুকখানাও ঢিপঢিপ করতে লাগল। তিনি কোনোরকমে স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের হাত ধরে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে শুরু করলেন প্রচণ্ড দৌড়। মুহূর্তের মধ্যে রাজপ্রাসাদ একেবারে ফাঁকা— কাকপক্ষীর চিহ্নও দেখা গেল না।



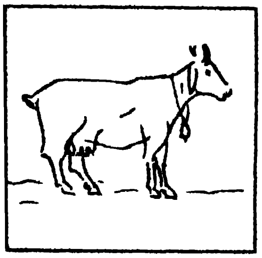
বুড়ো-বুড়ি প্রতিবেশী এবং পুলিশদের ছুটতে দেখে ধাঁধায় পড়ে তাদের পেছনে পেছনে ছুটতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু একে বয়স হয়েছে, তার উপর দুদিনের নিরম্বু উপবাস— আর ছুটতে পারছিল না।

সুতরাং সামনে রাজপ্রাসাদ দেখে তারা সেখানেই ঢুকে পড়ল। রাজপ্রাসাদে একটা কুকুর-বেড়ালেরও দেখা মিলল না।

তারপর থেকে সেই বুড়ো-বুড়ি দুজনে সেই শূন্য রাজপুরীতে পরমসুখে বাস করতে লাগল। বছরের পর বছর কেটে গেল। সেখানে আর কেউই এল না।

গোঁদরা বিশ্বাস করে যে, এই ঘটনার পরেই পৃথিবীতে 'ভয়'-এর জন্ম হয় এবং তখন থেকেই মানুষ ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে আসছে।

সততার পুরস্কার



খুবই সহজ-সরল জীবন যাপন করতো মানুষটা। নাম ছিল তার জানবা পাতিল। যেমনি ছিল ধার্মিক সে, তেমনি ছিল তার মনটাও। স্নেহ-মায়ায় ভরপুর। ছোট্ট একটি গ্রামে সে তার বউ আর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সুখে বাস করত। তার বউয়ের নাম ছিল জনাই। স্বামীর মতোই দয়ার প্রাণ তার। মানুষ কিংবা জীবজন্তু সকলেরই উপর মায়ামমতা ছিল খুব। গ্রামের মানুষদের মুখে মুখে ফিরতো তাদের দু-জনার কথা।

একফালি জমিতে ছোট্ট একটি ছবির মতো বাড়ি ছিল তাদের। এক পাশে ছিল গোয়াল। আর জমির চারধার ঘিরে ছিল সুন্দর সুন্দর ফুলগাছের বেড়া। চাষবাসের অল্প জমি ছিল তাদের। আর ছিল দুটো মেয়ে-মোষ। বিষয়-সম্পত্তি বলতে ওইটুকুই। তবু তাতেই তারা সুখী। এতটুকুও লোভ ছিল না মনে। দুঃখকষ্টও ছিল না সেই কারণে। এক এক করে বেশ কেটে যাচ্ছিল তাদের দিনগুলো।

কিন্তু দিন কেটে গেলে বয়েস বাড়ে। বয়েস বাড়লে কাজ করার শক্তি কমে। ঠিক তেমনটাই হল একদিন। সংসারের কাজকর্ম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে জনাই একদিন স্বামীকে এসে বললে, আর যে পারি না গো! বয়েস হয়েছে। এখন কি আর ঘরের কাজকর্ম সামলে দু-দুটো মোষকে দেখাশুনো করার ধকল সয়। তুমি বাপু, একটাকে নাহয় বেচেই দাও।

কথা শুনে পাতিল খানিক চিন্তা করল। মনে মনে বলল, ঠিকই বলেছে জনাই। দুটো মোষের কাজ করতে জনাইয়ের যেমন কষ্ট, তেমনি ঠিকমতো দেখাশুনো করতে না পারলে মোষগুলোরও কষ্ট। কথাগুলো ভেবে নিয়ে পাতিল বলল, বেশ বলছো যখন, কালই নাহয় যাব। হাটে গিয়ে বেচেই দিয়ে আসব একটাকে। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তাছাড়া একটা মোষ তো থাকবে। আমাদের প্রয়োজন ওতেই মিটে যাবে।

জনাই খুশি হল। বলল, তাহলে কাল সকাল-সকাল রওনা দিও, কেমন?

পাতিল ঘাড় নাড়লে। বলল, হ্যাঁ কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়ব।

যেমন কথা, তেমন কাজ। মোষের গলার দড়িটি হাতের মুঠোয় ধরে কাকভোরে রওনা দিল পাতিল। হাটের পথ তো আর একটু-আধটু নয়, কয়েক যোজন হবে। হাঁটতে হাঁটতে চলেছে পাতিল। হঠাৎ পথের মাঝে একটা লোকের সঙ্গে দেখা হল তার। পাতিল দেখল লোকটার সঙ্গে রয়েছে একটা ঘোড়া।

লোকটা পাতিলকে দেখে বলল, পাতিলবাবা যে! এমন সাত সকালে মোষ নিয়ে কদ্দুর গো?

পাতিল সরলমনের মানুষ। সব কথাই খুলে বললে লোকটাকে। সব শুনে লোকটা বললে, তোমার অসুবিধের কথা বুঝছি পাতিলবাবা। তবে কিনা, তোমার অমন সুন্দর সাধের মোষটা তুমি বেচে দেবে! নাঃ, এটা ঠিক নয়। তুমি বরং এক কাজ করো। আমার ঘোড়ার সঙ্গে তোমার মোষটার বদল করো। তোমার ঘোড়া নেই। আমার মোষ নেই। দুজনেরই দুটো নতুন জিনিস হবে। কী বল?

মোষ নিয়ে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল লোকটা। ঘোড়ায় চেপে পাতিল ধরল ফিরতি পথ। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! কয়েক পা এগোতেই পাতিল বুঝতে পারল ঘোড়াটা দু-চোখেই কানা। কিন্তু বুঝেও কিছু করার রইল না।

এমন সময় আর একজনের সঙ্গে দেখা। লোকটা পাতিলকে দাঁড় করিয়ে খোঁজ-খবর নিতে লাগল। ঘোড়ায় চেপে কোথায় যাচ্ছেন গো পাতিল? কী ব্যাপার?

কথা উঠতেই সব কথা হুড়মুড়িয়ে বলে ফেলল পাতিল। তারপর দুঃখী-দুঃখী মুখ করে বলল, এখন এই অন্ধ ঘোড়াটাকে নিয়ে কী করি, বলতো?

লোকটা জিভ কেটে বলল, ছিঃ! আপনার মত সৎ লোককে কিনা এমনভাবে ঠকাল! আপনি এক কাজ করুন, ঘোড়াটা আমায় দিয়ে আমার গোরুটা আপনি নিন। গোরুটা খায় কম। নিজে চরেই খায়। তাছাড়া দুধও দেয় বেশি। আপনার কাজে লাগবে। পাতিল বলল, তোমার গোরু নাহয় আমি নিচ্ছি। কিন্তু অন্ধ ঘোড়াটা নিলে তুমি যে মুশকিলে পড়বে। তার কী হবে?



লোকটা সামান্য হাসল। বলল, আপনার মতো মানুষের উপকারে লাগতে পারলে, ওটুকু মুশকিল আমার কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। কায়দা করে ঠিকই কাজে লাগিয়ে নেব ঘোড়াটাকে। আপনার মুখে শুধু একটু হাসি দেখতে পেলেই হবে।

এরপর লোকটার কথা আর ফেলতে পারল না পাতিল। ঘোড়াটাকে দিয়ে গোরুটা নিয়ে নিল। কিন্তু খানিকটা পথ যাবার পরেই বুঝতে পারল, গোরুটা খোঁড়া। ভালো করে চলতে পারে না। এদিকে লোকটাকে তখন আর দেখা গেল না। ঘোড়া নিয়েই সে ভেগে পড়েছে। কী আর করে পাতিল? গোরুটাকে নিয়ে কোনোরকমে হাঁটতে লাগল। হাঁটছে তো হাঁটছে। চিন্তা-ভাবনায় একসময় বেশ আনমনা হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ চমক ভাঙল একজনের প্রশ্ন শুনে, 'খোঁড়া গোরু নিয়ে এমন সকালে পাতিলবাবা হাঁটছেন! ব্যাপারটা কী?'

লোকটাকে এখন সবকথা না বলে আর উপায় আছে! সমস্ত ঘটনা একে একে বলল পাতিল। তারপর বলল, ভেবেছিলুম গোরুটাকে বাড়ি নিয়ে যাব। কিন্তু তা আর হল না। যাই একেবারে হাটে গিয়েই দেখি।

লোকটা চোখমুখ কুঁচকে বলল, না পাতিলবাবা, এটা আপনি ঠিক করছেন না। আপনি ধার্মিক মানুষ। ভগবানের দানকে এভাবে অবহেলা করা কি আপনাকে মানায়?

পাতিল ফাঁপড়ে পড়ল। বলল, তাইতো! কিন্তু এখন করি কী বলতো? এখানে থেকে হাট যতদূর, আমার বাড়ি যে তার চেয়েও ঢের বেশি দূর! অতটা পথ হাঁটালে গোরুটা হয়তো মরেই যাবে।

'সেই জন্যেই তো বলছি।'— বলল লোকটা। তারপর তার কাঁধের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, এই যে ছাগলটা দেখছেন, এর একটা পা-ও খোঁড়া নয়। আপনি এই ছাগলটা নিয়ে যান। খোঁড়া গোরুটার উপর আমার বড়ো মায়া পড়ে গেছে। ওটা আমাকে দিন। আমার বাড়ি তেমন দূরে নয়। টুক করে নিয়ে যাব। তারপর জাব-টাব খাইয়ে বেশ চাঙ্গা করে তুলব। আমারও কিছু পুণ্যের কাজ হবে।

পাতিল খুশিতে হাতদুটো জড়িয়ে ধরল লোকটার। বলল, তুমি আমাকে বাঁচালে ভাই। তোমার মতো ভালো মানুষ আর হয় না।

কিন্তু গোরুটাকে নিয়ে ভালো মানুষটি চলে যেতেই পাতিল পড়ল আর এক ঝামেলায়। ছাগলটার পাগুলো সব ঠিক আছে বটে। কিন্তু এতই অসুস্থ যে একটুও নড়তে পারছে না। উপায় খুঁজে না পেয়ে পাতিল ছাগলটাকে কাঁধে নিয়ে হাঁটতে লাগল।

এদিকে সেই পথ ধরেই হাঁটছিল একটা লোক। তার হাতে ছিল একটা মোরগ। লোকটা ছাগল-কাঁধে পাতিলকে দেখে বলল, একী পাতিলবাবা, ছাগলটার অসুখ করেছে নাকি? কোথায় নিয়ে চললেন?

পাতিল অভিমানী গলায় বলল, কী যে করব কিছুই বুঝতে পারছি না। তারপর সে সমস্ত ঘটনা খুলেই বললে লোকটাকে। লোকটা কিন্তু ভীষণ চালাক। চট করে বুদ্ধি খাটিয়ে ফেললে। আসলে ছাগলটাকে দেখেই সে বুঝতে পেরেছে, ছাগলটার কিছু হয়নি। কেবল খিদে-তেষ্টায় একটু কাহিল হয়ে পড়েছে! কিছু পাতা আর জল খাওয়ালেই ঠিক হয়ে যাবে। তাই সে বললে, আমাদের গ্রামে একজন বুড়ো মানুষ আছেন। তিনি এ যাবৎ তিপান্নটা ছাগলের অসুখ সারিয়েছেন। এটারও সারিয়ে দিতে পারেন। আপনি আর কিছুক্ষণ এভাবে নিয়ে গেলে, হয়তো মরেই যাবে ছাগলটা।

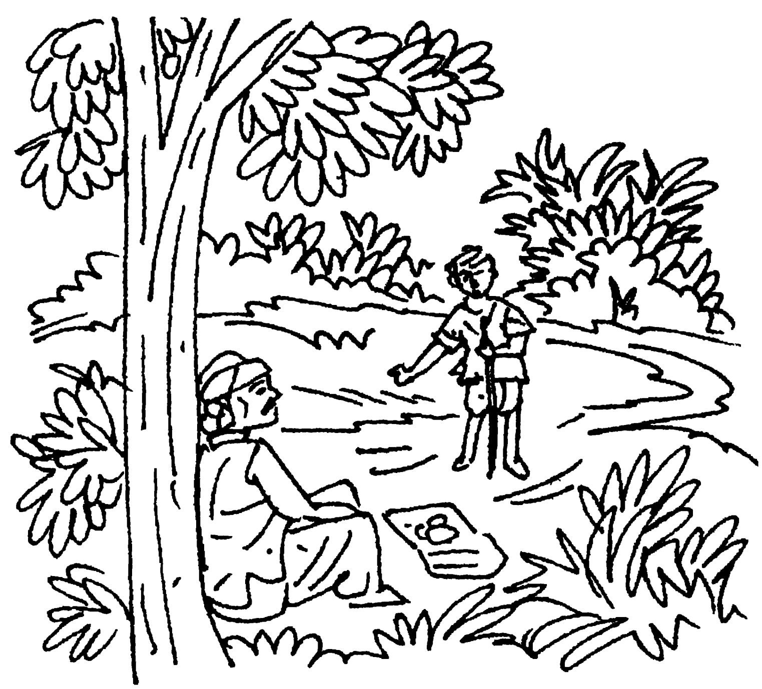
পাতিল ঘাবড়ে গিয়ে বললে, তাহলে ছাগলটাকে আপনিই বরং নিয়ে যান। সারিয়ে তুলুন। ছাগলটা বাঁচুক। যা সামান্য পারেন, আমায় কয়েকটা টাকা দিয়ে যান।

লোকটা বলল, টাকা-পয়সা তো কিছু নেই। আপনি বরং আমার মোরগটা নিয়ে যান। সুন্দর মোরগ। হাটে বেচলে ভালোই দাম পাবেন।

শেষকালে পাতিল তাই করল। মোরগটাকে নিয়ে হাটের পথেই হাঁটতে লাগল। বেলা তখন অনেক বেড়ে গেছে। খিদেও পেয়েছে ভীষণ। পাতিল ভেবেছিল হাটে গিয়ে মোষটাকে বেচে যা টাকা-পয়সা পাবে, তা

থেকে কিছু খরচ করে খাবার কিনে খাবে। কিন্তু পথেই ঘটে গেল এত কাণ্ড। তার হাতে মোষের বদলে মোরগ। যাই হোক, অনেক কষ্টে সে শেষপর্যন্ত হাটে গিয়ে পৌছাল।

পৌছেই তো আর মোরগটাকে বেচে দেওয়া যায় না। তার জন্যে অপেক্ষা করতে হল। এক সময় মাত্র এক টাকাতে মোরগটা বেচতে পারল সে। হাটের কেনাবেচা তখন পড়তির দিকে। এক টাকার থেকে বেশি কিছুতেই হল না। তখন কী আর করে, এক টাকা দিয়ে কিছু খাবার কিনে একটা গাছতলায় গিয়ে বসল সে। খাবার পাতায় সাজিয়ে খেতে যাবে, এমন সময় এক ভিখারি এসে হাজির হল সেখানে।



ভিখারি বলল, তিনদিন কিছু খাইনি। খিদের জ্বালায় মরে যাচ্ছি। আমায় কিছু খেতে দিন।

পাতিল ভিখারির দিকে তাকাল। না খেতে পেয়ে রোগা শরীর। ছেঁড়া-খোঁড়া জামা-কাপড়। মনে বড়ো কষ্ট হল পাতিলের। ভিখারির অবস্থা দেখে খুব মায়া হল তার। সাজানো খাবারটা সে ভিখারিকে দিয়ে দিল। মনে মনে ভাবল, এতটা কষ্ট যখন করেছি, তখন আরো একটু না হয় করব। একেবারে বাড়ি ফিরেই খাব। কিন্তু এই মানুষটা খাবার না পেলে মারা পড়বে।

ফেরার পথে একটা ইঁদারা থেকে জল খেল পাতিল। তারপর কোনোরকমে পা চালিয়ে বাড়ি ফিরল। সদরের কাছে আসতেই দেখতে পেল, জনাই দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজায়। সন্ধের অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছে চারিদিকে। জনাই বলল, এত দেরি হল যে ফিরতে? আমি কখন থেকে তোমার জন্যে খাবার নিয়ে বসে আছি। পাতিল বলল, তা দেরি একটু হল। আগে এক গেলাস জল দাও। তারপর সব বলছি। বলে সে ঘরে গিয়ে বসল।

জনাই এক গেলাস জল আর একটা হাতপাখা নিয়ে এল। পাতিল জল খেল। পাখার বাতাস দিতে লাগল জনাই। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করল পাতিল। একটু করে শোনে আর কথা বলে ওঠে জনাই। মোষ বদলে ঘোড়া হয়েছে শুনে সে বলল, ভালোই তো হয়েছে। ছেলেমেয়েরা চাপতে পারবে। খুব আনন্দ পাবে।

তারপর যখন শুনল, ঘোড়া নেই; বদলে গোরু হয়েছে। সে বলল, তাও চমৎকার, গোরু যথেষ্ট দুধ দেয়। মোষের মতো গোরুর কোনো ঝামেলা নেই। তাছাড়া গোরুর সেবা করতে পারলে পুণ্যি হবে।

কিন্তু তাও হল না। জনাই একে একে বদলের গল্প শুনতেই লাগল। সে কিন্তু মোটেই অখুশি নয়। তবে সে শুধু বলল, তোমার খিদে পেয়েছে। আগে খেয়ে নাও তারপর বাকিটা শুনব। জনাইয়ের কথামতো পাতিল

খেয়ে নিল। বিছানায় শুয়ে ফের কথা শুরু করল পাতিল। বেশ রাত হয়ে গেছে তখন, পাতিল গল্প শেষ করার মতো করে সবটুকু বলে জনাইকে বলল, আমি কি ভুল করলাম কিছু, বল দেখি?

জনাই বলল, ওমা সে কী কথা! তিন দিনের একজন উপোসী মানুষকে তুমি খাবার দিয়েছ। সে তো অনেক পুণ্যির কাজ। তুমি ঠিকই করেছ। ভগবান আমাদের ভালো করবেন দেখো। তিনি না চাইলে এতসব ঘটবেই বা কেন?

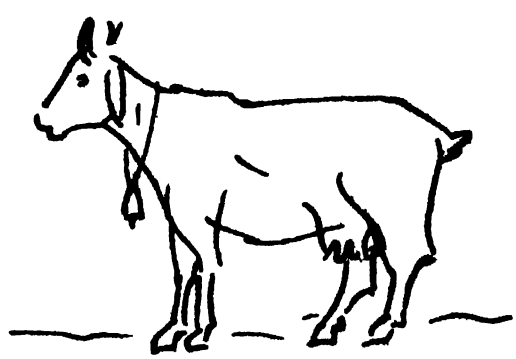
পাতিল বলল, ঠিকই বলেছ তুমি। আমারও মনে হয় তাই। ভগবান যা করেন, ভালোর জন্যেই করেন। আমরা যা কিছু করি, তাঁর ইচ্ছেমতোই করি। ভগবান আমাদের মঙ্গল করবেন।

এরপর তারা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল। ভোর রাতের দিকে হঠাৎ শোরগোল। ঘুম ভেঙে গেল পাতিলের। জনাইকেও ডেকে তুলল সে। পাতিল বলল, কিছু শুনতে পাচ্ছ?

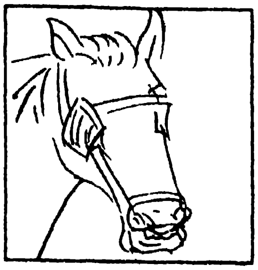
জনাই কেমন ভয়-ভয় গলায় বলল, হ্যাঁ। মনে হচ্ছে বেশ কিছু জীব-জন্তুর ডাক যেন ভেসে আসছে সদরের দিক থেকে। পাতিল বলল, চল গিয়ে দেখি। ব্যাপারটা কী?

দুজনে মিলে সদরের কাছে আসতেই অবাক হয়ে গেল। কারো মুখেই কোনো কথা সরল না প্রথমে। তারপর আশ্চর্যের ভাব কাটিয়ে উঠে পাতিল বলল, দেখো জনাই, কেমন সুন্দর মোষ একটা। ঘোড়াটাও অন্ধ নয়। জনাই বলল, গোরুটাও খোঁড়া নয়। ছাগলটাও সুন্দর, সুস্থ। পাতিল বলল, অবাক কাণ্ড একটা মোরগ রয়েছে। গাছের পাতার উপর একটা টাকাও কে যেন রেখে গেছে। ওই দেখো। জনাই এতটাই অবাক হয়েছে যে ভালো করে কথা বলতে পারছে না। কোনোরকমে ফিসফিস করে বলল, 'মনে হচ্ছে এতক্ষণে বুঝতে পারছি, এটা কার কাজ। গতকাল যে ভিখারি মানুষটাকে তুমি খাবার দিয়েছিলে, তিনি নিশ্চয়ই..

হ্যাঁ, তিনি নিশ্চয়ই ভগবান। জনাইয়ের কথাটাই শেষ করল পাতিল। তারপর পাতিল ও জনাই ভগবানকে স্মরণ করে জোড়হাত তুলে নমস্কার করল।



হাজারমারিয়ার গল্প



রাজপুরে একটা লোক বাস করত। তার ছিল ভারী অদ্ভুত অভ্যাস। প্রতিদিন সকাল থেকেই শুরু করত সে মাছি মারতে। আলেকালে একটা-আধটা মাছি অনেকেই মারে। কিন্তু এই লোকটা মাছি মারত রোজ। আর গুনে গুনে দেখত ঠিক এক হাজার হয়েছে কিনা। যদি না হত, তাহলে সে তার দুপুরের খাবার পর্যন্ত খেত না। এমন মানুষদের বউ যেমনটি হয়, ঠিক তেমনটিই হয়েছিল তার। দিনরাত যখনই সময় পেত, তখনই বলতো, 'এ কোন্ হতচ্ছাড়া কাজ তোমার বলতো! একটু ভালো কিছু করো না। কাজের কাজ করলে দুটো পয়সাও তো আসে। তোমাকে নিয়ে আমার হয়েছে যত জ্বালা।'

কিন্তু বউয়ের এসব কথায় কান দিতে তার বড়ো বয়ে গেছে। সে নগরীর পথে-পথে, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত মাছি পাবার আশায়। পুরোপুরি একটি হাজার মাছি মেরে তবেই সে বাড়ি ফিরত খাওয়া-দাওয়া করবার জন্যে। এমন কাণ্ড ঘটাতে থাকলে, তার নাম যে হাজার-মারিয়া হয়ে যাবে, এতে আর আশ্চর্য কী?

এইভাবেই কাটছিল অবশ্য দিনগুলো। বেশ ভালোভাবেই। কিন্তু বেশিদিন চলল না এরকম। হঠাৎ একদিন রাজপুর আক্রমণ করে বসল শত্রুপক্ষ। ভয়ঙ্কর প্রতাপশালী ছিল শত্রুপক্ষের সৈন্যরা। রাজপুরের রাজার সেনাবল যেমন কম, অস্ত্রবলও সেরকম কম। রাজা ভয় পেয়ে গেলেন। মন্ত্রীদের ডেকে পরামর্শ করলেন। যুদ্ধ চলতে লাগল। কিন্তু দু-একটা দিন কাটতে না কাটতে রাজপুরের বেশির ভাগ সৈন্য মারা পড়ল। নষ্ট হয়ে গেল বেশির ভাগ অস্ত্র। মন্ত্রীরা ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিলেন না, কী করা কর্তব্য।

হঠাৎ তাঁদের মনে পড়ল 'হাজার-মারিয়া'-র নাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা রাজাকে জানিয়ে দিলেন, 'হাজার-মারিয়া'-কে যুদ্ধে যোগ দিতে হবে। রাজার সৈন্যদের মধ্যে এখন আর এমন কেউ নেই যে, বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে। সুতরাং সৈন্যদের মধ্যে 'হাজার-মারিয়া'কেই আজ দরকার।

মন্ত্রীদের পরামর্শে রাজা কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। লোক পাঠালেন হাজার-মারিয়ার কাছে। রাজার মুখ থেকে যখন হাজার-মারিয়া শেষমেশ শুনল যে, তাকে রাজার সেনাদলে যোগ দিতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে শত্রু-সৈন্যদের সঙ্গে, তখন ভেতরে-ভেতরে ভয়েই অস্থির হয়ে উঠল সে। মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরোল না।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে রাজা বললেন, আদেশমতো কাজ করো হাজার-মারিয়া। না করলে তোমার মুণ্ডচ্ছেদ করা হবে।

তখন আরো বেশি ভয় পেয়ে গেল হাজার-মারিয়া। সে বুঝতে পারল, যুদ্ধে গেলেও মৃত্যু, আবার না গেলেও তাই। বড়োসড়ো একটি ঢোঁক গিলে কোনোরকমে সে রাজাকে বলল, মহারাজ, আপনার হুকুম শিরোধার্য। তবে আমাকে একটিবার আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিন। দেখা করেই আমি চলে আসব।

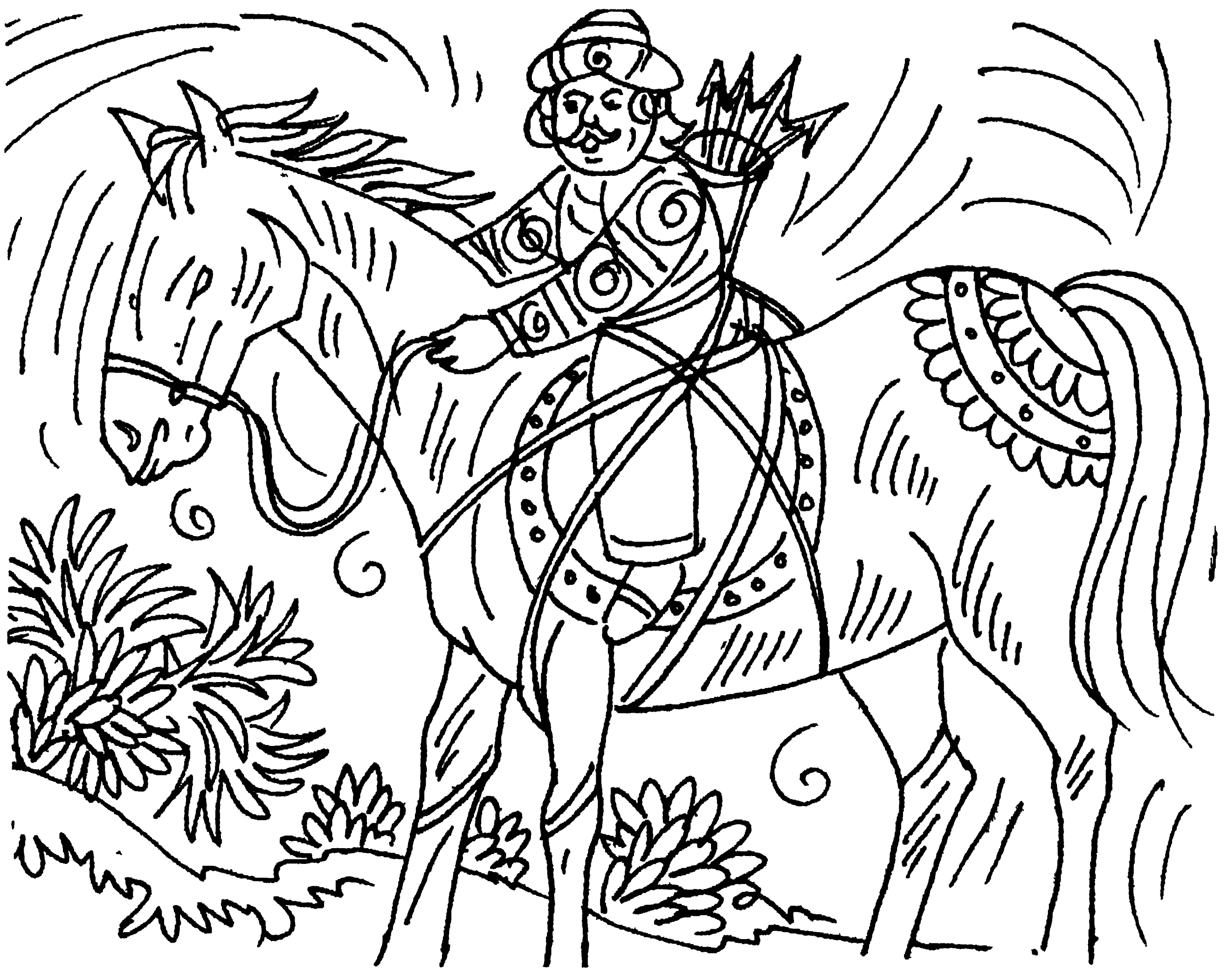
রাজা বললেন, ঠিক আছে। তবে বেশি বিলম্ব করা চলবে না। কথাটা যেন মনে থাকে।

হাঁফাতে হাঁফাতে রাজবাড়ি থেকে ফিরে হাজার-মারিয়া সব কথা খুলে বলল বউকে। আর যাই হোক, হাজার-মারিয়ার বউ কিন্তু স্বামীর মতো ভিতু ছিল না। সে বলল, তুমি যুদ্ধে যাও। জয়ী হয়ে ফিরে এসো।

বউয়ের এমন কথা শুনে হাজার-মারিয়া কিছুটা সাহস পেল। সে ভাবল, যুদ্ধে না গিয়ে রাজার হাতে মারা পড়লে, লোকে তার নামে সারাজীবন নিন্দা করে যাবে। অথচ জিততে না পেরেও যুদ্ধক্ষেত্রে মরলে সে অমরতা লাভ করবে। শহিদ হয়ে যাবে।

পরদিনই যুদ্ধে যোগ দিল হাজার-মারিয়া। রাজা তাঁকে ছোটো একটি সেনাদলের অধিনায়ক করে দিলেন। হাতে দিলেন তূণীর ভরা তির আর একটি ধনুক। অনুমতি পেয়ে হাজার-মারিয়া তার যুদ্ধযাত্রা শুরু করল বাড়ি থেকেই। তার বউ মস্ত একটি কাজ করেছে এর মধ্যে। গোরু-বাঁধা দড়ি দিয়ে হাজার-মারিয়াকে বেঁধে দিয়েছে ঘোড়ার সঙ্গে। বেশ শক্ত করে। বলেছে, পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করার ইচ্ছে হলেও তুমি যাতে ঘোড়া থেকে না নামতে পার, তার ব্যবস্থা করে দিলাম। ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করলে তুমি ঠিক জিতবে। দেখে নিও।

আসলে তার বউ ভেবেছিল, হাজার-মারিয়া ভয় পেয়ে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে পালাতে পারে। আব তাতেই মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং সে বুদ্ধি খাটিয়ে ওই ব্যবস্থাটা করল।



যুদ্ধক্ষেত্রে দুপক্ষের সৈন্যদল যখন মুখোমুখি হল, ঘোরতর যুদ্ধ বেধে গেল সে সময়। প্রচুর সৈন্য মারা পড়তে লাগল। হাজার-মারিয়ার সৈন্যরা ভয়েই পালিয়ে গেল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। কিন্তু হাজার-মারিয়ার ঘোড়াটা

পাগলার মতো ছুটতে লাগল শত্রুসেনাদের দিকে। হাজার চেষ্টাতেও ঘোড়ার মুখ ঘোরাতে পারল না হাজার-মারিয়া।

কোনো উপায় না পেয়ে সে শেষ পর্যন্ত বাঁশ বনের ভেতর দিয়েই ঘোড়া ছোটাল। দুহাতে শক্ত করে ধরল একের পর এক বাঁশ। কিন্তু বাঁশগুলো ছিল পচা। একের পর এক বাঁশ ভেঙে-ভেঙে হাতে উঠে আসতে লাগল তার। ঘোড়া যত ছোটে, ততই বাঁশ ধরে হাজার-মারিয়া। আর ঠিক তত বাঁশই ভেঙে-ভেঙে হাতে চলে আসে। শত্রুপক্ষের কাছে দৃশ্যটা বড়ো ভয়ঙ্কর ঠেকল।



একা সেনাপতি, তার কী ভীষণ সাহস। এভাবে এগিয়ে এলে মৃত্যু অনিবার্য। বড়ো বড়ো বাঁশ একের পর এক ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে যাচ্ছিল হাজার-মারিয়া। আসলে সে তো চেয়েছিল, বাঁশ ধরে থাকলে ছুটন্ত ঘোড়া তার দেহের সঙ্গে বাঁধা দড়ি ছিঁড়ে ছুটে যাবে। কিন্তু তা আর হল না। কিন্তু না হয়ে যে কত ভালো হল, সেটা সে বুঝল পরে।

শত্রুসৈন্যরা হাজার-মারিয়ার ওরকম ছুটন্ত মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেল রীতিমতো। যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে তারা পালিয়ে বাঁচল। হাজার-মারিয়ার সৈন্যরা ফের ফিরে এল একে একে।

রাজা হাজার-মারিয়াকে বিপুল সম্মানে সম্মানিত করলেন। হাতির পিঠে চেপে নগর ভ্রমণ করল হাজার-মারিয়া। নানা উপহার পেল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। ফিরে এসে হাজার-মারিয়া ঘোষণা করল, এবার থেকে আরো ভালো-ভালো কাজ করবে সে। যাকে বলে কাজের মতো কাজ। ফিসফিস করে বউকে বলল, আর মাছি মারব না। এবার থেকে তুমি যা বলবে, তাই করব আমি। দেখে নিও।

কথাটা মিথ্যে নয়। হাজার-মারিয়া তারপর থেকে আর কখনও মাছি মারেনি। কাজ করেছে। পয়সা-কড়ি উপায় করেছে। কোনো ঝগড়া, কথা-কাটাকাটি নয়। সুখে ঘর করেছে দুজনে মিলে।

টাকার গাছ



আত-পাত-নগরে[১] এক ব্রাহ্মণ বাস করত।

একদিন সে রাজার কাছে গেল ভিক্ষার জন্য। রাজামশাই তাকে একশোটি টাকা দিতে গেলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ তা নিতে অস্বীকার করে বলল ঃ

'আমি একশো টাকা চাই না। আমাকে একটিমাত্র পয়সা দিন—তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু তা আপনার নিজের রোজগার হওয়া চাই।'

রাজা খানিকটা হতভম্ব হয়ে গেলেন। নিজের পরিশ্রমে উপার্জিত পয়সা তিনি কোথায় পাবেন? রাজকোষের কোটি কোটি টাকা, রাশিরাশি মণিমুক্তো, সোনারুপো— কিছুই যে স্বোপার্জিত নয়।

কাজেই তিনি অপ্রতিভ মুখে ব্রাহ্মণকে বললেন ঃ দুদিন পরে আসুন, আপনার ইচ্ছা পূরণ করব।

পরদিন রাজা ঘুম থেকে উঠলেন খুব সকাল-সকাল এবং রাজকীয় পোশাক ছেড়ে রেখে পুরনো শতচ্ছিন্ন জামাকাপড় পরে নিকটবর্তী একটি গ্রামে গেলেন কাজের খোঁজে।

একদল লোক রাস্তা-তৈরির কাজ করছিল, তাদের 'মেটে'র কাছে গিয়ে তিনি বললেন ঃ 'আমাকে একটা কাজ দিতে পার?'

লোকটা জিজ্ঞাসা করল ঃ 'তুমি কী কাজ পার? মাটি খুঁড়তে পারবে?'

'হ্যাঁ', রাজা জবাব দিলেন।

কাজ আছে, তাহলে এই কোদালটা নাও— ওই জায়গাটা খুঁড়ে মাটি এনে রাস্তার উপর ফ্যালো।'

তখন রাজা একটা কোদাল তুলে নিয়ে মাটি খুঁড়তে লেগে গেলেন।

রাজা শারীরিক শ্রমে অনভ্যস্ত, জীবনে কখনো মাটি কাটেন নি। কাজেই, মাটি কাটতে গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি হাঁপিয়ে এবং ঘেমে নেয়ে উঠলেন। তাঁর হাতে বড়ো বড়ো ফোসকা পড়ে গেল। তখন তিনি আর কোদালটাই ধরে রাখতে পারছেন না।

রাজাকে পরিশ্রান্ত দেখে 'মেট' মন্তব্য করল ঃ

'দ্যাখো বাপু, মনে হচ্ছে তুমি খুব কাহিল হয়ে পড়েছ,— মাটি কাটতে তোমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। তোমাকে দিয়ে হবে না, বরং এই চার আনা পয়সা নিয়ে তুমি নিজের পথ দ্যাখো।'

এই বলে লোকটা রাজার দিকে চার আনা পয়সা ছুঁড়ে দিল। রাজা সেই পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন।

পরদিন রাজা সেই চার আনা পয়সা নিয়ে ব্রাহ্মণের জন্য অপেক্ষা করছেন। যথাসময়ে ব্রাহ্মণ এসে আবার তাঁর কাছে ভিক্ষে চাইল। রাজা তাঁর জামার পকেট থেকে পয়সাটা বের করে ব্রাহ্মণের হাতে দিয়ে বললেন ঃ

---

১. কাল্পনিক শহর, মানচিত্রে যার উল্লেখ নেই; মহারাষ্ট্রের লোককথায় কেবল পরিচয় পাওয়া যায়।

'মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই চার আনা পয়সা আমি উপার্জন করেছি। এটা নিতে নিশ্চয় তোমার আপত্তি হবে না!'

ব্রাহ্মণ সেই চার আনার মুদ্রাটি হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।



কিন্তু সেই পয়সা দিয়ে সে কী করবে? নিজের জন্য তার তো কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই।

সুতরাং করল কী— বাড়ির পেছনদিকে তুলসীমঞ্চের নিকটে মাটির তলায় সে সেই মুদ্রাটি পুঁতে রাখল।

মুহূর্তের মধ্যে মুদ্রাটিতে অঙ্কুর গজাল এবং কয়েক দিনের মধ্যে একটা বিশাল গাছে পরিণত হল। দেখতে দেখতে সেই গাছে ফলও ফলল— টাকার ফল। সমস্ত গাছটা টাকার ফলে ছেয়ে গেল।

একদিন রাজার ভৃত্যেরা পূজার জন্য ফুলের খোঁজে সেই ব্রাহ্মণের বাড়ি এসে দেখে ঃ একটা গাছে শুধু টাকা আর টাকা ঝুলছে, ফুল-ফল বলতে কিছুই নেই।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে তারা রাজাকে বলল ঃ রাজামশাই, আপনার আবার একটা বাগান! দেখে এলাম বামুনঠাকুরের বাগানটা! আহা, বাগানের একটা গাছে— খালি টাকাই ঝুলছে— একেবারে চাঁদির টাকা। রোদ পড়ে কীরকম ঝকমক করছে গো!

ভৃত্যদের কথা শুনে রাজা ভারি অবাক হলেন। টাকার গাছ— গাছে টাকা ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষকে ডেকে বললেন ঃ যাও, শীঘ্রি গিয়ে ওই বামুনের বাড়ি থেকে টাকার গাছটা তুলে নিয়ে এসো।

কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজার লোকেদের সেই গাছটা স্পর্শ করতেও দিল না, বলল, 'যদি রাজা চান, তিনি নিজেই এসে গাছটা তুলে নিয়ে যান। তোমাদের নিয়ে যেতে দেব না।'

রাজা এলেন। যেই তিনি গাছটা উপড়াতে যাবেন, ব্রাহ্মণ বলল ঃ বেশ, রাজা, আপনার মনে আছে, আপনি আমাকে কী দিয়েছিলেন? মাত্র চার আনার একটি মুদ্রা। কিন্তু যেহেতু আপনি নিজের পরিশ্রমে ওই চার আনা পয়সা উপার্জন করেছিলেন, তাই ওই চার আনা পয়সা এমন একটা বিশাল টাকার গাছে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং গাছটা আপনারই। কিন্তু মনে রাখবেন যে, আপনি আমাকে মাত্র চার আনা পয়সা দিয়েছিলেন। আপনি আমাকে যাই দিয়ে থাকুন, —যদি আপনি সুখী হন, গাছটা নিতে পারেন।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা লজ্জায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর ব্রাহ্মণ অন্যমনস্ক হওয়ামাত্র চোখের পলকে সটকে পড়লেন সেখান থেকে।

কমলারানি ও একটি পরশ পাথর



বাতাসের দেবতা পবনরাজের ছিল বিশাল রাজত্ব। মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারায় ছোট্ট শহর পাবনীতেই নাকি ছিল তাঁর রাজধানী। স্থানীয় উপজাতি মানুষদের এইরকমই বিশ্বাস। কমলারানি ছিলেন সেই রাজা পবনদেবের স্ত্রী। শোনা যায় রাজা পবন নাকি চান করতেন পাবনীতে। দুপুরের ভোজ সারতেন ভন্দকে। আর রাতে বিশ্রাম নিতেন অমরাবতীতে। হবে না-ই বা কেন, যে বিশাল রাজত্ব তাঁর!

কমলারানির ভারি আশ্চর্য এক ক্ষমতা ছিল। তিনি সরোবরের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারতেন। পারতেন জলেভাসা পদ্মের উপর সোজা হয়ে দাঁড়াতে। আর পারতেন সরু সুতোয় বেঁধে কাঁচামাটির কলসিতে করে কুয়া থেকে জল তুলতে।

কমলারানি রানি হলে কী হয়। ঠিক পবনরাজের মতোই ছিল তাঁর বেশভূষা। অতি সাধারণ। কিন্তু ছিমছাম সুন্দর। সাদা রঙ তাঁদের দুজনেরই ভারী পছন্দ। তাই সবসময় সাদা পোশাক পরতেন। তাঁদের ছিল ভারী মজার একটা জিনিস। জিনিসটা হল একটা পরশ পাথর। লোহায় ঠেকালেই লোহা সোনা হয়ে যায়।

রাজা-রানি দুজনকেই প্রজারা খুব ভালোবাসত। শ্রদ্ধা করত। উপহার দিত লোহায় তৈরি জিনিস। কিন্তু রাজা বা রানি কেউই সে-সব লোহায় পরশপাথর ঠেকাতেন না। সোনার কোনো প্রয়োজনই ছিল না তাঁদের। রানি যদি গহনা পরতেন, তাহলে সে গহনা সব সময়ই হত সাদা ফুল দিয়ে তৈরি। এভাবেই দিন যাচ্ছিল মহাসুখে।

কিন্তু কথায় আছে, সুখ চিরকাল থাকে না। তাই হয়তো পোলা উৎসবের সময় রানির মন হঠাৎ ঘুরে গেল। উৎসবে রকমারি সোনার গহনা পরে মহিলারা এসেছিলেন। সকলেই রানির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। আর একজন অপরজনকে ফিসফিস করে বলছিলেন, কী অপরূপ সুন্দর আমাদের রানি-মা! সোনার কোনো গহনা নেই, তবু কত সুন্দরই না দেখাচ্ছে।

কিন্তু রানি ভাবলেন উলটো। মহিলাদের ফিসফিসানি দেখে, তাঁর মনে হল, তাঁকে খুব খারাপ দেখাচ্ছে। তাছাড়া তিনি রানি, তাঁর কোনো সোনার গহনা থাকবে না, এ কেমন কথা!

তিনি রাজার কাছে গিয়ে বললেন, পোলা উৎসবে গেলাম, অথচ আনন্দ পেলাম না।

রাজা পবন কিছুটা অবাক হলেন। বললেন, কেন কমলারানি? উৎসবের আয়োজন কি এবারে তেমন ভালো হয়নি?

রানি বললেন, না। আয়োজন ভালোই হয়েছে। তবে এমন একটা উৎসবে আমাকে কেউ রানি বলে চিনতেই পারল না!

রাজা আরো অবাক হলেন। বললেন, সে কী! তাও কি হতে পারে?

রানি গলায় অভিমান ফুটিয়ে বললেন, হতে পারে না-ই বা কেন? আমি কি সেখানে সত্যিকারের রানির সাজে গিয়েছিলাম? আমার কি একটিও সোনার গহনা আছে?

এতক্ষণে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন রাজা। আর বুঝতে পেরে বড়ো কষ্ট অনুভব করলেন মনে। কমলারানির মুখ থেকে এমন কথা শুনবেন, তিনি কখনও কল্পনাতেও ভাবেন নি। তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। রানিকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, তুমি যে-সাজে সাজো কমলারানি, সে-ই তো সত্যিকার রানির সাজ। সাদা রঙ যে রঙের রাজা। তাছাড়া সাদা ফুলের গহনা, সে যে সোনা হিরে-জহরতের গহনার থেকেও বেশি দামি। সে কি তুমি বোঝনা?

রানি বললেন, আগে তাই বুঝতাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সে সব ভুল বুঝতাম। আপনি আমার জন্যে কিছু সোনার গহনার ব্যবস্থা করে দিন, রাজা। পরশপাথর তো আপনার কাছেই আছে।

রানির এই কথার পরে আর কোনো কথাই বললেন না রাজা পবন। রানি যেমনটি চাইলেন, ঠিক তেমনটি করে দেবার ব্যবস্থাই করলেন।

ফলে পোলা উৎসবের দ্বিতীয় দিনে কমলারানি হাজির হলেন সারা শরীর সোনার গহনায় মুড়ে। রানি ভেবেছিলেন, হাজির হওয়ামাত্রই হই-চই পড়ে যাবে। রূপসী রানির আসল রূপ এতদিনে দেখবে সকলে। কিন্তু ঘটনা ঘটল উলটো। আজ তো আর রানির শরীরে সাদা পোশাক নেই। নেই কোনো সাদা ফুলের গহনা। তাই রানিকে দেখেও কেউ আলাদা করে চিনে নিতে পারল না। অনেকের মধ্যে একজন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কমলারানি। রাগে দুঃখে অপমানে বুক ভেঙে যাচ্ছিল তাঁর। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। ফিরে এলেন।

কিন্তু ফিরেও কি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন? না, পারলেন না। এমন সব অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে লাগল যে, তিনি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলেন।

প্রথম ঘটনাটি ঘটল কুয়া থেকে জল তুলতে গিয়ে। সুতো ছিঁড়ে কাঁচা মাটির কলসি পড়ে গেল জলে। তারপর কাদা হয়ে গুলে গেল জলের মধ্যে। কমলারানি অবাক হলেন। কিন্তু দমলেন না। সরোবরের জলে পা রাখলেন হেঁটে যাবেন বলে। কিন্তু তাও পারলেন না।



না পেয়ে ভয় পেলেন। তবু শেষ চেষ্টা করতে চেয়ে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেলেন জলে-ভাসা পদ্মের উপর। এবার তিনি জলে পড়ে গেলেন। ডুবেই যাচ্ছিলেন প্রায়। তাঁকে উদ্ধার করল রাজার লোকেরা। ভুল ভেঙে গেল রানির।

কমলারানি বুঝলেন, তাঁর সেই আশ্চর্য ক্ষমতা আর নেই। চলে গেছে। আসলে যখনই তাঁর ইচ্ছেগুলো সাধারণ মানুষের মতো হয়ে গেছে, তখনই তাঁর অসাধারণ ক্ষমতাগুলো হারিয়ে গেছে। তিনি বুঝতে পারলেন. সাধারণ মানুষের মতো লোভ করে তিনি কতটা ভুল করেছেন।

কিন্তু তখন তো আর কিছু করার উপায় নেই। মনে মনে ভেঙে পড়লেন কমলারানি। বড়োই দুঃখে দিন কাটতে লাগল তাঁর।

রাজা পবনও দুঃখ পেয়েছিলেন রানির অবস্থা দেখে। কিন্তু মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখেছিলেন। আসলে পরশপাথরের মতো আর কোনো পাথর তো তাঁর ছিল না। রানির সেই পুরোনো ক্ষমতা তাই চিরকালের জন্যেই হারিয়ে গেল।

বিশাল রাজত্ব আর অঢেল সোনাদানা থাকা সত্ত্বেও, রাজা-রানির মনে কোনো সুখ রইল না। তবে এমনটা কিন্তু বেশিদিন চলল না। হঠাৎ এক ভূমিকম্পে একদিন পবন-রাজ্য মাটির নীচে তলিয়ে গেল।

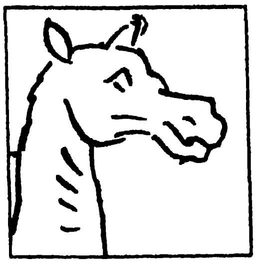
অনেক বছর পরে, এখন, সেই পুরোনো ধ্বংসস্তূপের উপর একটা ছোট্ট শহর গড়ে উঠেছে। পুরোনো কথা মনে রেখে লোকেরা এই শহরের নাম রেখেছে পাবনী।





তামিলনাড়ু

ভাগ্যের অনুসন্ধান



অনেকদিন আগে এক গ্রামে সোমনাথন্ বলে এক ব্যক্তি বাস করত। সে ছিল খুবই দরিদ্র। তার ছেলে-মেয়ে ছিল বারোটি। ছেলে-মেয়েদেব মুখে সে সামান্য খাবারও প্রতিদিন দিতে পারত না। এজন্য সোমনাথন্ ও তার স্ত্রীর মনে একেবারেই শান্তি ছিল না।

সোমনাথন্ ক্রমে অস্থিব হয়ে উঠল। সে নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিতে লাগল। ছেলেদের খেতে-পরতে না দিতে পারার দুঃখ-যন্ত্রণা তাকে ঈশ্বর-বিদ্বেষী করে তুলল। সে এতদিন বিশ্বাস করত, "জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।" কিন্তু কই? কোথায়? তার ঘরে ভগবান বারোটি ছোটো ছোটো জীব পাঠিয়েছেন, অথচ তাদের জন্য তিনি কোনো খাদ্যের সংস্থান কবেন নি। এ কী রকম তাঁব বিধান? এই কি তাঁর বিচার?" এই রকম সাত-পাঁচ সে ভাবতে লাগল। কোনো দিকে কোনো সমস্যা-সমাধানের কিনারা খুঁজে পেল না। অবশেষে সে একদিন আপন ভাগ্যের অনুসন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় নেমে যেদিকে দুচোখ যায়, সেই দিকেই সোমনাথন্ হাঁটতে শুরু করে দিল। হাঁটতে হাঁটতে ক্রমে সে একটি গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল। কিছুক্ষণ পর সে দেখতে পেল, একটি বিরাট উট তার দেহের দুদিকে সোনার মোহরে ভর্তি বস্তা ঝুলিয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই উটটি ছিল সে দেশের রাজার। রাজ কর্মচারীরা অনেকগুলো বস্তা সোনার মোহরে ভর্তি করে বহু উটের পিঠে চাপিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে যাচ্ছিল। জঙ্গলে বিশ্রাম নেবার সময় তারা এই উটটিকে ভুল করে ফেলে চলে যায়। সেই থেকে উটটি মোহর ভর্তি বস্তা নিয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বস্তা দু'টি তার দেহের সঙ্গে এমনভাবে বাঁধা যে, কোনো উপায়ে বস্তা দু'টি মাটিতে ফেলে দিয়ে ভারমুক্ত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে পিঠে বোঝা নিয়ে উঠটি বারো বৎসর সেই গভীর জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

যখন উটটি সোমনাথন্‌কে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে দেখল, তখন জিজ্ঞাসা করল, "ভাই, তোমার পরিচয় কী? যদি কোনো আপত্তি না থাকে, তবে আমাকে বল তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

তার কথা শুনে সোমনাথন্ থমকে দাঁড়াল। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, "ভাই, সে কথা আর জিজ্ঞাসা কর কেন? আমার মতো ভাগ্যহত পৃথিবীতে আর কে আছে? আমি আমার ভাগ্যের অনুসন্ধানে চলেছি। তাঁর সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করব, — কেন এবং কোন্ অপরাধে আমার এই চরম লাঞ্ছনা, আমার এই নিষ্ঠুর দাবিদ্র্য?"

সোমনাথনের কথা শুনে উটটি তাকে মিনতি করে বলল, "ভাই, তুমি আমাকে দয়া কর। গত বারো বছর ধরে আমি এই দু-টি বোঝা পিঠের উপর বয়ে বেড়াচ্ছি। আমি বসতে পারি না, খেতে পারি না, এমন কী ঘুমানও আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। তুমি কি আমার হয়ে ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা করবে, কেন আমার এই

দুর্গতি?" উটের কথা শুনে সোমনাথনের ভারী মায়া হল। সে ভাবল যে, এই উটটিও তার মতো দুঃখী এবং ভাগ্যতাড়িত। সে বলল, "ভাই, তুমি কোনো দুশ্চিন্তা কর না, আমি তোমার জন্য যথাসাধ্য করব।" এই বলে সোমনাথন্ আবার চলতে শুরু করল।

জঙ্গলের পথ দিয়ে আরও কিছুটা এগুতেই সে একটি নদী দেখতে পেল। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল— কীভাবে ওপারে যাওয়া যায়। এমন সময় কোথা থেকে এক বিরাট কুমির তার সামনে জলের উপরে ভেসে উঠল এবং তার পিঠে চেপে সোমনাথনকে নদী পার হতে অনুরোধ করল। সোমনাথন্ খুব খুশি হল এবং তার পিঠে চেপে নদীব ওপারে গেল। তারপর সেই কুমির তাকে জিজ্ঞাসা করল, "ভাই, তুমি কোথায় যাচ্ছ?"



তার প্রশ্নের উত্তরে সোমনাথন্ বলল, "ভাই, আমার মতো গরিব পৃথিবীতে কেউ নেই। আমি আমার বারোটি ছেলে-মেয়েকে খেতে দিতে পারি না। তাই মনের দুঃখে ভাগ্যের অনুসন্ধানে চলেছি। যদি তাঁর দেখা পাই, তবে জিজ্ঞাসা করব, কেন আমার এই কষ্ট? কেনই বা তিনি আমাকে গরিব করে সৃষ্টি করেছেন? আমি ভাগ্যের কাছে ধন-দৌলত চাইব।'

সোমনাথনের কথা শুনে কুমিরটি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, "ভাই, গত বারো বছর ধরে আমি পেটের যন্ত্রণায় খুবই কষ্ট পাচ্ছি। যদি তোমার সঙ্গে ভাগ্য-বিধাতার দেখা হয়, তবে আমার হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে, কেন আমার এই দৈহিক যন্ত্রণা?" কুমিরের অসুস্থতার কথা শুনে সোমনাথনের চোখে জল এল। সে তার আর্জি ভাগ্যদেবতার কাছে পেশ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার হাঁটতে লাগল।

যেদিকে দুচোখ যায়, সে-পথে হাঁটতে হাঁটতে সে অনেকদূর চলে গেল। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তার মনে কিন্তু কোনো ভয় ছিল না। সে জানত কোনো বাঘ-সিংহ তার মতো ভাগ্যহীনকে খাবে না। তাই মনে কোনো উদ্বেগ না নিয়ে সে এগিয়ে চলল। কিছুটা এগিয়ে যেতেই সে দেখতে পেল যে, একটা বাঘ তার সামনে বসে আছে। বাঘটি তাকে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল না। একটি বড়ো কাঁটা তার পায়ে বিঁধে যাবার জন্য সে নড়তে-চড়তে পারে না। সমস্ত পা-টা ফুলে গেছে। এইভাবে বারো বছর ধরে অকর্মণ্য হয়ে সে ওই পথের ধারে বসে আছে। চলে-ফিরে আহার জোগাড় করার কোনো ক্ষমতা তার নেই।

বাঘটি সোমনাথন্‌কে ওর পাশ দিয়ে যেতে দেখে অত্যন্ত করুণ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "ভাই, তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

সোমনাথন্ তাকে একই কথা বলল। তারপর তাকে আরও জানাল, "আমার মনে হচ্ছে, ভাগ্যবিধাতা এখনও অনেক দূরে। এখন অনেক বছর লাগবে এই ভাবে হেঁটে তাঁর কাছে পৌঁছতে। তিনি পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছেন। আমার জন্য তাঁর কোনো ভাবনা নেই। যদি ভাগ্যবিধাতার দেখা পাই, তবে এই লাঠির আঘাতে তাঁর ঘুম ছুটিয়ে দেব। ঘর থেকে বার হবার সময় আমাদের গ্রামের এক বুড়ো এই লাঠি দিয়ে আমাকে এই কাজটা করতে বলেছেন।" —এই বলে সে একটা বড়ো লাঠি বাঘকে দেখাল।

বাঘ সমস্ত কথা শুনে মনে মনে খুশি হল। সোমনাথন্‌কে বলল, "ভাই, গত বারো বছর ধরে আমি তীব্র যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি। আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। যদি ভাগ্যদেবতার সঙ্গে তোমার দেখা হয়, তবে আমার রোগমুক্তির জন্য কি তাঁকে বলবে? আমার পায়ের যন্ত্রণা কমে গেলেই আমি সুস্থ হব। আবার চলে-ফিরে বেড়াতে পারব।" বাঘের করুণ মিনতি শুনে সোমনাথন্ বলল, সে অবশ্যই তা করবে। তারপর সে পুনরায় যাত্রা শুরু করল।

এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে বারো বছর পার হয়ে গেল। অবশেষে একটা বিরাট মাঠের মাঝে উপস্থিত হল। সেখানে সোমনাথন্ মানুষের সমস্ত ভাগ্যবিধাতাদের দেখতে পেল। পাথরের আকৃতি নিয়ে মানুষের ভাগ্যবিধাতারা সেখানে রয়েছেন। কোনো কোনো ভাগ্যবিধাতা চলাফেরা করছেন, কিন্তু বেশির ভাগ ভাগ্যবিধাতাই জোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। সোমনাথন্ নিজের ভাগ্য বিধাতাকে খুঁজে বার করল। তার ভাগ্যপতি প্রস্তরীভূত অবস্থায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। এই দেখে সোমনাথন্ তার হাতের মোটা লাঠিটি দিয়ে ভাগ্যের পাথর-শরীরে খুব জোরে আঘাত করতে শুরু করে দিল। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই নিদ্রিত দেবতার ঘুম ভাঙে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ক্রমাগত প্রহার চালিয়ে যেতে লাগল। কোনোভাবেই ভাগ্যবিধাতাকে পরিত্রাণ দিল না।

অবশেষে এক দয়াময় দেবতা এসে সোমনাথন্‌কে শান্ত করলেন এবং তার ভাগ্যদেবতাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললেন। ভাগ্যবিধাতা হাই তুলে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কেন আমাকে প্রহার করছ? আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি?"

নিজের ভাগ্যপতির কথা শুনে সোমনাথন্ প্রচণ্ড চিৎকার করে বলে উঠল, "তুমি জান না কী ক্ষতি তুমি আমার করেছ? তুমি একদিকে কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমুচ্ছ,— আর আমি অন্যদিকে জীবন-যন্ত্রণা নিয়ে অত্যন্ত

পরিশ্রম করে অভাবে, অনাহারে দিনপাত করছি। ছেলে-মেয়েদের মুখে সামান্য খাবারও তুলে দিতে পারছি না। আর তুমি জিজ্ঞাসা করছ, কেন আমি তোমাকে প্রহার করছি? তোমাকে আমার সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তেমার কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করবার জন্যই তোমাকে আমি প্রহার করেছি।"

সোমনাথনের সমস্ত কথা শুনে, তার ভাগ্যপতি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে বললেন, "ঠিক আছে, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। এখন থেকে তুমি ও তোমার পরিবারের সবাই সুখে থাকবে। জীবনধারণের জন্য তোমাকে আর কঠোর পরিশ্রম করতে হবে না। সামান্য প্রচেষ্টাতেই তুমি আনন্দে জীবন যাপন করতে পারবে।"

সোমনাথন্ ভাগ্যবিধাতার এই কথা শুনে খুবই আনন্দিত হল। সে তখন বলল, "পথে আসতে আসতে আমার সঙ্গে একটি উটের দেখা হয়েছে। সে বারো বছর পিঠের উপর সোনার মোহর-ভরা ভারি বোঝা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে ভালো করে খেতে-শুতে বা ঘুমুতে পারে না। উটটি আমাকে মুক্তির পথ আপনার কাছে জেনে আসতে অনুরোধ করেছে। আপনি দয়া করে তার কষ্ট লাঘবের উপায় বলে দিন।"

এই কথা শুনে ভাগ্যদেবতা তাকে বললেন, "তুমি তার দেহ থেকে থলি দুটি নামিয়ে নিও। এর ফলে সে ভারমুক্ত হবে এবং অস্বস্তি থেকেও মুক্তি পাবে।"

একথা শুনে সোমনাথন্ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। পরে সে আবার বলল, "এখানে আসতে আমাকে একটি নদী পার হতে হয়েছে। এক বিরাট কুমির পিঠে করে আমাকে নদী পার করে দিয়েছে। গত বারো বছর ধরে কুমিবটি পেটের যন্ত্রণায় খুবই কষ্ট পাচ্ছে। সেই কুমিরটি আপনার কাছে জানতে চেয়েছে, কবে ও কীভাবে তার ওই পেটের যন্ত্রণা চলে যাবে ও সে সুস্থ হয়ে উঠবে।"

সোমনাথনের কথা শুনে ভাগ্যদেবতা বললেন, "ওই কুমিরের পেটে এক বিরাট মুক্তো আটকে আছে। তোমার মাথার মতো সেটা বড়ো আর শক্ত। পেট থেকে মুক্তোটা বেরিয়ে গেলেই সে সুস্থ হয়ে উঠবে, আর তার পেটের যন্ত্রণাও কমে যাবে।"

একথা শোনার পরেও সোমনাথন্ কিন্তু ফিরে গেল না। সে ভাগ্যদেবতার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "পথে আমার সঙ্গে এক বাঘেরও সাক্ষাৎ হয়েছে। বারো বছর সে পায়ের ব্যথা নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে। সে কোনো রকম চলা-ফেরা করতে পারে না। তার পায়ের নীচে কাঁটা ফুটে এমন ফুলে আছে যে, বেচারির কষ্টের শেষ নেই। বাঘটি ব্যাকুলভাবে আমাকে আপনার কাছ থেকে জানতে বলেছে, কীভাবে ওর কাঁটা বের হবে?"

তার কথা শুনে ভাগ্যবিধাতা বললেন, "যদি তুমি তোমার দাঁত দিয়ে বাঘের পায়ের কাঁটা বার করে দাও, তবে সে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে।" সমস্ত কথা শুনে ও পথের দুঃখী বন্ধুদের যন্ত্রণা লাঘবের নির্দেশ নিয়ে সোমনাথন্ ঘরের দিকে ফিরে চলল। বাড়ি ফেরার সময়ে সে আপন ভাগ্যপতিকে ধন্যবাদ দিল। কিছুক্ষণ পরেই সেই ভাগ্যবিধাতা আবার পাথরে পরিণত হয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

ফেরার পথে প্রথমে বাঘের সঙ্গে দেখা হল। সোমনাথন্ বাঘটির কাছে গিয়ে তার পা দেখাতে বলল। পরে দাঁত দিয়ে কাঁটাটি বার করে দিল। দীর্ঘদিন পর পায়ের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে বাঘটি খুবই খুশি হল। এর আগে সেই বাঘ অনেক রাজাকে হত্যা করে তাদের মাংস খেয়েছিল। কিন্তু সেই সমস্ত রাজার সোনা-দানা সে এক জায়গায় জড়ো করে রেখেছিল। কৃতজ্ঞতার ঋণ-পরিশোধ করার জন্য বাঘটি সোমনাথন্‌কে তার গুহায় নিয়ে গেল এবং সেই জমা করে রাখা ধন-দৌলত তাকে থলি ভর্তি করে দিল। বাঘটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে সে থলিভর্তি সোনা-দানা নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

সোমনাথন্ আবার সেই নদীর ধারে উপস্থিত হল। সেই বিরাট কুমিরটি আবার তাকে নদী পার করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ভাই, তুমি কি আমার রোগমুক্তির উপায় জেনে এসেছ?"

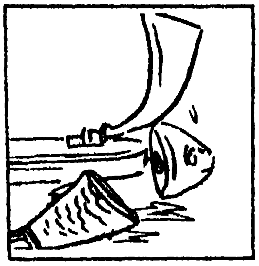
সোমনাথন্ বলল, "দেখ, তোমার পেটে আমার মাথার মতো বড়ো একটা মুক্তো আটকে আছে। সেটা যদি কোনো উপায়ে বার করে ফেলা যায়, তবেই তোমার পেটের যন্ত্রণা কমে যাবে। তুমি হাঁ কর, আমি তোমার পেটের ভিতর হাত ঢুকিয়ে মুক্তোটা টেনে বার করি।" এই কথা শুনে কুমীরটি হাঁ করল। সোমনাথন্ তার হাতটি কুমিরের পেটে চালান করে সেই বড়ো মুক্তোটি টেনে বার করল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই কুমিরের পেটের যন্ত্রণা একেবারে কমে গেল। সে খুশি হয়ে মুক্তোটি সোমনাথন্‌কে উপহার হিসাবে প্রদান করল।



জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে উটের সঙ্গে সোমনাথনের আবার দেখা হল। সে তার পিঠ থেকে দুথলি ভর্তি সোনাব মোহরের বোঝা নামিযে দিল। উটের শরীর দীর্ঘদিনের কষ্ট থেকে মুক্তি পেল। উটটি খুশি হয়ে তাকে ওই থলি দু-টি উপহার হিসাবে নিতে অনুরোধ জানাল। সোমনাথন্ মহানন্দে থলি দু-টি নিয়ে ঘরে ফিরে এল।

দীর্ঘ দিন পরে বাড়িতে ফিরে এলে সকলে তাকে দেখে খুবই খুশি ও আনন্দিত হল। স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা তাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগল, সোমনাথনও তাদের সমস্ত কথার উত্তর দিল। পথের সমস্ত ঘটনা সে বিস্তারিতভাবে ছেলে, মেয়ে ও স্ত্রীকে জানাল। তারপর ওই গ্রামে একটি বাড়ি তৈরি করে পরম সুখে বসবাস করতে লাগল।

দূরদর্শী মহামন্ত্রী



অনেকদিন আগে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর সুশাসনে দেশের ধনী-দরিদ্র সবাই সুখে কাল কাটাত। একদিন রাজা মহামন্ত্রীর সঙ্গে রাজপ্রাসাদের বারান্দায় বসে এক জটিল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। প্রশ্নটা ছিল, পুরুষকার বড়ো, না ভাগ্য বড়ো। রাজা বললেন, "দেখুন মহামন্ত্রী, আমার মনে হয় জীবনে কর্মই প্রধান এবং কর্মই মানুষের ভাগ্য গড়ে তোলে। অকর্মণ্য ব্যক্তি কখনই ভাগ্যের প্রসাদ লাভ করে না।"

মহামন্ত্রী রাজামশায়ের কথা শুনে বললেন, "মহারাজ, আপনার কথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কর্মই মানুষের ধ্যান-জ্ঞান হওয়া উচিত; তবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হলে কোনো কর্মই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। এমনকী ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হলে অনেক কর্ম ব্যর্থ হয়ে যায়।" রাজা মন্ত্রীর কথা সমর্থন করতে পারলেন না।

যখন রাজা ও মহামন্ত্রী এই রকম এক বিতর্কে ব্যস্ত, তখন রাজপ্রাসাদের সামনে এক গরিব ব্রাহ্মণকে দেখা গেল। সে রাস্তায় পৈতে বিক্রি করছিল। রাজা তাকে দেখে মহামন্ত্রীকে বললেন, "দেখুন মন্ত্রীমশাই, আমি একমাসের মধ্যে এই গরিব ব্রাহ্মণকে বড়োলোক করে দিতে পারি।" এই বলে রাজা ব্রাহ্মণকে রাজপ্রাসাদে ডেকে পাঠালেন। তার হাতে পাঁচশো টাকা দিয়ে বললেন, "তুমি এই টাকায় অধিক পরিমাণে তুলো কিনে পৈতের ও কাপড়ের ব্যবসা কর। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তুমি ধনী হয়ে উঠবে। নিজের ও বাড়ির সকলের জন্য ভালো জামাকাপড় ও খাবার কিনে নিয়ে যেও।"

ব্রাহ্মণ রাজার কথা শুনে প্রথমে খুবই বিস্মিত হল। পরে বাজারে গিয়ে নিজের ও বাড়ির সকলের জন্য চল্লিশ টাকায় জামাকাপড় ও খাবার কিনল এবং দশ টাকা দিয়ে তুলো কিনল। ঘরে চরকায় সেই তুলো পেঁজে অনেক পৈতে তৈরি করবে, এই ভাবনায় মহানন্দে সে বাড়ির দিকে চলতে শুরু করল। একটি পয়সাও যাতে বাজে খরচ না হয়, সেজন্য ব্রাহ্মণ তুলোর পুঁটলিটি নিজেই মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

তুলোর পুঁটলির মধ্যে অবশিষ্ট সাড়ে চারশো টাকা, নিজেদের জামাকাপড় এবং খাবারের ঠোঙা সবই সে একসঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। ব্রাহ্মণের মাথার পুঁটলিটি এক চিল দেখতে পেল। মুহূর্তের মধ্যে চিলটি ছোঁ মেরে পুঁটলিটি নিয়ে বহু দূরে এক গাছের উপরে বসল। ব্রাহ্মণ পুঁটলির শোকে 'হায়', 'হায়'— করে মাথা চাপড়াতে লাগল। কিন্তু কোনো মতেই চিলের কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারল না। অবশেষে দিনের শেষে মলিন মুখে সে বাড়ি ফিরে গেল। ঘরে ফিরে ব্রাহ্মণীকে সবকথা জানাতে সেও অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে কাঁদতে লাগল। জীবনে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবার সুযোগ এলেও ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হওয়ার জন্য সমস্ত কিছু তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল।

কিছুদিন পর রাজা ব্রাহ্মণের কোনো সংবাদ না পেয়ে খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। অবশেষে তিনি মহামন্ত্রীকে নিয়ে ওই ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানে বেরুলেন। তার বাড়ির সামনে এসে তাঁরা দেখলেন যে, ব্রাহ্মণ

মনের দুঃখে মাথায় হাত দিয়ে বারান্দায় বসে আছে। রাজা ও মহামন্ত্রীকে দেখে সে দাঁড়িয়ে উঠে ভয়ে কাঁপতে লাগল। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে, কাঁদতে কাঁদতে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা সবিস্তারে নিবেদন করল। রাজা খুবই বিস্মিত হলেন। তিনি পুনরায় ওই গরিব ব্রাহ্মণকে পাঁচশো টাকা দিয়ে বললেন, "তুমি এই টাকা নিয়ে আবার নতুন করে ব্যবসা আরম্ভ কর। একমাস পরে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

রাজামশায়ের আশ্বাস-বাক্যে ব্রাহ্মণ আবার নতুন উদ্যমে তার জীবনে সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনতে উঠে-পড়ে লাগল। সে রাজার কাছ থেকে টাকা নিয়ে অতি সাবধানে লুকিয়ে রাখল। এমনকী তার স্ত্রীকেও সেই টাকার কথা বলল না। একটি মাটির হাঁড়ির ভিতরে টাকা রেখে সে তুষ দিয়ে ভর্তি করে রাখল; যাতে কেউ কোনো উপায়েই টাকার কথা না জানতে পারে। তারপর একদিন তুলোর বাজার দর জানতে সে হাটে গেল।

ব্রাহ্মণ হাটে গেলে তার স্ত্রী ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করতে লাগল। সেই সময়ে একজন বুড়ো লোক বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে তুষ কিনছিল। লোকটি ব্রাহ্মণীর কাছে এসে তুষ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করল। ব্রাহ্মণী তাকে অপেক্ষা করতে বলে ঘরের ভিতরে গেল। ঘরে ইতিমধ্যে কয়েক হাঁড়ি তুষ জমেছিল। ব্রাহ্মণী তার তুষের হাঁড়িগুলোর সঙ্গে ব্রাহ্মণের তুষে-ঢাকা টাকার হাঁড়িটিও বিক্রি করে দিল।

পরদিন সকালে ব্রাহ্মণ আবার হাটে যাবার জন্য তৈরি হল। যে তুষের হাঁড়ির মধ্যে সে টাকা রেখেছিল, অনেক খুঁজেও তা না পেয়ে ব্রাহ্মণীকে হাঁড়ির কথা জিজ্ঞাসা করল। ব্রাহ্মণী বলল যে, গতকাল সমস্ত তুষ বিক্রি করা হয়েছে। ব্রাহ্মণীর কাছে একথা শুনে ব্রাহ্মণ পাগলের মতো মাথার চুল ছিঁড়ে চিৎকার করতে লাগল এবং স্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতে লাগল। চিরকালের ঠাণ্ডা মেজাজের ব্রাহ্মণের এহেন আচরণ দেখে ব্রাহ্মণী ভাবল যে নিশ্চয়ই তার স্বামী পাগল হয়ে গেছে। এই ভেবে সেও ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল। ব্রাহ্মণীর কান্না শুনে ব্রাহ্মণের সম্বিৎ ফিরে এল। সে ভাবল যে, এখনই পাড়া-প্রতিবেশীরা এসে ঘরে ভিড় জমাবে এবং পরিস্থিতি আরও অসহনীয় হয়ে উঠবে। মনের আতঙ্কে সে চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ পর ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে সমস্ত কথা খুলে বলল। সব শুনে ব্রাহ্মণী প্রথমে তাকে গোপন করার জন্য স্বামীকে ভর্ৎসনা করল এবং নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিতে লাগল। তারপর দুজনে ছেলেমেয়েদের নিয়ে পূর্বের মতো দুঃখে-কষ্টে দিন কাটাতে লাগল।

একমাস পর রাজা মহামন্ত্রীকে নিয়ে ব্রাহ্মণকে দেখতে এলেন। কিন্তু এবারেও ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য দেখে তিনি খুবই আশ্চর্য হলেন। রাজার প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণ তার দুর্ভাগ্যের কথা বলল। রাজা বুঝলেন যে, মহামন্ত্রীর কথাই ঠিক; সু-সময় না এলে কিছুই করা যায় না। শুধুমাত্র পুরুষকারের দ্বারা কেউ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অবশেষে রাজা মহামন্ত্রীকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

ব্রাহ্মণের কুটির ত্যাগ করবার আগে মহামন্ত্রী তাকে একখণ্ড লোহা দিয়ে বললেন, "যদি তোমার ভাগ্য সদয় হয়, তবে এই থেকেই তুমি ধনী হতে পারবে।"

সে রাত্রে একটি অঘটন ঘটল। এক জেলের গভীর রাত্রে মাছ ধরা জাল মেরামত করার জন্য এক টুকরো লোহার দরকার হল। কিন্তু বাড়িতে বাড়িতে অনেক খোঁজ করেও সে তার প্রয়োজনীয় লোহা পেল না। অবশেষে ব্রাহ্মণের বাড়ির লোহার-টুকরোটি তার প্রয়োজন মেটাল।

সমস্ত রাত ধরে সেই জেলে তার জাল মেরামত করল। পরে সকাল হলে মাছ ধরতে গেল। তার জালে প্রথমেই একটা মস্ত বড়ো মাছ পড়ল। মাছটার দিকে তাকিয়ে সে ভাবল, এই মাছটা ব্রাহ্মণকে দিতে হবে।

ভা. লোক — ১৭

ব্রাহ্মণ তার বড়ো উপকার করেছে। এই ভেবে সে মাছটিকে নিয়ে ব্রাহ্মণের বাড়িতে এল। ব্রাহ্মণ তো বিরাট মাছ দেখে অবাক। সে কিছুতেই বিনা পয়সায় এতবড়ো মাছ নিতে রাজি হল না। তখন জেলে বলল, "আপনি গতরাত্রে আমার খুব উপকার করেছেন। এখন দয়া করে মাছটি নিন। আপনার ভাগ্যেই এত বড়ো মাছ উঠেছে। এটা আপনারই প্রাপ্য।" জেলের মিনতি শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ উপেক্ষা করতে পারল না। সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করে সে অবশেষে মাছটি গ্রহণ করল।



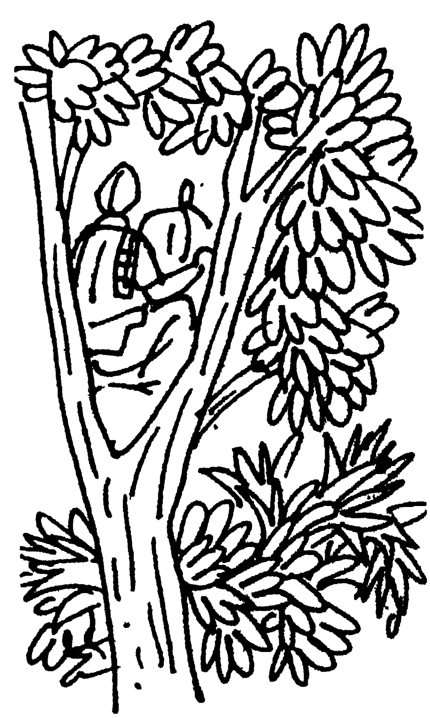
মাছটি ব্রাহ্মণকে দিয়ে জেলে বাড়ি ফিরে গেলে ব্রাহ্মণ তার স্ত্রীকে মাছটি কাটতে বলল। ব্রাহ্মণী অত্যন্ত খুশি হয়ে অত বড়ো মাছ কাটার জন্য পাশের বাড়ি থেকে বিরাট বঁটি চেয়ে নিয়ে এল। মাছটিকে কাটতেই তার পেট থেকে একটা বড়ো মাপের হিরে বেরিয়ে এল। ব্রাহ্মণী স্বামীর হাতে হিরেটা দিতে সে পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

ইতিমধ্যে পাশের বাড়ির বউ তাদের বাড়িতে এল। ব্রাহ্মণী এই বউটির কাছ থেকে মাছ কাটার বঁটি এনেছিল। গরিব ব্রাহ্মণের স্ত্রীর এতবড়ো আঁশবঁটি কেন দরকার পড়ল, সেই কৌতূহলেই বউটি এ সময়ে এসেছিল। কথায় কথায় ব্রাহ্মণী তাকে মাছের পেটে পাওয়া হিরের কথা বলল। বউটির স্বামীর সোনা-জহুরতের দোকান ছিল। সে বাড়ি ফিরে স্বামীকে মাছের পেট থেকে পাওয়া হিরের কথা বলল। সমস্ত ঘটনা শুনে

সেই সোনা-জহরত ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের বাড়িতে এসে হিরেটা দেখতে চাইল। সমস্ত কিছু দেখে সেই ব্যবসায়ী হিরেটা কিনতে চাইল। ব্রাহ্মণ ওই জহরত ব্যবসায়ীকে হিরেটা পঞ্চাশ লাখ টাকায় বিক্রি করে দিল।

এর পরে ব্রাহ্মণের আর ধনী হতে কোনো বাধা রইল না। সে এক অট্টালিকা তৈরি করে মহাসুখে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাস করতে লাগল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করে আরও ধনী হল।

একদিন কোনো কারণে রাজা মহামন্ত্রীকে নিয়ে ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তার ধারে এক বিরাট অট্টালিকা দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, যেখানে ব্রাহ্মণের কুঁড়েঘর ছিল, ঠিক সেখানেই এই বিশাল বাড়ি। তিনি রথ থেকে নেমে আসতেই সেই ব্রাহ্মণ তাঁকে অভিবাদন করল। রাজা ও মহামন্ত্রী ব্রাহ্মণের আতিথ্যে সন্তুষ্ট হয়ে তার অট্টালিকায় প্রবেশ করলেন। ব্রাহ্মণ, রাজা ও মহামন্ত্রীকে বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য ফল ও মিষ্টান্ন দিল। সুস্বাদু পানীয়ও পরিবেশন করা হল। তারপর রাজার প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণ পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা নিবেদন করল। রাজা আবার অনুভব করলেন যে, মহামন্ত্রীর কথাই ঠিক। ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হলে মানুষের কোনো প্রচেষ্টা কখনও সার্থক হয় না।



ইতিমধ্যে রাজা ও মহামন্ত্রী যখন আহার করছেন, তখন ব্রাহ্মণের ছোটো ছেলে হাতে লাটাই নিয়ে বাবাকে বিরক্ত করত শুরু করল। তার ঘুড়ি দূরের একটা গাছে আটকে গেছে। সে ঘুড়িটিকে পাড়তে চায়। তখন ব্রাহ্মণ তার চাকরকে ঘুড়িটি পেড়ে আনতে আদেশ দিল। এদিকে রাজার রাজপ্রাসাদে ফিরে যেতে দেরি হওয়ায় রথের চালক ঘোড়াগুলোকে রথ থেকে খুলে রেখে নিকটবর্তী একটি দোকান থেকে ঘোড়ার খাবার তুষ আনতে গেল। ঘোড়ারাও ছাড়া পেয়ে মনের আনন্দে ঘাস খেতে লাগল।

এদিকে ব্রাহ্মণের চাকরটি যে গাছে ঘুড়ি পাড়তে উঠেছিল, সেখানে একটি জিনিস দেখে সে খুব আশ্চর্য হল। গাছের দুটি উঁচু ডালের মাঝখানে একটি বড়ো পুঁটলি রয়েছে। সে ঘুড়ির সঙ্গে পুঁটলিটিও পেড়ে এনে ব্রাহ্মণকে দিল। ব্রাহ্মণ অতি সহজেই ওটি চিনতে পারল। গিঁট খুলতেই পুঁটলির মধ্যে থেকে তুলো, জামাকাপড় ও শুকিয়ে যাওয়া খাবারের ঠোঙা পাওয়া গেল। রাজার দেওয়া পাঁচশো টাকার অবশিষ্ট সাড়ে চারশো টাকাও পাওয়া গেল। রাজা ও মহামন্ত্রী উভয়ে ঘটনাটি লক্ষ করে খুবই চমৎকৃত হলেন।

ইতিমধ্যে রথের সারথি ফিরে এল। তার হাতে একটি তুষভরা মাটির হাঁড়ি। হাঁড়ির তুষ ঘোড়াদের মুখের সামনে ঢালতেই তার ভিতর থেকে একটি ছোটো পুঁটলি বেরিয়ে এল। সে পরম বিস্ময়ে সেটি রাজার কাছে নিয়ে এল। ব্রাহ্মণ তার নিজের পুঁটলি চিনতে পারল। পুঁটলি খুলতে তার ভিতর থেকে রাজার দেওয়া দ্বিতীয়বারের পাঁচশো টাকাও পাওয়া গেল।

সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে রাজামশায় তৃতীয় বার মহামন্ত্রীর কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারলেন। তাঁর বিশ্বাস হল যে, পুরুষকারের সঙ্গে ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হওয়া চাই। একে অপরের পরিপূরক। শুধুমাত্র কর্মের দ্বারা সৌভাগ্য অর্জন করা যায় না। তিনি মহামন্ত্রীর জ্ঞান ও বিচক্ষণতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

আরশি



একবার এক চাষি শহরে বেড়াতে গিয়েছিল। বাজারে ঘুরতে ঘুরতে সে নানারকম জিনিস দেখতে লাগল। প্রত্যেকটি জিনিসই তার সুন্দর লাগে। সবই সে নেড়ে-চেড়ে দেখে আর কিনতে চায়। কিন্তু তার হাতে বেশি পয়সা না থাকার জন্য সবকিছু তার পক্ষে কেনা সম্ভব হয় না। শহরের বাজারে ঘোরার সময় একটি আশ্চর্য জিনিস তার নজরে পড়ল।

একটি দোকানে সে দেখল, এক চৌকো কাঠের বাতায় আঁটা একটি চকচকে জিনিস। তার সামনে দাঁড়াতেই ওর ভিতর থেকে আর একটি লোক বেরিয়ে এল। সে হাসলে ও হাসে, হাত নাড়লে সেও হাত নাড়ে। চাষিটি এমন জিনিস জীবনে কখনও দেখেনি। সে ভাবল এইটি সে কিনবে এবং গ্রামের লোকও এটা দেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে যাবে। আর কোনো স্বতন্ত্র চিন্তা না করে, সে ওই জিনিসটি কিনে মনের আনন্দে বাড়ি নিয়ে এল। বাড়িতে একটি আলাদা ঘরে খুবই যত্নের সঙ্গে সেটি টাঙিয়ে রেখে চারদিক বন্ধ করে দরজায় তালা দিয়ে রাখল।

প্রতিদিন সকালে মাঠে যাবার আগে সে ওই বস্তুটির সামনে দাঁড়ায় আর হাসে। দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর ভিতর থেকে আর একটি মানুষ বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় আর অবিকল তার মতো হাসে। এই ব্যাপারে দেখে চাষির খুব আনন্দ হয়। ঘরের দরজায় তালা দিয়ে মনের খুশিতে মাঠে চলে যায় কাজ করতে।

চাষিটি লক্ষ করেনি যে, তার বউ গোপনে সমস্ত কিছু নজর করছে। চাষি-বউ খুব কৌতূহলী হয়ে ওঠে। সে ভাবে কেন এবং কী উদ্দেশ্যে মাঠে যাবার আগে চাষি ওই ঘরটিতে একাকী ঢোকে আর হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে। সমস্ত ঘটনাটি দিনের পর দিন লক্ষ করে চাষি-বউয়ের মনে গভীর সন্দেহ জাগে। রহস্য আবিষ্কারের নেশায় সে অধীর হয়ে ওঠে।

একদিন চাষি-বউয়ের সুযোগ এসে গেল। চাষি মাঠে যাবার আগে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার মন এতই খুশি ছিল যে দরজায় চাবি দিতে সে ভুলে গেল। চাষি মাঠে চলে যাওয়ার পর, চাষি-বউ খুব সাবধানে চারদিকে নজর রেখে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ঘরের ভিতরে সে কিছু দেখতে পেল না। হাঁড়ি-কলসি, ঘটি-বাটি সরিয়ে সে রহস্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হল। কোথাও কিছু দেখতে না পেয়ে সে মনের দুঃখে উঠে দাঁড়াতেই একেবারে থ' হয়ে গেল। সে দেখল— একটি মেয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার দিকে তাকাচ্ছে। মেয়েটির পরনে টিয়া রঙের শাড়ি, কানে দুল আর তার মতোই কম বয়সি। চকচকে বস্তুটির ভিতর থেকে মেয়েটিকে বেরিয়ে আসতে দেখে চাষির বউ মনে মনে বলল, — "এখন বুঝতে পারছি, কেন মাঠে যাবার আগে এই ঘরে ও একা একা ঢোকে আর হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়। এই মেয়েটিকে সে ভালোবাসে বলেই ঘরে চাবি দিয়ে রেখেছে। তাকে আর তার স্বামী ভালোবাসে না। তাই ঘরে সতীন এনেছে।" এইরকম আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে চাষি-বউ ঘরের বাইরে এসে কাঁদতে লাগল।

চাষির মা ছেলের বউকে খেতে ডাকলেন। বউ কোনো উত্তর দিল না। আঁচলে মুখ ঢেকে শুধুই কাঁদতে লাগল। হঠাৎ তার কান্না দেখে, চাষির মা অবাক হয়ে গেল। তাকে বারবার কাঁদবার কারণ জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু ছেলের বউ কোনো কথা না বলে জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। চাষির মা, বউ-এর কান্নার কারণ জানতে অনেক চেষ্টা করল। হঠাৎ চাষি-বউ শাশুড়ির বুকে মুখ গুঁজে আরও জোরে কেঁদে উঠল। চাষির মা ছেলের বউকে খুব ভালোবাসত। সে বউ-এর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞাসা করল— তার কী হয়েছে? তখন বউ তার মনের দুঃখের কারণ ব্যক্ত করল।

সমস্ত বিবরণ শুনে চাষির মা অত্যন্ত বিস্মিত হল। সে জানে তার ছেলে খুব ভালো আর বউকেও ভালোবাসে। ফলে চাষির মা কিছুতেই ঘটনাটিকে মেনে নিতে পারল না। সে চাষি-বউকে বলল, "বউমা, তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে! খোকা তোমায় খুবই ভালোবাসে। তুমি মিছিমিছি সন্দেহ করছ। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনা যে, ও-ঘরে সে অন্য কোনো মেয়েকে এনে আটকে রেখেছে; আর তোমাকে উপেক্ষা করে তাকে বেশি ভালোবাসছে।" শাশুড়ির কথার প্রতিবাদ করে ছেলের বউ বলল,— "ঠিক আছে, যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, আপনি নিজে ওই ঘরে গিয়ে দেখে আসুন। আমি ওই মুখপুড়িকে আর দেখতে চাই না। আমার সংসারে ও আগুন জ্বালাতে এসেছে।"

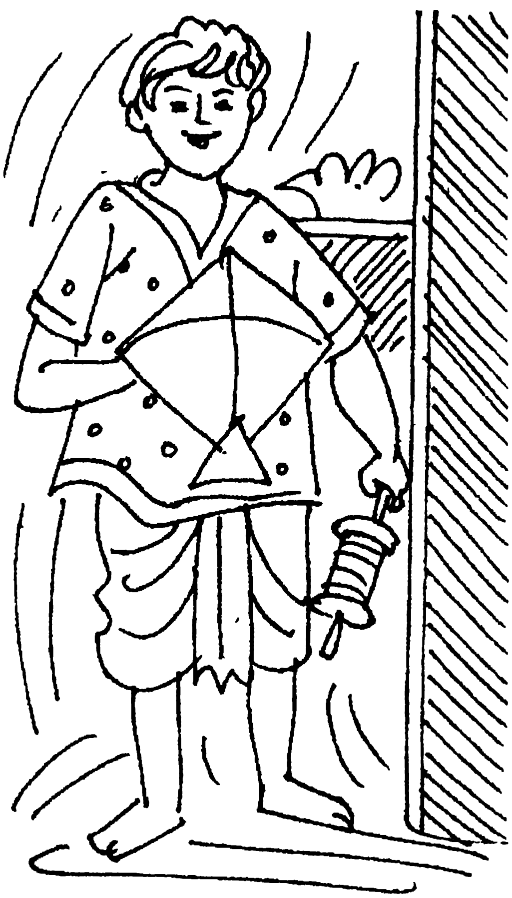


ছেলের বউ-এর অভিযোগ শুনে চাষিরা মা ঘরের ভিতরে ঢুকল। সেও অনুরূপভাবে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে মেয়েটিকে খুঁজতে লাগল। ঘরের ভিতরে একটা তক্তাপোশ রাখা ছিল। তার নীচে মেয়েটি লুকিয়ে থাকতে পারে, এই ভেবে সে মাটিতে বসে নীচের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগল। কোথাও কাউকে না দেখে সে বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়াতেই সামনের একটি চকচকে বস্তুর দিকে চোখ পড়ল। কৌতূহলী হয়ে জিনিসটির সামনে দাঁড়াতেই তার মতো একটি বুড়ি তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল। সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে বুড়িটিকে লক্ষ করল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাসতে হাসতে ছেলের বউকে বলল, "কোথায় তোমার সুন্দরী মেয়ে। ও তো একটা বুড়ি, মাথার চুল সব পাকা, গাল তোবড়ানো, দাঁত পড়ে গেছে। আর তুমি বলছ কিনা কমবয়সি সুন্দরী মেয়ে। মিছিমিছি আমার ছেলের বদনাম দিচ্ছ।" এই বলে সেই চাষির মা ছেলের পক্ষ নিয়ে বউকে কথা শোনাতে লাগল।

শাশুড়ির কথা শুনে বউ একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। লজ্জা-সংকোচ পরিত্যাগ করে চিৎকার করে বলতে লাগল, "আপনার ছেলে এক মায়াবিনীকে ঘরে এনেছে। আমি মিথ্যা বলছি না। সেই মায়াবিনী

আপনাকে তার প্রকৃত চেহারা দেখায়নি। প্রতারণা করার জন্য সে আপনার সামনে এক বুড়ির রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। ও একটা ডাইনি। আপনার ছেলে ডাইনির প্রেমে পড়েছে। আমার সর্বনাশ করাই ওই ডাইনির একমাত্র কাজ।"

ঘরের মধ্যে শাশুড়ি-বউয়ের মধ্যে যখন কথা কাটাকাটি হচ্ছে, এমন সময় বুড়ো চাষি এল। সে কোনোদিনই সংসারে এরকম দৃশ্য দেখেনি। তার স্ত্রী ছেলের বউকে খুব ভালোবাসে আর বউমাও শ্বশুর-শাশুড়িকে যত্ন করে। সমস্ত কিছু মিলে তাদের শান্তির সংসার। আকস্মিকভাবে এই ঝগড়া তাকে খুবই বিস্মিত করল। শ্বশুরকে দেখে ছেলের বউ চুপ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে বিছানায় মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। বৃদ্ধ শ্বশুর বোকার মতো স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইল। সে কোনো কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। অবশেষে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে, শাশুড়ি তার স্বামীকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। শ্বশুর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল। শেষে সে সমস্ত ব্যাপারটা তদন্ত করার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করল।



বৃদ্ধ চাষিও সেই ঘরে ঢুকল। চারদিকে বেশ ভালো করে সে মায়াবিনী রমণীকে খুঁজতে লাগল। কোথাও কোনো কিছু দেখতে না পেয়ে সে বিস্মিত হয়ে দেওয়ালের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল, তারই মতো এক বৃদ্ধ লোক ওই জিনিসটির ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে। বস্তুটির চারদিকে খোঁজাখুঁজি করে সে এক বৃদ্ধ ছাড়া, অন্য কাউকে দেখতে পেল না। বৃদ্ধ তখন ঘরের বাইরে এসে খুব জোরে একচোট হেসে নিয়ে বলল,—"সত্যি, তোমরা দুজনেই পাগল হয়ে গেছ। কোথায় বা তোমার দেখা বৃদ্ধা! আমার মতো একটা বুড়ো লোক জিনিসটার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল,—যার মাথা ভরতি টাক, মুখে একটাও দাঁত নেই, শুধু একটা পাকানো মস্ত গোঁফ। তোমাদের কারুর মাথার ঠিক নেই, তাই তোমরা কী দেখতে কী দেখেছ, নিজেরাই জান না।"

বুড়ো চাষির কথা শুনে শাশুড়ি-বউ দুজনেই খুব রেগে গেল। বুড়ো চোখে ভালো দেখে না, তাই সে-ই অন্য কিছু দেখেছে বলে চাষির মা স্বামীকে তিরস্কার করতে লাগল। শাশুড়ি আর বউ দুজনেরই এতক্ষণে নিশ্চিত বিশ্বাস হল যে চাষি নিশ্চিত কোনো মায়াবিনীর কবলে পড়েছে। আর সেই মায়াবিনী এক-একজনের কাছে এক-এক রকম রূপ ধরছে। বুড়ো চাষি তাদের অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই সমস্যার সমাধান করতে পারল না।

এদিকে চাষির একমাত্র ছেলে হাতে ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে ঘরে ঢুকল। মা ও ঠাকুমাকে কাঁদতে দেখে সে ভীষণ ঘাবড়ে গেল। এমন ঘটনা সে কখনো দেখেনি। ঠাকুমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করতেই চাষি-বউ ছেলেকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আরও জোরে কাঁদতে লাগল। মায়ের কোল থেকে ছটফট করে বেরিয়ে আসতেই ঠাকুমা নাতিকে জড়িয়ে ধরে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল। সমস্ত ব্যাপারটাই ছেলেটির কাছে রহস্যময় মনে

হল। ঠাকুমার কাছ থেকে কোনো রকমে ছাড়া পেতেই ঘুড়ি-লাটাই রাখতে সে ওই ঘরে ঢুকল। পরে লাট্টু ও লেত্তি খুঁজতে লাগল।

লাট্টু ও লেত্তি নিয়ে বেরিয়ে আসতে হঠাৎ ছেলেটির দেওয়ালের দিকে নজর পড়ল। সে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে দেখল যে তার মতো একটি ছোটো ছেলে চকচকে জিনিসটি থেকে বেরিয়ে এল এবং তার হাতেও লাট্টু আর লেত্তি। খুব অবাক হয়ে সে বলল, "এই, আমার দিকে তাকিয়ে আছিস কেন?" ওই জিনিসটির থেকে বেরিয়ে আসা ছেলেটিও তাকে একই কথা বলল। চাষির ছেলেটি মুখ ভেংচে বলল,— "শিগগির বল্ তুই কে? না বললে তোকে ঘুসি মারব।"— এই বলে হাতের মুঠো পাকিয়ে ঘুসি দেখাল। জিনিসটির ভিতরের ছেলেটিও ওই একই কথা বলে তাকে হাতের ঘুসি দেখাল।

চাষিব ছেলেটি হাতের লাট্টু দেখিয়ে বলল, "আমার হাতে কী দেখছিস? এটা ছুঁড়ে তোর মাথা ভেঙে দেব।" এই বলে সে যেমন লাট্টুটা ছোঁডার ভান করল, ঠিক অনুরূপভাবে, সে দেখতে পেল যে, তার দিকে সেও হাত ছুঁড়ছে। এইভাবে ক্রমশ চাষির ছেলেটির রাগ চড়তে লাগল। অবশেষে সে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে হাতেব লাট্টুটা ওই জিনিসটিতে ছুঁড়ে মাবল। লাট্টুটা জোরে গিয়ে লাগতেই দেওয়ালে টাঙান আয়নাটি ঝনঝন্ শব্দে ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল।

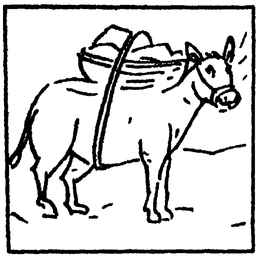
আওযাজ শুনে চাষির বউ, মা এবং বাবা ছুটে এল। তারা সকলে দেখল যে, চকচকে জিনিসটি খণ্ড খণ্ড হযে মাটিতে পড়ে আছে।

ইতিপূর্বে তারা কেউ আয়না দেখেনি। এখন বুঝতে পাবল যে ওতে তাদের সকলেরই প্রতিবিম্ব পড়ত এবং তাই প্রত্যেকেই নিজের নিজের মুখ ওতে দেখতে পেত। অবশেষে তারা মায়াবিনীর ভীতি থেকে মুক্ত হযে স্বস্তিব নিশ্বাস ফেলল।

সন্ধেবেলা চাষি মাঠ থেকে ফিরে এসে সেই ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল দরজা খোলা। তাড়াতাড়ি ঘবে ঢুকে শতখণ্ডে ভাঙা আয়নাটি দেখতে পেল। আর কী করবে! সে খুব দুঃখিত হয়ে কাঁচের খণ্ডগুলি কুড়াতে লাগল।



দুই বন্ধু



এক গ্রামে দুই বন্ধু ছিল। একজন কালা আর একজন অন্ধ। কালা হলেও সে জোরে কথা বললে শুনতে পেত। অন্ধের ছিল খুব বুদ্ধি আর কালার ছিল প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি।

একদিন দুজনে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। হঠাৎ কালা দেখতে পেল যে, একটি পুকুরের ধারে মস্ত বড়ো একটা গামলাতে একরাশ দামি দামি কাপড় রয়েছে; আর গামলাটির পাশে একটা গাধা বাঁধা রয়েছে। কালা অন্ধকে সব কথা জানালে সে বলল, "ওই গামলাসুদ্ধ কাপড় আর গাধাটা সঙ্গে নাও। দামি দামি কাপড় বিক্রি করে কিছুদিন আমরা পেট পুরে খেতে পারব। গাধাটাকেও কোনো-না-কোনো কাজে লাগান যাবে।" অন্ধের কথা শুনে কালা কাপড়গুলোকে একসঙ্গে বেঁধে গাধার পিঠে চড়িয়ে গামলাটা কাঁধে তুলে নিল এবং পা চালিয়ে চলতে লাগল।

কিছুটা যাওয়ার পর কালা দেখতে পেল যে, অস্বাভাবিক বড়ো বড়ো কতকগুলো পিঁপড়ে মাটিতে ঘোরাফেরা করছে। অন্ধকে সে কথা বলতেই সে কয়েকটা পিঁপড়ে নস্যির কৌটোর মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে বলল। অন্ধের কথামতো কালা বেছে বেছে বেশ কয়েকটা পিঁপড়েকে কৌটোতে রেখে দিয়ে আবার পথ চলতে শুরু করল।

যেতে যেতে ক্রমে সূর্যের আলোর বদলে সন্ধের অন্ধকার শুরু হল। এখন কী করা যায়, কালা বন্ধুর কাছে সে বিষয়ে পরামর্শ চাইল। অন্ধ তাকে একটা গাছের উপর উঠে চারিদিক দেখতে বলল। অন্ধের কথামতো কালা একটা গাছে উঠে চারদিক দেখতে দেখতে সামান্য দূরে মস্ত বড়ো একটা বাড়ি দেখতে পেল। গাছ থেকে নেমে কালা সেকথা বলল। অন্ধ বলল, "চল, ওইখানেই আমরা আজকের রাতটা কাটাব।"

বাড়িটার সামনে এসে কালা দেখতে পেল যে, গাছের উপর থেকে যেমন ভেবেছিল, বাড়িটা তার চেয়েও অনেক বড়ো। কিন্তু বাড়িটার সদর দরজায় একটা তালা ঝোলান।

এদিকে সন্ধের অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল। অন্ধ বন্ধুকে তালা ভাঙতে বলল। তালা ভাঙা হলে দুই বন্ধু গাধাটাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

ওই বাড়িটা ছিল এক দৈত্যের। দৈত্য ফিরে এসে যখন দেখল যে তার বাড়ি ভিতর থেকে বন্ধ, তখন সে খুবই অবাক হয়ে গেল। ঘরের তালা ভেঙে কেউ যে তার ভেতরে ঢুকতে পারে, একথা দৈত্যের সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। ফলে সে নানা অদ্ভুত অদ্ভুত এবং আজব জীব সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগল। যদিও দৈত্যের শরীরে শক্তির অভাব ছিল না, কিন্তু তার মাথা ছিল নিরেট। দরজা ভেঙে নিজের বাড়িতে না ঢুকে প্রচণ্ড ভীতস্বরে সে জিজ্ঞেস করল, "বাড়িতে কে আছে? দোহাই তোমার গলার আওয়াজটা একটু শোনাও তো!"

দৈত্যের গলা শুনে কালা ভয়ে সাদা হয়ে গেল। কিন্তু অন্ধ বলল যে, ভয়ের কিছু নেই। বুদ্ধি দিয়েই দৈত্যকে তাড়ানো যাবে। সে কালাকে গাধাটার দুকানের ফুটোয় বেশ কয়েকটা পিঁপড়ে ছেড়ে দিতে বলল।

অন্ধের কথা শুনে কালা নস্যির কৌটো খুলে সেই বড়ো বড়ো পিঁপড়েগুলোকে গাধার কানের ফুটোয় ঢুকিয়ে দিল। কানের মধ্যে পিঁপড়েগুলো যখন কামড়াতে লাগল, তখন গাধাটা প্রাণপণে বিকট চিৎকার করতে লাগল।

গাধার চিৎকার শুনে দৈত্য ভয়ে প্রায় আধমরা হয়ে গেল। সে ভাবল, নিশ্চয়ই কোনো অপদেবতা তার বাড়িতে ঢুকেছে এবং এটা তারই আওয়াজ। যাই হোক কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে সে আবার বলল, "দেখি, তোমার হাঁ"। অন্ধ কালাকে সেই বিরাট গামলাটা তুলে জানালার উপর রেখে দিতে বলল। দৈত্য গামলার গহ্বরকে অপদেবতার হাঁ মনে করে ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে কাছের জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিল।

ভোর হলে কালা দৈত্যের বিশাল বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। সমস্ত বাড়িটা ঘোরা হলে সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে অন্ধকে বলল, "বন্ধু, বাড়ির ভিতরে একটা চোর-কুঠরি আছে। সেটা শুধু মণি-মুক্তোয় ভরা!"

"আমাকে এক্ষুনি সে ঘরে নিয়ে চল"— অন্ধ বলল। ঘরে পৌঁছে অন্ধ বলল, "মণি-মুক্তোগুলো আমরাই নেব। কিন্তু নেবার আগে প্রত্যেকটা জিনিস আমি ছুঁয়ে দেখতে চাই।"



অন্ধের কথামতো কালা প্রত্যেকটা মণি-মুক্তো আগে তাকে ছুঁতে দিল। অন্ধ বন্ধুটি এবারে সবগুলোকে এক জায়গায় এনে সমান মাপের চারটি পুঁটলি করতে বলল। তাই করা হল এবারে গাধার পিঠে দুটো পুঁটলি ও দুই বন্ধু দুটো পুঁটলি নিয়ে সদর দরজা খুলে রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করল।

এদিকে দৈত্যটি কাছের জঙ্গলেই লুকিয়ে বসেছিল এবং সারাক্ষণ তার নিজের বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ সদর দরজা দিয়ে দুটি মানুষ ও একটি গাধাকে বেরোতে দেখে সে সাহস করে এগোতে লাগল। কিছুদূর এসে তার নজর পড়ল পুঁটলিগুলোর উপর। রেগে লাল হয়ে সে তার পাঁচ ভাইকে ডাকতে ছুটল।

দৈত্যের পাঁচ ভাই কাছাকাছি থাকত। হঠাৎ দৈত্যকে হন্তদন্ত হয়ে সকাল বেলায় আসতে দেখে তারা উদ্বিগ্ন হল। সব শুনে পাঁচ ভাই পাঁচটা মোটা মোটা লাঠি নিয়ে দৈত্যের সঙ্গে ঘটনাস্থলে রওনা হল।

দৈত্য তার ভাইদের ডেকে আনতে গিয়ে যেটুকু দেরি করেছিল, তার মধ্যে কালা আর অন্ধ বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ পিছন থেকে ঝড়ের মতো ধুলো আসতে অন্ধ ব্যাপারটা জানার জন্য কালাকে একটা উঁচু জায়গা থেকে দেখতে বলল। বন্ধুর কথামতো কালা কাছের একটা টিলায় উঠে দেখতে গেল। একটু পরেই সে চেঁচিয়ে অন্ধকে বলল যে এবারে একজনের জায়গায় ছজন দৈত্য আসছে। সুতরাং ইষ্টনাম জপ করা ছাড়া আর গতি নেই।

অন্ধ সব শুনে বলল— "এক্ষুনি গাধাটাকে কাছাকাছি কোনো গর্তে লুকিয়ে ফেল। পুঁটলিগুলো একটু দূরে দূরে মাটিতে ফেলে দাও, আর চটপট আমাকে নিয়ে একটা উঁচু গাছে ওঠ।"

অন্ধের পরামর্শমতো কাজ করা হতেই দৈত্যগুলো কাছাকাছি এসে পড়ল। তারা ধন-রত্নের পুঁটলিগুলোকে প্রথমে এক জায়গায় রাখল। তারপর গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে কট্‌মট্‌ করে দুই বন্ধুর দিকে তাকাতে লাগল।

কালা থরথব কবে কাঁপতে কাঁপতে দেখল যে, দৈত্যরা গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে কী যেন বলাবলি করছে। দৈত্যগুলোর চেহারা ছিল বিকট, কানগুলো ছিল কুলোর মতো চওড়া, আর মাথা ছিল গাছের গুঁড়ির মতো বড়ো। কিন্তু তারা কেউ-ই গাছে চড়তে পারত না। গাছের মগডালে বসে-থাকা দুই বন্ধুকে তারা কী কবে ধরতে পারে, তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে দৈত্যদের মধ্যে একজন বলল, "কোনো ভাবনা নেই। একজনের ঘাড়ে পা দিয়ে আর একজন উঠবে। দ্বিতীয় জনেব ঘাড়ে দাঁড়াবে তৃতীয় জন। আব এভাবে উঠলে ষষ্ঠ জন নিশ্চয়ই ওই দুজন মানুষেব নাগাল পাবে।"

বুদ্ধিমান দৈত্যের কথামতো তারা একজনের উপর আর একজন— এভাবে দাঁড়াতে লাগল। পঞ্চম জনের উপর ষষ্ঠজন দাঁড়াতেই কালা ভয়ের চোটে অন্ধকে সামনে ঠেলে দিল।

অন্ধ এতক্ষণ ধরে কী ঘটছে, তা কিছু জানতে পারেনি। তাই দৈত্যের ঘাড়ে পড়ে সে ভাবল যে এটা নিশ্চয়ই একটা মোটাসোটা গাছের গুঁড়ি। সে দুদিকে হাত বাড়িয়ে গাছের ডাল খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে দৈত্যের মস্ত মস্ত কানদুটো তার হাতে ঠেকল। সে ওই কানকেই গাছের ডাল মনে করে প্রাণপণে চেপে ধরল।

আচমকা ঘাড়ের উপর একটা ভারি বোঝা পড়ায় এবং দু-কানে প্রচণ্ড টান লাগায় ষষ্ঠ দৈত্যটি চিৎকার করে পঞ্চম দৈত্যের ঘাড় থেকে লাফিয়ে পড়ল। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে তার পিঠে নিশ্চয়ই কোনো অপদেবতা চড়েছে।

এদিকে ষষ্ঠ দৈত্যের ওই রকম চিৎকার ও লাফিয়ে পড়া দেখে আর পাঁচজন দৈত্যও প্রাণভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগল। ষষ্ঠ দৈত্যটিও দেহের সর্বশক্তি দিয়ে পিঠের বোঝাকে ফেলে দিয়ে দৌড়ুতে লাগল।

ছজন দৈত্যই চোখের আড়াল হলে কালা গাছ থেকে নেমে এল, এবং খুব দুঃখিত হয়ে অন্ধকে বিপদে ফেলার জন্য ক্ষমা চাইল। পরে অন্ধের কথামতো গাধাটাকে লুকোনো জায়গা থেকে বের করে এনে আগের মতোই পুঁটলিগুলো নিয়ে বাড়ির পথে হাঁটতে লাগল।

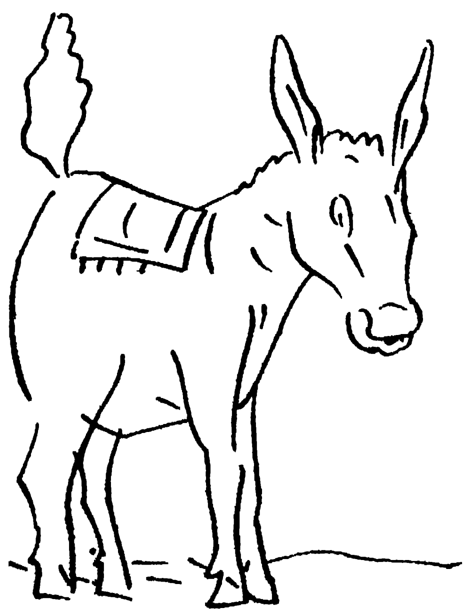
বাড়ি পৌঁছে কালার মনে দুষ্টবুদ্ধি জেগে উঠল। সে ভাবল যে, ধন-রত্নের সমান ভাগ করার কোনো দরকার নেই। কারণ অন্ধ যখন চোখে দেখতে পায় না, তখন সে নিশ্চয়ই হেরফের বুঝতে পারবে না। এই ভেবে সে নিজের একটি পুঁটলি ও গাধার পিঠের দুটো পুঁটলি লুকিয়ে ফেলল। শুধু অন্ধের হাতের পুঁটলিটি নিয়ে সমান দুভাগে ভাগ করল। তারপর খুব খুশিখুশি গলায় বলল, "বন্ধু, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখে নাও, ভাগ ঠিক হয়েছে কিনা।"

কালার কথামতো অন্ধটি হাত দিয়ে দুটো ভাগই স্পর্শ করল। তারপর প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে বলল, "তুমি আমাকে ঠকাতে চাইছ? আমি হলফ করে বলতে পারি এটা একটা পুঁটলির ধনরত্ন। ভালো চাও তো আরও তিনটে পুঁটলি বার কর।"

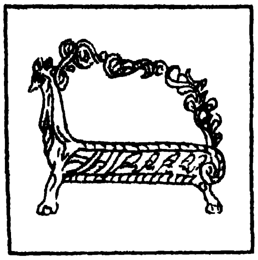
কালা একথা শুনে গলার পর্দা সপ্তমে চড়িয়ে বলল, "চোখে যে দেখতে পায় না, তার কথা কেউ মানবে না। ইচ্ছে হয় এই ভাগ নাও, নয়তো বিদায় হও। এগুলিই চারটে পুঁটলিব ধন-রত্ন।"

অন্ধ এ ধরনের জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা শুনে প্রচণ্ড রেগে কালাকে বিরাশি সিক্কা ওজনের একটি ঘুষি মারল। ঘুষিটি কালার কানে লাগল। ঘুষি খেয়ে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলে সে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল যে, সে কানে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই তাকে মারার প্রতিশোধ নিতে উন্মত্ত হয়ে সে অন্ধের চোখে মুঠো মুঠো বালি ছুঁড়তে লাগল। বালি চোখে পড়তেই অন্ধ চোখ কচলাতে লাগল। কচলাতে কচলাতে তার চোখ থেকে হালকা পর্দার মতো কী যেন বেরিয়ে এল। তারপর অবাক বিস্ময়ে সে বুঝতে পারল যে, সে সমস্ত কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

এখন কালা আর কালা নয়, অন্ধও আর অন্ধ নয়। কালা বন্ধুকে প্রবঞ্চনা করার জন্য ক্ষমা চাইল, অন্ধও বন্ধুকে মাবার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করল। দুজনে সমস্ত মণি-মুক্তো একসঙ্গে রেখে সমান তিনটি ভাগ কবল এবং এক ভাগ গরিব-দুঃখীকে দান করল। তারপব নিজের নিজের ভাগ নিয়ে পরম শান্তিতে জীবন কাটাতে লাগল।



অলৌকিক পালঙ্ক



এক ছিল সওদাগর। নিঃসন্তান। তাই তার মনে একটুও সুখ ছিল না। দিনরাত গালে হাত দিয়ে সে ভাবে আর ভাবে। তার এত ধন-সম্পত্তি শেষ পর্যন্ত কে নেবে? অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে সে একটি পুত্রসন্তান লাভ কবল। তার নাম রাখা হল সদাশিবম্।

বাবা-মায়ের পর্যাপ্ত আদর আর ভালোবাসায় সদাশিবম্ বড়ো হতে লাগল। কিন্তু ছেলের প্রতি অত্যধিক মমতার জন্য সওদাগর তাকে পড়াশোনা বা কোনো কাজ করতে দিত না। কারণ সে ও তার স্ত্রী ভাবত যে ওসব করলে সদাশিবমের কষ্ট হবে।

ক্রমে সদাশিবমের বিয়ের বয়স হল। সওদাগর একটি পরমা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিয়ের অল্পদিন পরেই আকস্মিকভাবে সওদাগর ও তার স্ত্রী মারা গেল।

শ্বশুর শাশুড়ির মৃত্যুর পর সদাশিবমের বউ খুবই মুশকিলে পড়ল। কারণ কথায় আছে— বসে খেলে পাহাড়ও ক্ষয়ে শেষ হয়ে যায়। স্বামী কোনো কাজ না-করায় জমানো টাকার পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকল, সদাশিবমের বউ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল। আর এভাবে চিন্তা করতে করতে সে ক্রমশ রোগা হতে লাগল।

একদিন সন্ধেবেলা বউয়ের শুকনো মুখ দেখে সদাশিবম্ জিজ্ঞাসা করল— "কী হয়েছে তোমার? কী ভাবছ এত?"

"ভাবছি জমানো টাকা শেষ হয়ে গেলে আমাদের ভবিষ্যৎ চলবে কী করে? তুমি তো কোনো কাজ জান না!"— বউ বলল।

সদাশিবম্ হেসে বলল যে, যিনি জীব সৃষ্টি কবেন, তিনিই তার আহারেরও ব্যবস্থা করেন। ভগবানে বিশ্বাস রাখলে কোনো ভাবনাই থাকে না।

পরদিন ভোর হতে-না-হতেই সদাশিবম্ বউকে ডেকে বলল, "শিগগিব আমাকে কিছু খাবার দাও, আমি বেরুব।" খাবার খেয়ে একটা ধারালো কুঠার নিয়ে সদাশিবম্ এক গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল। জঙ্গলে প্রত্যেকটি বড়ো গাছকে সে জিজ্ঞাসা করল, "আমি কি তোমাকে কাটতে পারি?" কিন্তু কোনো গাছ উত্তর দিল না। সন্ধে নেমে এলে সে ঘরে ফিরে এল।

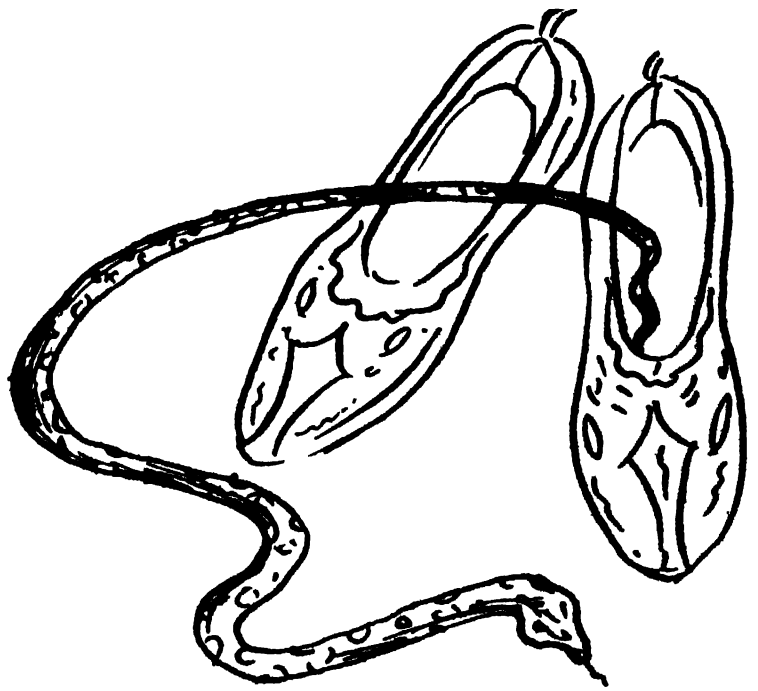
তার পরের দিন সদাশিবম্ অন্য একটি জঙ্গলে গেল এবং আগের দিনের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। কিন্তু এদিনও কেউ জবাব দিল না। এভাবে ছদিন সে বিভিন্ন জঙ্গলে ঘুরল আর জঙ্গলের প্রত্যেকটি বড়ো গাছকে এই একই প্রশ্ন করল; এবং যথারীতি উত্তর না পেয়ে বাড়ি ফিরে এল।

সপ্তম দিন সদাশিবম্ অনেক দূরের এক জঙ্গলে গেল, আর খুব প্রাচীন একটা আম গাছকে জিজ্ঞাসা করল— "আমি কি তোমাকে কাটব?" অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ভাবে আমগাছটি গভীর আন্তরিক স্বরে বলল, "নিশ্চয়ই কাটবে। তোমার যতটা কাঠ দরকার, আমার কাছ থেকে নাও।" খুব খুশি হয়ে সদাশিবম্ প্রচুর পরিমাণে কাঠ সেই আমগাছ থেকে নিল। তারপরে সমস্ত কাঠ একটা ঠেলায় চাপিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

সদাশিবমের বউ এত কাঠ দেখে খুব আশ্চর্য হল। কিন্তু তাকে কোনো প্রশ্ন করতে না দিয়ে সদাশিবম্ বলল যে, এই কাঠ নিয়ে সে একটি ঘরে ঢুকবে এবং সাতদিন সেই ঘরেই থাকবে। এই সাতদিন তাকে যেন কেউ না ডাকে। তার খাবার ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে যেন নামিয়ে দেওয়া হয়। এইকথা বলে সে সমস্ত কাঠ নিয়ে একটি ঘরে সাতদিন দরজা-জানলা বন্ধ করে একলা থাকল।

সাতদিন পর দরজা খুলে সদাশিবম্ তার বউকে ডাকল। বউ দেখল একটি অপরূপ সুন্দর পালঙ্ক ঘরের ভিতর রাখা আছে। সে খুব বিস্মিত হল এবং স্বামীর হাতের কাজের অনেক প্রশংসা করল।

কিছুক্ষণ পরে সদাশিবম্ ওই অপূর্ব পালঙ্কটি নিয়ে সেই দেশের রাজার প্রাসাদের সামনে রেখে নিজেও তার পাশে বসে থাকল। ওই অসাধারণ কারুকার্যময় পালঙ্কটি দেখে অনেকেই কৌতূহলী হয়ে সেটার দাম জিজ্ঞেস করতে লাগল। কিন্তু সে খুব বিনীতভাবে বলল যে, এই পালঙ্কটি স্বয়ং মহারাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে। তাই সেটার দাম সম্পর্কে আর কারু সঙ্গে কথা বলতে সে পারবে না।



সদাশিবমের এই কথা মহারাজের কানে গেল। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পালঙ্কটি দেখতে এলেন। পালঙ্কটি পছন্দ হওয়ায় তিনি সেটি কেনার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। সদাশিবম্ মূল্য বাবদ দশ হাজার টাকা চাইল। মহারাজ একটি পালঙ্কের এত বেশি দাম শুনে খুব আশ্চর্য হলেন। কিন্তু প'রক্ষণেই ভাবলেন— নিশ্চয়ই এতে কোনো রহস্য আছে।

মহারাজ পালঙ্কের মূল্য বাবদ সদাশিবম্‌কে দশ হাজার টাকা দিলেন। সদাশিবম্ মহারাজকে বলল, "হুজুর, আমার অনুরোধ, আপনি প্রথম রাত্রিতে পালঙ্কটিতে একলা শোবেন আর সারা রাত জেগে থাকবেন।" মহারাজ সম্মত হলেন।

এদিকে এত টাকা একসঙ্গে হাতে পেয়ে সদাশিবমের বউ খুব খুশি হল। সে ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তা করা ছেড়ে দিল। অল্পদিনের মধ্যেই তার চেহারায় আবার সৌন্দর্য ও লাবণ্য দেখা দিল।

সদাশিবমের কথামতো মহারাজ একটি নির্জন ঘরে পালঙ্কটি পেতে তাতে একলা শুলেন। এবং না ঘুমিয়ে পালঙ্কের রহস্য সম্পর্কে নানা কথা ভাবতে লাগলেন। ইতিমধ্যে দেউড়ি থেকে রাত দশটার ঘণ্টা বাজল। একটু পরে মহারাজ শুনতে পেলেন যে, পালঙ্কের একটি পায়া আর তিনটি পায়াকে ফিসফিস করে বলছে,— "বন্ধুরা, আমি একটু ঘুরে আসছি। তোমরা সতর্ক থেকো যেন মহারাজ পালঙ্ক থেকে পড়ে না যান।" এই বলে সেই পায়াটি ধীরে ধীরে নিজেকে পালঙ্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে চটপট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে পায়াটি একটি গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল। সে সেখানে দুটি বিষধর সাপকে ঝগড়া করতে

দেখল। কী নিয়ে তারা ঝগড়া করছে— জানার জন্য পায়াটি একটি গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকল। সে শুনতে পেল, প্রথম সাপটি বলছে, "আমিই রাজাকে কামড়াব।" দ্বিতীয় সাপটি প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, "না, তুই কিছুতেই পারবি না। আমি রাজাকে কামড়াব।" তখন প্রথম সাপটি আবার বলল, "আমি রাজার জুতোর মধ্যে ঢুকে থাকব। রাজা যেই জুতো পরতে যাবে, অমনি আমি তাকে কামড়াব।"

এই কথা শুনে পালঙ্কের প্রথম পায়া ফিরে এল এবং অন্য তিনটি পায়াকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে আবার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। এবারে দ্বিতীয় পায়াটি পালঙ্ক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করল এবং প্রথম পায়াটির মতো রাজ্যটি ঘুরে দেখতে গেল!

দ্বিতীয় পায়াটি একটি বনে প্রবেশ করল। এই বনে মহারাজের গ্রীষ্মকালীন আবাস ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল সংস্কার না হওয়ায় বাড়িটি বেশ জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় পায়াটি শুনতে পেল যে, সেই ভগ্নপ্রায় বাড়িটি গভীর বেদনায় বলছে, "আমাকে মহারাজ সারাচ্ছেন না। মহারাজ আমার কাছে এলেই আমি তাঁর ঘাড়ে ভেঙে পড়ব।"

দ্বিতীয় পায়াটি ফিরে এল আর তার অভিজ্ঞতার কথা তিন বন্ধুকে বলে আবার পালঙ্কের সঙ্গে লেগে নিশ্চল হয়ে রইল।

তৃতীয় পায়াটিও অনুরূপভাবে পালঙ্ক থেকে বার হল এবং অপর তিনজনকে মহারাজের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলল। ঘুরতে ঘুরতে সেও একটি জঙ্গলে প্রবেশ করল। এই জঙ্গলে এক সন্ন্যাসী ধুনি জ্বেলে ঈশ্বরের আরাধনা করতেন। সামনের গ্রামে এক সৈনিকের স্ত্রী এই সন্ন্যাসীর সেবাযত্ন করত। ক্রমশ সন্ন্যাসীর প্রতি সেই সৈনিকের স্ত্রীটির ভালোবাসা জন্মেছিল। সেদিন সৈনিকটি দীর্ঘকাল পর বাড়ি ফেরায় সৈনিকের স্ত্রীর সন্ন্যাসীর কাছে আসতে অনেক দেবি হয়েছিল। রমণীব দেরি হওয়ায় সন্ন্যাসী প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে সব সত্যকথা বলল। কিন্তু তাতেও শান্ত না হয়ে সন্ন্যাসী তাকে বললেন, "যদি তুমি সত্য সত্যই আমাকে ভালোবাস, তবে এই মুহূর্তে তোমার স্বামীর মাথা কেটে এনে আমাকে দেখাও।"

সন্ন্যাসীর কথা শুনে রমণীটি একছুটে বাড়ি গেল এবং একটি ধারালো বঁটির সাহায্যে তার পরিশ্রান্ত ও ঘুমন্ত স্বামীর মাথা কেটে ফেলল। তারপরে সেই কাটামুণ্ডটি আঁচলের তলে লুকিয়ে সন্ন্যাসীকে এনে দেখাল।

এই পৈশাচিক কাজ দেখে সন্ন্যাসী আতঙ্কে চিৎকার করে বললেন, "তুমি এতদূর অধঃপাতে গেছ যে, এ ধরনের অমানুষিক কাজ করতেও তোমার দ্বিধা হল না। এই মুহূর্তে তুমি আমার সামনে থেকে বিদায় হও। আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।"

রমণীটি সন্ন্যাসীর কথা শুনে এক মুহূর্ত চিন্তা করল; তারপর দ্রুতপদে বাড়ি পৌঁছে রক্তমাখা বঁটিটি খাটের নীচে লুকিয়ে রেখে কাটামুণ্ডটি স্বামীর দেহের সঙ্গে লাগিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। তার কান্নার শব্দে প্রতিবেশীরা এলে সে বলল যে, এইমাত্র তাদের বাড়িতে একদল চোর ঢুকে তার স্বামীকে কেটে ফেলেছে। প্রতিবেশীরা এই শোচনীয় ঘটনা শুনে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলল যে, কাল সকালেই তারা এই কথা মহারাজকে জানাবে।

তৃতীয় পায়াটি সবকিছু দেখল এবং ফিরে এসে অন্য পায়াদের বলল।

চতুর্থ পায়াটি যথারীতি ঘুরতে বেরুল। সে একটি গভীর বনে সাতজন দুর্ধর্ষ ডাকাতকে দেখতে পেল। ডাকাতরা মহারাজের ধনাগার লুণ্ঠন করেছে এবং ঘুমন্ত রাজকন্যাকেও চুরি করে এনেছে। ধনরত্ন সমান সাতভাগে ভাগ করলেও রাজকন্যাকে কে নেবে— তাই নিয়ে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড বচসা হচ্ছে। চতুর্থ পায়াটি সবকিছু দেখে ফিরে এল এবং অন্য পায়াদের তার অভিজ্ঞতার কথা বলল।

মহারাজ চারটি পায়ার কথাই শুনলেন। ইতিমধ্যে রাতের আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠল।

অলৌকিক পালঙ্কের পায়াদের কথার সত্যতা যাচাই করতে মহারাজ তাঁর চাকরকে ডেকে জুতো জোড়া আনালেন। জুতো ঝাড়তেই কালো কুচকুচে এক সাপ জুতো থেকে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের চাকব সাপটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলল।

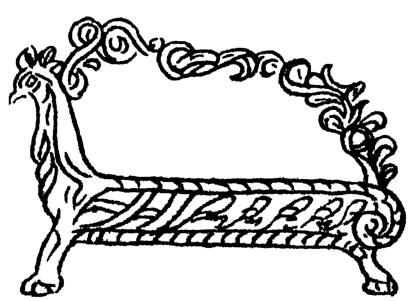
এবাবে মহাবাজ প্রচুর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ডাকাতরা যে বনে লুকিয়ে ছিল, তা ঘিরে ফেললেন। তাবা ধবা পড়ল; ঘুমন্ত রাজকন্যাকে মহাবাজ বাজপুরীতে পাঠাবাব ব্যবস্থা কবলেন।

প্রথম ও চতুর্থ পাযার কথার সত্যতা যাচাই হলে মহাবাজ দ্বিতীয় পাযাব কথামতো তাঁব গ্রীষ্মাবকাশের বাড়িটি দেখতে গেলেন। মহারাজকে আসতে দেখেই বাড়িটি হুড়মুড় কবে ভেঙে পড়ল। একটুব জন্য তিনি বক্ষা পেলেন।

বাজদববাবে মহাবাজ আসন গ্রহণ কবলেন। কিছুক্ষণ পবে কযেকজন লোক এসে বলল যে, একদল চোর মহাবাজেব একজন সৈনিককে কেটে ফেলেছে। মহারাজ সৈনিকের স্ত্রীকে দরবাবে হাজির করতে আদেশ দিলেন। স্ত্রীটি কাঁদতে কাঁদতে এসে পূর্ব নালিশেবই পুনরাবৃত্তি কবল। কিন্তু মহাবাজ ভাবলেন যে অন্য পায়াদের কথাব সত্যতা যখন প্রমাণিত হযেছে, তখন তৃতীয পাযাটিব কথাও নিশ্চযই সত্য হবে। এই ভেবে তিনি এক ব্যক্তিকে গোপনে সৈনিকেব বাড়িতে পাঠালেন এবং বাড়িটি ভালো কবে অনুসন্ধান কবতে বললেন। মহাবাজেব আদেশে ব্যক্তিটি সৈনিকেব বাড়িতে গেল এবং সমস্ত বাড়িটি তন্ন তন্ন কবে খুঁজে খাটের নীচে একটি বক্ত মাখা বঁটি পেল। সে ওই বঁটিটি এনে মহাবাজকে দেখাল। সমস্ত বহস্য পবিষ্কার হয়ে গেল। বমণীটিও হাতে-নাতে ধবা পড়ায তাব অপবাধ স্বীকাব করতে বাধ্য হল। মহাবাজ এই মিথ্যাবাদিনী ও স্বামীঘাতিনী স্ত্রীকে তাব মৃত স্বামীব সঙ্গে একই চিতায নিক্ষেপ কবতে আদেশ দিলেন। মহারাজের আদেশ পালন কবা হল।

পবদিন মহাবাজ সদাশিবম্‌কে ডেকে পাঠালেন। অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে তাকে মহাবাজ বললেন, ''আগামীকাল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তুমি একা যত প৺িমাণ ধন-দৌলত বইতে পার, আমাব কোষাগার থেকে নিয়ে যাবে।''

মহাবাজেব আদেশ মতো সদাশিবম্ প্রচুব পবিমাণ ধনরত্ন নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। এরপর থেকে সদাশিবম্ ও তাব বউযেব জীবন সুখে কাটতে লাগল।



জ্যোতিষী ও কয়েকজন দস্যু



একদল ডাকাতের সঙ্গে একজন জ্যোতিষীও ছিল। সে অবশ্য ডাকাতি করতে যেত না; তবে কোন্‌দিন কোথায়, কোন্ সময়ে কার বাড়িতে ডাঁকাতি করতে হবে— তা গণনা করে বলে দিত। ডাকাতরাও অপহৃত সম্পত্তি সমানভাবে ভাগ করে তাকেও এক অংশ দিত।

একদিন জ্যোতিষীর কেমন সন্দেহ হল। সে ভাবল যে ডাকাতেরা তাকে ঠকাচ্ছে। তারা তাকে ঠিকমতো পাওনা-গণ্ডা দিচ্ছে না। ফলে, জ্যোতিষী ঠিক করল যে, সে ডাকাতদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে ও ডাকাতির শেষে নিজের অংশ কড়ায় ক্রান্তিতে বুঝে নেবে।

এক গভীর রাত্রে ডাকাতের দল তার বাড়িতে এল। সে গণনা করে কোন্‌দিকে, কোন্ বাড়িতে, কোন সময় ডাকাতি করতে হবে, জানিয়ে দিল। অবশেষে তারা চলে যাবার জন্য উদ্যোগী হলে সে বলল — "দেখ, আমি মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছি। পাত্রপক্ষকে বেশ কিছু টাকা দিতে হবে। আর এটাও তো তোমরা জানো যে, বিয়েতে অনেক টাকার দরকার হবে। তাই আমি ভাবছি এখন থেকে আমিও তোমাদের সাথী হব। তারপর লুটের মাল কোনো একটি ফাঁকা জায়গায় রেখে সমানভাবে ভাগ করে নেব। আশা করি এতে তোমাদের অমত হবে না।"

জ্যোতিষীর কথা শুনে ডাকাতেরা একেবারে থ' হয়ে গেল। তারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। অবশেষে একজন বলল, "তুমি কেন এই খাটুনির কাজে আসবে? আমরা যেভাবে সমস্ত কাজ করে থাকি, সেভাবে তুমি পারবে না। তোমার আমাদের সঙ্গে না আসাই ভালো।"

দস্যুর কথা শুনে জ্যোতিষীর সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। সে ভাবল যে, তারা তাকে খুবই ফাঁকি দিচ্ছে। তাই ডাকাতদের সঙ্গে যাবার জন্য সে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। অনেক বুঝিয়েও জ্যোতিষীকে নিরস্ত করতে না পেরে ডাকাতেরা তাকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হল।

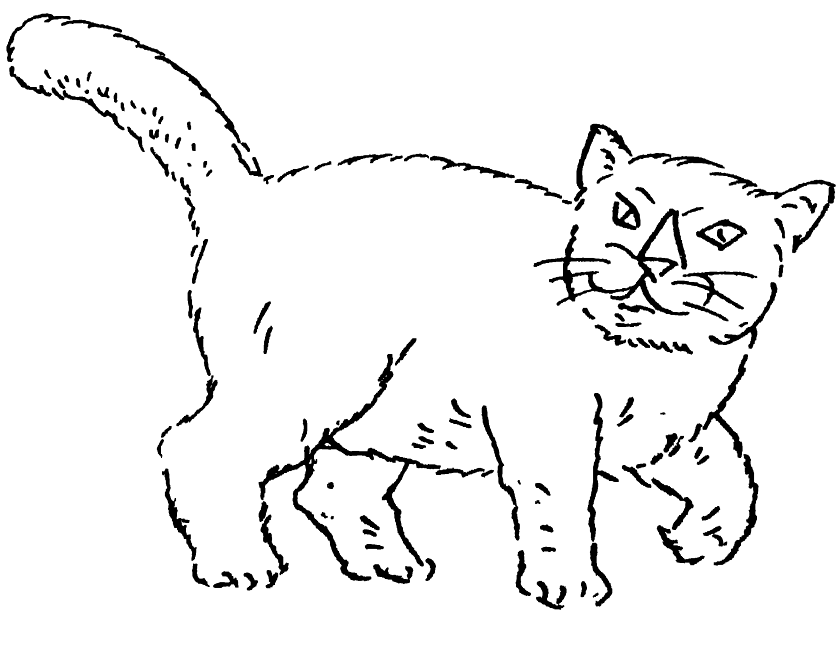
সেদিন তারা গ্রামের দক্ষিণ দিকে এক বাড়িতে ডাকাতি করতে গেল। সে বাড়িটি ছিল এক ধনী ব্যবসায়ীর। প্রচুর ধন-দৌলতের মালিক ছিল সে। জ্যোতিষী গণনা করে যে তিথি ও সময় নির্ধারিত করেছিল, তা ছিল অমাবস্যার রাত। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে সমস্ত দিক গভীর অন্ধকারে ডুবে গেলে ডাকাতেরা সেই ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে চড়াও হল। বাড়ির ভিতরে ঢোকার আগে ডাকাতের সর্দার জ্যোতিষীকে বলল, "ঠাকুর, তুমি তো কোনোদিন ডাকাতি করনি। ডাকাতি করার নিয়ম-কানুন তুমি জান না। এক কাজ কর। আমরা ঘরের ভেতরে যাচ্ছি, তুমি দরজার বাইরে পাহারায় থাক। যদি কোনো বিপদের সঙ্কেত পাও, তবে তোমাকে যে বাঁশি দিলাম, তাতে একটা ফুঁ দেবে জোরে। তোমার বাঁশির আওয়াজ শুনলেই আমরা অন্য পথ দিয়ে পালিয়ে যাব। আর তুমিও খুব জোরে জোরে ভগবান বিষ্ণুর নাম করতে করতে সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করবে। সবাই তোমাকে এ অঞ্চলের ভালো লোক বলে জানে, কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। ভাববে তুমি হয়তো কোথাও গণনার কাজে গিয়েছিলে। পরে আমরা তোমার ঘরে বসে ডাকাতির মাল ভাগ করে নেব।"

ডাকাত-সর্দারের কথা জ্যোতিষীর মনে ধরল। সে বাইরে মুখে বাঁশি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সে ভাবল একটু চলে-ফিরে বেড়ান যাক। এই ভেবে সে দরজা ছেড়ে পাঁচিলের চারপাশে খুব সাবধানে ঘোরাফেরা করতে থাকল।

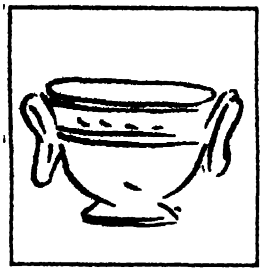
আনমনে ঘোরাফেরা করতে করতে জ্যোতিষী সমস্ত পরিবেশটাই বিস্মৃত হয়ে গেল। এমন সময় একটা কালো বিড়াল 'ম্যাও' আওয়াজ তুলে পাঁচিল থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল। জ্যোতিষী অন্ধকারে বিড়ালের চকচকে চোখ দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠতেই মুখের বাঁশিটি জোরে বেজে উঠে মাটিতে পড়ে গেল। এদিকে ডাকাতেরা হঠাৎ বাঁশির আওয়াজ শুনে পালাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। অন্যদিকে চিৎকার ও বাঁশির আওয়াজ একই সঙ্গে শুনতে পেয়ে বাড়ির সবাই জেগে উঠল। একদিকে অনেক লোকের পালিয়ে যাবার পায়ের আওয়াজ, অপরদিকে বাঁশির তীব্র স্বরে সকলে ভাবল ঘরে ডাকাত পড়েছে। সকলে 'ডাকাত' 'ডাকাত' বলে চেঁচাতে লাগল। চিৎকার ও হুড়োহুড়ির মধ্যে পালাতে গিয়ে এক ডাকাত অন্ধকারে পা পিছলে মাটিতে পড়ে গেল। তার পিঠে বাঁধা চুরির জিনিসপত্র চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল বিপুল আওয়াজে। সকলে মিলে ডাকাতটাকে বেঁধে ফেলল। অন্য ডাকাতরাও বিভিন্ন লোকের হাতে ধরা পড়ে গেল।

এদিকে জ্যোতিষী নিজের আহাম্মকির জন্য প্রথমে খুব মুষড়ে পড়ল। কিছু পরে সমস্ত দিক বিবেচনা করে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নিজেও 'ডাকাত' 'ডাকাত' বলে চেঁচাতে লাগল। বাড়ির মালিক ভাবলেন, এই জ্যোতিষী নিশ্চয়ই গণনা করে জানতে পেরেছেন যে তাঁর বাড়িতে চুরি হবে অমাবস্যার মধ্যরাত্রে। তাই তাদেব সকলকে সাবধান করে দিতে এসেছেন।

একথা ভেবে তিনি পরম সমাদরে জ্যোতিষীকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। তার কাজের জন্য খুশি হয়ে তিনি জ্যোতিষীকে অনেক ধন-রত্ন উপহার দিলেন। এদিকে সমস্ত ডাকাতরা ধরা পড়েছে বাড়ির ও পাড়ার লোকের হাতে। তাদের সবাইকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হল। অন্যদিকে জ্যোতিষী নিজের বুদ্ধির তারিফ করতে করতে বাড়ি ফিরে গেল।



অলৌকিক পেয়ালা



তামিল গ্রামে রামচন্দ্রপুরমে এক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করত। সে খুবই গরিব। প্রতিদিন সকালে স্নান সেরে সে দেবতা বিষ্ণুর পুজো করতে যেত। সেখানে ভক্তরা দেবতার চরণে যা কিছু নিবেদন করত, তাই প্রসাদ হিসাবে ব্রাহ্মণ গ্রহণ করত। এ ছাড়া বাড়িতে বাড়িতে পুজো করেও সে কিছু রোজগার করত। এমনি ভাবেই তার সংসার নানা কষ্টের মধ্য দিয়ে চলে যেত। ব্রাহ্মণের ব্যক্তিগত জীবনে এ বিষয়ে ক্ষোভ ছিল না। সে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন, নির্লিপ্ত ব্যক্তি। বিষ্ণুভক্তিই ছিল তার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান।

কিন্তু ব্রাহ্মণীর স্বভাব ছিল অন্য প্রকৃতির। সে অল্পে সন্তুষ্ট হতে চাইত না। তাছাড়া চারটি ছেলে-মেয়ের খরচও ব্রাহ্মণের অল্প আয়ে তার পক্ষে চালানো খুবই কষ্টের ছিল। সে বারবার স্বামীকে শহরে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে বলত। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য করলে সংসারের শ্রী ফিরবে, সবাই সুখে ও শান্তিতে থাকতে পারবে। ব্রাহ্মণও উপায়হীন হয়ে ব্রাহ্মণীর কথায় রাজি হল এবং একদিন খুব সকালে শহরের উদ্দেশে যাত্রা করল।

ব্রাহ্মণী শহরে যাবার আগে পথে প্রয়োজন হবে মনে করে কিছু শুকনো দই-চিঁড়ে ঠোঙ্গায় ভরে সঙ্গে দিল। পথে হাঁটতে হাঁটতে ব্রাহ্মণ খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। রাস্তার ধারে একটি বিরাট আমগাছের ছায়ায় সে বিশ্রাম নিতে বসল এবং পরে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে ঘুম ভাঙলে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসে চুপচাপ কী যেন ভাবতে লাগল। পরে আবার হাঁটতে লাগল।

শহরে যাবার পথে, এক গভীর জঙ্গল অতিক্রম করতে হবে। তাই ব্রাহ্মণ আর দেরি না করে পা চালাতে লাগল। এর আগে সে কখনো এত পরিশ্রম করেনি। বনের মধ্যে প্রবেশ করে কিছুটা এগুতে সে আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন খাবারের ঠোঙাটা গামছায় বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। সেই ব্রাহ্মণ কোনো ব্যাপারেই দুশ্চিন্তা করত না। সে জানত ভাগ্যে যা আছে তাই ফলবে। অনর্থক দুশ্চিন্তা করে কোনো লাভ হয় না।

ঠিক সেই সময়ে আকাশ-পথে নারায়ণ ও লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠে ফিরে যাচ্ছিলেন। লক্ষ্মীদেবীর খুবই খিদে পেয়েছিল। তিনি নীচে তাকিয়ে গাছের ডালে বাঁধা ঠোঙায় শুকনো দই-চিঁড়ে দেখতে পেলেন। পরে সেই খাবার নারায়ণের সঙ্গে ভাগ করে খেলেন আর বনের মধ্যে বয়ে যাওয়া নদীর মিষ্টি জল পান করে পরিতৃপ্ত হলেন।

গরিব ব্রাহ্মণের খাবার খেয়ে ফেলে লক্ষ্মীদেবী নারায়ণকে বললেন, "দেখ, আমরা দুজনে এই ব্রাহ্মণের সমস্ত খাবার খেয়ে ফেললাম। বেচারা জেগে উঠে কী খাবে?"

লক্ষ্মীর কথা শুনে নারায়ণ একটু হাসলেন। পরে দশটি সুন্দর সুন্দর রুপোর পেয়ালা তৈরি করে ব্রাহ্মণের গামছায় বেঁধে দিয়ে আকাশ-পথে বৈকুণ্ঠের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণের ঘুম ভাঙল। এখন তার বেশ খিদে পেয়েছে। গাছ থেকে গামছা নামিয়ে ফাঁস খুলতেই সে দশটি রুপোর পেয়ালা দেখতে পেল। শুকনো দই-চিঁড়ের জায়গায়, দশটি রুপোর পেয়ালা বাঁধা দেখে সে ভাবল নিশ্চয়ই এ ভগবানের লীলা। ভগবান এতদিনে তার উপর সদয় হয়েছেন। এবার তাদের দুঃখ ঘুচবে। পরে সেই ব্রাহ্মণ পেয়ালা দশটি মাটিতে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখল এবং একদৃষ্টে সেগুলোর দিকে চেয়ে রইল আর খাবারের কথা ভাবতে লাগল। হঠাৎ সে দেখল যে, দশটি পেয়ালা থেকে দশটি পরী বেরিয়ে এসে তাকে নানা রকম সুস্বাদু খাদ্য পরিবেশন করতে আরম্ভ করল। ব্রাহ্মণের আনন্দ তখন দেখে কে? সে ভগবান বিষ্ণুর নামে জয়ধ্বনি করে পেয়ালাগুলি গামছায় বেঁধে বাড়ি ফিরে গেল।

ঘরে এসে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে সমস্ত কথা খুলে বলল। দশটি পেয়ালার অলৌকিক ক্ষমতা তারা দুজনে পুনরায় পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হল। তারা ভাবল, ভগবান বিষ্ণু তাদের উপর করুণা করেছেন। এখন থেকে তারা অন্যান্যদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই সমাদর পাবে।

একদিন ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণকে গ্রামের সমস্ত মাতব্বরদের নিমন্ত্রণ করতে অনুরোধ করল। ব্রাহ্মণী নিজে তাদের স্ত্রীদের নিমন্ত্রণ করে এল। পরদিন সকাল থেকে সমস্ত ঘর ঝাড়-পোঁচ করা হল, দরজায় বৈচিত্র্যপূর্ণ আলপনা আঁকা হল। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কাজকর্ম দেখে গ্রামের সকলেই বিস্মিত হল। তারা কেউ-ই বুঝে উঠতে পারল না— কেন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী এমনভাবে গ্রামের বড়ো বড়ো লোকদের নেমন্তন্ন জানাচ্ছে। তারা সবাই সৎ ও সাধু ব্রাহ্মণকে খুব ভালোবাসত। তাই কেউ-ই ব্রাহ্মণের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল না। কিন্তু ব্রাহ্মণের অবস্থা বুঝে প্রত্যেকেই বাড়ি থেকে পেট পুরে খেয়ে এসেছিল। সৌজন্যের খাতিরে সামান্য কিছু গ্রহণ করবে, এই ধারণা নিয়ে তারা ব্রাহ্মণের বাড়িতে সমবেত হয়েছিল।

অতিথিরা সকলে আস্তে আস্তে সমবেত হতে শুরু করল। তাদের স্ত্রীরাও সঙ্গে এসেছিল। খাবার-দাবারের খুব বেশি আয়োজন নেই দেখে তারা প্রত্যেকেই নিজেদের বুদ্ধিকে তারিফ করল। কারণ আগে থেকেই তারা অনুমান করেছিল যে, গরিব ব্রাহ্মণের পক্ষে এত লোকের খাবার আয়োজন করা কোনোমতেই সম্ভব হবে না।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলে, ব্রাহ্মণ অতিথি-অভ্যাগতদের খাবারের আয়োজন করতে লাগল। প্রত্যেকের বসবার নির্দিষ্ট আসন করা হল। সকলে অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেও কেউ কিছু না বলে নিজ নিজ আসনে উপবেশন করল। ব্রাহ্মণ ঘরের ভিতরে গিয়ে সেই দশটি পেয়ালা পাশাপাশি সাজিয়ে রাখল। মুহূর্তের মধ্যে দশটি পরী এসে প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্য, মিষ্টান্ন ও নানা সুমিষ্ট ফল-মূলে ঘর ভরে দিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী পরমানন্দে অতিথিদের মধ্যে সে-সব পরিবেশন করল। প্রত্যেকটি উপাদান প্রচুর পরিমাণে অভ্যাগতদের মধ্যে বণ্টন করা হল। খাদ্য ও পানীয়ের সমারোহ দেখে সবাই খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল। পরম তৃপ্ত হয়ে অতিথিরা বাড়ি ফিরে গেল।

কিন্তু সকলেই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর এই সচ্ছল অবস্থা দেখে খুশি হতে পারল না। পাশের বাড়িতে একজন লোভী হিংসুটে বউ থাকত। সে কৌশল করে ব্রাহ্মণীর কাছে তাদের অবস্থা ফেরার অন্তর্নিহিত কারণটি জেনে গিয়েছিল। আরও ধনী হবার লোভে সে একদিন সকালে তার স্বামীকে বলল, "তুমি কি জান কেমন করে ওই পাশের বাড়ির গরিব ব্রাহ্মণ ধনী হয়েছে?" "না, আমি জানি না"— রমণীর স্বামী নিষ্প্রাণভাবে উত্তর দিল। তখন মহিলাটি সমস্ত কথা খুলে জানাল। পরের দিন সকালে অনুরূপভাবে সে স্বামীকে সবকাজ করতে নির্দেশ দিল। স্বামীটি তার স্ত্রীকে ভালোভাবেই চিনত। তার কথা না শুনলে, চিৎকার আর ঝগড়া করে পাড়া

ম্যাথায় করবে। শাপ-শাপান্ত দিয়ে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। তাছাড়া ওই ধরনের কয়েকটি পেয়ালা পাবার জন্য স্বামীটিরও কৌতূহল হয়েছিল। ফলে, সে সহজেই স্ত্রীর কথায় সায় দিল।

রাত্রি শেষ হতে না হতেই স্ত্রী স্বামীকে যাত্রা করার জন্য তাড়া দিল। সে ব্রাহ্মণীর মতো একটা ঠোঙায় শুকনো চিঁড়ে-দই দিল। ভগবান যাতে বেশি খুশি হন, তাই সে পরিমাণে অনেকটা চিঁড়ে-দই ঠোঙায় বেঁধে



দিল। তারপর কী কী করতে হবে, সমস্ত কিছু বারবার স্বামীকে বুঝিয়ে দিল। স্বামীটিও সমস্ত উপদেশ ঠিক ঠিক মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ি থেকে জঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হল।

ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিটি গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল। ব্রাহ্মণ যে জায়গায় যে গাছের নীচে বিশ্রাম নিয়েছিল, সেখানে সেও বিশ্রাম নিতে বসল।. গাছের ডালে গামছা করে খাবারের বিরাট ঠোঙাটি বেঁধে রেখে সে গাছের নীচে ঘুমানোর ভান করে শুয়ে থাকল। চোখ পিটপিট করে অপেক্ষা করতে লাগল কখন দেবতার আগমন হয়।

আকাশ-পথে লক্ষ্মী-নারায়ণ ঠিক আগের মতো ভ্রমণ শেষ করে বৈকুণ্ঠে ফিরে যাচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ ঘরের বাইরে থাকার জন্য নারায়ণ ও লক্ষ্মী দুজনেরই খুব খিদে পেয়েছিল। তারা দুজনেই গাছের ডালে বাঁধা খাবার নিয়ে আহার করলেন। খিদের ঝোঁকে সমস্ত খাবারটাই তারা খেয়ে ফেললেন।

নারায়ণ কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন কেন এই লোকটি গাছের নীচে ঘুমোবার ভান করে শুয়ে আছে। লোকটি যথেষ্ট ধনী এবং ব্রাহ্মণের প্রতি প্রতিহিংসাবশত আরও বড়োলোক হবার প্রত্যাশায় সে এই কৌশল অবলম্বন করেছে। ভগবান নারায়ণ ঠিক আগের মতো দশটি পেয়ালা গামছায় বেঁধে লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে নিয়ে আকাশপথে বৈকুণ্ঠে ফিরে গেলেন।

কিন্তু জঙ্গলে লক্ষ্মী-নারায়ণের আবির্ভাব-সময়ে চারদিক এমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিল যে, তার প্রভাবে সেই ব্যক্তিটি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে; কোথায় কী হচ্ছে কিছুই জানতে পারে না। কিছুক্ষণ পর লোকটির তন্দ্রা কেটে গেল। সে গাছ থেকে গামছাটি নামিয়ে আনল এবং উঁকি মেরে দেখল যে তাতে দশটি রুপোর পেয়ালা বাঁধা আছে। প্রত্যেকটি পেয়ালাই খুব সুন্দর। সে কোনো দিকে না তাকিয়ে গামছাটি অত্যন্ত যত্ন করে ধরে মনের আনন্দে বাড়ি ফিরে গেল। ঘরে ফিরে স্ত্রীর হাতে গামছাটি দিয়ে বলল, "এই গামছা এখন একেবারে খুলবে না। আমি কাল বিকালে পাড়ার সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নেমন্তন্ন করে আসব। তুমি মহিলাদের বাড়িতে পরম সমাদরে ডেকে আনবে। পরে তাদের খাওয়া-দাওয়ার আসন পাতা হলে তখন এই গামছা খোলা হবে। কিন্তু ওই গরিব ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে নেমন্তন্ন করবে না।"

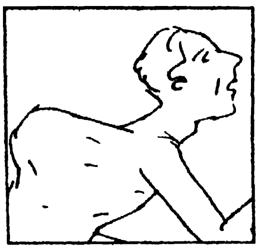


স্বামীর কথা স্ত্রীর খুব ভালো লাগল। সে ব্রাহ্মণীকে টেক্কা মারতে পারবে, এই আনন্দে খুশি হয়ে ব্রাহ্মণী বাদে গ্রামের সব মহিলাকে নেমন্তন্ন করে এল। স্বামীটিও ওই ব্রাহ্মণ বাদে গ্রামের সব পুরুষ মানুষকে নেমন্তন্ন করল।

সন্ধ্যা হলে সবাই এসে উপস্থিত হল। চারদিকে খুশির ফোয়ারা। ধনী ব্যক্তিটি হঠাৎ বড়োলোক হওয়ার জন্য নানা রকম খাবারের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়াও আছে অলৌকিক খাদ্যের রমরমা আয়োজন। রাত্রি হলে সে সকলকে আহার করার জন্য আহ্বান করল। প্রত্যেকে মনের খুশিতে আসন গ্রহণ করল। এবারে কারুর মনে কণামাত্র আশঙ্কা নেই। বাড়ি থেকে কেউ-ই কোনোরকম আহার করে আসে নি। আসন গ্রহণ করে সকলে নীরবে আহার্য দ্রব্য-সামগ্রীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

ইতিমধ্যে গৃহস্বামী স্ত্রীকে নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। আলমারিতে সযত্নে রাখা গামছার পুঁটলিতে বাঁধা রুপোর পেয়ালাগুলি নিয়ে এল। তারপর যেমনি তারা গামছা খুলেছে অমনি দশটি নাপিত ধারালো ক্ষুর নিয়ে বেরিয়ে এসে ওদের দুজনের মাথা মুড়িয়ে দিল। তারপর সেই দশটি নাপিত বিরাট বিরাট ক্ষুর নিয়ে অতিথিদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের মাথা মুড়িয়ে দিল।' চারদিকে পালিয়ে বাঁচবার জন্য ছোটাছুটি লেগে গেল। কিন্তু কেউই পালাতে পারল না। সকলে নেড়া মাথা নিয়ে ঘরে ফিরে এল।

দর্জি ও কুঁজো



এক শহরে জাকির হোসেন নামে এক দর্জি থাকত। সে ছিল খুবই পরিশ্রমী। তার হাতের কাজও ছিল চমৎকাব। জামা, পাঞ্জাবি, সার্ট, ফ্রক— সমস্ত রকম পোশাক সে সুন্দর করে কাটতে ও সেলাই করতে পারত। এব জন্য তার নামও ছড়িযে পড়েছিল চারদিকে।

শীতের সন্ধ্যায় একজন লোক তার দোকানে হাজির হল। লোকটি খুব বেঁটে আর তার পিঠে একটা বিরাট কুঁজ। সোজা হযে সে চলতেই পাবে না। তাব শখ হয়েছে, সে এই শীতে একটা গরম কাপড়ের জামা তৈরি করে গায়ে দেবে। কিন্তু কেউ তার গায়ের মাপ নিতেই পারছে না, জামা তৈরি করবে কী করে? অবশেষে সে জাকির হোসেন দর্জির শরণাপন্ন হয়েছে।

কুঁজোর ইচ্ছের কথা শুনে প্রথমে জাকির একটু ঘাবড়ে গেল। মনে মনে ভাবতে লাগল কী করেই বা এই কুঁজো লোকের জামা তৈরি করা যায়। অথচ সে শীতে খুবই কষ্ট পাচ্ছে। চাদর গায়ে জড়িয়ে থাকলেও সে ঠিকমতো সবকিছু সামলে রাখতে পারছে না। এদিকে আবার জামার জন্য গরম কাপড়ও কিনে এনেছে। কুঁজো লোকটির প্রতি জাকিরের খুব মায়া হল; অথচ সে বুঝে উঠতে পারছে না কীভাবে সে ওই কুঁজো লোকটির জামার মাপ নেবে এবং স্পষ্ট করে সে বলতেও পারছে না যে, কুঁজোর জামা তৈরি করা সম্ভব নয়। ফলে মনে মনে খুব অস্থিরতা অনুভব করছিল জাকিব।

দোকানের এক কোণে কুঁজোকে বসিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল সে। এমন সময় তার বিবি ফতিমা নাস্তা-পানির জন্য তাকে ভিতর থেকে ডাকল। সমস্ত পরিস্থিতি অস্বস্তিকব হয়ে ওঠার জন্য সে খুবই বিব্রত বোধ করল। এদিকে রাতও বেড়ে যাচ্ছে। জাকিব বুঝে উঠতে পারছে না সে কী করবে। ফতিমা আবাব কিছুক্ষণ পর খেতে ডাকল। ভিতরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেই সে আবার কুঁজো লোকটির কথা ভাবতে লাগল। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

জাকিরকে খাওয়ার জন্য বারবার ডেকেও তাকে আসতে না দেখে ফতিমা বেশ একটু রেগে ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এল। সে দেখল তার স্বামী মাথায় হাত দিয়ে একটি কুঁজো লোকের দিকে চেয়ে চেয়ে কী যেন ভাবছে তন্ময় হয়ে। আর কুঁজো লোকটি একটা গরম কাপড়ের টুকরো নিয়ে চুপ করে বসে আছে। ফতিমাকে দেখে জাকির একটু নড়ে-চড়ে বসল। অবশেষে সে কুঁজো লোকটিকে বলল— "তুমি কাল বিকালে এস। আমি ভেবে দেখি তোমার জামার কী ব্যবস্থা করতে পারি।" প্রত্যুত্তরে কুঁজো লোকটি ফ্যাসফেসে গলায় বলল যে, ওই শহরে তার কোথাও থাকবার জায়গা নেই। যদি রাতটুকু জাকির তার দোকানের এককোণে তাকে কাটাতে দেয়, তবে সে খুবই কৃতজ্ঞ হবে। আল্লার কাছে জাকির ও তার বিবির জন্য দোয়া চাইবে।

ফতিমার মনটাও ছিল খুব নরম। সে জাকিরকে বলল— "ওকে তুমি এখানেই থাকতে বল। আমি ওর নাস্তার ব্যবস্থা করছি।" কিছুক্ষণ পর জাকির বিবির সঙ্গে কুঁজো লোকটিকে নিয়ে একসঙ্গে নাস্তায় মনোনিবেশ

করল। খাবারের আয়োজন ছিল খুবই সাধারণ। রুটি, আলুভাজা আর একটু করে মাংসের ঝোল। কথায় কথায় কুঁজো লোকটি জানাল যে, তার নাম— জামাল।

নাস্তা করতে করতে হঠাৎ জামাল খুব জোরে বিষম খেল। কাশতে কাশতে সে মাটিতে শুয়ে পড়ল, তারপর তার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। জাকির ও ফতিমা খুবই ভয় পেয়ে গেল। তারা জামালকে জোরে জোরে নাড়া দিল, কিন্তু কোনো আওয়াজই তার গলা থেকে বেরুল না। তখন তারা ভাবল, সে নিশ্চয়ই মরে গেছে। এই সমূহ বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য তখন তারা দুজনে যুক্তি করতে লাগল। বাড়িতে এই মৃত লোকটিকে দেখে পাড়ার লোক তাদের সন্দেহ করবে, খুনী বলে ভাববে এবং বিচারে তাদের ফাঁসি হবে— এ সমস্ত ভেবে তারা দুজনেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সমস্যা সমাধানের জন্য জাকির ও ফতিমা তৎপর হল।



কিছুক্ষণ পর চারদিকের অন্ধকার আরও গভীর হয়ে এলে, তারা দুজনে কুঁজো লোকটির দেহটিকে তুলে কাছাকাছি এক স্থপতির বাড়িতে নিয়ে গেল। ঘন কুয়াশায় ঢাকা শীতের রাত্রিতে তাদের কেউ দেখতে পেল না। স্থপতির বাড়ির দরজায় কুঁজো লোকটিকে কোনোরকমে বসিয়ে রেখে তারা দু-জনে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এল।

এদিকে সেই স্থপতিকে বাইরে কাজের জন্য বেরুতে হবে। ঘর থেকে বেরিয়ে চাকরকে দরজা বন্ধ করতে বলে পা বাড়াতেই সে একটা বিশাল মাংসপিণ্ডের উপর ধাক্কা খেল। ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে

সে, তার চাকরকে আলো নিয়ে আসতে বলল। চাকরটি আলো নিয়ে এলে স্থপতি দেখতে পেল যে, এক কুঁজো তার বাড়ির দরজার সামনে মরে পড়ে আছে। তার পায়ের আঘাতে লোকটি সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। ধরা পড়ার ভয়ে স্থপতি চাকরটির সাহায্যে মৃতদেহটি ঘরের মধ্যে তুলে নিয়ে গেল। এর পর স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে সে মৃতদেহটিকে দড়ি দিয়ে বাঁধল। পরে ছাদে গিয়ে ধীরে ধীরে দড়িটির সাহায্যে কুঁজোর দেহটি পাশের একতলা বারান্দায় অন্ধকারে নামিয়ে রাখল, আর কৌশলে দড়ির ফাঁস খুলে নিল।

অনেক রাত্রে বাড়ির মালিক ঘরে ফিরল। তার বাড়ি খালি ছিল, কারণ তার স্ত্রী ছেলেদের নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছিল। ভদ্রলোক ছিল ব্যবসায়ী। ব্যবসার কাজকর্ম সেরে সে রাত্রিবেলা ঘরে এসে বারান্দায় এক কোণে কুঁজোকে বসে থাকতে দেখে ভাবল— 'বেটা নিশ্চয়ই চোর। চুরি করার জন্য ফন্দি আঁটছে।' অণু পরিমাণ দেরি না করে সে পিছন থেকে লোকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু আশ্চর্য! লোকটি পালাবার কোনো চেষ্টাই করল না। কুঁজোকে নিজের আয়ত্তে পেয়ে ব্যবসায়ীটি মনের সুখে কিল-চড়্-ঘুষি লাগাতে

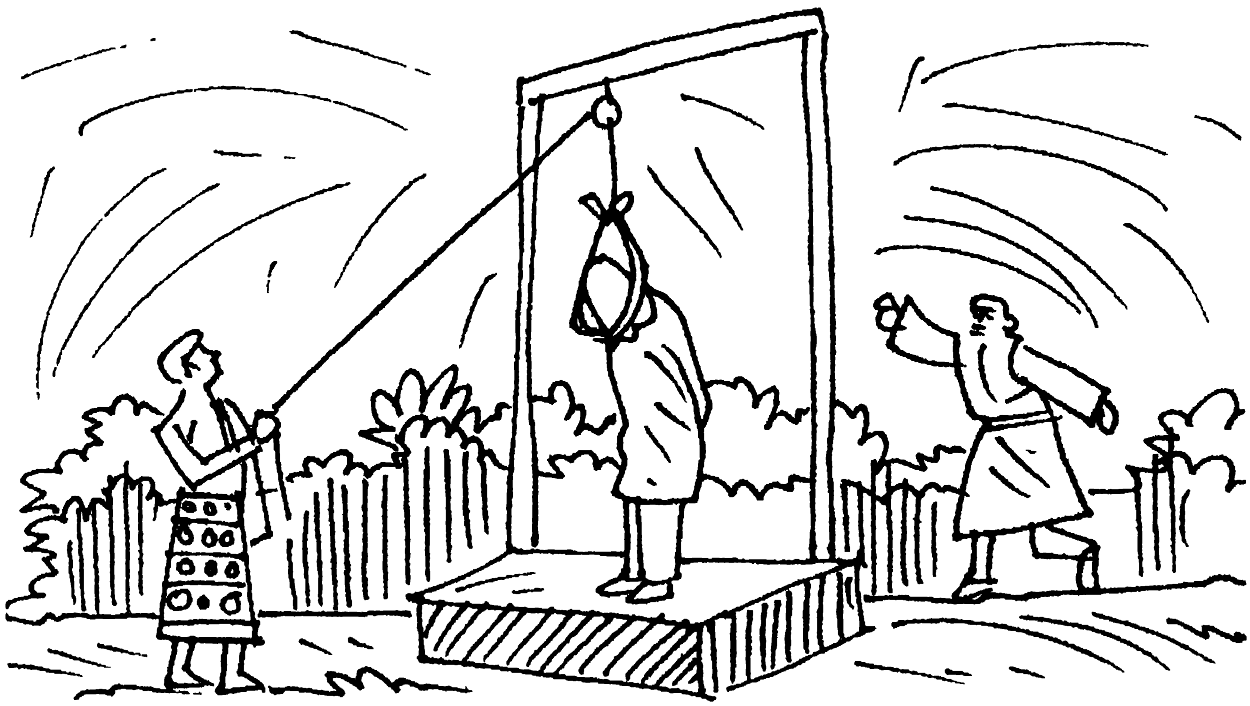


লাগল। কিন্তু এত মার খেয়েও লোকটা যখন নড়ল না, একটা কথাও বলল না, তখন ব্যবসায়ীটির সন্দেহ হল। লোকটা মাটিতে শুয়ে আছে, পালাবার চেষ্টা করছে না দেখে সে ক্রমশ ভীত হয়ে পড়ল। আলো জ্বালিয়ে কুঁজো লোকটির মুখ দেখে সে চিৎকার করে বলে উঠল— হায় ভগবান, এ তো মরে গেছে! ভয় ও আতঙ্কে সে কাঁপতে লাগল। তার বিশ্বাস হল যে, প্রচণ্ড মারের আঘাতেই লোকটার মৃত্যু হয়েছে। অনেকক্ষণ চিন্তা করে ব্যবসায়ীটি ওই মৃতদেহ উঠিয়ে চারদিক দেখতে দেখতে বড়ো রাস্তার ধারে ফেলে রেখে পালিয়ে এল।

খুব ভোরবেলা এক মহাজন নিকটবর্তী নদীতে স্নান করতে যাচ্ছিল। তখন চারদিক পরিষ্কার হয়নি। ঘন কুয়াশায় ঢাকা। তাছাড়া মহাজনের চোখে চশমা না থাকার জন্য সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না ঠিকভাবে। স্নান করতে বেরিয়ে রাস্তার কোণে বসিয়ে রাখা কুঁজোর সঙ্গে তার ধাক্কা লাগল এবং কুঁজোর দেহটি গড়িয়ে তার উপর পড়ে গেল। মহাজন ভাবল, কোনো চোর তাকে আক্রমণ করে গলার সোনার হার আর হাতের সোনার কবচ কেড়ে নিতে চাইছে। সে চিৎকার করে উঠল এবং কুঁজোর দেহটিতে লাথি মারতে লাগল। চিৎকার শুনে পুলিশ ছুটে এল— তারা দেহটিকে পরীক্ষা করে দেখল এবং সিদ্ধান্তে এল যে, ওই মহাজনটি এই কুঁজোকে মেরে ফেলেছে। মহাজনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসা হল। মৃতদেহটিও থানায় জমা থাকল।

মহাজনকে বিচারালয়ে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হল। মহামান্য আদালত সমস্ত কিছু শুনলেন, সাক্ষীদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হল এবং পরিশেষে মহাজনকে দোষী হিসাবে সাব্যস্ত করা হল। বিচারে ফাঁসির হুকুম হল। প্রকাশ্য রাজপথে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে একজন নিরীহ মানুষকে খুন করার অপরাধে।

মহাজনের ফাঁসি দেখতে অনেকেই জড় হল। আসামীকে ফাঁসিকাঠে দাঁড় করানোর সময় ভিড়ের মধ্যে এক ব্যক্তিকে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসতে দেখল সকলে। ঘটনাটি সকলকেই বিস্মিত করল। সেই ব্যবসায়ী সামনে এগিয়ে এসে বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলতে লাগল— "হুজুর, ধর্মাবতার, এই ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্দোষ। লোকটিকে আমিই খুন করেছি। আমাকে আপনি ফাঁসি দিন আব ওই নির্দোষ মহাজনকে ছেড়ে দিন।" এই বলে সেই ব্যবসায়ী সমস্ত কিছু বিচারকেব কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করল। তখন বিচাবক মহাজনকে বে-কসুর খালাস করে দিয়ে ব্যবসায়ীকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করে ফাঁসির আদেশ দিলেন।



ব্যবসায়ীকে ফাঁসি দেবার উদ্দেশ্যে যখন সমস্ত ব্যবস্থা ঠিকঠাক কবা হয়েছে, ঠিক সেই সময় আবার কে যেন ভিড়ের মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠল,— "থামুন, একটু অপেক্ষা করুন দয়া করে।" ফাঁসুড়ে ব্যবসায়ীর মুখে কালো টুপি পরাতে গিয়ে থেমে গেল। বিচারকও বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন। দেখা গেল— একজন স্থপতি সেই ভিড় ঠেলে খুব তাড়াতাড়ি সামনে আসতে চাইছে। লোকেরা পাশে সরে দাঁড়িয়ে তাব যাওয়াব পথ করে দিল। স্থপতি বিচারকের সামনে এসে হাতজোড করে ব্যবসায়ীর মুক্তি প্রার্থনা করল, এবং বলল যে, সে-ই প্রকৃত দোষী। কীভাবে এই ব্যক্তিটিকে সে ব্যবসায়ীর ঘরের বারান্দায় নামিয়ে দিয়েছিল, সে-কথাও বলল। বিচারক ব্যবসায়ীর মুক্তির আদেশ দিয়ে ওই স্থানে স্থপতির ফাঁসির ব্যবস্থা করলেন একই অপরাধে।

স্থপতির গলায় ফাঁসির দড়ি পরানো হল। ফাঁসুড়ে তার মুখ কালো টুপি দিয়ে ঢেকে দিল। হাতের রুমাল নেড়ে বিচারক দড়ি টানার সংকেত দিতে যাবেন, এমন সময়ে আবার ভিড়ের মধ্যে শোরগোল উঠল। কে যেন দূরে থেকে চিৎকার করে আবেদন জানাচ্ছে— "থামুন, দয়া করে একটু থামুন। মহামান্য বিচারক হুজুর, আপনি রুমাল নাড়বেন না। নাড়বেন না।" সবাই বিস্মিত হয়ে পিছন ফিরে তাকাল। ভিড়ের মধ্যে থেকে তাড়াতাড়ি লোকজনে ঠেলে ফেলে জাকির দর্জি এগিয়ে আসছে। পিছনে পিছনে আসছে তার বিবি ফতিমা।

জাকির ও ফতিমা মহামান্য বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে গত সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনা নিবেদন করল। তারা জানাল কী ভাবে তারা মুক্তির উপায় খুঁজেছে এবং কী পথ অবলম্বন করে আইনকে ফাঁকি দিতে চেয়েছে। মহামান্য বিচারক সব শুনে একই সঙ্গে জাকির ও ফতিমার ফাঁসির হুকুম দিলেন। স্থপতি মুক্তি পেল।

ফাঁসির ঠিক আগে জাকির হাতজোড় করে বিচারককে বলল— "ধর্মাবতার, মৃত্যুর আগে আপনার কাছে আমার এক নিবেদন আছে। শুনেছি ফাঁসির আসামীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করা হয়। আপনি ধর্মাবতার, যদি দয়া করে আমার শেষ আর্জিটুকু রাখেন—"

বিধান ও রীতি অনুযায়ী মহামান্য বিচারপতি জাকিরের শেষ ইচ্ছা কী, জিজ্ঞাসা করলেন। তখন জাকির হাতজোড় করে বলল, —"ধর্মাবতার, আমার শেষ ইচ্ছা, আমি আর আমার বিবি ফতিমা একই সঙ্গে ফাঁসিতে ঝুলব। কেউ আগেপিছে হব না। একই সঙ্গে একইভাবে আমরা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।"

জাকিরের আবেদন মহামান্য বিচারক মঞ্জুর করলেন। কিন্তু ফাঁসি কাঠ তো একটা। অতএব তাড়াতাড়ি আর একটার ব্যবস্থা করতে তিনি হুকুম জারি করলেন



ইতিমধ্যে স্থানীয় চিকিৎসক গাড়ি করে সে-পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বড়ো রাস্তার মোড়ে বিচারালয়ের সামনে অনেক লোকের সমাবেশ দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। গাড়ি থামিয়ে নামতেই তাঁর এক উকিল বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি একটু ভেবে বললেন— "আচ্ছা, সেই মৃতদেহটি কি দাহ করা হয়ে গেছে?"

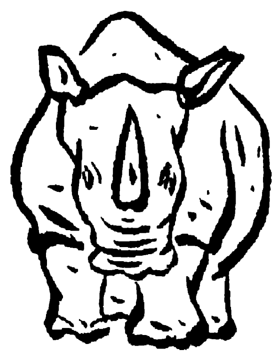
'না, দেহটি থানায় একটি ঘরে ফেলে রাখা হয়েছে'— বন্ধুটি জানাল।

'আমি কি একবার মৃতদেহটিকে দেখতে পারি?'— ডাক্তার তাঁর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন।

বন্ধুটি সেই ডাক্তারকে নিয়ে মহামান্য বিচারকের সঙ্গে দেখা করলেন এবং সমস্ত পরিচয় দিয়ে মৃতদেহটিকে একবার দেখতে দেবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ডাক্তারের পরিচয় পেয়ে মহামান্য বিচারক মৃতদেহটি দেখবার হুকুম দিলেন। সেই বিখ্যাত ডাক্তার মৃতদেহটিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করলেন। পরে মহামান্য বিচারপতিকে বললেন যে, তিনি অপারেশনের জন্য দেহটিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চান। দেহটিতে এখনও প্রাণ আছে। বিচারক এই কথা শুনেই মুমূর্ষু দেহটিকে হাসপাতালে সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন এবং একই সঙ্গে জাকির ও ফতিমার ফাঁসির হুকুম চিকিৎসকের রিপোর্ট না-আসা অবধি মুলতুবি রাখলেন।

সেই বিখ্যাত চিকিৎসক দেহটিকে নিয়ে হাসপাতালে অপারেশন টেবিলে শোয়ালেন। অপারেশনের পর ওই কুঁজোর মুখ থেকে এক টুকরো মাংসের হাড় বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ পর জামালের জ্ঞান ফিরে এল। সে প্রাণে বেঁচে গেল।

হাসপাতালের রিপোর্ট সঙ্গে সঙ্গে মহামান্য আদালতকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। জাকির ও তার বিবি ফতিমা দুজনকে মুক্তি দেওয়া হল। আল্লার দোয়ায় তারা প্রাণে বেঁচে পরম আনন্দে ঘরে ফিরে এল।



অসম

এক বামুন আর এক চাকর



এক বামুন ছিল। কাছাড়ি বামুন। একদিন ইচ্ছে হল শ্বশুরবাড়ি যাবে। বিয়ের পর এই প্রথম তার যাওয়া। তার উপর অনেক দূরের পথ। একজনকে সঙ্গে চাই। কে যাবে, কে যাবে যখন খোঁজা হচ্ছে; তখন দামু এসে বলল— আমি সঙ্গে গেলে কেমন হয়।

দামু বাড়ির কাজের লোক। বেশ মোটাসোটা আর লম্বাই চওড়াই চেহারা। খাটতে পারে খুব। তার উপর বুদ্ধিও ধরে। সবাই বলল— বেশ হয় তাহলে।

দিনটিন দেখে রওয়ানা দিল বামুন। দামুর মাথায় এক বড়োসড়ো বোঝা। তাতে এক কাঁদি পাকা কলা। দুটি হাঁড়ি-ভর্তি মেঠাই মণ্ডা। আরও সব ভালো ভালো খাবার জিনিস। শ্বশুড়বাড়ি বলে কথা! এদিকে দামুর অনেক গুণ থাকলেও একটা বড়ো খারাপ দোষ ছিল। বড্ড তাড়াতাড়ি খিদে পেত তার। বড়োই পেটুক। তাই বামুন পই পই করে বলে দিল— দামু, খাবারে দাবারে যেন হাত দিও না বাবা। আমি তোমার আগে আগে গেলেও জানবে আমার পেছনেও দুটো চোখ আছে। ঘাড়ের ঠিক উপরে। ওই চোখ দিয়ে আমি সব দেখতে পাব।

দামু একগাল হেসে বলল— আজ্ঞে না ঠাউর মশাই, আপনার শ্বশুরবাড়ির জিনিস কি আমি খেতে পারি!

বামুন তো মহাখুশি। যাক, দামুকে বেশ বোকা বানানো গেছে। ভেবে মহা আনন্দে পথ হাঁটছে তো হাঁটছেই। অনেক দূরের পথ, তাড়াতাড়ি না হাঁটলে যেতে সন্ধে হয়ে যাবে। খানিক দূর যেতেই কিন্তু দামুর খুব খিদে পেয়ে গেল। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করতে লাগল তার। কী খাওয়া যায়! কী খাওয়া যায়! ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল তার— মাথার উপরেই এক কাঁদি কলা। পাকা কলা থেকে ভুর ভুর করে গন্ধ উঠে আসছে। তাতে জিবে জল এসে গেল দামুর। বেশি তো নয়, মাত্র একটা খেলে কী এমন ক্ষতি। ভেবে সে একটা কলা ছিঁড়ে খোসা ছাড়িয়ে মুখে পুরল সেটা। আঃ! কী স্বাদ! যেমন মিষ্টি, তেমনি ভুরভুরে গন্ধ। একটায় কি মন মানে নাকি দামুর! দূর ছাই, খিদে নিয়ে কি হাঁটা যায়। এমন ভেবে পুটপুট করে কলা ছিঁড়তে লাগল দামু। তারপর খুসখুস করে খোসা ছাড়িয়ে কুপকুপ করে মুখে পুরতে লাগল। দেখতে দেখতে কলার কাঁদি শেষ।

বেশ খানিকক্ষণ হাঁটার পর পেছন দিকে তাকিয়ে বামুন তো অবাক। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বলল— কলার কাঁদি গেল কোথায়?

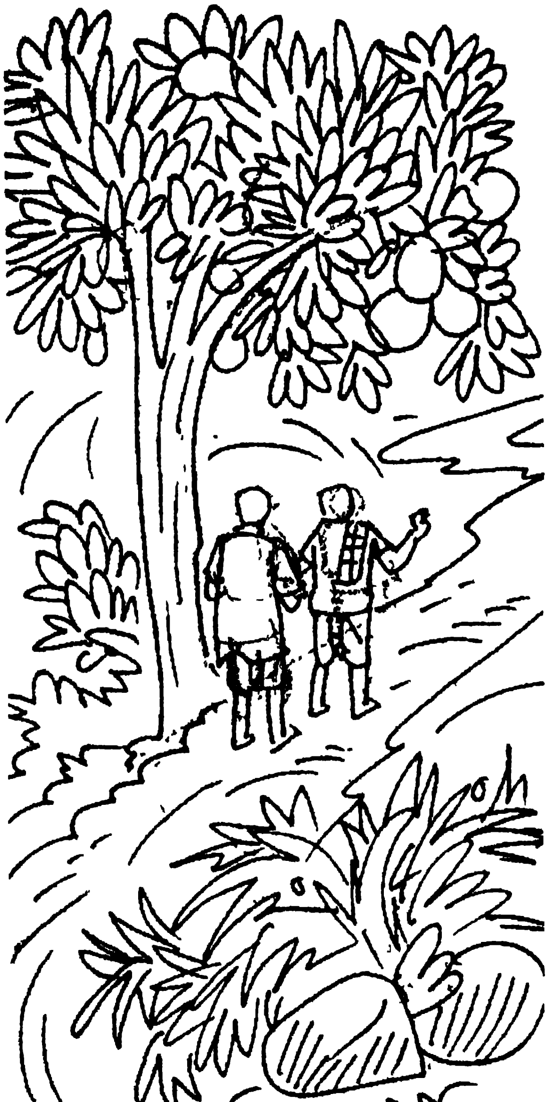
দামু অবাক হয়ে বলল— কেন আপনি দেখেন নি ঠাউরমশাই।

শৃগাল, গর্দভ, মার্জার— বলে প্রথমে একচোট গাল দিল বামুন। তারপর রেগে কাঁই হয়ে বলল— কী করে দেখব। আগে আগে হাঁটছি না আমি।

—ওমা, আমি তো জানি আপনি সব দেখছেন, ঠাউর মশাই। হাসতে হাসতে বলল দামু ওই যে আপনি

বললেন— দুটো চোখ আপনার পেছনেও আছে। আমি সেই দুটো চোখকে দেখিয়ে তবে কলা খেয়েছি। কই তখন তো বারণ করলেন না।

একথা শুনে চুপ করতে হল বামুনকে। ব্যাটা বড্ড প্যাঁচে ফেলে দিয়েছে। কী আর করা যায় এখন। কথা না বাড়িয়ে তাই চুপচাপ হাঁটতে লাগল।



দুপুরবেলা এক গাছতলায় তারা থামল। দুপুরে-[redacted] আর খাওয়াদাওয়া এখানেই সেরে নেবে। বামুন যেহেতু অপরের হাতের রান্না খাবে না, তাই নিজেই উনুন ধরিয়ে ভাত ফুটিয়ে নিল। সঙ্গে ছিল কটা কৈ মাছ। মাছ দিয়ে হল একটা তরকারি। খেতে বসে দামু দেখল— তার পাতে মাত্র একটা কৈ মাছ পড়েছে। ওদিকে বামুনের পাতে বেশ কয়েকটা মাছ। দামু দেখে-টেখে আস্তে আস্তে বলল— ঠাউরমশাই, একটা কথা কইতে পারি?

ভাতে হাত দিয়ে বামুন বলল— পারো।

—আচ্ছা, কৈ মাছ একা-একা থাকে না, ঝাঁকে থাকে?

বামুন বলল— আচ্ছা বোকা বটে। এটাও জান না? কৈ মাছ থাকে ঝাঁকে।

তার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, দামু নিজের পাতের মাছটি তুলে নিয়ে বলল— তাইলে এটাও ঝাঁকেই থাকুক।

বামুন রেগে কাঁই। বলল— নরাধম। আমার খাওয়াটাই মাটি করলি আজ।

যেহেতু অপরের ছোঁয়া খাবে না, তাই বামুনের পাতের সব ভাত আর মাছ খেয়ে নিল দামু।

আবার তারা হাঁটছে। হাঁটছে তো হাঁটছেই। পথ আর ফুরোয় না। এক সময় দামু বলল— ঠাউর মশাই, এমন চুপচাপ হাঁটতে ভালো লাগে না।

বামুন বলল— ঠিক বলেছিস। একটু গল্প-সল্প করলে হয়।

—শুধু গল্প কিন্তু জমবে না, ঠাউর মশাই। দামু বললে। তার চে' বরং বাজি ধরা খেলা খেলুন। যে বাজিতে হারবে, তাকে পাঁচটা করে কিল খেতে হবে পিঠে।

—বেশ। বামুন মনে মনে হাসল। এবার সব শোধ তোলা যাবে দামুর উপর। ওই বোকাটা তো বাজিতে হারবেই। আর প্রত্যেকবারই পাঁচটা করে বেশ বড়ো মাপের কিল মারা যাবে ওর পিঠে।

একটু পরেই পথের পাশে দেখা গেল একটা বেলগাছ। দামু বলল— এটা কী গাছ? বামুন শুদ্ধ ভাষায় বলল— বিল্ব।

—হল না। হল না। এটা হল বেলগাছ।

বামুন বলল— নারে বাপু, এটা হল বিল্বগাছ।

—ছাই, আপনি জানেন না। এটা বেলগাছ।

দূরে দেখা গেল কজন রাখালকে। দামু তাদের দেখে বলল —বিশ্বাস না হয়, ওই রাখালগুলোকে জিজ্ঞেস করুন।

বামুন তাদের সামনে গিয়ে বলল— এটা কী গাছ ভাই?

রাখালেরা হি হি করে হাসতে হাসতে বলল— ওমা, এটাও জান না? এটা যে বেলগাছ।

—এবার বিশ্বাস হল তো। দাঁত বার করে হাসল দামু। তারপর গুম গুম করে পাঁচখানা কিল মারল বামুনের পিঠে।

যেতে যেতে মাঠের উপর দেখা গেল একপাল ছাগল চরছে। দামু বলল— ওগুলো কী!

বামুন হাসতে হাসতে বলল— ওগুলো হল ছাগ।

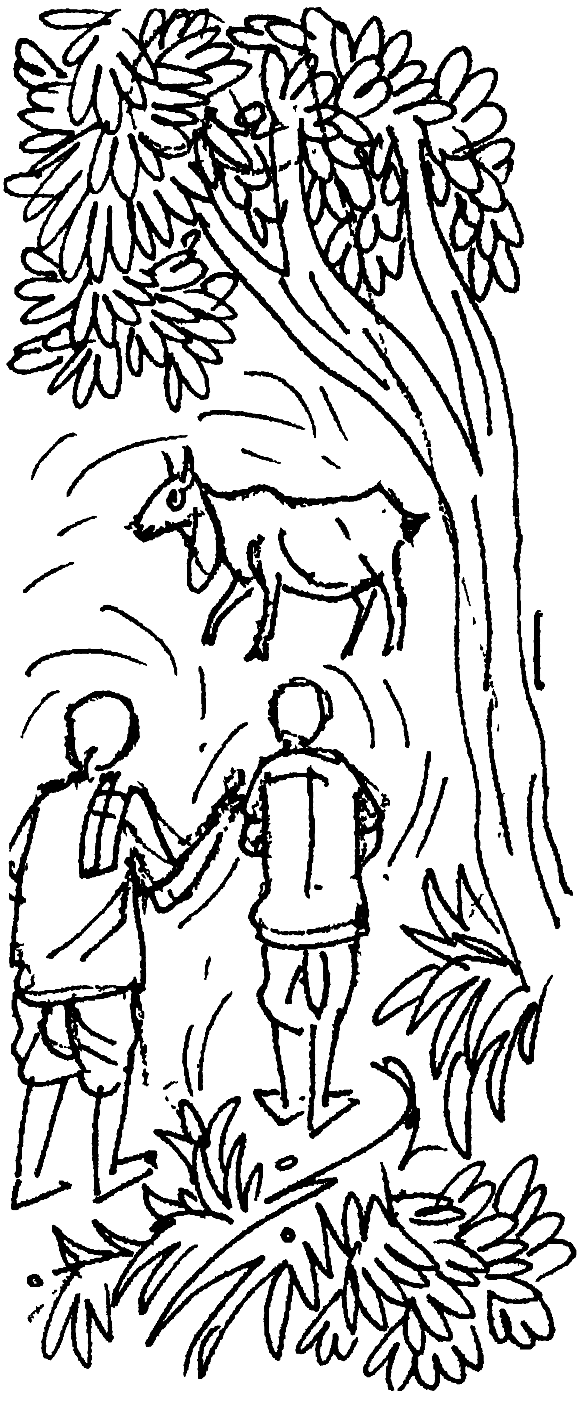
—এবারেও হল না। দামু হেসে তো বাঁচে না। ওগুলো ছাগলী। বলে আবও পাঁচটা কিল বসিয়ে দিল বামুনেব পিঠে।

এমন করতে কবতে হাঁটতে লাগল তারা। সাবাদিন কিছু খাওয়া নেই। তার উপব দামুব ওই কাবসাজি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বামুন। হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। এখনও শ্বশুববাড়ি এক ক্রোশ' দামুকে বামুন বলল— বাবা দামু, তুই একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে খবর দে জামাই আসছে। বাতেব খাবাব যেন তারা তৈবি রাখে।

দামু 'যে আজ্ঞে' বলে তাড়াতাড়ি হেঁটে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে গেল। গিয়ে বললে— তোমাদের জামাই আসছে গো' তাড়াতাড়ি ভাত আর হাঁসের মাংস তৈরি করো।

শুনে তো সবায়ের আনন্দ আর ধবে না। জামাই আসছে। একজন ভাত চাপাল। একজন হাঁস কাটতে বসল। আব একজন কড়া চাপাল উনুনে। কড়া ঝাল দিয়ে হাঁসের মাংস রান্না হবে। বান্না যখন হয়ে এসেছে, তখন দামু একমুঠো নুন ছড়িয়ে দিল রান্না মাংসে।

খেতে বসে নুনে মুখ পুড়ে গেল বামুনের। ভাবল, এ নিশ্চয়ই ওই চাকরটার কাজ। পেটে খিদে। তাই এবার আর খাবার ফেলে দিতে পাবল না। আস্তে আস্তে খেয়ে নিল। আর ভাবল চাকরটাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।



পরের দিন ভাইকে একটা চিঠি লিখল বামুন। তারপর দামুকে ডেকে বলল— যা এটা নিয়ে ভাইকে দিবি।

দামু লেখাপড়া জানত না। তাই কিছু পড়তে পারল না সে। কিন্তু তার মনে হল— এটাতে নিশ্চয়ই সন্দেহজনক কিছু লেখা আছে। সে দেখল রাস্তা দিয়ে আর একজন বামুন যাচ্ছে। তাকে গিয়ে ধরল দামু—

এ চিঠিতে কী লেখা আছে পড়ে দিতে হবে। ওই চিঠিতে ভাইকে বামুন লিখেছিল—দামু গেলেই ওকে যেন মেরে ফেলা হয়। দামু সেটা জানতে পারল। চিঠিটা নিয়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর আর একটা চিঠি লিখিয়ে নিল সে। এ চিঠিতে ছিল— "দামুকে তোমার কাছে পাঠাইলাম। ও পৌঁছাইলেই তোমার মেয়েব সঙ্গে দামুর বিবাহ দিয়া দিবে।"



চিঠি পেয়ে ভাই তো রেগে আগুন। দাদার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! চাকরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে! কিন্তু উপায় নেই। দাদা যখন বলেছে তখন তা মানতেই হবে। কী আর করবে ভাই, চাকরের সঙ্গে ধুমধাম করে বিয়ে দিয়ে দিল মেয়ের।

কয়েকমাস বাদে বামুন ঘরে ফিরছে। মনে মনে ভাবতে ভাবতে আসছে, যাক আপদটা নিশ্চয়ই বিদেয় হয়েছে এবার। ভাই তাকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু বাড়ি ঢুকে বামুন অবাক— এ কী কাণ্ড! মরার বদলে দামুটা যে বাড়ির জামাই সেজে বসেছে। রাগে লাল হয়ে ওঠে বামুন। এর একটা বিহিত না করলেই নয়! ভায়ের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে আলোচনা করল। কী করে যেন তা জানতে পারল বামুনের ভাইঝি। সে আবার দামুকে চুপিচুপি গিয়ে বলল— আজ রাতে তোমাকে মেরে ফেলা হবে।

—তাই নাকি! একগাল হাসল দামু। দেখি কে কাকে মারে।

দামু রাতে করল কী, নিজের বিছানায় সেদিন শুতে গেল না। তার বদলে বাড়ির পোষা বাছুরটাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পা আর মুখটা বেঁধে দিল দড়ি দিয়ে।

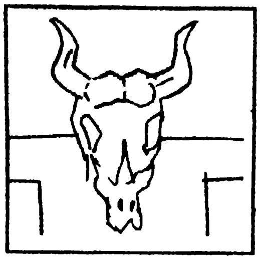
বামুন রাতে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল। এই ঘরেই দামু থাকে। বিছানায় শুইয়ে রাখা বাছুরটাকেই ভাবল, ওই দামুটা শুয়ে আছে। বামুন করল কী, হাতের মুগুরটা বাগিয়ে ধরে চালিয়ে দিল দমাদম। বেশ কিছুক্ষণ মুগুর চালাবার পর যখন বুঝল এবার দামুটা মরে গেছে, বামুন দেখতে চাইল মরাটা। আহ্লাদে উপরের চাদরটা সরাতেই তার চক্ষু চড়কগাছ। হায় হায়, একী করল সে! এ যে গোরুর একটা বাছুর। এখন কী হবে! গোরু মারলে যে পাপ হয়। এ কথা জানাজানি হলে যে আর নিস্তার নেই। সবাই তাকে একঘরে করবে। তাড়াতাড়ি দামুকে ডেকে বলল— বাবা দামু, এই বাছুরটাকে বাগানে নিয়ে গিয়ে মাটিতে পুঁতে দাও। দামু মনে মনে হাসতে হাসতে বাছুরটাকে মাটিতে পুঁতে দিল। তবে ল্যাজটা রাখল মাটির উপরে।

এদিকে পাপের হাত থেকে বাঁচতে বামুন সেদিন বাড়িতে ভোজ দিল। বাড়িতে অনেক লোক। তারা আসল কারণটা জানে না। যেই সবাই খেতে বসবে, দামু ছুটে গেল বাগানে। তারপর মাটি খুঁড়ে বাছুরটাকে বার করে অতিথিদের সামনে নিয়ে এল। বলল— এই দেখুন, ঠাউর মাশাই কিন্তু গোরু হত্যা করেন নি। শুধু একটা বাছুর।

অতিথিরা দেখে তো রেগে লাল। তারা আর জলস্পর্শ করল না। ধিক্, নরাধম।— বলতে বলতে চলে গেল সবাই।



চৌর কাহিনী



কোনো এক সময়ে গারোদের গ্রামে রাকদা নামে একজন লোক বাস করত। তার ডেংজা নামে একটা ছেলে ছিল। সেবছর তেমন বৃষ্টি হয়নি, গ্রামে তাই দুর্ভিক্ষ হল। লোকজন অনাহারে কাটাচ্ছিল। একদিন রাকদা তার ছেলে ডেংজাকে সঙ্গে নিয়ে দূরে কোথাও যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। সেখানে বাবা আর ছেলে যে টাকাকড়ি রোজগার করবে, তাই দিয়ে তারা খাবার-দাবার কিনে বাড়ি ফিরে আসবে।

এক বড়োলোকের ধানক্ষেতে ঝলসানো রোদের মধ্যে তারা কয়েকদিন কাজ করল। কাজ করার সময়ে ঘামে নেয়ে গেল তাদের সমস্ত শরীর। কাজের শেষে পরিশ্রমের দাম হিসেবে পাওয়া কয়েক কাঠা ধান নিয়ে থলি ভর্তি করে বাবা আর ছেলে বাড়ির পথে রওনা হল। চলতে চলতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লে একটা পিপুল গাছের ছায়ার নীচে বসে তারা বিশ্রাম নিতে লাগল। ডেংজার জলতেষ্টা পেয়েছিল খুব। একটু পরে সে জলের খোঁজে গেল। বাবাকে বলে গেল পিপুল গাছের নীচে তার জন্যে অপেক্ষা করতে।



ডেংজা ঝোপের আড়াল হতেই রাকদা ভাবল, বাড়িতে ভাত খেতে না পেয়ে কী কষ্টটাই না হয়! ইচ্ছে করে আরেকটু ভাত যদি পেতাম! ডেংজা এখন নেই, আর অন্য কেউই নেই যে দেখতে পাবে আমি কী করছি না করছি। এই সুযোগে ডেংজার থলি থেকে খানিকটা ধান সরিয়ে আমার থলিতে রেখে দিই। এই রকম ভাবতে ভাবতে মুঠো ভর্তি করে ছেলের থলি থেকে বেশ কিছুটা ধান চুরি করে নিল রাকদা। পাছে ছেলে সন্দেহ করে, এইজন্যে হাত দিয়ে বাকি ধানটা সমান করে রেখে দিল।

কালে রাকদা অসুস্থ হয়ে মারা গেল। ডেংজা ছিল খুবই বাধ্য আর কর্তব্যপরায়ণ ছেলে। অনেক শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সে বাবার পারলৌকিক কাজ সম্পন্ন করল। তাদের জাতের রীতি অনুযায়ী একটা কুকুর, একটা ষাঁড় আর কতকগুলো মুরগি মেরে খাওয়াল গাঁয়ের লোকজনকে; শেষে বাবার মৃতদেহটা দাহ করল শুকনো কাঠের চুল্লিতে। কিছুদিন পরে অনেক কষ্টে-সৃষ্টে চেয়েচিন্তে বাড়ির সামনে বাবার একটা স্মৃতিস্তম্ভও প্রতিষ্ঠা করল সে।

মানুষে জানে না, কিন্তু দেবী মাতা দিংগিপা বাহবরা সবই দেখেন। কিছুই হারায় না, কিছুই নজর এড়ায় না, কোনো ভুলই হয় না তাঁর। আমাদের প্রত্যেক কাজ, চিন্তা আর অনুভবের হিসেব রাখেন তিনি। আর সেই হিসেব অনুযায়ী মানুষ লাভ করে পুরস্কার বা শাস্তি।

রাকদা আবার জন্মাল। তার চুরির জন্যে সে আর মানুষ হতে পারল না। সে জন্মাল একটা ষাঁড় হয়ে। তার আগের জন্মে যে ডেংজা তার ছেলে ছিল, রাকদাকে সারাজীবন সেই ডেংজারই ধানক্ষেত চষতে হল। পাঁচ বছর পরে সে মারা গেল। ডেংজা তার সবজি-বাগানে ষাঁড়টার মাংসবিহীন মাথাটাকে রেখে দিল কাকতাড়ুয়া হিসেবে।

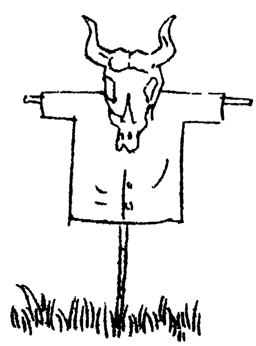
ডেংজার বাগানটা ছিল গাছ-লতা, সবুজ আর সুন্দর সবজিতে ভরা। একজন স্ত্রীলোকের কিছু সবজি চুরি করার লোভ হল। একদিন সন্ধ্যার পরে সে চুপিচুপি এল চুরি করতে। কিন্তু একটা গাছ যেই-না-ছোঁওয়া, অমনি অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। তাতে স্ত্রীলোকটির হাড়ের ভেতরটা পর্যন্ত শিউরে উঠল। ষাঁড়ের মাথাটা স্ত্রীলোকটিকে বলে উঠল, ''ও মেয়ে, সাবধান, চুরি কোরো না! গতবার দুর্ভিক্ষের সময়ে আমার ছেলের থলি থেকে আমি খানিকটা ধান চুরি করেছিলুম। সেই অন্যায় কাজের জন্যে দিংগিপা বাহবরা আমাকে ক্ষমা করেননি। আমার ছেলের ধানক্ষেত চষবার জন্যে আমাকে আবার ষাঁড় হয়ে জন্মাতে হল। পাঁচটা বছর আমাকে ষাঁড় হয়ে বেঁচে থাকতে হল। এখন আমি মরে গেছি। কিন্তু একবার চুরি করার অপরাধে আজ আমি আমার ছেলের বাগান পাহারা দিয়ে চলেছি। এই ভাবে আমাকে পাপের শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে।''

বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল স্ত্রীলোকটির। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। ষাঁড়টা তাকে কী বলেছে, ছুটে গিয়ে সেই খবরটা দিল ডেংজাকে। ডেংজার মনের শান্তি চলে গেল। বাবার দুর্দশার কথা জেনে ভীষণ কষ্ট হল তার। পরদিন সে সবজিবাগান থেকে ষাঁড়ের মাথাটাকে সরিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলল।

পরের রাতে ডেংজা স্বপ্ন দেখল-- তার বাবা তাকে জিজ্ঞেস করছে, ''বাছা, আমায় তুমি পুরোপুরি ক্ষমা করেছ তো?'' ডেংজা খুব দুঃখ পেল, বাবার উপর তার মায়াও হল খুব। সে বলল, ''হ্যাঁ বাবা, করেছি।''

রাকদা বলল, ''তবে আমাকে শান্তিতে এখান থেকে চলে যেতে দাও।''

যখন ঘুম ভাঙল, ডেংজার সব বিষাদ মুছে গেছে।



রানি কমলা কুওরি



অনেকদিন আগে আসামের একটা জায়গায় এক রাজা ছিলেন। তিনি তাঁর প্রজাদের ভালোবাসতেন খুব, তাদের সুখে-শান্তিতে নিরাপদে রাখবার জন্যে যা তাঁর পক্ষে করা সম্ভব, তিনি সবই করতেন। তাঁর প্রজারাও খুব প্রভুভক্ত ছিল। রাজা তাঁব প্রিয় রানি কমলা কুওরিকে নিয়ে সুখে বাস করছিলেন।

কিন্তু সুখ তো চিরকাল থাকে না। পদ্মের পাতার উপর জল যেমন, ঠিক সেইরকম টলমল করে সুখ।

একবার সে রাজ্যে ভয়ংকর খরা হল। খেত মাঠ সব ঝলসে গেল। সবুজেব একফোঁটা চিহ্ন বলতে কোথাও রইল না। মানুষজন গোরুবাছুর সব খিদেয় তেষ্টায় মরতে লাগল।

রাজা চিন্তায় পড়লেন, কীভাবে তাঁর প্রজাদের বাঁচানো যায়! বড়ো করে গভীর কবে একটা পুকুর খোঁড়াব জন্যে লোক লাগালেন তিনি। পুকুর তো বড়ো হল, গভীরও হল, কিন্তু জল কই? পুকুর শুকনো। আবা নিচু, আরো নিচু পর্যন্ত খোঁড়া হল, কিন্তু একফোঁটা জলও উঠল না।

রাজা ভেবে আকুল হলেন। প্রজারা সব আশাই ছেড়ে দিল।

কটা দিন গেল। রাজ্যের অবস্থা আরো খারাপ হল।

এই সময় এক রাতে রাজা একটা স্বপ্ন দেখলেন। হ্যাঁ, বিরাট পুকুর জলে ভরে উঠবে, প্রজাদের তিনি বাঁচাতে পারবেন, কিন্তু তাঁকে তাঁর প্রিয় রানিকে উৎসর্গ করতে হবে।

রাজার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি ধড়মড় কবে উঠে বসলেন। তাঁর মনের মধ্যে তোলপাড় চলছে ঃ একদিকে তাঁর প্রিয় রানি, অন্যদিকে তাঁর বিশ্বস্ত প্রজারা। প্রজাদের রক্ষা করা রাজার পরম পবিত্র কাজ। তিনি ভাবতে লাগলেন— কী কবা যায়?

শেষকালে রাজা তাঁর স্বপ্নের কথা রানি কমলা কুওরিকে বললেন।

রানি মন দিয়ে সব শুনলেন, তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কান্নায় তাঁর চোখ ভরে গেল। তারপর রানি বললেন, "রাজা, এইসব লোকজন— আপনার প্রজারা তো আমার নিজের সন্তানের মতো। এদের জন্যে আমি নিশ্চয়ই নিজেকে উৎসর্গ করব। আমি জানি আমাকে ছাড়া আপনি কখনো সুখী হতে পারবেন না। তবু আপনি আমাকে যেতে দিন। এটাই আমার পক্ষে উচিত কাজ হবে।"

রাজা গিয়ে দাঁড়ালেন পুকুর পাড়ে। প্রজারা অপেক্ষা করছিল আশেপাশে। তাদের মন দুঃখ আর কৌতূহল দুই-ই।

রাজাকে বিদায় জানিয়ে রানি যেই শূন্য পুকুরে পা দিলেন, অমনি অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল! ঠাণ্ডা, বিশুদ্ধ আর পরিষ্কার জল বেরিয়ে আসতে লাগল হুড়হুড় করে।

রাজার মুখে কথা সরল না। প্রজারা চোখ ফেরাতে পারল না।

রাজা চিৎকার করে বলে উঠলেন রানিকে—

"ও আমার হৃদয়ের দেবী, কমলা,
জল কত?"

"ও আমার হৃদয়ের দেব,
জল আমার গোড়ালি পর্যন্ত",— উত্তর এল।

জল আরো উঁচুতে উঠল। রাজা আবার জিজ্ঞেস করলেন,

"ও আমার হৃদয়ের দেবী, কমলা,
জল কত?"

"ও আমার হৃদয়ের দেব,
জল আমার হাঁটু পর্যন্ত"— উত্তর এল।

জল আরো উঁচুতে উঠল। রাজা আবার জিজ্ঞেস করলেন,

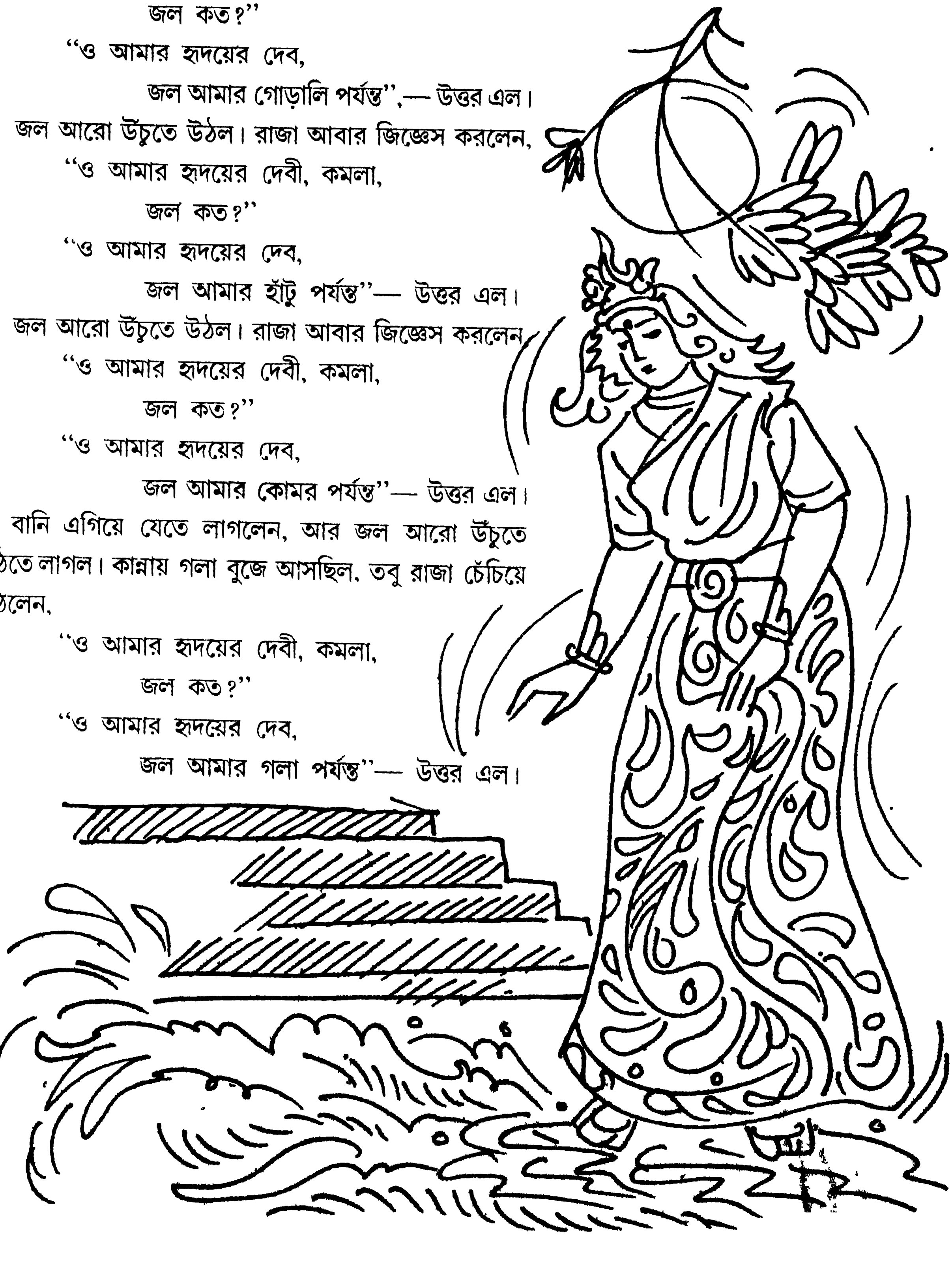
"ও আমার হৃদয়ের দেবী, কমলা,
জল কত?"

"ও আমার হৃদয়ের দেব,
জল আমার কোমর পর্যন্ত"— উত্তর এল।

রানি এগিয়ে যেতে লাগলেন, আর জল আরো উঁচুতে উঠতে লাগল। কান্নায় গলা বুজে আসছিল, তবু রাজা চেঁচিয়ে উঠলেন,

"ও আমার হৃদয়ের দেবী, কমলা,
জল কত?"

"ও আমার হৃদয়ের দেব,
জল আমার গলা পর্যন্ত"— উত্তর এল।





রানি আরো খানিকটা সামনে এগোলেন। আর এবার জল এল তোড়ে।

ততক্ষণে রাজার দুটি গাল বেয়ে কান্নার জল গড়িয়ে পড়ছে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন,

"ও আমার হৃদয়ের দেবী, কমলা,
জল কত?"

"ও আমার হৃদয়ের দেব,
জল আমার মাথা পর্যন্ত।"

রানির গলার আওয়াজ তখন প্রায় শোনাই যায় না। সুন্দরী কমলা কুওরি চিরকালের মতো হারিয়ে গেল গভীর জলে।

ও ড়ি শা

রামুর কারসাজি



রামু হচ্ছে মুচির ছেলে।

বয়স তার বেশি নয়। এই দশ কী এগারো।

জুতো মেরামত করতে পারে না, কিন্তু বুরুশ করতে ওস্তাদ। ভোর না হতেই কালি আর বুরুশের ছোটো ঝোলাটা নিয়ে বেরিয়ে সে গান করতে শুরু করে দেয়।—

এক টি
পয়সা দাও গো বাবু
একটি পয়সা দাও—
ময়লা জুতো ময়লা পায়ে
পালিশ কবে নাও।



খদ্দের জুটতে দেরি হয় না। সে চটপট জুতোর কালি লাগায়, বুরুশ করে আর গান গায়। খদ্দেব খুশি হয়ে ওর জন্যে একটি পয়সার সঙ্গে আরেকটি পয়সা বকশিশ দিয়ে বসে।

কিন্তু এই উড়িয্যা রাজ্যে দুষ্টু লোকের তো অভাব নেই। এই তো দিন কয়েক আগে চশমা-পরা একটি বাবু ওকে জুতো পালিশ কবিয়ে নিয়ে সরে পড়েন— আর ফেরেন না।...

রামু সেদিন বুঝে উঠতে পারেনি যে ভদ্রলোকের কেন এমন মনোবৃত্তি হয়। তাও সামান্য একটি পয়সার জন্য।

এই ঘটনার দিন কয়েক পরের কথা। সেদিন খদ্দেরের অন্ত নেই। রামু জুতো পালিশ করে যাচ্ছে, আর গান গেয়ে চলেছে মিষ্টি মধুর গলায়।

একটি বাবু তো ওর গান শুনেই একটা পয়সা দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রামু তাঁকে

থামিয়ে বললে, 'কই আপনার জুতো তো পালিশ করিনি বাবু। জুতো পালিশ করিয়ে নিন, তারপর না হয় একটা পয়সা বকশিশ দেবেন আরো।'

বাবু ওর কথায় খুশি হয়ে জুতো পালিশ করিয়ে নেন। আর যাবার সময় দুটো পয়সা বকশিশ দিয়ে যান। রামু ভাবে এমন লোকও তবে আছে।

রামুর খদ্দের কমে এসেছে।

এমন সময় সে দেখত পেল, পয়সা না দিয়ে পালিয়ে যাওযা সেই বাবুটি আসছেন ওদিক থেকে।

রামুর মাথায় এক ফন্দি খেলে গেল। সে বলল, 'বাবু, একবারই পালিশ করিয়ে নিন, দেখবেন জুতো কেমন ঝকঝক করে। পয়সা আজ না থাকে আরেক দিন দেবেন। আসুন।'

বাবু ভাবলেন মন্দ কী? পালিশটা কবিয়ে নিইতো, তারপর পয়সা। একবার সরে পড়লে, কে আব ধবে।

বাবু ছোটো কাঠেব বাক্সটার উপর পা রাখেন, বামু পালিশ করে। সেটা পালিশ হযে গেলে বাবু তাঁব জুতো-শুদ্ধ বাঁ পাটা বাক্সের উপর তুলে ধরেন।

'নে এটা পালিশ কর।'— রামুর দিকে চেয়ে বাবু বলেন।

ঘাড নেড়ে রামু জবাব দেয়, 'বাবু একটাই থাক। আগে সেদিনকার পয়সাটা ফেলুন; তারপর ওটা হবে।'

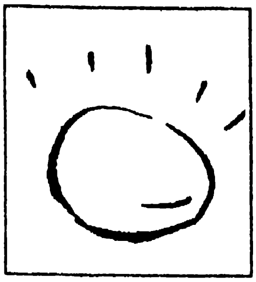
রামুর কথা শুনে বাবু তো অবাক। ছোঁড়াটা বলে কী? আচ্ছা চালাকি তো! আরেক পাটি জুতো পালিশ না করলে যা বিচ্ছিরি দেখাবে।... মহা মুশকিল।... বেশি দেরি করলে হয়তো লোকজন জোটাতে পারে। তার চেয়ে পয়সা দুটো দিয়ে দেওয়াই ভালো। এই ভেবে বাবুটি তখন রামুকে দুটো পয়সাই দিয়ে বললেন, 'নে বাপু, খুব আক্কেল হয়েছে, তাড়াতাড়ি এখন এটা পালিশ করে দে।'

পয়সা পেয়ে রামু তখন জুতোটা পালিশ করে দেয় আর বাবু চলে যাওয়ার সময তাঁর দিকে চেয়ে বলে ওঠে, মনে বাখবেন বাবু, কাউকে ঠকালে নিজেকেই শেযটায় ঠকতে হয।..

বামুর কথা শুনে বাবুটি লজ্জায় মরে যান।



বুজির কল



ছোট্ট গ্রাম। চাষিদের বাসই বেশি এখানে। একদিন চাষিরা সবাই গল্প করছিল। একজন মহাজন আসছিল ওই পথে।

চাষিরা জিজ্ঞাসা কবল ঃ 'কোথায় চলেছেন মহাজন?'

জবাবে মহাজন বলল, 'একটা বিশেষ কাজে জমিদারবাবুর কাছে যাচ্ছি।'

তার কথা শুনে এক গবিব চাষি বলল, 'এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন খুব গর্বের কথা। ইচ্ছে করলে আমিও জমিদাববাবুর সঙ্গে দেখা করে তাঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে আসতে পারি।'

'কী বললি? তুই নেমন্তন্ন খেয়ে আসতে পাবিস?'—বেগে গিয়ে মহাজন বলল এই কথা।

চাষি হাসতে হাসতে বলল, 'বাজি রাখুন।'

বাজি হল। শর্ত এই ঃ যদি ওই চাষি জমিদারবাবুর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে আসতে পারে, তো মহাজন তাকে একজোড়া বলদ কিনে দেবে। আর যদি না পারে, তাহলে তাঁকে টানা তিন বছর মহাজনের জমিতে হাল চালাতে হবে।



চাষি বলল, তাই হবে।

তারপর ওই চাষি সোজা জমিদারবাবুর বাড়ি গিয়ে নমস্কার করে তাঁকে বললঃ 'পেন্নাম হই বাবু।'

'কে তুই? কোথা থেকে আসছিস?'— জমিদার বলল।

'আজ্ঞে, গ্রাম থেকে আসছি।'— চাষি বলল।

'কেন আসছিস?'— জমিদার বলল।

'আপনাকে একটা গোপন প্রশ্ন করতে চাই। একটি ডিম যত বড়ো, তত বড়ো একটা সোনার টুকরোর কত দাম হতে পারে?' — চাষি বলল।

সোনার কথা শুনে জমিদারের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর বলল, "আরে অতো তাড়া কীসের? আমার বাড়িতে এসেছো খাওয়া-দাওয়া কর। বিশ্রাম কর। তারপর এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।"

গরিব চাষি পরম সমাদরে জমিদারের সঙ্গে এক সারিতে বসে খেল। খাওয়া-দাওয়ার পর জমিদার বলল, 'কই দেখি তোমার সোনাটা।'

চাষি মাথা নিচু করে বলল, 'আমি কোথায় সোনা পাব বাবু? গরিব মানুষ। আমি শুধু জানতে এসেছিলাম একটা ডিমের পরিমাণ সোনার দাম—।"

রাগে ফুলতে লাগল জমিদার। তারপর বলল, 'যা পালা। বোকা কোথাকার।'

চাষি বলল, 'কী বললেন বাবু। আপনি নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন, আর মহাজনের কাছ থেকে পাব এক জোড়া বলদ। এর পরেও আমাকে বোকা বলা ঠিক হবে কী?'

এই বলে চাষি মহাজনের বাড়ির দিকে পা চালাল।



এক বরে সব



কোনো এক গ্রামে অতি গরিব এক অন্ধ বাস করত। তার ভারী দুঃখ— তার ঘরবাড়ি নেই, টাকা-পয়সা নেই, ছেলে-পুলে নেই। আর সে চোখে দেখতে পায় না।

মনের দুঃখে অনেক কষ্টে তার দিন কাটে।

একদিন স্বর্গ থেকে দেবতা এসে বললেন ঃ 'ওরে অন্ধ, তুই আর কাঁদিসনে। আমি তোকে বর দিতে এসেছি। তুই কী বর চাস আমাকে বল। একটিমাত্র বর তুই পাবি। সুতরাং ভালো করে ভেবে-চিন্তে বলিস।'

অন্ধ কী বর চাইবে তা ভেবেই পায় না। একবার বলতে চায়, আমার চোখে দৃষ্টি এনে দাও। আবার ভাবে, শুধু দৃষ্টি নিয়ে কী করব, বলি টাকা-পয়সা দাও, কিংবা ঘরবাড়ি দাও। আবার তার মনে হয়, টাকা-পয়সা, ঘর-বাড়িই বা কার জন্যে চাই— আমার তো ছেলেপিলে কেউ নেই। আর দুদিন বাদে যদি মরে যাই, তা হলে এসব চেয়ে লাভ কী?

তার ভাবনা দেখে দেবতা বললেন, 'আচ্ছা, তুই এঁখন না বলতে পারিস, না-হয় আমি কাল আবার আসব। এর মধ্যে ভালো করে ভেবে রাখিস।'— এই বলে দেবতা চলে গেলেন।

তারপর অন্ধ বেচারার সারা রাত ঘুম হয় না।

শুধু ভাবছে কী বলবে

ভোর হতে বাকি নেই।

ভোরবেলা আবার দেবতা ফিরে এলেন।

তিনি বললেন, 'আমি এসেছি— এখন কী বর চাস্ বল।''

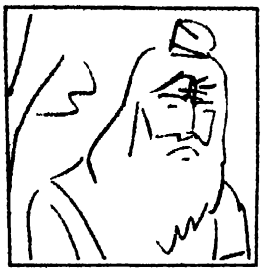
তখন অন্ধের বুদ্ধিটা হঠাৎ যেন খুলে গেল। সে লাফিয়ে উঠে বলল, ''আমায় খালি এই বর দিন ঃ আমি যেন হাসতে হাসতে দেখে যেতে পারি যে আমার নাতি-নাতনিরা বাড়িতে আমার চারদিকে সোনার পালঙ্কে বসে খেলা করছে।''

দেবতা তার বর চাওয়ার বাহাদুরি দেখে হেসে বললেন, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

এক বরে অন্ধের ছেলেপিলে, ঘরবাড়ি, টাকা-পয়সা, চোখের দৃষ্টি, অনেক বয়স আর মনের সুখ সবই চেয়ে নেওয়া হল।



মীমাংসা



উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চলে দিবাকর নামে এক গরিব যুবক ছিল। সে ওই পাহাড়ের পাদদেশে কঠোর পরিশ্রম করে নিজের মাকে নিয়ে কোনো রকমে সংসার চালাচ্ছিল।

একদিন দিবাকরের মনে প্রশ্ন জেগে ওঠে — যারা বড়লোক হয় তারা কি আমার মতো কঠোর পরিশ্রম করে বড়লোক হয়? তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমি এক বছর ধরে এই বনাঞ্চলে এত পরিশ্রম করছি, তবুও এক পয়সা জমছে না কেন?

ওই অঞ্চলের লোকেরা যে-কোনো প্রশ্নের সমাধানের জন্য সন্ন্যাসী-সাধুদের কাছে যেত। ওই অঞ্চলে থাকতেন এক সাধু। তাঁর নাম গোপীকৃষ্ণ।

দিবাকর ঠিক করল তার মনে যে প্রশ্ন জেগেছে, সেই প্রশ্নের জবাবের জন্য গোপীকৃষ্ণের কাছে যাবে। সে একদিন বলল, 'মা, আমি সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ওঁর কাছ থেকে আমার দু-একটা প্রশ্নের জবাব ভালো ভাবে জেনে নিতে হবে।'

দিবাকরের মা তাকে যেতে বারণ করল।

অনেক দূরে যাওয়ার পর এক নির্জন প্রান্তে সে একটি ঘর দেখতে পেল। তার খুব খিদে পেয়েছিল। সেই ঘরের কাছে গিয়ে এক বুড়িকে লক্ষ করে তাকে বলল, 'দিদিমা আমার খুব খিদে পেয়েছে। আমি অনেক দূর থেকে আসছি। আমাকে একটু ভাত খেতে দাও।'

ওই বুড়ি তার সঙ্গে বেশি কথা না বলে, ভাত ফুটিয়ে, খেতে দিয়ে বলল, 'আচ্ছা বাবা, তুমি কোথা থেকে আসছ? কোথায় যাবে? তুমি কি কোনো কাজের জন্য যাচ্ছ, না বেড়াতে যাচ্ছ সেখানে?'

'আমি বেড়াতেও যাচ্ছি না, কোনো কাজেও যাচ্ছি না। আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে— আমি যতই পরিশ্রম করি না কেন, আমি আগে যে রকম গরিব ছিলাম, সেইরকমই আছি। এর কারণ যে কী, তাই আমি গোপীকৃষ্ণের কাছে জানতে যাচ্ছি।'—দিবাকর বলল।

'তাই নাকি? তা হলে আমারও একটা প্রশ্ন আছে। ওঁকে জিগগেস কোরো তো— আমাদের খিড়কির দরজার কাছে একটা গাছ লাগিয়ে অনেক বছর কেটে গেল। গাছটা বেশ বড়ো হয়েছে, কিন্তু ফল ধরছে না। কেন যে ফল ধরছে না, সেটা তুমি ওই সাধুর কাছে জিগগেস করে এসো।'— বুড়ি বলল।

বুড়ির কথামতো কাজ করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে দিবাকর আবার রওনা হল। অনেক দূর যাওয়ার পর একটা আশ্রম খুঁজে পেল। সেটা ছিল কোনো এক সাধুর আশ্রম। সেখানে গিয়ে সাধুকে বলল, 'আমি অনেক দূর থেকে আসছি। আমার খুব খিদে পেয়েছে। আমাকে একটু ভাত খেতে দিন।'

সাধু ওকে খেতে দিয়ে বলল, 'তুমি কোথা থেকে আসছ? কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি কোনো কাজে যাচ্ছ, না বেড়াতে যাচ্ছ?'

'আমি বেড়াতেও যাচ্ছি না, কোনো কাজও যাচ্ছি না। আমার দারিদ্র্য কেন যে দূর হচ্ছে না— সেই প্রশ্ন গোপীকৃষ্ণকে করতে যাচ্ছি।'—দিবাকর বলল।

'তা হলে বাবা, আমারও একটা প্রশ্ন ওঁকে জিগগেস করবে। আমি অনেক বছর ধরে তপস্যা করছি। কিন্তু সিদ্ধিলাভ হচ্ছে না। এর কারণ যে কী সেটাই আমার প্রশ্ন।'— সাধু বলল।

তার কথায় রাজি হয়ে দিবাকর গোপীকৃষ্ণ যেখানে ছিল সেখানে গেল।

'হে মহাত্মা! আমি আপনার কাছে তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে এসেছি।'— দিবাকর বলল।

'কিন্তু আমি তো দুটোর বেশি প্রশ্নের জবাব দিই না। তুমি তিনটে থেকে যে-কোনো একটি বাদ দিয়ে বাকিগুলো জিগগেস করতে পার। আমি তার সঠিক সমাধান দেব।' গোপীকৃষ্ণ বলল।



দিবাকব খানিকক্ষণ ভেবে ঠিক করে নিল তিনটি প্রশ্নের মধ্যে নিজেব প্রশ্নটা বাদ দিতে হবে। তাই সেটাকে বাদ দিয়ে বাকি দুটো প্রশ্ন অঙ্গীকার করে তার সঠিক প্রমাণ পেয়ে বাড়ির দিকে বওনা হল।

ফেরার পথে প্রথমে সাধুর আশ্রমে ঢুকে সাধুকে বলল, 'আপনার মাথায় এমন একটা মণি রয়েছে যার ফলে সমস্ত তপস্যায সিদ্ধিলাভ করা যায় না। ওই মণিটাকে বেব করে দিলে সিদ্ধিলাভ সম্ভব হবে।'

সাধু অবাক হয়ে, মাথায় হাত দিয়ে ওই জটাগুলোর মধ্যে খুঁজে একটা মণি পেল। ওই মণি দিবাকরকে দিয়ে বলল, 'এটাকে তুমিই রাখো। আমার আর এ সবেব দরকার নেই। আমি তো সিদ্ধিলাভ করব।'

এর পর বুড়ির কাছে গেল। বুড়ি বলল, 'আমার প্রশ্নের সমাধান পেয়েছ?'

'হ্যাঁ। আপনার গাছের ঠিক নীচে নটা কলসি-ভরা সোনা আছে। ওই কলসিগুলোকে তুললে ফেললে আপনার ওই গাছে ফল ফলবে।'— দিবাকর বলল।

ব্যাপারটা যে গোপন রাখা উচিত, আগে তাদের কাউকে যে জানানো উচিত নয়, সেটা তাকে বুঝিয়ে বলল।

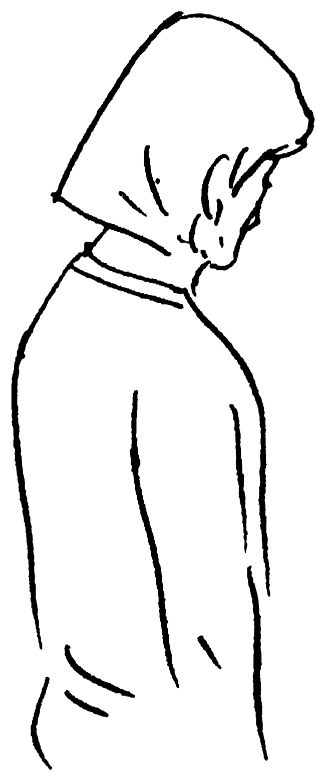
সেদিন রাত্রে গাছের তলার মাটি খুঁড়ে সত্যি-সত্যি নয় কলসি সোনা পাওয়া গেল। মাটি খোঁড়া, সোনা পাওয়ার ব্যাপারে দিবাকরকে সবই কবতে হল।

বুড়ি বলল, 'তুমি আমার অনেক উপকার করেছ। এক কলসি তুমি নিয়ে যাও।'

তারপর মণি আর সোনাভরা কলসি নিয়ে ফিরে এল দিবাকর।

এত কিছু পেয়েও দিবাকর কিন্তু পরিশ্রম করতে ভোলেনি। দিনরাত কাজের মধ্যে থেকে তার সঞ্চিত অর্থ নিয়ে উড়িয্যাব গ্রামাঞ্চলে হলদিপোতাতে সে একটি আশ্রম করে ফেলল। সেই আশ্রম হল, যারা অসহায় আর দুর্গত, কেবল তাদেবই জন্য।

আজও অনেক লোকের মুখে দিবাকরের এই অসাধ্য সাধনের কাহিনীটি প্রচলতি হয়ে আসছে।



ভাগ্যের রেখা



কোনো এক বুড়ির ছিল দুটি ছোটো ছেলে। ওদের দেখার কেউ ছিল না।

বুড়ি দিন আনত দিন খেত। যেদিন কাজ পেত না, সেদিন তিনজনকে উপোস করতে হত। কতদিন যে উপোসে কাটত, তার হিসেব নেই।

আগের দিন উপোসে কেটেছে। ভোরে কাজ খুঁজতে বের হল বুড়ি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কাজ পেল এক বাড়িতে।

বাড়ির বউ বলল, কাজটা একটু অন্য ধরনের। সারাদিন ধরে আমার মাথার উকুন বাছতে হবে। দিনের শেষে মজুরি পাবে। টাকা নয়, চাল। রাজি আছ? মাথার সমস্ত উকুন বের করে দিতে হবে কিন্তু।

বুড়ি রাজি হল। তারপর বসে গেল কাজে। উকুন বাছার কাজ। সকাল থেকে দুপুর। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বিকেলের পর অন্ধকার হল।



বুড়ি এবার বউকে বলল—'এবার আমার চাল দাও।'

বুড়ির কথা শুনতে শুনতে বউটি হঠাৎ মাথা চুলকে একটা উকুন পেয়ে বলল, 'মজুরি আবার কীসের? কথা ছিল আমার মাথার সব উকুন বের করে দেবে। এই তো একটা বেরুল। আরও কত আছে কে জানে? চাল দেব না ছাই দেব। যাও, যাও, আর কোনোদিন এ পথ মাড়াবে না।'

বুড়ির পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল দুদিন ধরে না খেতে পাওয়া দুটি বাচ্চার মুখ। কাঁদতে কাঁদতে গেল ডোবার ধারে। শাকপাতা তুলে ফিরছিল তার কুঁড়েঘরে। ঘরের দিকে শাক নিয়ে ফেরার সময় বুড়ির সঙ্গে দেখা হল এক বুড়োর। সে বলল, কাঁদছ কেন? কাঁদতে নেই। ঘরে গিয়ে এই শাক কুচি-কুচি করে কেটে ঝুড়ি, থালা, বাসন যতগুলি পাত্র আছে সবগুলোতে কিছু কিছু ফেলে রাখ, আর বাকি কিছু শাক রান্না করবে।

বুড়োর কথামতো বুড়ি তাই করল। শাক রান্না করে থালায় ঢালতেই শাক আর রইল না, ভাত হয়ে গেল। বুড়ির খুব আনন্দ হল। প্রাণভরে ছেলেদের খেতে দিল।

সেদিন রাত্রে সবার টানা ঘুম হল। পরের দিন সকালে উঠে বুড়ি দেখে— তার ঝুড়ি, ধামা, থালা, বাসন সব চালে ভরে গেছে।

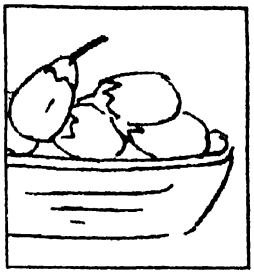


সেদিন থেকে বুড়ির কপাল ফিরল।

আস্তে আস্তে সে ছাগল, গোরু ও মোষ কিনল।

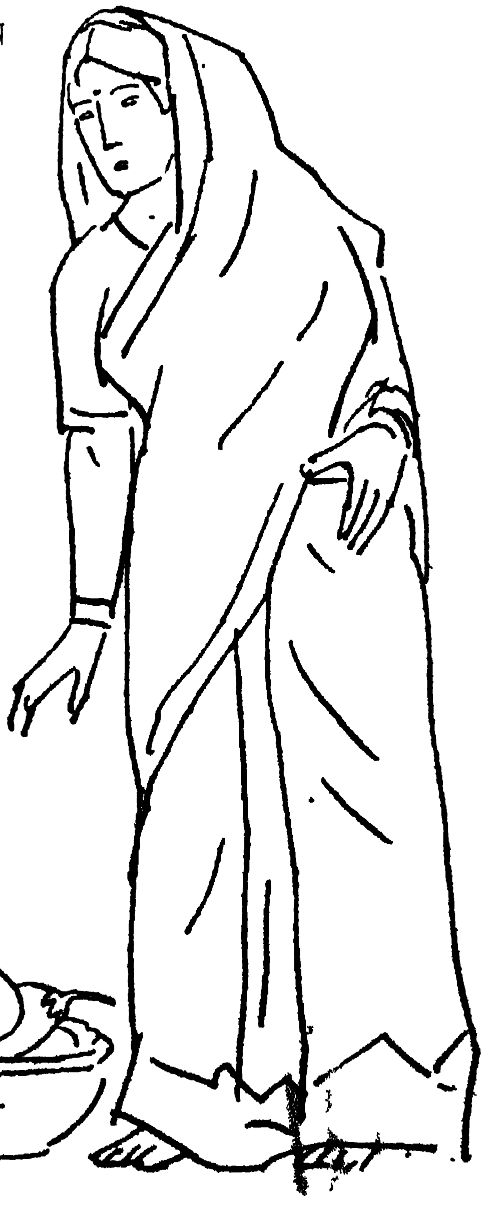
তার ছেলে দুটো বড়ো হল। শেষ বয়সটা তার ভালোই কাটল। মৃত্যুর দিনেও গালে হাত দিয়ে বুড়ি ভাবতে লাগল, শাক নিয়ে ফেরার পথে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সে কে?

লোভের শাস্তি



উড়িষ্যার কোনো এক গ্রামে বাস করত এক ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণের নাম ছিল ঘনশ্যাম, ব্রাহ্মণীর নাম ছিল রাধা। ব্রাহ্মণ বেগুনের তরকারি খেতে খুব ভালোবাসত। হলে কী হবে, তারা এত গরিব ছিল যে, যা খেতে ইচ্ছে করত তা খেতে পেত না।...

একদিন রাধা বলল 'তুমি যে রোজ পতিতপাবনের বাড়ির পুকুরে চান করতে যাও, ওদের পুকুর পাড়ে অনেক বেগুন রয়েছে। ইচ্ছে করলে তো সহজেই আনতে পার। তা মনে থাকবে আমার কথা? না, মনে করিয়ে দিতে হবে?'



ঘনশ্যাম তার বউকে ভীষণ ভয় করত। তার কোনো উপায় ছিলনা 'না' বলার। তাই চুপ করে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

পতিতপাবনের বাড়িতে সেদিন কেউ ছিল না।

অগত্যা পতিতপাবন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাড়ি গো বাড়ি, শুনছ আমার কথা?'

বাড়ি তো আর কথা বলতে পারে না, তাই বললে নিজেই। 'কী বলছ?' 'দু-চারটে বেগুন নেব।' 'নাও নাও, যত পার।'

তারপর ঘনশ্যাম দশবারোটা বেগুন নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

রাধা তো বেগুনগুলো পেয়ে খুব খুশি হল।

এমনি করে পর পর চারদিন পতিতপাবনের পুকুর পাড় থেকে বেগুন আনে ঘনশ্যাম। আর রাধা নানান রকমের তরি-তরকারি রেঁধে খাওয়ায়।

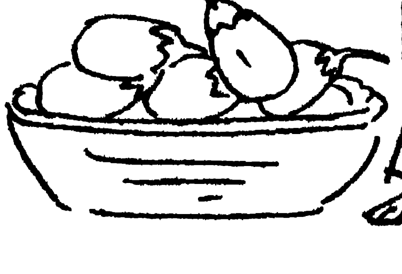
মহা আনন্দে দিন কাটে।...

পঞ্চম দিনে ঘনশ্যাম যথারীতি বেগুন আনার জন্য তৈরি হল।

এদিন পতিতপাবন সপরিবারে বাইরে থেকে ফিরে এসেছে।

বেগুন-ক্ষেত দেখে তো অবাক!

অনেক বেগুন কমে গেছে। এ নিশ্চয়ই আশে-পাশের লোকে করেছে।



তাই চোর ধরবার জন্য পতিতপাবন আড়ালে লুকিয়ে থাকল।

পঞ্চম দিনে পতিতপাবন যথারীতি বাড়ির সামনে এসে বলল, 'বাড়ি গো বাড়ি, বেগুন নেব।' 'নাও না যত খুশি। দশবারোটাই নাও।'

তারপর ঘনশ্যাম দশবারোটা বেগুন নিয়ে নেবার জন্য তৈরি হচ্ছে, পতিতপাবন হাতে-নাতে তাকে ধরে কুঁয়োর সামনে নিয়ে এল।

তারপর কুঁয়োর কাছে গিয়ে বলল, 'কুঁয়ো গো কুঁয়ো, শুনছ আমার কথা?

— কী বলছ পতিতপাবন?

— দু-চারবার চোবাব এই ঘনশ্যামকে।

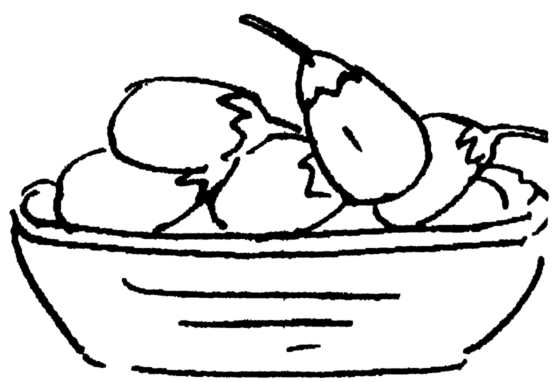
— চোবাও না দশ-বারোবার।

তারপর ঘনশ্যামকে কাছে টেনে এনে কুঁয়োয় চোবাল।

কাকুতি-মিনতি করে সে যাত্রা বেঁচে গেল ঘনশ্যাম।

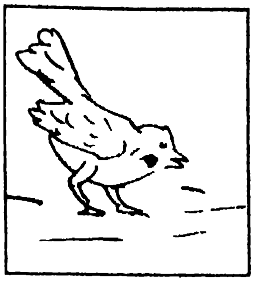
বাড়িতে ফিরতেই রাধা বলল, কই বেগুন কই?

— আর বেগুন? বেগুন খাওয়ার সখ মিটে গেছে চিরদিনের মতো। বুঝলে গিন্নি? পতিতপাবন মারতে মারতে আমায় ছেড়ে দিয়েছে।



উত্তরপ্রদেশ

পরিশ্রমী চড়ুই ও অলস কাক



উত্তরপ্রদেশের গ্রামে এই গল্পটা বেশ চালু। এক কাক আর এক চড়ুইয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব। তারা একটা জমি পছন্দ করেছিল। জমিটা চাষ করবার সময় যখন এল, তখন চড়ুই কাককে বললে, 'ভাই কাক, এস আমরা দুজনে মিলে জমিটা এবার চাষ করি।'

কাক বড়ো অলস। সে বন্ধুর কথা শুনে বললে—

'আসছি আমি, চড়ুই তুমি একলা সেথা নিজেই যাও
হুঁকোয় দেখ ধুম উঠেছে, মনের সুখে টানতে হবে,
আমের ডালে বসব গিয়ে, আরাম যদি দেখতে চাও—'

চড়ুই একাই গেল মাঠে। সে সারাদিন জমি চাষ করল। কাক এল না। পরদিন ভোরবেলা চড়ুই জাগল, জেগে বন্ধুকে বললে, 'ভাই কাক, চল মাঠে যাই, মাটি সমান করে আসি। দুজনে হাত লাগালে কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হবে। এক বেলাতেই শেষ হয়ে যাবে, চল।'

কাক উত্তর দিলে ঃ

'আসছি আমি, চড়ুই তুমি একলা সেথা নিজেই যাও,
হুঁকোয় দেখ ধুম উঠেছে, মনের সুখে টানতে হবে,
আমের ডালে বসব গিয়ে, আরাম যদি দেখতে চাও—'



চড়ুই একা আবার গেল মাঠে। কাকের জন্যে বসে রইল অনেকক্ষণ। কাক আসছে না দেখে সে নিজেই নামল। মাটির শক্ত শক্ত ঢেলাগুলো ভাঙতে লাগল হাঁপাতে হাঁপাতে। মাটি এক সময় সমান হল। চড়ুই আনন্দে জমিটার উপর দিয়ে একবার চক্কর দিয়ে এল।

কাক আমের ডালে বসে বন্ধুর কাজ দেখছিল।

'বাঃ বেশ হয়েছে।' কাক বন্ধুর কাজের তারিফ করল, 'চালিয়ে যাও—'

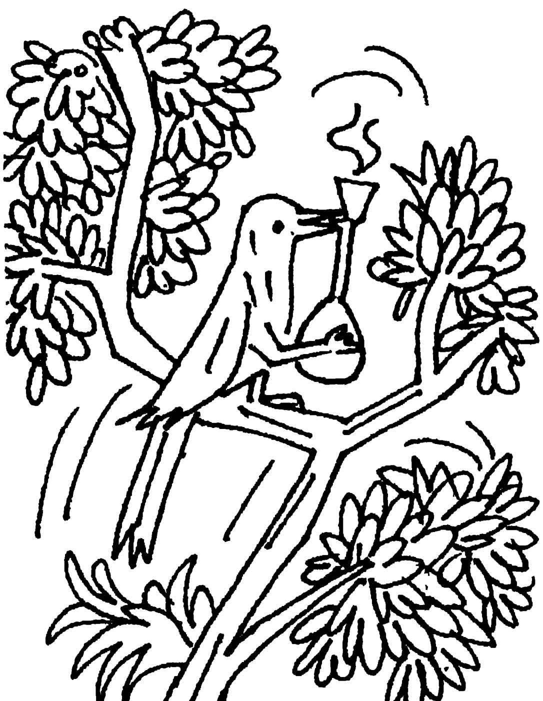
চড়ুই খুশি হল বন্ধুর প্রশংসায়।

জমি যখন তৈরি হয়ে গেছে, আর মাটি বেশ নরম-নরম, তখন চড়ুইয়ের মন খুশিতে ভরে ওঠে। এখনই তো বীজ রোপণের সময়। চড়ুই বললে, 'ভাই কাক, এখন আমাদের মাঠে যাবার সময় হয়েছে। চলো, আমরা গমের দানা ছড়িয়ে দিয়ে আসি।'

শুনে কাক বুঁদ হয়ে রইল। বললে—

'আসছি আমি, চড়ুই তুমি একলা সেথা নিজেই যাও,
হুঁকোয় দেখ ধুম উঠেছে, মনের সুখে টানতে হবে,
আমের ডালে বসব গিয়ে, আরাম যদি দেখতে চাও—'

আবার চড়ুই একাই গেল মাঠে। সে খানিকটা অসহায় বোধ করল বটে, কিন্তু বললে না কিছুই। কাক তখন আমগাছের মগডালে বসে হুঁকো টানছে আর এদিক-ওদিক চোখ ঘোরাচ্ছে সুখে। গমের কচি চারাগুলো যখন গজিয়ে উঠল, তখন চড়ুইয়ের ফুর্তি দেখে কে। আনন্দে সে নাচতেই লাগল। কিন্তু পরে দেখতে পেল, চারাগুলোব আশেপাশে আগাছা মাথা চাড়া দিয়েছে। সে তাড়াতাড়ি কাকের কাছে গিয়ে বললে, 'ভাই কাক, সর্বনাশ হয়েছে। শিগগির এস। আগাছায় ভরে গেছে খেত, ওগুলো উপড়ে না-ফেললে ভালো-জাতের গম পাওয়া যাবে না। সব খাটুনি বরবাদ হয়ে যাবে—'



শুনে কাক উদাস হয়ে গেল। উড়ে গিয়ে বসল আমগাছের আর-এক ডালে। সেখান থেকে সে আগের মতন একই উত্তর দিলে ঃ

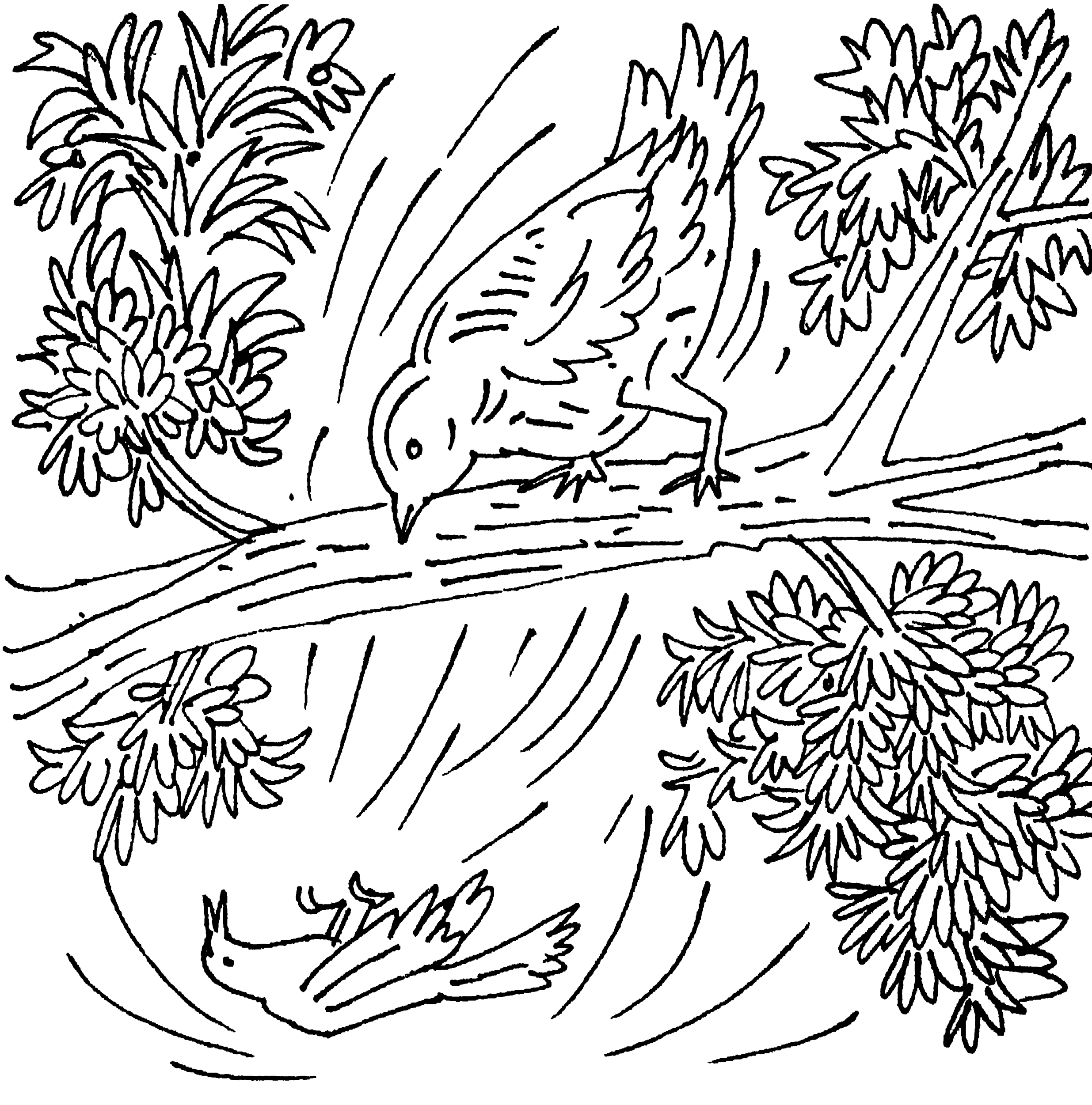
'আসছি আমি, চড়ুই তুমি একলা সেথা নিজেই যাও,
হুঁকোয় দেখ ধুম উঠেছে, মনের সুখে টানতে হবে,
আমের ডালে বসব গিয়ে, আরাম যদি দেখতে চাও—

চড়ুই আর কী করে। একাই সব আগাছা উপড়ে ফেলল। পরের কাজটা আরও শক্ত। মাঠে জল দেওয়া। জল না পেলে চারাগুলো পুষ্ট হবে না। চড়ুই সেকথা কাককে বললে। কাক আগের মতনই উত্তর দিলে। শুনে, চড়ুইকে সারা মাঠে জল দিতে হল।

ধীরে ধীরে বোঁটা শক্ত হল। দানায় পাক ধরল। তাতে বাদামি রঙ ধরল। মনে হল মাঠে সোনার আভা ছড়িয়ে পড়েছে। ফসল কাটার দিন এগিয়ে এল। চড়ুই সাহায্য করার জন্য কাককে অনুরোধ করল। কাক আগের মতন উত্তর দিলে ঃ

'আসছি আমি, চড়ুই তুমি একলা সেথা নিজেই যাও,
হুঁকোয় দেখ ধুম উঠেছে, মনের সুখে টানতে হবে,
আমের ডালে বসব গিয়ে, আরাম যদি দেখতে চাও—'

তারপর যখন খোসা ছাড়াবার সময় এল তখনও কাক গাছের ডালে চুপটি করে বসে রইল আর টিপ্পটি



পিট কবে দেখতে লাগল, একা চড়ুই গম থেকে খোসা ছাড়িয়ে আলাদা কবছে, জড়ো করছে দু-ভাগে, গমের দানা একদিকে খোসা অন্যদিকে।

এবার ভাগাভাগি। কাক অলস বটে কিন্তু বুদ্ধি খুব, সে আমেব ডাল থেকে উড়ে গিয়ে বসল দানার ভাগের উপর— বুঝিয়ে দিলে ওই ভাগটি হল তাব। দুঃখী চড়ুই অগত্যা তা-ই মেনে নিলে। সে পেল খোসার ভাগ। তবু রাগ করল না। কেননা সে তার বন্ধু। বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া করা উচিত নয়।

বাত্রি আসে। শুরু হয় ঝড়-বৃষ্টি। চড়ুই তার ভাগের খোসার গাদার মধ্যে ঢকে বেঁচে যায়। আর কাক? সে গতিক সুবিধে নয় দেখে, গাছের ডাল থেকে নেমে ঢুকে যায় গমের দানার গাদার ভেতর। বৃষ্টিতে দানার গাদা ধসে গেল, কুঁড়ে কাক মারা পড়ল সেই গাদার চাপে পড়ে।

চার অন্ধ



অনেকদিন আগে উত্তরপ্রদেশে এক জ্ঞানী ও দানশীল রাজা বাস করতেন। প্রজাদের তিনি খুব ভালোবাসতেন। দেশবাসীর কোনো অভাব ছিল না। সবাই সুখে বাস করত।

একদিন রাজা শিকার করে ফিরছিলেন। পথে চার অন্ধের সঙ্গে দেখা হল। তাদের খুব খিদে পেয়েছিল। তারা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনেছিল। তাই ভেবেছিল— কেউ আসছে। শব্দ কাছে এল। তারা হাত তুলে খাবার চাইল।

ঘোড়ায় চড়ে যিনি আসছিলেন তিনি স্বয়ং রাজা। তাঁর দয়া হল। তিনি সৈন্যদের বললেন, ওদের ঘোড়ায় পিঠে চড়িয়ে নিতে। ওরা তাই করল।

খানিক দূর যেতেই এক মিষ্টির দোকান চোখে পড়ল।

রাজা বললেন, 'ওদের ওই দোকানে নিয়ে যাও। পেট ভরে খাবার খাইয়ে দাও—'

ওদের খাওয়া শেষ হলে রাজা দাম মিটিয়ে দিলেন।

এক অন্ধ বললে, 'মহারাজ, আপনি করুণাময়। দয়ালু। আমাদের আরেকটু দয়া করতে হবে। আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। আপনি একটু ঠাঁই দিন। আমরা আপনার অনেক কাজ করে দোব—'

'আমার কাজ করে দেবে!' রাজা হাসি চেপে বললেন, 'কী করে করবে?'

সে বললে, 'মহারাজ, না দেখেও অনেক কাজ করা যায়। আমরা পারি—'

'কী রকম?'

'যেমন ধরুন, আমাদের মধ্যে একজন নকল মুক্তো থেকে আসল মুক্তো বেছে দিতে পারে—'

'তাই নাকি!' রাজার কৌতূহল হয় ঃ 'বেশ। তারপর?'

'একজন ঘোড়ার গায়ে হাত দিয়ে বলতে পারে সেই ঘোড়াটি কোন্ জাতের? ভালো না মন্দ—'

'বটে!'

'হ্যাঁ মহারাজ। আমার তৃতীয় বন্ধুটির গুণ হল, পায়ের শব্দ শুনে সে বলে দিতে পারে কোন্ নারী অসতী—'

'আর চতুর্থ জন?'

'সে-ও ওই রকম। সে বলতে পারে কোন্ পুরুষ অসৎ—'

রাজা বললেন, 'তোমাদের বেশ মজার পরিচয় পেলাম। এখন চল প্রাসাদে। আজ বিশ্রাম করো। কাল তোমাদের পরীক্ষা করা হবে।'

তাই হল।

পরের দিন তিনি এক রত্ন-কারবারীকে ডেকে পাঠালেন। বলে দিলেন সে যেন একই রকমের দুটি বাক্সে দুরকম মুক্তো আনে। একটায় থাকবে আসল, আর-একটায় নকল। সে তাই নিয়ে এল।

রাজা অন্ধের হাতে বাক্স দুটি তুলে দিলেন।

সে বাক্স দুটি একবার এ-হাত আর একবার ও-হাত করে নকলটি নামিয়ে রাখল। আসলটি হাতে রেখে বললে, 'মহারাজ, এই বাক্সে আসল মুক্তো আছে—'

দরবারের সবাই অবাক হয়ে গেলেন।

রাজা বললেন, 'তুমি আজ থেকে আমার মন্ত্রী হলে—'

এবার ঘোড়াশালা থেকে নিয়ে আসা হল সেরা ঘোড়াটি।

দ্বিতীয় অন্ধ ঘোড়ার গলা ঘাড় আর কোমর ছুঁয়ে ভালো করে পরখ করল। তারপর বললে, 'মহারাজ, এটা সেরা জাতের ঘোড়া নয়। আপনি ঠকেছেন—'



'ঠকেছি? বলো কী!'

তিনি তক্ষুনি ঘোড়ার কারবারীকে তলব করলেন। লোকটি ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ঘাড় নেড়ে বললে, 'মহারাজ, এ ঘোড়া আমি বিক্রি করিনি। এ অন্য ঘোড়া—'

তিনি ঘোড়াশালার তদারককারীকে ডেকে পাঠালেন। বেচারি কাঁপতে কাঁপতে দরবারে এল। সব শুনে সে রাজার পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'মহারাজ, ক্ষমা করুন। আমি লোভ সামলাতে পারিনি। ভালো ঘোড়াটিকে আমি বাড়ি নিয়ে গেছি। পরিবর্তে ওই ঘোড়াটা এনে রেখেছিলুম যাতে গুনতি ঠিক থাকে—'

'যাও।' রাজা বললেন, 'এবার তৃতীয় জনের কেরামতি দেখতে চাই। বলো, কী করতে হবে?'

'আজ্ঞে আপনার খাস দাসীকে ডেকে পাঠান—'

তাই হল। খাস দাসী এল।

'ওকে একটু হাঁটতে বলুন—'

দাসী হাঁটল।

'হুঁ।' সে বললে, 'তুমি একটি চোর। রাজার সম্পত্তি চুরি করেছ—'



'কখখনো না।' দাসী মুখিয়ে উঠল।

'তুমি চুল খুলে ফেল। তোমার খোঁপায় রাজার মুকুটের হিরে লুকোনো আছে। সত্যি কিনা দেখাও—'

দাসীর মুখ শুকিয়ে গেল। রাজার ভয়ে সে খোঁপা খুলতে বাধ্য হল কয়েকটি হিরে ঝরে পড়ল তার খোঁপা থেকে।

রাজা ঘোষণা করলেন, 'আজ থেকে তুমিও আমার মন্ত্রী হলে—

তারপর তিনি চতুর্থ অন্ধকে বললেন, 'দেখি, তুমি কীভাবে অসৎ পুরুষ বিচার করতে পার। বলো, কাকে ডাকব?'

চতুর্থ অন্ধ বললে, 'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার প্রধান মন্ত্রীকে ডাকুন—'

'প্রধানমন্ত্রী!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

প্রধানমন্ত্রীর আসন রাজার পাশেই। তিনি তখন সেই আসনে বসেছিলেন।

রাজা বললেন, 'তিনি এখানেই আছেন --'

'তাঁকে আমার সামনে দিয়ে হাঁটতে বলুন।'

প্রধানমন্ত্রী কয়েক পা হেঁটে আবার নিজের আসনে গিয়ে বসলেন।

'ছি ছি মন্ত্রীমশাই' সে বললে, 'যে রাজা আপনাকে এত ভালোবাসেন, আপনি কিনা তাঁকে হত্যা করার মতলব করেছেন?'

'কী! কী বললে?' মন্ত্রীমশাই তো রেগে টং।

'আমি দুঃখিত মন্ত্রীমশাই।' সে বললে, 'আপনি হাঁটার সময়েই আমি বুঝতে পেরেছি। আপনার কোটের পকেটে বিষের শিশি আছে। সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। রাজা জল খেতে চাইলে সেই পাত্রে বিষ ঢেলে দিতেন আজই। আপনার লোভ রাজার সিংহাসনের উপর—'

'মিথ্যে কথা। ডাহা মিথ্যে—' মন্ত্রীমশাই চিৎকার করে বলতে গেলেন। কিন্তু গলায় তেমন জোর ফুটল না।

তাঁর কোটের পকেট থেকে সত্যি একটা বিষের শিশি বেরুল।

তখন রাজা মন্ত্রীর ফাঁসির হুকুম দিলেন। আর অন্ধকে বললেন, 'তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে। তোমাকে আমি প্রধানমন্ত্রীর পদ দিলুম। আজ থেকে তুমি আমার প্রধানমন্ত্রী হলে—'

সেই থেকে সেই চার অন্ধ রাজার কাছেই থেকে গেল। রাজাকে নানাভাবে সাহায্য করতে লাগল। তাদের দিন সুখেই কাটাতে লাগল।

এক চাষা ও তার বউ



বড়বাঁকির গ্রামে এক চাষি বাস করত। তার ছিল এক কুঁড়ে বউ। কুঁড়ে বউ সব সময় শুয়ে-বসে থাকত। সে কুটোটি নাড়ত না। ঘরে-বাইরে সব কাজ করত ওই চাষি। বেচারি চাল বেঁধে নিয়ে মাঠে যেত। ইট সাজিয়ে উনুন তৈরি করত। কাঠ জ্বেলে সেই আগুনের উপর হাঁড়ি চড়াত। রান্না করত। তারপর খেয়ে নিয়ে সারাদিন ধরে মাঠে কাজ করত।



মাঠের কাজ করার পরও রেহাই ছিল না। বাড়ি ফিরে বউয়ের জন্য তাকে রান্না করতে হত। গোরুগুলোকে যত্ন করতে হত। কাজের একটু ভুলচুক হলে বউ একেবারে বাড়ি মাথায় করত। সে যত বলে, 'চুপ চুপ', বউ তত গলা চড়ায়। চেঁচামেচি শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। চাষি লজ্জায় মরে যায়।

সেজন্যে বউকে সে বেশি ঘাঁটায় না।

একদিন চাষি ঠিক করল, বউকে জব্দ করবে। ভোরবেলা সে ঘুম থেকে উঠল। হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে এল।

বউ জিজ্ঞেস করলে, 'আজ কোথাও যাওয়া আছে নাকি?'

'হ্যাঁ।' চাষি বললে, 'বেশ দূরে যাব। জরুরি কাজ। ফিরতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। তুমি ওঠো, আমার জন্যে চাপাটি করে দাও। খেয়ে রওনা হই—'

বউয়ের তক্ষুনি শরীর খারাপ হল।

সে করুণসুরে বললে, 'ওঃ। —উঃ' —আহ্ দ্যাখ গো, আমার কী ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। মরে যাচ্ছি। চাপাটিগুলো তুমি নিজেই তৈরি করে নাও না-গো। এমন কী শক্ত কাজ!'

'তা বটে!'— চাষি চেঁচামেচির ভয়ে কিছু বললে না। নিজেই লেগে গেল চাপাটি তৈরির কাজে। কয়েকটা চাপাটি বানিয়ে নিজের জন্যে রাখল। বাকিগুলো বউয়ের বিছানার কাছে রেখে দিয়ে বললে, 'চাপাটি আর আচার রইল। খেয়ে নিও—'

বউ কাতরাতে কাতরাতে বলল, 'আহা, তুমি আবার এসব হাঙ্গামা করতে গেলে কেন? তুমি তো জানো আমি অসুস্থ। সারাদিন বিছানায় পড়ে আছি। আমি কী করে খাব?'

'তা বলে তো উপোস করা চলে না', চাষি বললে, 'বেশি কিছু রাঁধতে পারলুম না। আচার দিয়ে যে-কটা চাপাটি পারো, খেয়ে নিও। আমি চলি—'

'কখন ফিরবে?'

'ঠিক বলতে পারছি না। তবে সন্ধের আগে নয়। যেতে আসতে অনেকটা পথ। কাজ শেষ না করে তো আসতে পারি না—'

'তা ঠিক।'

'আসি—'

চাষি ঘর থেকে বেরুল আর বউ বিছানা থেকে উঠল। রোজই তাই করে। তারপর ভালো করে চান করল। কর্তার হাতের তৈরি চাপাটি তার পছন্দ নয়। কেমন শক্ত শক্ত। সে গম-পেষাই-করা আটা বার করল। তাতে নুন আর অনেকখানি মাখন মেশাল। ঠেসে ঠেসে নরম করল আটাটা। তারপর আটার মধ্যে পুর দিয়ে চাপাটি বানাতে লাগল। দুধ ফোটাল ঘন করে। শেষে আচারের বাটিটা আর দুধের বাটি টেনে নিয়ে জুত করে খেতে বসল বউ।



চাষি কিন্তু বাইরে কোথাও যায়নি। সে ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিল চুপটি করে। দেখছিল বউয়ের কাণ্ডকারখানা। বউ যখন তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে তখন সে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

বউয়ের মুখের কাছে গ্রাস। সে পেছন ফিরে বসেছিল। দেখতে পায়নি। জিজ্ঞেস করল, 'কে ওখানে?'

চাষি সামনে এগিয়ে আসে। বলে, 'আমি—'

বউ তাকে দেখে হতভম্ব।

সে তার অস্বস্তি চেপে রেখে বললে, 'তুমি তো বলেছিলে সন্ধের আগে ফিরবে না। হঠাৎ এত তাড়াতাড়ি—'

'পথে যেতে যেতে দেখি', চাষি উত্তর তৈরি করে রেখেছিল, 'একটা সাপ ডানদিক থেকে বাঁদিকে চলে গেল। লক্ষণ শুভ নয়। তাই ফিরে এলাম।'

'বেশ করেছ। তা সাপটা কত মোটা ছিল?'

'ঠিক যতখানি মোটা তোমার হাতের তৈরি ওই চাপাটি—'

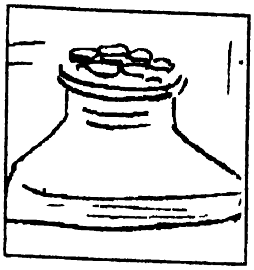
'কত জোরে ছুটছিল?'

'যত জোরে তুমি আটা ঠাসছিলে—'

বউ বুঝতে পারল, চাষি সবই দেখেছে। ধরে ফেলেছে তার কুঁড়েমি হল ছল। সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, চাষি ততক্ষণে ঘরের কোণ থেকে তুলে নিয়েছে একটা পাচনবাড়ি। এবার পাচনবাড়ি পড়বে বউয়ের পিঠে। বউ তাড়াতাড়ি পাচনবাড়িটা কেড়ে নিলে স্বামীর হাত থেকে।

বললে, 'রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি। এবার থেকে ঘরের সব কাজ আমি করব। আমার অসুখ সেরে গেছে—'

কে বিশ্বাস করে



আলমোড়া জেলায় যোগীন্দর আর মণিন্দর নামে দুই ভাই বাস করত। দুই ভাই মিলে একটা বাড়ি তৈরি করেছিল। এক ভাগে থাকত বড়ো ভাই, আর এক ভাগে থাকত ছোটো ভাই। তাদের কিছু জমি ছিল আর গোরু-ছাগল। বড়ো ভাই যোগীন্দর খুব খাটত আর শক্ত শক্ত কাজগুলো করত। ছোটোভাই মণিন্দর ঠিক উলটো। সে খুব কুঁড়ে, কাজেকর্মে ভীষণ ঢিলে, সব সময় বসে আছে কিংবা শুয়ে। তার এই বিচ্ছিরি কুঁড়েমি দেখে তার বউ প্রায়ই টিটকারি দিত। মণিন্দর পরোয়াই করত না।



মণিন্দর বলত, 'তুমি মিছেই আমাকে বকাবকি কর। আমি বিশ্বাস করি, সবই ওই ভগবানের ইচ্ছে। তিনি ইচ্ছে করলে ছাদ ফুঁড়ে ধন দৌলত নেমে আসে—'

'কচু!' তার বউ বলত, 'কুঁড়ে মানুষকে ভগবান কিচ্ছু দেয় না। ধন্যি মানুষ যা-হোক!'

একদিন সে জঙ্গলে গোরু চরাতে গিয়েছিল। কচি ঘাস খেতে খেতে গোরুর পাল এদিক-ওদিক ছিটকে গেছে। তাদের খুঁজতে গিয়ে এক জায়গায় মণিন্দরের বউ দেখল, ঘাসের চাপড়া উঠিয়ে কী-একটা মাটি-চাপা দেওয়া হয়েছে। তার কৌতূহল হল। সে কাস্তে দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। কিছুটা খোঁড়ার পর শক্ত মতন কী-যেন ঠেকল কাস্তের ডগায়। সে আরও খুঁড়ল। খুঁড়তে খুঁড়তে সে একটা ধাতুর তৈরি ঘড়া দেখতে পেল। ঘড়ার মুখ মাটি দিয়ে বন্ধ করা আর তার উপর কচি পাতা সমেত গাছের ছোটো ছোটো ডাল পুঁতে দেওয়া হয়েছে। পাতা আর মাটি সরিয়ে মণিন্দরের বউ দেখল, ঘড়া ভর্তি-মোহর। বেশ ভারি। একা বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। সে ফের ঘড়াটাকে মাটি চাপা দিলে।



মণিন্দরের বউ দৌড়ে বাড়ি চলে এল। স্বামীকে ঝাঁকানি দিয়ে বললে, 'ওগো শিগগির চল। জঙ্গলে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি। এক ঘড়া মোহর। চল, দুজনে ধরাধরি করে নিয়ে আসি—'

মণিন্দর উৎসাহ বোধ করল না। সে বললে, 'গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছ, ভালো কথা। কিন্তু চোরের মতন লুকিয়ে বয়ে নিয়ে আসব কেন? ওটা যদি আমাদের ভাগ্যে থাকে তাহলে ঈশ্বর নিশ্চয় আমাদের দেবেন।'

'উঃ! কী-রকম বোকা লোককে নিয়ে ঘর করছি আমি—'

রেগে, স্বামীকে সে আরও দু-চার কথা শোনাল। তারপর চলে গেল বড়ো বউয়ের কাছে। বড়ো বউকে সে সব কথা বললে। বড়ো বউ বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে তক্ষুনি রাজি না হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে নিলে জায়গাটা ঠিক কোথায়।

সব জেনে নিয়ে বড়ো বউ বললে, 'তুই বড্ড ছটফট করছিস। অবশ্য ছটফট করারই কথা। কিন্তু ভেবে দেখেছিস কী, এখন রাত্তির বেলা, অন্ধকার। এখন দুজনে ধরাধরি করে ঘড়া বয়ে আনলে রাস্তায় নিশ্চয় চোর-ডাকাতের কবলে পড়ে যাব। তার চেয়ে কাল ভোরবেলা গেলে কোনো বিপদ থাকে না। তা, তুই কী বলিস?'

'হুঁ। তুমি ঠিকই বলেছ দিদি।' মণিন্দরের বউ বললে, 'তাই হোক, কাল ভোরেই যাওয়া যাবে—'

মণিন্দরের বউ বাড়ি ফিরে এল।

বড়ো বউ যখন বুঝতে পারল ছোটো বউ খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তখন সে স্বামীকে জাগাল। আচমকা জেগে যোগীন্দর চেঁচিয়ে উঠল, 'কী? কী হয়েছে গো?'

বড়ো বউ বললে, 'আস্তে—'

ছোটো বউয়ের কাছে শোনা গুপ্তধনের কাহিনী সে সবিস্তারে স্বামীকে শোনাল।

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ গো। বলছি কী তবে? এখনই যাওয়া দরকার। এস আমার সঙ্গে—'

বউ তাকে টেনে নিয়ে চলল জঙ্গলে পথে। পৌঁছে গেল গুপ্তধনের জায়গায়। মাটি খোঁড়া ছিল বলে চিনতে অসুবিধা হল না। তখনও চাঁদ অস্ত যায়নি। আবছা আলোয় তারা দ্রুত মাটি খুঁড়তে লাগল। পেয়ে গেল ঘড়াটা। দুজনে টেনে তুলল উপরে। ডালপালা সরাল। ঘড়ার মুখের মাটি সরাতেই এক ঝাঁক মৌমাছি ছাড়া পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের চোখে-মুখে। হুলের জ্বালায় ওরা হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। 'বাপরে মারে' বলে চেঁচাতে লাগল। ওদের সারা শরীর জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে।

যোগীন্দর গা চুলকাতে চুলকাতে রেগে বললে, 'এ নিশ্চয়ই ছোটো বউয়ের রসিকতা। গুপ্তধন না ঘোড়ার ডিম। আসলে এটা মৌমাছির চাক। উ-রে বাপস্—'

সে চেঁচাতে চেঁচাতে বোঁ-বোঁ করে হাত ঘোরাতে লাগল মুখের সামনে। ঝাঁক ঝাঁক মৌমাছি উড়ছিল। তার বউও চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

'দারুণ শয়তান মেয়ে তো!' বড়ো বউয়ের মুখ ফুলে গেছে, জ্বালা করছিল খুব। সে দাঁত কিড়মিড় করে বললে, 'দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি। ওগো, ঘড়ার মুখটা ভালো করে বাঁধো দেখি আমার এই ছোটো চাদরটা দিয়ে। বেঁধেছ? বেশ। ওটা নিয়ে চল এবার—'

ওদের কীভাবে জব্দ করা যায় ভাবতে ভাবতে ওরা বাড়িতে ফিরে এল। মণিন্দরের ঘরের দরজা বন্ধ। নিশুতি রাত। সবাই ঘুমুচ্ছে। ওরা ছাদে উঠল। সেখানে চিমনি ছিল। ঠিক মণিন্দরের ঘরের মাঝখানে। ওরা



সেই চিমনির মুখে ঘড়ার ঢাকনা খুলে দিলে। মৌমাছির ঝাঁক চিমনির ভেতব দিয়ে ঘরে ঢুকে ওদেব কামড়াবে— এই ছিল মতলব। কিন্তু ঢাকনা খোলা পেয়ে মৌমাছির ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে দেখে, ওরা তাড়াতাড়ি পুরো ঘড়াটাই উপুড় করে দিলে। তখন ঘড়া থেকে রাশি রাশি মোহর পড়তে লাগল। ঘরের মেঝেতে ঝনঝন শব্দ। মণিন্দর আর ওর বউয়ের ঘুম ভেঙে গেল।

মণিন্দরের বউ একেবারে তাজ্জব। এ কী কাণ্ড! ঘরের ভেতর মোহরের বিষ্টি হচ্ছে যেন!

'ওগুলো তুলে সিন্দুকে রাখো—'

মণিন্দর বললে।

ওরে বউয়ের হুঁস ফিরে এল। সে সিন্দুক খুলে তাড়াতাড়ি মোহরগুলো ভরতে লাগল।

স্ত্রীর ব্যস্ততা দেখে মণিন্দর বললে, 'দেখছ তো! আমি কী বলেছিলুম— ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন তাহলে ছাদ ফুঁড়ে দৌলত নেমে আসে। হল তো?'

বউ মোহর কুড়োতে কুড়োতে বললে, 'হুঁ—'



পঞ্জাব

ভাই ভাই



এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল দুটি ছেলে।

ছেলে দুটি গুরুর কাছে রাজপুত্রের শিক্ষণীয় সবকিছু শিখল।

কিন্তু তারা বড়ো-সড়ো হওয়ার আগেই তাদের মা মারা গেলেন; তখন রাজা আবার বিয়ে করে একজন নতুন রানিকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন।

সৎ-মা রাজপুত্রদের একেবারেই দেখতে পারত না, সবসময় তাদের হিংসা করত— সৎ-মারা যেমনটা হয়। সে তাদের গমের চাপাটির বদলে বাজরার রুটি খেতে দিত। তাদের খাবারে নুন দিত না। বরং পরে কখনো কখনো খাবারে তেতো কিছু মিশিয়েও খেতে দিত।

ছেলে দুটি প্রতিবাদ করলে রানি তাদের ভর্ৎসনা করে বলত: গোল্লায় যাও।



যখন তারা বাবার কাছে প্রতিবাদ করত, রাজা রেগেমেগে তাদের বেধড়ক পিটুনি দিতেন. নতুন রানির নিন্দে তিনি সইতে পারতেন না।

রাজপুত্রদের প্রায় রোজই রানির গালমন্দ আর রাজার পিটুনি চুপ করে সয়ে যেতে হত।

একদিন বিকেলবেলা রাজপুত্রেরা নিজেদের ঘরে বসে কথাবার্তা বলছিল। সেই সময় ছোটো-ভাই দাদাকে বলল: চল, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। আমরা নিজেরাই আমাদের খাবার জোগাড় করে নেব। তাহলে আমরা এই জেলখানা থেকে মুক্তি পাব, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারব।

দাদাটার এ-কাজে তেমন সায় ছিল না। কেননা সে মনে জানত— একদিন সে-ই রাজা হবে। অবিশ্যি শেষমেশ ভাইয়ের প্রস্তাবে সেও রাজি হল এবং বলল: তাহলে চল, আজ রাত্রেই পালিয়ে যাই।

ছোটো-ভাই বলল: না, আমরা রাত্রের

খাবার খেয়ে কাল যাব। তুমি কি ওই প্রবাদটা জান না?—'খালি পেটে কখনো পথ চলতে নেই।'

পরদিন সকালবেলা, দুই ভাই অন্যদিনের চেয়ে বেশি খেল, পেট পুরে ঠাসাঠাসি করে খেল; তারপর তারা আস্তাবলের সহিসদের ছদ্মবেশে সাজাল নিজেদের এবং দুটো ঘোড়ার পিঠে চেপে সুযোগ মতো রাজপুরীর পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে রাজপুরী থেকে পালিয়ে গেল।

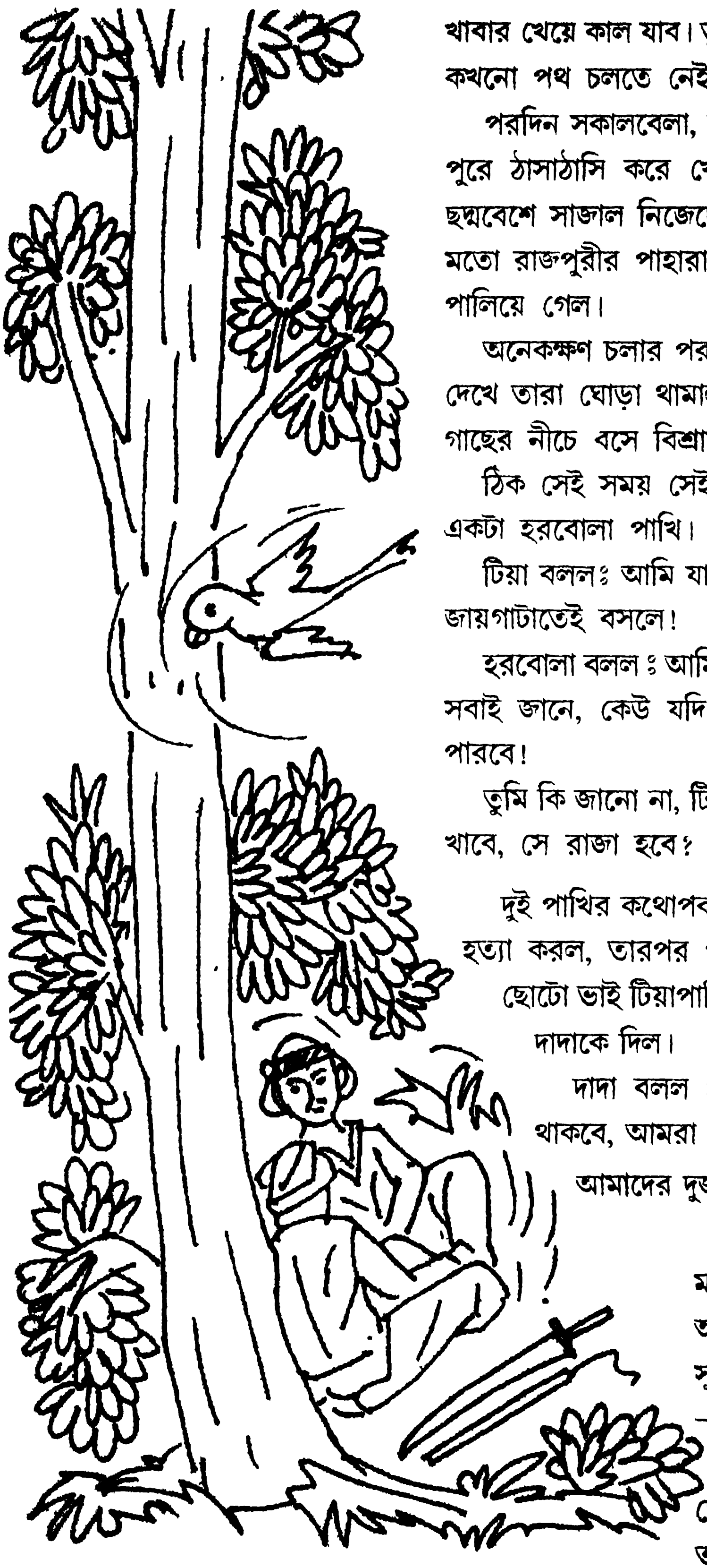
অনেকক্ষণ চলার পর, একটা নির্জন ফাঁকা ঊষর পাহাড়ি জায়গা দেখে তারা ঘোড়া থামাল, ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে একটা অশ্বত্থ গাছের নীচে বসে বিশ্রাম নিতে লাগল।

ঠিক সেই সময় সেই গাছে উড়ে এসে বসল একটা টিয়া আর একটা হরবোলা পাখি।

টিয়া বলল: আমি যার উপর বসতে চেয়েছিলাম, তুমি ঠিক সেই জায়গাটাতেই বসলে!

হরবোলা বলল: আমি তোমার চেয়ে উঁচুদরের লোক,—এইজন্যে। সবাই জানে, কেউ যদি আমায় খায়, তাহলে সে প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে!

তুমি কি জানো না, টিয়াপাখি বলল: লোকে বলে— যে আমাকে খাবে, সে রাজা হবে?



দুই পাখির কথোপকথন শুনে দুই ভাই পাখি দুটোকে তির মেরে হত্যা করল, তারপর পালক ছাড়িয়ে তাদের মাংস রান্না করল। ছোটো ভাই টিয়াপাখির মাংস খেতে অসম্মত হল, সে সেই মাংস দাদাকে দিল।

দাদা বলল: যেহেতু, যতদিন আমাদের সৎ-মা বেঁচে থাকবে, আমরা কেউ রাজা বা মন্ত্রী হতে পারব না, সেহেতু আমাদের দুজনেরই এই মাংস ভাগ করে খাওয়া উচিত।

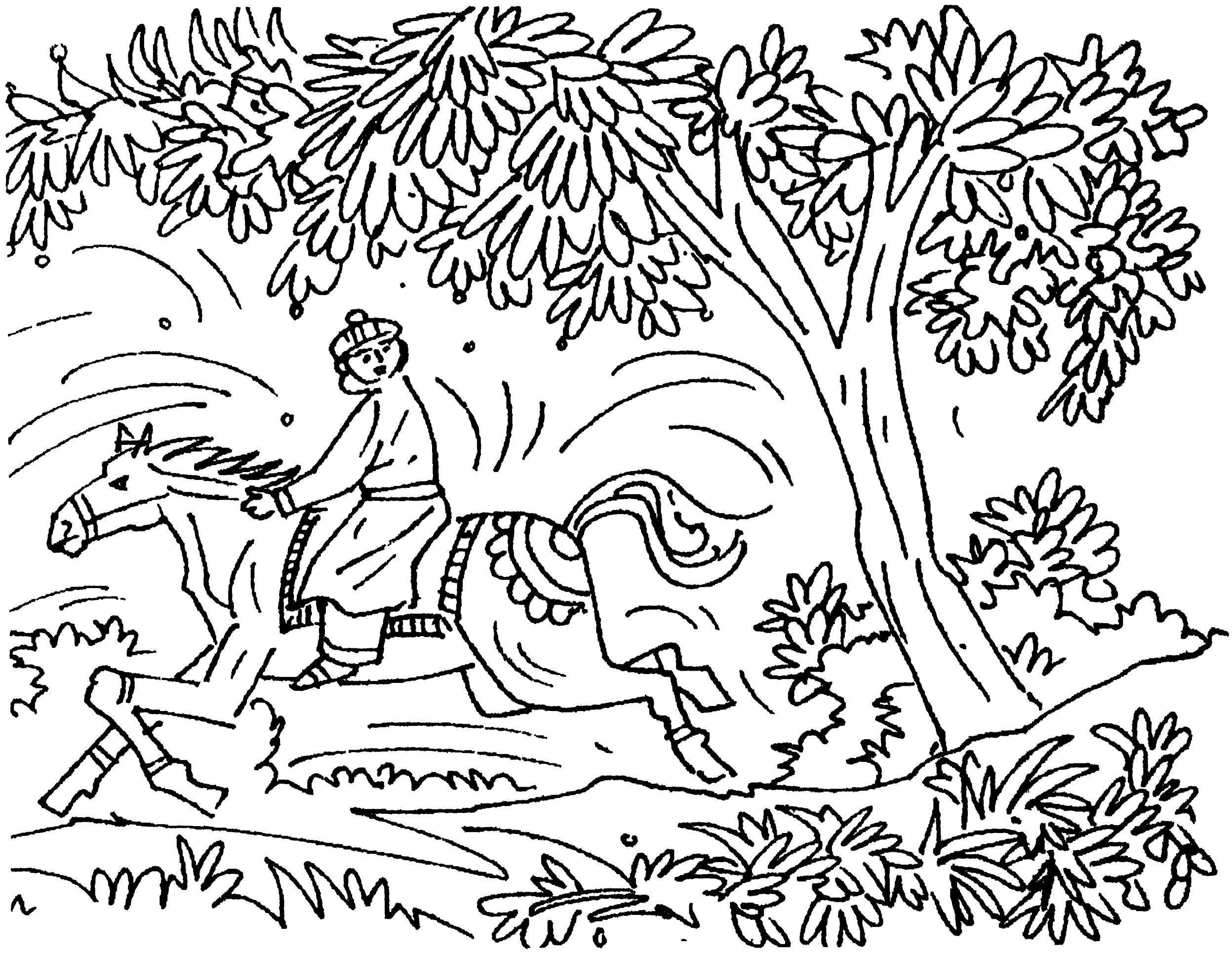
ছোটো ভাই বলল: আমাদের সৎ-মা মরতেও পারে। সেক্ষেত্রে, যেহেতু আমি ছোটো, আমার রাজা হওয়ার কোনো অধিকার নেই। সুতরাং টিয়ার মাংস তোমারই খাওয়া উচিত, — কেননা তুমিই বড়ো-ভাই।

তখন বড়ো-ভাই টিয়ার মাংস খেল আর ছোটো-ভাই খেল হরবোলার মাংস। তারপর তারা ঘোড়ায় চেপে আবার চলতে শুরু করল।

কিছুদূর গিয়ে বড়ো-ভাই দেখল চাবুকটাই নেই, বোধহয় অশ্বত্থ গাছের নীচেই ফেলে এসেছে। তাই সে ফিরে গিয়ে সেটা নিয়ে আসতে চাইল। তাতে ছোটো-ভাই বলল : তুমি রাজা, আমি তোমার প্রধানমন্ত্রী। কাজেই আমারই উচিত চাবুকটা নিয়ে এসে তোমায় দেওয়া।

ছোটো-ভাই ঘোড়ায় চেপে আবার আগের জায়গায় ফিরে এল।

গাছটার কাছে পৌঁছে সে দেখতে পেল— একটা বিশাল অজগর সাপ গাছের গোড়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে। সে মনে মনে ভাবল চাবুকটা কুড়িয়ে নিয়েই দৌড় লাগাবে। কিন্তু সাপটা দেখামাত্র বিশাল হাঁ-এর মধ্যে এক নিমেষে তাকে গিলে নিল এবং উগরেও ফেলল কিছুক্ষণের মধ্যে।



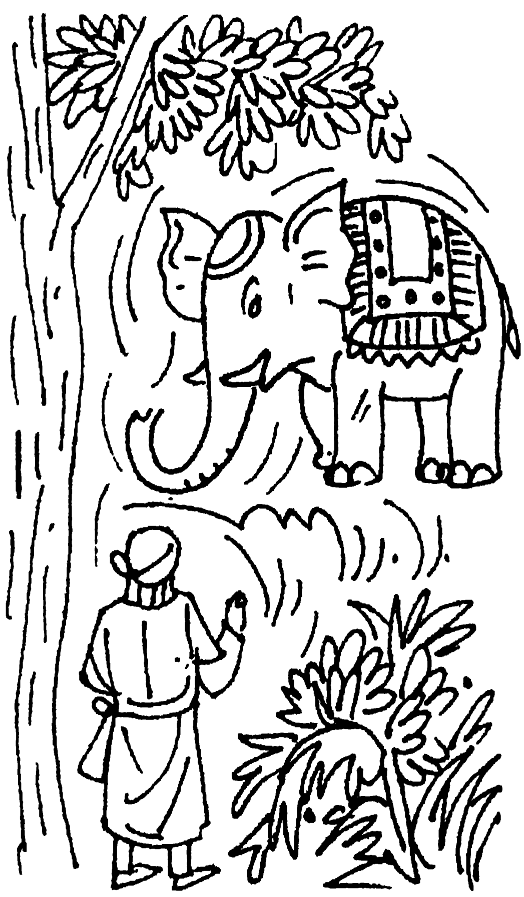
বড়ো-ভাই ভাইয়ের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়েই আছে। ভাই আসে না। এইভাবে বিকেল হয়ে গেল। তখন সে ভাবল— ভাই হয়তো অন্য পথ দিয়ে নিকটবর্তী শহরে চলে গেছে। তারপর সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে শহরে পৌঁছে গেল। সেখানে পৌঁছে সে দেখতে পেল সেখানকার লোকেরা খুব বিষণ্ণ আর দুঃখিতভাবে পরস্পর কী-সব বলাবলি করছে।

কী ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করে সে জানতে পারল ওই রাজ্যের রাজার মৃত্যু হয়েছে। সেখানকার নিয়ম এই, রাজধানীর সব লোক এক পবিত্র সাদা হাতির সম্মুখে মার্চ করে এগিয়ে যাবে। তখন হাতি-মহাশয় তাদের মধ্যে যাকে পছন্দ, তাকেই সেই রাজ্যের রাজা হিসাবে নির্বাচন করবে।

কিন্তু যদিও রাজধানীর সব প্রজা হাতির সম্মুখে মার্চ করে এগিয়ে গিয়েছিল, হাতি-মহাশয় তাদের কাউকেই রাজা হওয়ার যোগ্য বলে অনুমোদন করেনি। তখন নগরবাসীরা ঠিক করেছে হঠাৎ যদি কোনো আগন্তুক এসে হাজির হয়, তাকেই ওই 'ধর্মের হাতি'র কাছে নিয়ে যাওয়া হবে।

'তুমি একজন আগন্তুক, সুতরাং তোমাকেই আমাদের সঙ্গে হাতির কাছে আসতে হবে,' ভিড়ের মধ্যে কে একজন রাজপুত্রকে এই কথা বলল।

রাজপুত্র তার কথায় সম্মত হল।



তারপর কী হল? যেই-না রাজপুত্র হাতির দিকে এগিয়ে গেল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে হাতি-মহাশয় রাজপুত্রের সামনে নত-মস্তক হয়ে বসে পড়ল, রাজপুত্রকে 'স্যালুট' করার ভঙ্গিতে তার শুঁড়টা নাড়তে লাগল এবং শুঁড়ে করে তাকে তুলে নতুন রাজা হিসাবে হাওদার উপর বসিয়ে দিল।

সেই চরম আনন্দের মুহূর্তে রাজপুত্রের ছোটো ভাইয়ের কথা বড়ো বেশি করে মনে পড়ল।

বহুদিন সে ভাইয়ের প্রতীক্ষায় থাকল— এই বুঝি ভাই এসে পড়ে। কিন্তু মাসের পর মাস চলে গেল। ভাই এল না। কাজে কাজেই বাধ্য হয়ে নতুন রাজাকে তার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অন্য একজনকে নিয়োগ করতে হল।

এদিকে, এক জাদুকর আর তার স্ত্রী কাছাকাছি একটি ঝরনা থেকে জল নিয়ে আসার জন্যে সেই অশ্বত্থ গাছের কাছে এসে উপস্থিত হল।

জাদুকরের স্ত্রী দেখতে পেল একজন রাজপুত্র মৃত অবস্থায় গাছের নীচে পড়ে আছে। তার মনে হল— জীবনে ইতিপূর্বে সে এমন রূপবান যুবক আর কখনো দেখেনি।

'তুমি যে বল,— আমি মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি,' সে তার স্বামীকে বলল, 'কই, এই রাজপুত্রকে বাঁচাও তো, দেখি।'

রাজপুত্রের রূপের প্রশংসা করায় সেই জাদুকর তার স্ত্রীর উপর কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তাই সে স্ত্রীর কথার উত্তর দিল না, হাত নাড়িয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল।

তখন তার স্ত্রী বিদ্রূপ করে বলল ঃ তুমি নিজে যদি এই রাজপুত্রকে না বাঁচাতে পার, আমি অন্য কোনো জাদুকরকে দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে তুলব।

স্ত্রীর বিদ্রুপে জাদুকর বেশ তেতে উঠল, বলল ঃ যাও, এই পাত্রটায় জল ভরে নিয়ে এসো।

তখন জাদুকরের স্ত্রীর পাত্রটায় জল ভরে আনতে ঝরনার ধারে গেল, কিন্তু গিয়ে দেখল ঝরনায় এক ফোঁটাও জল নেই।

'এদিকে এসো,' জাদুকর বলল, 'দেখো— আমি কী করি।'

সেই অজগরটা এবং তার পরিবার ঝরনার ধারেই ছিল। জল বিহনে তারাও তিনদিন যাবৎ তৃষ্ণার্ত হয়ে ধুঁকছে।

জাদুকরকে দেখে সেই অজগর তাকে বলল, সে যদি মন্ত্রগুণে ঝরনায় জল নিয়ে আসতে পারে, তবে অজগরও মৃত রাজপুত্রকে পুনর্জীবন দান করবে।

জাদুকর ঝরনাকে আদেশ করতেই ঝরনা অজস্র জল নিয়ে এল।

এদিকে রাজপুত্রও পুনর্জীবন লাভ করল। সে ভাবল একটা লম্বা ঘুম থেকে সে যেন এইমাত্র জেগে উঠেছে।

হঠাৎ তার মনে পড়ল তার দাদা বুঝি এখনো তার জন্যে অপেক্ষা করছে। এই ভেবে সে চাবুকটা তুলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল এবং ঘোড়াটাকে দ্রুতবেগে ছোটাতে লাগল।

তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ছোটো রাজপুত্র— দাদা যে পথে গেছে সে পথে না গিয়ে ভুল পথে চলতে লাগল; এবং সে এমন একটি শহরে এসে পৌঁছল, যেটি তার দাদার রাজধানী থেকে অনেক দূরে।

সে খুবই ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার পকেটে একটা পয়সাও ছিল না। একজন বৃদ্ধা মেষপালিকাকে দেখে সে বলল ঃ

'মা, তুমি যদি আমাকে দুটো কিছু খেতে দাও, তাহলে আমি তোমাকে আমার ঘোড়াটা দিয়ে দেব'

বৃদ্ধা মেষপালিকা রাজি হয়ে গেল। রাজপুত্রকে তার বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাদ্য আর আশ্রয় দুইই দিল।

একদিন কী দুদিন পরে, রাজপুত্র দেখল বৃদ্ধা খুব বিষণ্ণ মুখে কী যেন ভাবছে! সে জিজ্ঞাসা করল '

মা, তুমি কীসের জন্য দুর্ভাবনা করছ?'

বৃদ্ধা বলল '

'বাছা, এই রাজ্যে এক ডাইনি আছে। রোজ তার খাওয়ার জন্যে একজন হৃষ্টপুষ্ট যুবক, একটা ভেড়া আর একটা রুটি তাকে জোগান দিতে হয়। যখন এসব খাবার সে পায়, তখন গাঁয়ের লোক সুখে-শান্তিতে বাস করে। নচেৎ তার উপদ্রবে গাঁয়ে বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। আজ আমার পালা পড়েছে, তাকে এইসব আমাকেই জোগান দিতে হবে।'

'তাহলে সবাই মিলে ওই ডাইনিকে মারে না কেন?' রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করল।

'অনেকেই চেষ্টা করেছে', বুড়ি বলল, 'কিন্তু কেউ মারতে পারে নি। এই রাজ্যের রাজা ঘোষণা করেছেন, যে এই ডাইনিকে মারতে পারবে, তিনি তাকে অর্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা দান করবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ ওই ডাইনির কোনো ক্ষতিই করতে পারেনি।' এই বলে বুড়ি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

'মা, কেঁদো না। আমিই ওই ডাইনিকে মারব।' রাজপুত্র বলল।

'কিন্তু বাছা, আমি চাই না তোমার মতো একজন সুন্দর যুবক এরকম ভয়ঙ্কর একটা ঝুঁকি নেয়।' বৃদ্ধা বলল।

রাজপুত্র তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল ঃ

'মাগো, তুমি আমাকে একটা বড়োসড়ো রুটি বানিয়ে দাও। আর তোমার ছাগলের পাল থেকে বেছে মোটাসোটা দেখে একটা ছাগল এনে দাও।'

বুড়ি রাজপুত্রকে একটা বিশাল আকারের রুটি তৈরি করে দিল, আর একটা ছাগলও দিল।

সেগুলো নিয়ে রাজপুত্র গাছের কাছে গেল এবং গাছের নীচে রুটিটা রেখে একটু দূরে আর একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই এক ভয়ঙ্করী ডাইনি এসে হাজির! আগে যেমনটা হয়েছে, তেমনি সে প্রথমে ছাগল আর রুটিটাকে খেতে এগিয়ে গেল।

যখন সে খাওয়া শেষ করে এনে যুবক রাজপুত্রের দিকে লোভের চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছে, সেই মুহূর্তে রাজপুত্র উঠে দাঁড়াল, কোষ থেকে বিরাট তরোয়ালখানা বের করে ডাইনির দিকে এগিয়ে গেল।

তারপর সেকি কাণ্ড! কী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ!

ডাইনির লম্বা লম্বা হাত, বিশাল দেহ। সে রাজপুত্রকে প্রায় হারিয়েই বসেছিল। কেবল, ডাইনিটা ইতিপূর্বে একটা বিরাট ছাগল আর রুটি গিলে বসে আছে, তাই সে রাজপুত্রকে ঠিকমতো কবজা করতে পারছিল না। রাজপুত্র হঠাৎ তার পেটের মধ্যে আস্ত তরোয়ালটাই চালিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাইনি তার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। পতন এবং মৃত্যু।

তখন রাজপুত্র তার মাথাটা কেটে নিল। তারপর একটা কাপড়ের মধ্যে সেটা বেঁধে ফেলল। রাজপুত্র ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই ভাবল— বাড়ি ফেরার আগে সে গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবে।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে সে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল।

এক ঝাড়ুদার রোজ ডাইনির বাড়িতে এসে ডাইনির খাওয়ার পর পড়ে-থাকা হাড়গোড়, মাথার খুলি ইত্যাদি এবং টুকরো টাকরা যা পড়ে থাকত— ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে যেত। কিন্তু আজ সে দেখতে পেল অন্যদিনের তুলনায় আবর্জনা অনেক কম। ব্যাপার কী? সে খুব বিস্মিত হয়ে চারদিকে তাকাতে দেখতে পেল— এক সুন্দর রূপবান যুবক গাছতলায় ঘুমিয়ে আছে, ডাইনির মৃতদেহটা পড়ে আছে তারই পাশে।

সে রাজপুত্রকে জাগাতে চেষ্টা করল।

কিন্তু রাজপুত্র এতই নিদ্রাচ্ছন্ন যে সে কিছুতেই তাকে জাগাতে পারল না।

তখন ঝাড়ুদার রাজপুত্রকে একটা গর্তের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে রেখে চলে গেল।

তারপর সে ডাইনির মাথার খুলিটা নিয়ে রাজার কাছে গিয়ে হাজির হল এবং ডাইনিকে হত্যা করার পুরস্কারস্বরূপ রাজার কাছে রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব দাবি করে বসল।

কিন্তু রাজা ঝাড়ুদারের গল্প বিশ্বাস করলেন না। অথচ উপায়ই বা কী! তিনি নিজেই যখন প্রতিজ্ঞা করেছেন, তখন প্রতিজ্ঞা-পূরণও তাঁকেই করতে হবে। কাজেই, তিনি ঝাড়ুদারকে তাঁর রাজ্যের অর্ধেক অংশ দান করলেন, কিন্তু কিছুতেই তার হাতে রাজকন্যাকে দান করতে পারলেন না। তিনি ঝাড়ুদারকে বললেন : 'রাজকন্যা বিয়ের আগে এক বছর ধরে একটা ব্রত করবে, ততদিন সে কাউকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করবে না।'

ঝাড়ুদার অর্ধেক রাজ্যের রাজা হয়ে সুখে রাজত্ব করতে লাগল। এইভাবে একটা বছর পার হয়েও গেল। তখন সে রাজকন্যাকে বিয়ে করার জন্য উদ্যোগ করতে লাগল এবং সেই মর্মে রাজার কাছে খবরও পাঠিয়ে দিল।

এদিকে ঝাড়ুদার যে জায়গাটায় রাজপুত্রকে পুঁতে রেখে গিয়েছিল, সেখানে নরম মাটি সংগ্রহ করতে এল কজন কুমোর। তারা মাটির চাপড়া সরিয়েই রাজপুত্রকে দেখতে পেল। তখনও রাজপুত্রের শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। তারা রাজপুত্রকে বাড়ি নিয়ে গেল। তাদের বাড়ির মেয়েরা সেবা-শুশ্রূষা করে অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজপুত্রের জ্ঞান ফিরিয়ে আনল।

চেতনা ফিরে পেয়ে রাজপুত্র বুঝতে পারল, ঝাড়ুদার মিথ্যে কথা রটিয়ে বেড়িয়েছে যে সেই ডাইনিকে হত্যা করেছে।

কিন্তু রাজপুত্রের কোনো সাক্ষী নেই। তার কথা কে বিশ্বাস করবে! তাই সে কুমোরদের কাছে মাটির জিনিসপত্র তৈরির কাজে শিক্ষানবিশি শুরু করল এবং অল্পদিনের মধ্যে সে একজন পাকা কারিগর হয়ে উঠল।



এদিকে চারদিকে রাজপুত্রের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে সবাই জানল যে সে-ই ডাইনিকে হত্যা করেছে. ঝাড়ুদার মিথ্যে কথা প্রচার করে বেড়িয়েছে যে সে ডাইনিকে হত্যা করেছে।

ঝাড়ুদার-রাজা প্রমাদ গণল এবং স্থির করল--- রাজপুত্রকে রাজ্য থেকে তাড়াতে হবে। সে আদেশ জারি করল--- দেশের সব মাটি রাজার সম্পত্তি, কোনো কুমোর সেই মাটি নিয়ে কাজ করতে পারবে না।

কাজে কাজেই রাজপুত্রকে নিয়ে সেই কুমোর এবং তার পরিবার কাছাকাছি একটা পাহাড়ি জায়গায় চলে গেল, এবং সেখানেই তারা একটা কেল্লা বানিয়ে বাস করতে লাগল।

রাজপুত্র দেখল ঢালু পাহাড়ি জায়গায় চমৎকার একটা কুমোরশালা বসানো যায়। সেখানেই সে মাটি খুঁড়ে হাঁড়ি কলসি বানাবার উপযুক্ত নরম মাটি আবিষ্কার করল। কাছাকাছি একটা ঝরনা ছিল। সেখান থেকে জল টেনে এনে সে কাজ আরম্ভ করল। অল্পদিনের মধ্যে সেখানে সে একটা চমৎকার বাগানও তৈরি করে ফেলল। সেই বাগানের জন্যে কুমোর পরিবার হাজার হাজার ফুলের চারা-বসানোর টব তৈরি করল। কাছাকাছি গ্রাম থেকে লোকেরা সেই বাগানে এসে ভিড় করতে লাগল। অল্পদিনের মধ্যেই কুমোর-পরিবার বেশ অবস্থাপন্ন হয়ে উঠল।

একদিন সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী সপরিবারে বনভোজনের জন্য সেই বাগানে এলেন। মন্ত্রীমহোদয়ের কন্যা বাগানে ফুলের আর ফলের গাছগুলো দেখে খুব খুশি হল। তার আরো ভালো লাগল বাগানের পরিবেশ,-- অদূরে ঝরনা, নীল আকাশে পায়রা উড়ে বেড়াচ্ছে, মৌমাছিরা গান গেয়ে ফুলে ফুলে মধু খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং সে বাবাকে বলল, বারবার সে এখানে বেড়াতে আসতে চায়।

পরের বার এসে মন্ত্রীকন্যা আরো খুশি হল-- ঝরনার দিকে বেড়াতে গিয়ে তার নজরে পড়ল— একজন সুদর্শন যুবক ঝরনার ধারে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে।

সে এগিয়ে যেতে সেই যুবক মুখ তুলে চাইল, তার মুখ ভারি বিষণ্ণ, —একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে চলে গেল।

মন্ত্রীকন্যা এই অপরিচিত সুন্দর যুবকের প্রেমে পড়ে গেল। বাড়ি ফিরে এসে সে বাবাকে বলল ঃ পাহাড়ের বাগানে ঝরনার ধারে বসে যে যুবকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছিল, যতদিন পর্যন্ত মন্ত্রী তার সঙ্গে তার বিয়ে না দেবেন, ততদিন সে কিচ্ছু খাবে না, এমন কী জলপানও করবে না।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর লোক পাঠালেন— সেই যুবক কে তা জানতে'

মন্ত্রীর লোকেরা সেই যুবকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানতে পারল, সে-ই সে-ব্যক্তি যে ডাইনিকে হত্যা করেছে।

মন্ত্রীর ভয় হল, এখন ওই যুবক যদি এই দাবির বশে অর্ধেক রাজত্ব পেয়ে যায় তাহলে তিনি তাঁর চাকুরিটাই হারিয়ে বসবেন। অথচ তিনি তাঁর কন্যার ইচ্ছা পূরণ না করলে সেও হয়তো অনাহারে উপবাসে প্রাণত্যাগই করে বসবে! শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিক করলেন ওই যুবকের সঙ্গেই তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন। তারপর মেয়ে আর জামাইকে নৌকাপথে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে পাঠাবেন কোনো দূর দেশে এবং একদিন রাত্রিবেলা তাঁর লোকজন জামাইকে জলে ঠেলে ফেলে দেবে, তারপর তাঁর মেয়েকে নিয়ে ফিরে আসবে।

বিয়ে হয়ে গেল।

জামাই আর মেয়েকে একটা বড়ো নৌকায় তুলে দেওয়া হল, এবং তারা মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্যে নৌকো ভাসিয়ে দিল।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে গভীর রাত্রে যথারীতি চাকরেরা রাজপুত্রকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

সৌভাগ্যক্রমে রাজপুত্র একটা ভাসমান দড়ি ধরে সকলের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে নৌকায় উঠে আসতে পারল। মন্ত্রীকন্যা স্বামীকে একটা বড়ো বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

পরদিন সকালে যখন মন্ত্রীকন্যাকে খেতে দেওয়ার জন্য খাবার নিয়ে আসা হল, মন্ত্রীকন্যা পরিচারিকাদের বলল ঃ রেখে যাও,— পরে খাব। তারা চলে গেলে মন্ত্রীকন্যা সেই খাবার স্বামীর সঙ্গে ভাগ করে খেল।

রাজমন্ত্রীর চাকরেরা মন্ত্রীকন্যা এবং তার বাক্সটাকে রাজমন্ত্রীর কাছে ফিরিয়ে আনল। রাজমন্ত্রী চাকরদের কাজে খুব সন্তুষ্ট হয়ে তাদের জমি এবং টাকা দান করলেন।

রাজপ্রাসাদে নিজের ঘরে ফিরে এসে মন্ত্রীকন্যা বাক্সটা খুলল, তারপর স্বামীকে ঝিয়ের ছদ্মবেশে সাজিয়ে দিল— যাতে তার সঙ্গে থাকলেও তার স্বামীকে কেউ চিনতে না পারে।

রাজপুত্র তার স্ত্রীকে তার জীবনের সব কাহিনী খুলে বলল। তার বদলে 'ধর্মের হাতি' কীভাবে সেখানকার রাজা নির্বাচিত করেছিল— তার স্ত্রী তাকে সেই গল্পটা বর্ণনা করে শোনাল। রাজপুত্র বুঝতে পারল এই রাজা তার হারানো দাদা ছাড়া আর কেউ নয়।

কীভাবে দাদার কাছে যাওয়া যায়— সে মনে মনে সেই উপায় আঁটতে লাগল।

রোজই প্রধানমন্ত্রীর বাগান থেকে রাজার কাছে ফুল পাঠানো হত।

একদিন রাজপুত্র ছদ্মবেশে বাগানের মালীর মেয়ের কাছে গেল। তাকে বলল: তোমাকে ফুলের তোড়া বানাবার একটা নতুন কায়দা শিখিয়ে দিচ্ছি। — বলে সে মালীর মেয়ের কাছ থেকে ফুল নিয়ে খুব সুন্দর, একটা নতুন ধরনের তোড়া বানিয়ে দিল।

পরদিন রাজাকে সেই তোড়াটা দেওয়া হলে রাজা মালীকে জিজ্ঞাসা করলেন: এই ফুলের তোড়াটা কে বানিয়েছে?

মালী জবাব দিল : মহারাজ, আমিই বানিয়েছি।

তুমি একটা মিথ্যুক, রাজা বললেন, যাও, কাল সকালে এই রকম আর একটা ফুলের তোড়া বেঁধে নিয়ে এসো,— তা না হলে তোমার গর্দান যাবে।

মালী ফিরে এসে তার মেয়েকে রাজার আদেশের কথা বলল।

তখন মালীর মেয়ে রাজপুত্রের কাছে গিয়ে তার বাবার বিপদের কথা খুলে বলল, এবং তার কাছে ওই রকম আরো একটা তোড়া বানিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল।

রাজপুত্র রাজি হল। এখন সে নিশ্চিত হল যে, এই রাজাই তার হারানো দাদা, আর কেউ নয়।

রাজপুত্র খুব চমৎকার একটা তোড়া বানাল, এবং একটা ছোটো চিরকুটে নিজের নাম লিখে ফুলের ভেতর গুঁজে দিল।



মালী রাজার কাছে সেই তোড়া নিয়ে গেলে তোড়া দেখে রাজা খুব খুশি হলেন; তারপর ফুলের ভেতর একটা চিরকুট দেখতে পেয়ে সেটা হাতে নিয়ে পড়লেন। মালীকে বললেন: তুমি এই তোড়াটা তৈরি কর নি। তা আমি বুঝতে পেরেছি। এখন সত্যি করে বল— তোমাকে কে এটা তৈরি করে দিয়েছে?

তখন ভয়ে ভয়ে মালী বলে ফেলল : মহারাজ, মহামন্ত্রীর এক চাকর আমার মেয়েকে এই তোড়াটা বেঁধে দিয়েছে।

তারপর রাজা মালীর ছদ্মবেশে মালীর মেয়ের কাছে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন: তাঁর হারানো ভাই চাকরের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তখন দুই ভাইয়ের পুনর্মিলন হল। রাজা দুষ্ট মহামন্ত্রীকে নির্বাসিত করে নিজের ভাইকে মহামন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করলেন।

টিয়াপাখি আর হরবোলা পাখির ভবিষ্যৎ-বাণী সত্য হল।

বড়ো রাজপুত্র হল রাজা, আর ছোটো রাজপুত্র হল তার মন্ত্রী।

রাজা রসালুর অভিযান

প্রথম পর্যায়



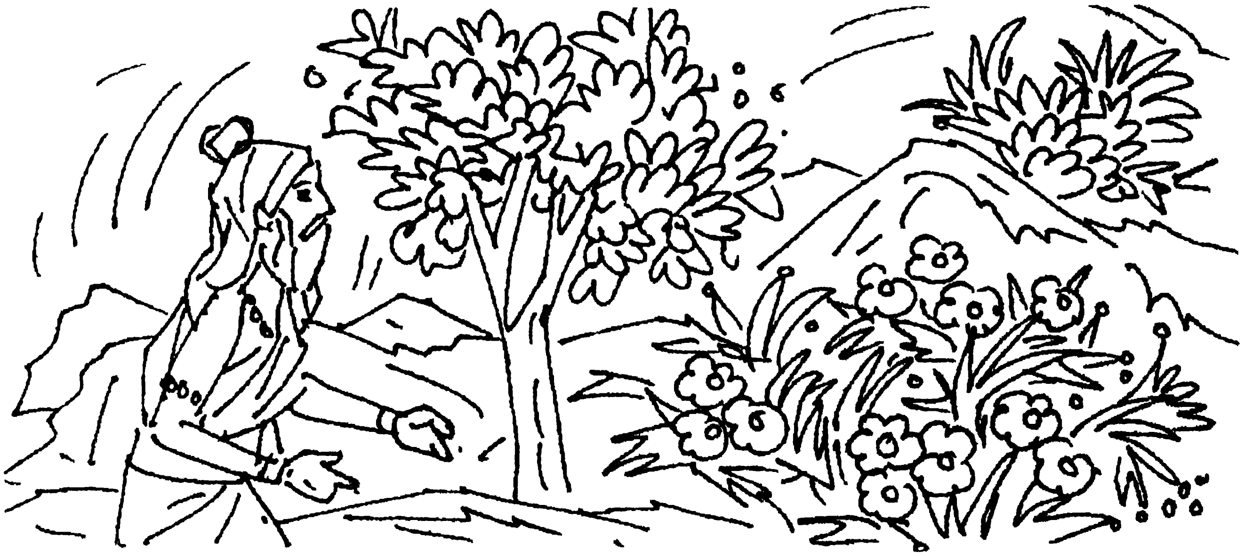
শিয়ালকোটের রাজা শালাহান। তাঁর দুই রানি। বড়ো রানি অচলা, ছোটো রানি লুনা। রানি অচলার ছিল সুন্দর ফুটফুটে একটি ছেলে; নাম পূরণ। রানি লুনার কোনো ছেলেমেয়ে নেই। তাই ছোটের রানির অচলা আর পূরণের ওপর ভারী হিংসে। একদিন রানি লুনা পূরণের নামে রাজা শালাহানের কাছে এমন একটা মিথ্যে নালিশ জানায় যে, রাজা খুব রেগে গিয়ে আদেশ দেন, "যাও বড়োরানি অচলার ছেলের হাত-পা কেটে তাকে ইঁদারার মধ্যে ফেলে দিয়ে এসো।"

যেমন আদেশ, তেমন কাজ। কিন্তু পূরণ ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষ। কুয়োর মধ্যে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়, আর কাঁদে। পূরণের ডাকে সন্ত গুরু গোরখনাথ তার সামনে এসে হাজির হন। ইঁদারার মধ্যে থেকে পূরণকে বাইরে এনে গুরু তার কাটা হাত-পা জোড়া দিয়ে দিলেন। পূরণ আবার তার সুন্দর রাজপুত্রের মতন চেহারা ফিরে পেল। গুরু গোরখনাথ তাকে দিলেন মন্ত্রপূত কুণ্ডল। দু-কান বিঁধিয়ে সেই কুণ্ডল পরে পূরণ গোরখনাথ গুরুর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল দেশবিদেশে। গুরুর প্রতি তার সেবা আর ভক্তি তাকে দিল আর এক নতুন নাম— পূরণ ভগৎ।



দেশেদেশে ঘুরতে ঘুরতে পূরণ আরো বড়ো হয়ে উঠল। তাকে দেখতেও তেমনই সুন্দর—রাজপুত্রের মতো রূপ অথচ যোগীর বেশ। গ্রাম-

গঞ্জ শহর-বাজার যেখানেই যায়, পূরণ ভগৎ সেখানেই পায় অগাধ ভক্তি আর আদর-যত্ন। কিন্তু পূরণের মন হুহু করে তার মায়ের জন্যে। গুরুর অনুমতি নিয়ে তাই একদিন পূরণ ফিরে আসে তার নিজের দেশে। রাজপ্রসাদের কাছে সেই মস্ত বাগান, যেখানে একদিন রাজকুমার পূরণ তার বন্ধুদের নিয়ে খেলা করত। পূরণ ভগৎ দেখে সেখানে আগাছার ঘন জঙ্গল। পূরণ এখন যোগী। সে সেখানেই ডেরা বাঁধল আর অমনি চোখের লহমায় আগাছার জঙ্গলে ফুটিয়ে তুলল কত-না সুন্দর সুন্দর ফুল। এ খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। গ্রাম-গঞ্জ থেকে লোক এসে ভিড় করল এই নতুন সাধুর ডেরায়। রাজা শালাহানের প্রাসাদেও পৌঁছল সাধুর অদ্ভুত ক্ষমতার খবর। একদিন রানিদের সঙ্গে নিয়ে শালাহান এলেন সাধু-দর্শনে। সঙ্গে এল প্রাসাদের দাসদাসী আর রাজার মন্ত্রী-কর্মচারীর দল। বড়ো রানি অচলা ছেলের শোকে কেঁদে কেঁদে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছেন। মা অচলাকে দেখেই সাধু তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ রানি ফিরে পেলেন তাঁর চোখের দৃষ্টি।



ছোটো রানি লুনা নিজের চোখে সাধুর এই আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে পূরণ ভগৎ-এর পা জড়িয়ে ধরে তার কাছে একটি সন্তান বর চাইলেন। তখন পূরণ নিজের পা ছাড়িয়ে নিয়ে ছোটো রানিকে বলল, "দেখ রানি, রাজা শালাহানের একটি ছেলে ছিল। তুমিই একদিন তার নামে মিথ্যা বদনাম দিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলে। আজ সকলের সামনে সব কথা খুলে বল আর নিজের দোষ স্বীকার করে নাও।"

রানি লুনা সাধুর কথা শুনে ভয় পেলেন। তিনি দেখলেন সাধুজি সবই জানেন। তাই রাজা শালাহান আর সকলের সামনে তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন। সাধু পূরণ তাঁকে তখন বলল, "রানি, আপনি ভেবেছিলেন পৃথিবী থেকেই পূরণকে সরিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু ভালো করে তাকিয়ে দেখুন আপনার সামনেই রয়েছে সেই পূরণ।" তখন শালাহান আর লুনা মুখ তুলে তাকিয়ে দেখেন— সেই পূরণই ফিরে এসেছে। শুধু এখন তার দু-কানে সাধুর মতো কুণ্ডল আর তার মুখ ঢাকা পড়েছে দাড়িগোঁফে। রানি লুনা ভয়ে বিস্ময়ে সাধু পূরণের পা ছুঁয়ে ক্ষমা চাইতে থাকে। তাঁকে বাধা দিয়ে, তুলে ধরে পূরণ বলে, "এই নাও, মা, এককণা শস্য। এটি ভক্তিভরে খেয়ে নিও। তোমার গর্ভে জন্মাবে সাহসী আর সুন্দর এক ছেলে। কিন্তু বড়ো হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ছেলে তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে অনেক দূরে। আমার মায়ের মতো তোমাকেও ছেলের জন্য কষ্ট পেতে হবে।"

পূরণ ভগতের কথামতো ছোটোরানি লুনার একটি ছেলে হল। রাজপুরোহিত জাতকের কোষ্ঠীগণনায় বসলেন। শুনে-গেঁথে তিনি বললেন— এই জাতক ভবিষ্যৎ জীবনে একজন মহৎ মানুষ বলে খ্যাতিলাভ করবে। তবে বারো বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত এই সন্তান যদি তার পিতা বা মাতার সামনে আসে, তাদের দিকে তাকিয়ে দেখে, দুজনেরই মৃত্যু হবে। রাজপুরোহিতদের কাছে রানি এই বিপদের প্রতিকার চাইলেন। পুরোহিত পরামর্শ দিলেন জাতককে যেন বারো বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো অন্ধ কুঠুরিতে বন্ধ করে রাখা হয়। তখন রানি আর রাজা শালাহান ছেলের জন্য মাটির নীচে বানালেন এক সুন্দর প্রাসাদ। ছেলেকে সেই প্রাসাদে বন্দি করে রাখলেন। ছোটো ছেলে— তাই তার দেখাশোনার জন্য রাখলেন একজন দাই-মা, পাহারায় রইল কয়েকজন রাজভৃত্য।

ছোটোরানি লুনা তার ছেলের নাম রেখে ছিলেন রসালু। 'রসালু' কথাটার অর্থ প্রাণশক্তি। কিন্তু সেই প্রাণবান রাজকুমার এগারো বছর রইলেন মাটির নীচে বন্দি হয়ে। মা লুনা তাঁকে দিয়েছিলেন একটি তোতাপাখি। সেই পাখিটাই ছিল তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। বারো বছরে পা দিয়েই রসালুর মনে হল তিনি বেরিয়ে পড়বেন এই পাতাল-প্রাসাদ থেকে। দাই-মা আর ভৃত্যদের নিষেধ তিনি শুনলেন না। পুরোহিতের ভবিষ্যৎবাণীর কথা তিনি কানেও তুললেন না। নিজের প্রিয় সাদা ঘোড়া আর ঝকঝকে বর্মগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন অজানা অচেনা জগতের পথে। সাদা ঘোড়ার সওয়ার রসালুর কাঁধের উপরে বসে রইল প্রিয় তোতা। শিয়ালকোট নগরীর পাতাল প্রাসাদের দরজা পর্যন্ত ছুটে এলেন রসালুর দাই-মা। রাজকুমারকে বিদায় জানাবার সময় বললেন, "পথে প্রথম যে নদী পাবে, তার জলে স্নান করে নতুন পোশাক পরে নিও।" অন্ধকার পাতালপুরীর সিংহদ্বার পেছনে ফেলে রেখে রসালু উঠে এলেন সুন্দর আলোয় ভরা এই পৃথিবীর বুকে। শুরু হল তাঁর নতুন জীবন। কিছুদূর অগ্রসর হয়েই দাই-মার কথামতো রসালু দেখতে পেলেন ছোট্ট এক নদী। তির তির করে বয়ে চলেছে তার স্বচ্ছ জলধারা। রসালু নদীতে স্নান সেরে উঠলেন, পরে নিলেন নতুন পোশাক, যেমনটি দাই-মা বলে দিয়েছিলেন।

তারপর অচেনা পথ ধরে রাজকুমার রসালু ঘোড়া ছোটালেন শালাহানের নগর-প্রাসাদের দিকে। রাজা আর রাণীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়া দরকার। তিনি যে অন্ধকারের বন্দিদশা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন নতুন আলোর খোঁজে, সে খবরটা তো তাদের দেওয়া দরকার। আর তাঁদের কাছে রয়েছে তাঁর অনেক প্রশ্ন।

ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে ক্লান্ত হয়ে রসালু থামলেন রাস্তার ধারে এক কুয়ার কাছে। সেখানে দূর-দূর গ্রাম থেকে মেয়েরা এসেছে কলসি ভরে জল নিয়ে যাবার জন্য। রসালু তখন অধৈর্য হয়ে উঠেছেন শালাহানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। তিনি গ্রামের মেয়েদের মাটির কলসিগুলি ভেঙে দিলেন আড়াল থেকে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে। ভাবলেন এই মেয়েরা যখন রাজার কাছে গিয়ে নালিশ জানাবে, তখন শালাহান নিজেই আসবেন কুয়ার ধারে। কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটল না। মেয়েরা নালিশ জানাল ঠিকই, কিন্তু শালাহান এলেন না। মেয়েদের কাছে সব কথা শুনে শালাহান বুঝতে পারলেন যে ছেলেটি মেয়েদের উত্যক্ত করেছে সে আর কেউ নয়, তাঁরই নিজের সন্তান রসালু। কিন্তু কুল-পুরোহিতের ভবিষ্যদ্বাণী শালাহান ভুলতে পারেন না। তাই তিনি সাহস করে ছেলের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইলেন না। ওদিকে রাজা শালাহানের কাছ থেকে কোনো প্রতিকার না পেয়ে বিরক্ত আর বিব্রত মেয়েরা পেতলের কলসি নিয়ে এল জল তুলতে। রসালু তখন তাঁর ধনুকে তির জুড়ে সেই সুন্দর কলসিগুলি ফুটো করে দিলেন। আবার মেয়েরা গেল রাজার কাছে নালিশ জানাতে। ঘটনা শুনে শালাহান আরও চিন্তিত হলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি রসালুর সামনা-সামনি আসবেন না।



ভা. লোক — ২২

ওদিকে রসালুও হয়ে উঠেছেন অধৈর্য। পাতাল-প্রাসাদ থেকে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন জগৎকে চেনবার অদম্য কৌতূহল নিয়ে— মহারাজ শালাহান তাঁকে বন্দি করে রাখতে পারেন নি-— এ খবরটা তাঁকে দেওয়া দরকার। তাই সাদা ঘোড়ার সওয়ার রসালু একদিন রাজসভায় এসে হাজির। শালাহান তাঁকে দেখে যেমন চমকিত তেমনি ভীত হয়ে পড়লেন। রসালু মহারাজকে বললেন, "রাজা!

কোন্ সে দোষে দোষী আমি, দিলেন নির্বাসনে?
রাজমুকুটের লোভ নেইকো একটুও মোর মনে।
অজানাকে জয়ের ব্রতে ফিরবো দেশান্তরে,
যাবার আগে তাই এসেছি তোমার প্রাসাদপুরে।"

শালাহানকে অভিবাদন জানিয়ে রসালু তাঁর সাদা ঘোড়ায় চেপে আবার বেরিয়ে আসেন পথে। ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর চোখ পড়ে প্রাসাদ-অলিন্দে, যেখানে তাঁর মা সাশ্রুনয়নে দাঁড়িয়ে। রানি লুনাকে দেখে রসালু আবার লাগাম টেনে ধরেন আর উচ্চকণ্ঠে বলেন,

"চোখের জল ফেলছ কেন, রানি?
অশ্রু আনে অমঙ্গল, মা, মোছো নয়নখানি।
অজানাকে জয়ের ব্রতী অচিন পথের যাত্রী তোমার ছেলে,
বিদায়কালে আশিস্ তোমার দাও গো শিরে ঢেলে!'

চোখের জল মুছে নিয়ে রানি লুনা তখন রসালুকে উত্তর দেন ঃ

"মায়ের হৃদয় ব্যথায় যখন দোলে,
চোখের জলে আভাসটুকু মেলে।
রইল আশিস্, যাত্রা করো অচিন কর্মপথে
শুদ্ধ রেখো হৃদয়খানি, নিষ্ঠা রেখো ব্রতে।"

রাজপ্রাসাদের অলিন্দ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে রসালু তার প্রিয় সাদা ঘোড়াটির পিঠে মৃদু চাপড় দিতেই পাখির মতো উড়ে চলল ঘোড়া। দূরে পড়ে থাকে প্রাসাদপুরী, অলিন্দে দাঁড়িয়ে-থাকা মায়ের মূর্তি; সামনে অন্তহীন অজানা পথের রেখা।

চলতে চলতে রসালুর সঙ্গে এক সূতপুত্রের দেখা। রসালু তাকে সঙ্গী করে নেন; কতদূরের পথ! দুজনে ছুটেছেন ঘোড়ার সওয়ার। আবার দেখা হোল এক মণিকার-পুত্রের সঙ্গে। মণিকারের ছেলে তাঁদের সঙ্গী হলেন। রসালু তাঁর বন্ধুদের নিয়ে ছুটলেন হিন্দুস্থানের সমতলভূমির দিকে। সারাদিন তিনজন ঘোড়ার পিঠে; রাতে তাঁরা এসে পৌঁছান এক নিবিড় বনের ধারে। ক্লান্ত রসালু, ক্লান্ত তাঁর সঙ্গীরা। একটা গাছের নীচে তাঁরা আশ্রয় নিলেন। কিন্তু খুব নির্জন সেই বন; তার উপর রাতের ঘন অন্ধকার জায়গাটাকে করে তুলেছিল ভয়ঙ্কর। তাই তিনবন্ধু পালা করে পাহারা দিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেবেন স্থির করলেন। প্রথমে সূতপুত্র, তারপর মণিকার-পুত্র আর সবশেষে রাত্রির চতুর্থযামে পড়ল রসালুর প্রহরার পালা। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে মণিকার-পুত্র যখন প্রহরায় রয়েছেন, বিশাল এক অজগর এসে হাজির সেখানে। মণিকারের পুত্র, সাহসভরে তাকে প্রশ্ন করেন, "এখানে কেন? এখান থেকে যাও।" আগুনের হলকার মতো নিশ্বাস ফেলে ফণা তুলে অজগর উত্তর দেয়— 'এই বনের চার ক্রোশের মধ্যে যে পা দেবে, তাকেই আমি মারি। আমিই এই অরণ্যের রাজা! তোমরা তিনজন কোন্ সাহসে এখানে এসেছ? প্রাণ নিয়ে তোমাদের আর ফিরে যেতে হবে না!" ততক্ষণে সূতপুত্রও জেগে উঠেছেন। তিনি অজগরের দিকে তেড়ে যান; হাঁক পাড়েন, "দূর হও এখান থেকে। নয়তো

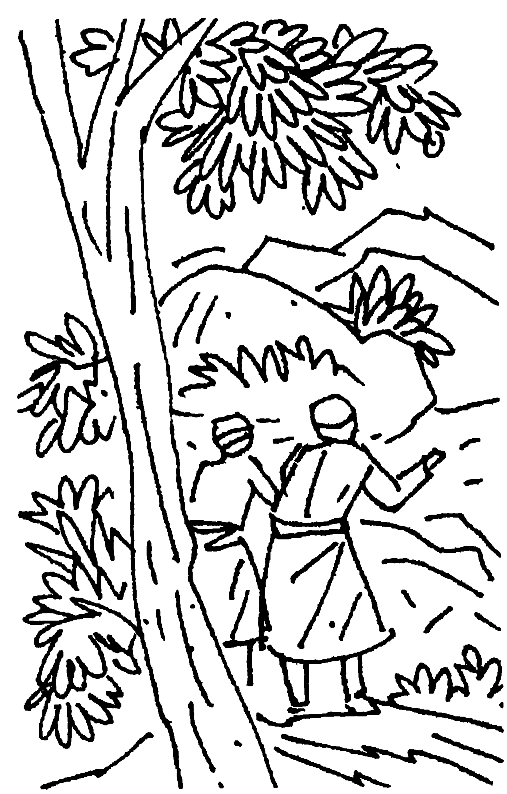
মর।" অজগরও তেড়ে আসে দুজনের দিকে তার ভয়ঙ্কর ফণা দুলিয়ে আর ফোঁস ফোঁস আওয়াজে, চতুর্দিকে আগুনের হল্‌কা ছড়িয়ে। সূত্রপুত্র তখন তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন, আর অজগরের ল্যাজটা সাপটে ধরে এমন এক আছাড় মারেন যে তার মুণ্ডুটা যায় থেঁতলে।

অজগর-বধের পর সূতপুত্র তার দেহটা লুকিয়ে রাখেন নিজের বর্মের নীচে, মাটির উপর।

রাতের শেষপ্রহরে রসালু যখন প্রহরায় রত, একটা ভয়ঙ্কর রাক্ষস বেরিয়ে এল বনের অন্ধকারের মধ্যে থেকে।

রসালু একটুও ভয় পেলেন না। প্রচণ্ড গর্জনে তিনি রাক্ষসকে প্রশ্ন করেন, "কে তুমি হে? এই রাতে এখানে কী বদ উদ্দেশ্যে ঘুরছ?"

উত্তরে রাক্ষস বলে, "এ বনের দশ ক্রোশের মধ্যে যে পা দেয়, তাকেই আমি ধরে খাই। আমি এই অরণ্যের সম্রাট। তোমাদের এত সাহস যে আমার এলাকায় ঢুকেছ, অথচ আমাকে কোনো কিছু বলার দরকার মনে করনি। এখন বাছাধনরা, মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও।"



রসালু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধনুকে তির যোজনা করলেন এবং একটি তিরেই রাক্ষসের লম্ফঝম্ফ স্তব্ধ করে দিলেন।

সকালের আলো ফুটলে রসালু তাঁর সঙ্গীদের ঘুম ভাঙালেন। ঘুম ভেঙে উঠেই সূতপুত্র বর্মের নীচে লুকিয়ে-রাখা মৃত সাপের দেহটি বের করে আনলেন, এবং রসালুকে বোঝাতে লাগলেন— তাঁরা দুজনে কীভাবে বিশাল অজগর সাপটাকে মেরেছেন। সব শোনার পর রসালু বললেন, "ভাই, তোমরা তো শুধু একটা সাপের মোকাবিলা করেছ। এদিকে এসো, দেখে যাও, কী ভয়ঙ্কর এই রাক্ষসটা রাতের শেষ প্রহরে হানা দিয়েছিল আমাদের সবাইকে প্রাণে মারবে বলে।"

বনের ঝোপের পাশে পড়ে-থাকা মৃত রাক্ষসটার বীভৎস চেহারা দেখে সূতপুত্র আর মণিকার-পুত্র দুজনেই ভয়ে কেঁপে উঠলেন। তাঁরা ভাবলেন, যদি রসালু না থাকতেন, আর যদি তাঁদের সামনে ওই ভয়ঙ্কর রাক্ষসটা এসে দাঁড়াত, তাহলে কী বিপদটাই না হত! অনেক ভেবে-চিন্তে সূতপুত্র আর মণিকার-পুত্র ঠিক করলেন এমন বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে রসালুর সঙ্গী হয়ে লাভ নেই। তাঁরা দুজনেই রসালুকে বললেন, "রাজকুমার, আমাদের বিদায় দাও। এই বিপদ আর মরণের মুখোমুখি অজানার অভিযানে আমরা তোমার সঙ্গী হবার যোগ্য নই!"

সঙ্গীদের হারাতে হবে ভেবে রসালুর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। তবু তিনি ভাবলেন বিপদের মধ্যে, মৃত্যুর মুখে তাদের টেনে আনার কোনো অধিকার তাঁর নেই। ভারাক্রান্ত মনে বন্ধুদের ছেড়ে রসালু এগিয়ে চললেন একা। সাদা ঘোড়ার সওয়ার, ঘাড়ের উপর বসে আছে প্রিয় তোতা, এক হাতে লাগাম টেনে রেখে রসালু ছুটে চললেন ঘন অরণ্য আর পাহাড় পার হয়ে রবি নদীর তীর ধরে সমতলের দিকে।

নদী আর প্রান্তরের মাথার উপরে গেরুয়া আলোর চাঁদোয়া টাঙিয়ে দিয়ে এক সময় সূর্যদেব লুকিয়ে পড়লেন পশ্চিমা পাহাড়ের আড়ালে। রসালুর সাদা ঘোড়া ততক্ষণে এসে থেমেছে লাহোর নগরীর আলোকোজ্জ্বল পথে।

নগরীর প্রধান পথ দিয়ে চলেছেন রসালু। দু-পাশে সারি-সারি দোকান, ব্যাপারিরা সাজিয়ে বসেছে পসরা। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ে এক বুড়ি পথের ধারে জ্বেলেছে উনুন, আর সেঁকে চলেছে একটার পর একটা রুটি। কাজের মধ্যে বুড়ি আপন মনে কখনও হাসছে, আবার কখনও কাঁদছে। রসালু তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "মা-জি, আপনি এরকম একবার হাসছেন আবার কাঁদছেন কেন?"

বুড়ি খেপে উঠে রসালুকে পালটা প্রশ্ন করে, "তোমার কি আসে যায় তাতে? তুমি নিজের কাজে মন দাও। রসালু নাছোড়বান্দা। বুড়িকে তিনি বললেন, "তোমার হাসি আর কান্নার আসল কারণটাই তো আমি জানতে চাই। বলো আমাকে তোমার সুখ-দুঃখের গল্প।"



মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে বুড়ি— ছেলেটার মুখে-চোখে যেন কত দয়া আর ভালোবাসা মাখানো। চোখের জল ফেলতে ফেলতে বুড়ি তার গল্প শুরু করে।

"জানো, বাছা আমার সাত-সাতটি জোয়ান ছেলে ছিল। একটা বাদে সবাই গেছে রাক্ষসের পেটে। সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসটা প্রতিদিন বাজারে আসবে রাত গভীর হলে, আর তার হাতে এখানকার মানুষদের তুলে দিতে হয় একটা তরতাজা প্রাণ। কাঁদছি কী আর সাধে! সেই রাক্ষসের নজরানা আজ আমার শেষ ছেলেটা, আর তার সঙ্গে জোগাতে হবে এই রুটিগুলো।"

বুড়ির কথাগুলো শুনে রসালুর মন ক্রোধে আর করুণায় ভরে উঠল। তিনি বুড়িকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : "মা, তুমি নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরে যাও। তোমার ছেলের প্রাণের দায় আমি নিলাম। জেনো, সাহসী রাজপুত্রেরা দেশে-দেশে চিরকালই অন্যায়ের মোকাবিলা করেছে— মরতে তাদের ভয় নেই মা। তোমার ছেলের বদলে রাক্ষসের সামনে আজ রাতে আমিই দাঁড়াব।"

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে, বুড়ি যেখানে রুটি সেঁকে জড়ো করে রেখেছিল, রসালু সেখানেই বসে পড়লেন, যাতে রাক্ষস এসে মনে করে তিনিই বুড়ির ছেলে। রাক্ষস কিন্তু নিজে এল না। পাঠিয়ে দিল তার এক ভৃত্যকে ভেট নিয়ে যাবার জন্যে। সেই ভৃত্যের সঙ্গে রসালু ঢুকলেন নগরীর পিছনে এক গভীর বনের মধ্যে। ঘোর জঙ্গলের মধ্যে রাক্ষসের আস্তানার কাছাকাছি আসতেই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল বদ্‌খদ্ চেহারার এক ভিস্তিওয়ালা। রসালুর ঘোড়ার পিঠে দুটো চাপড় মেরে লোকটা বলে উঠল, "এই সুন্দর ঘোড়াটা নিশ্চয়ই তোর নিজের নয়। কোথা থেকে চুরি করেছিস এটা? তোর মতো একটা ভবঘুরের কাছে এ ঘোড়া থাকার কথা নয়। এটা আমি রাখলাম, আর তোর সামনেই এটাকে তারিয়ে তারিয়ে খেয়ে নিজের পেট ভরাই আগে। তারপর তোর কথা ভাবা যাবে!"

লোকটার হাবভাব আর কথাবার্তা শুনে রসালুর মনে ধন্দ লাগল। বিদ্যুৎগতিতে নিজের তলোয়ার কোষমুক্ত করে তিনি লাগালেন একটা কোপ, আর দু-খণ্ড হয়ে মাটিতে খসে পড়ল বদমাশটার মুণ্ডু।

বনের মধ্যে পাহাড়, আর সেই পাহাড়ের গুহায় খোদ রাক্ষসের ডেরা। রাক্ষসটা সেখান থেকেই তার সাকরেদের এই দুর্দশা দেখে ভীষণ ভয় পেল। ডেরা ছেড়ে সে পালাতে থাকে। রাক্ষসের বোন তাই দেখে চিৎকার করে, "কোথায় যাচ্ছ দাদা?"

"পালা, পালা, দেখতে পাচ্ছিস না বনের মধ্যে রাজা রসালু এসে হাজির হয়েছেন। রাক্ষসের বংশ ধ্বংস না করে তিনি ক্ষান্ত হবেন না," — বলেই রাক্ষস আবার ছুটে পালাতে থাকে।



ওদিকে সেই ঘনান্ধকার অরণ্যে একা রসালু দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়েন, "কোথায় আছো হে রাক্ষসপুঙ্গবেরা। সাহস থাকে সামনে এসো।" সেই বজ্রের মতো গম্ভীর আওয়াজ নির্জন বনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। রাক্ষসেরা সব নিজের নিজের ডেরা থেকে বেরিয়ে আসে বাইরে; তারপর রসালুর দীপ্ত মূর্তি দেখে অনেকেই পালাতে থাকে। একটা বিদ্‌ঘুটে শয়তান কিন্তু রসালুর কথায় উত্তর দেয়। বলে, "তুই কে-রে হতভাগা! তুই আমাদের কড়ে আঙুলের জুগ্যি নোস্। রাজা রসালু যখন সত্যিসত্যিই আসবেন, তাঁর ঘোড়া আমাদের মাড়িয়ে চলে যাবে, আর তাঁর শাণিত তলোয়ার আমাদের কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে।"

রসালু তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ঘোড়ার গা থেকে ঝোলানো দড়ির গোছা খুলে নিলেন। তারপর ফাঁসের মতো করে সেটাকে ছুঁড়ে দিলেন জঙ্গলের দিকে। জালের মতো ছড়িয়ে পড়ল দড়িটা আর সেই জালে বাঁধা পড়ে গেল রাক্ষসগুলো। তারপর রসালুর শাণিত তরোয়ালের কোপে তাদের দেহগুলো খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল।



অরণ্যের মধ্যে দিয়ে সাদা ঘোড়ার সওয়ার রসালু খানিকটা এগোন, আর হাঁক দেন রাক্ষসদের উদ্দেশে। আর কোনো সাড়া আসে না। বেশ কিছুদূর যাবার পর কিন্তু সাতটা বিরাটাকার দৈত্য তাঁর পথ জুড়ে দাঁড়ায়। তারা গর্জন করে রসালুকে বলে, "ওহে ফন্দিবাজ ছোকরা! বেজায় সাহস তো তোমার। নাম ভাঁড়িয়ে নজের পরিচয় দিচ্ছ রাজা-রসালু বলে! গণৎকার আমাদের বলে দিয়েছেন— রাজা রসালুর হাতেই আমাদের মৃত্যু। কিন্তু তিনি যখন আসবেন, তাঁর ধনুকের একটি তির এই আমাদের সাত-সাতটা বিশাল দেহ ভেদ করে চলে যাবে।"

এসব হুঙ্কার শুনে রসালু একটিও কথা বললেন না। নীরবে নিজের ধনুকটি ঘোড়ার পিঠ থেকে তুলে নিলেন, আর তাতে করলেন শর-যোজনা। তারপর সেই বিরাট বিরাট দৈত্যগুলোকে ডেকে বললেন সার দিয়ে দাঁড়াতে। রসালু তির ছুঁড়লেন আর আগুনের ঝলক তুলে সেই তির সাত দৈত্যের দেহ ভেদ করে চলে গেল।

দৈত্যদের নিধনপর্ব শেষ করে রসালু আবার তাঁর বজ্রকণ্ঠে হাঁক পাড়লেন। কিন্তু আর কেউই বেরিয়ে আসে না তাঁর সামনে। তখন অরণ্য আর তার পাশের জনপদগুলিকে চিরদিনের মতো বিপদমুক্ত করবার জন্য, রসালু বনের মধ্যে জাদুবলে গড়ে দিলেন নিজের এক মূর্তি। যে কজন দানো আর রাক্ষস তখনও লুকিয়ে ছিল বনের মধ্যে, নিজের নিজের ডেরা থেকে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে দেখে আর ভাবে রাজা রসালু দাঁড়িয়ে আছেন তাদের ধরবার জন্যে। ভয়ে রাক্ষস কজন আর তাদের আস্তানা থেকে বাইরে আসে না। দিনের পর দিন এইভাবে গুহার মধ্যে বন্দি থেকে না খেতে পেয়ে রাক্ষসগুলো শুকিয়ে মরে যায়। এভাবেই একদিন রাজা রসালু রাক্ষস-বংশ ধ্বংস করে দিলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়

রাক্ষস আর দানোদের বধ করে রসালু এগিয়ে চললেন আরও দূর দূর দেশের মধ্যে দিয়ে। চলতে চলতে একদিন পৌঁছে গেলেন হস্তিনাপুরে। হস্তিনাপুরের রাজপথ দিয়ে যেতে যেতে রানি সুন্দ্রানের বিরাট প্রাসাদের ছায়ায় রসালু দেখলেন সারা গায়ে ভস্মমাখা এক সাধু বসে আছেন। সাধুর সামনে জ্বলছে তাঁর ধুনি।

"সাধুজি, নির্জন বন ছেড়ে এই কোলাহলে-ভরা রাজপথের ধারে আপনি কেন বসে আছেন?" রসালু সাধুকে প্রশ্ন করলেন। সাধু বললেন, "বসে আছি নয়, অপেক্ষা করে আছি কবে রানি সুন্দ্রানের সাক্ষাৎ পাব— সেই আশায়। বাইশ বছর আমি একই আসনে অপেক্ষা করছি রানির দর্শন পাব বলে।"

"আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন, সাধুজি! আমিও শুনেছি রানি সুন্দ্রানের রূপ আর গুণের অনেক কথা", রসালু বললেন।

সাধু রসালুকে বললেন, "তোমার চোখে রয়েছে স্বর্গের পবিত্র আলো। তোমার আর সাধু হবার দরকার নেই।" কিন্তু রসালু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি সাধুকে জানালেন তাঁর সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্যন্ত তিনি জানতেন না— যা সুন্দর তার জন্যও মানুষকে সাধনা করতে হয়। রসালুর কথায় সন্তুষ্ট হয়ে সাধুজি প্রথমে তাঁর কান বেঁধালেন; তারপর পরিয়ে দিলেন সাধুর কুণ্ডল।

রসালু বসলেন ধ্যানে। আর ওদিকে সাধু চললেন ভিক্ষার জোগাড়ে। ভিক্ষা করে সাধু যা জোগাড় করলেন, তার অর্ধেক দিতে হল রসালুকে। ফলে সাধুজির ভরপেট আহার হল না; ক্ষুধা রয়ে গেল। প্রথমদিন সাধুজি কিছু বললেন না। কিন্তু রোজই এক ব্যাপার ঘটতে লাগল। রসালু ধ্যানাসনে বসে থাকেন, আর সাধু বেরিয়ে পড়েন খাবারের জোগাড়ে। শেষে একদিন অধৈর্য হয়ে সাধু রসালুকে বললেন, "শিষ্যের কাজ গুরুর সেবা। আমি তোমাকে শিষ্য করে নিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম তুমি খাবার আর পানীয় জোগাড় করে আনবে, ধুনী জ্বালাবে, জায়গাটা সাফ করে রাখবে। উলটে আমাকেই সবকিছু করতে হচ্ছে, আর তুমি বসে বসে দিন কাটাচ্ছ।"

রসালু তখন সাধুকে বললেন— গুরুর আদেশ ছাড়া তো শিষ্য কোনো কাজ করতে পারে না। সাধুজিতো তাঁর উপর কোনো কাজের ভার দেন নি। দিলেই তিনি সে কাজ করে দিতেন।

রসালুর যুক্তি শুনে সাধুজি কিছুক্ষণ নীরব থেকে, তাঁকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে যেতে বললেন। রসালু তখন ভিক্ষার ঝুলিটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

রসালু কিন্তু নগরীর পথে পথে ঘুরলেন না, সোজা চলে গেলেন রাজপ্রাসাদে। প্রাসাদের বিশাল তোরণদ্বারে দাঁড়িয়ে রসালু ডাকলেন, "রানি সুন্দ্রান! রানি সুন্দ্রান! অনেক দূরের পথ ভেঙে তোমার কাছে এসেছি রানি। তোমার রূপের খ্যাতি, তোমার গুণের প্রশংসায় সকলে মুখর। দয়া করে দেখা দাও এই দীন সন্ন্যাসীকে। তাকে দাও দুমুঠো প্রাণধারণের অন্ন!"



রসালুর গম্ভীর কণ্ঠের স্বর প্রতিধ্বনি তোলে প্রাসাদের অন্দরমহলে। রানি সুন্দ্রান শুনলেন সেই স্বর। তাঁর করুণা হল। পাঠিয়ে দিলেন এক পরিচারিকার হাত দিয়ে একমুষ্টি অন্ন। কিন্তু কৌতূহল ভরে রানি যেই জানলা দিয়ে তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখতে গেলেন, অমনি রসালুর তেজপূর্ণ রূপ দেখে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। রসালু আবার তাঁর বজ্রকণ্ঠে হাঁক পাড়লেন। সেই আওয়াজে রানির মূর্ছা ভেঙে গেল। তিনি তাঁর আর এক পরিচারিকাকে পাঠালেন সাধুর হাতে ভিক্ষা তুলে দেবার জন্য। পরিচারিকাও রসালুর বীররূপ দেখে মূর্ছিত হল। তখন রানি সুন্দ্রান নিজে এলেন রসালুর কাছে। তাঁর ভিক্ষার ঝুলিতে ভিক্ষা তুলে দিয়ে বললেন, "তরুণ, কবে থেকে আপনি এই সন্ন্যাসব্রত নিয়েছেন? এই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে কি আপনি নগরীর গৃহে গৃহে ঘুরেছেন, না শুধু আমার কাছেই এসেছেন?"

রসালু রানিকে সম্মান দেখিয়ে মাথা নোয়ালেন। তারপর বললেন, "রানি সুন্দ্রান! তোমার ঘরে অনেক মণিমুক্তো, আমি সে-সব কিছুই চাই না। এই প্রাসাদের যিনি দেবী, সেই রানি সুন্দ্রানকেই আমি চাই।"

রসালু ছিলেন যেমন রূপবান, তেমন বীর। তরুণ সন্ন্যাসীর কথায় সৌন্দর্যের দেবী রানি সুন্দ্রান মনে মনে খুশি হলেন। কিন্তু ভয়ে আর লজ্জায় তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন অন্দরমহলে।

ওদিকে রসালু সাধুর ডেরায় ফিরে এসে তাকে দিলেন ভিক্ষার ঝুলি। ঝুলি থেকে সন্ন্যাসী পেলেন একগুচ্ছ মুক্তো। তিনি আশ্চর্য হলেন। কিন্তু রসালুর কাছে ক্রোধপ্রকাশ করে বললেন, "মুক্তোয় সাধুর কী প্রয়োজন? আমি চাই ক্ষুধা মেটাবার অন্ন।" গুরুর কথা শুনে রসালু আবার ফিরে গেলেন রাজপ্রাসাদে। সিংহদ্বার থেকে হাঁক দিলেন, "হস্তিনাপুরের রানি সুন্দ্রান, তোমার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে এক যোগী। দেখা দাও, দাও তাকে ক্ষুধার অন্ন।" রানি সুন্দ্রান নেমে এলেন প্রাসাদদ্বারে। সন্ন্যাসীকে বললেন, "কেন ছলনা করছ তরুণ, এই

ভস্মমাখা দেহ তোমার অল্প বয়স চাপা দিতে পারেনি। ভিক্ষায় তোমার কোনো প্রয়োজন নেই। অকপটে বল কী চাও?''

রসালু উত্তর দেন, ''রানি, তোমার ঘরে অনেক ধনরত্ন। কিন্তু সে-সব আমার কী কাজ! ফিরে নাও তোমার দেওয়া এই মুক্তাগুচ্ছ— আমাকে দাও ক্ষুধার অন্ন।'' রানি ফিরিয়ে নিলেন তাঁর দেওয়া রত্ন কিন্তু তরুণ সাধুর বীররূপ দেখে তিনি মোহিত। অন্ন প্রস্তুত হচ্ছে— এই অছিলায় রসালুকে বসিয়ে রাখলেন সুন্দ্রান। গল্প জুড়লেন তাঁর সাথে।

''তুমি তো সাধু নও, তুমি রাজপুত্র!
রাজপুত্র কোথায় তোমার দেশ?
ঘরে তোমার কে আছে তরুণ কুমার?''

এই রকমের হাজারো প্রশ্ন রানির। রসালুও উত্তর দেন ঃ

আছেন রাজা শালাহান, জগৎ-জোড়া নাম।
তারই পুত্র আমি রানি, মাতা লুনার প্রাণ!
দূর বিদেশে শুনেছিলাম তোমার রূপের যশ;
কৌতূহলে দেখতে এসে হলেম বুঝি বশ!
জড়িয়ে পাছে পড়ি রানি তোমার মায়াডোরে,
তাই নিয়েছি সাধুর ব্রত, ফিরব দেশান্তরে।

রানি সুন্দ্রানের দেওয়া অন্ন আর ব্যঞ্জন নিয়ে গিয়ে রসালু দিলেন তাঁর গুরুকে। তারপর পাড়ি দিলেন অজানা পথে।

ওদিকে রানি সুন্দ্রান অপেক্ষা করেন প্রাসাদে। কখন আসেন সেই তরুণ যোগী। দিনের পর দিন যায়। রসালুর কণ্ঠস্বরে আর কেঁপে ওঠে না প্রাসাদের সিংহতোরণ! শেষে অধীর সুন্দ্রান নামলেন প্রাসাদের প্রধান দ্বারে, বেরিয়ে পড়লেন রাজপথে, খুঁজে বার করলেন সাধুর ডেরা। সাধুর কাছে যখন তিনি রসালুর খোঁজ চাইলেন, সাধু মনে মনে খুব ক্রুদ্ধ হলেন। বাইশ বছর তিনি অপেক্ষা করে আছেন রানি সুন্দ্রানের দর্শন পাবার আশায়— তিনি আসেন নি। আর তাঁরই শিষ্য রসালুর অদর্শনে রানি এত ব্যাকুল যে, প্রাসাদ ছেড়ে নেমে এলেন রাজপথে তাঁর মতো এক দীন সাধুর ডেরায়।

ক্রুদ্ধ সাধুজি সুন্দ্রানকে বললেন, ''আমার শিষ্য রসালুকে আমি খেয়ে ফেলেছি। ক্ষুধায় কাতর হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু রসালু আমার আহার জোগাড় করে আনেনি। তাই তাকে খেয়েই আমি আমার ক্ষুধা মিটিয়েছি। মানুষের মাংসের স্বাদ যে এত মিষ্টি তা' আমার জানা ছিল না।''

সাধুর কথা শুনে সৌন্দর্যের দেবী সুন্দ্রান 'হায় হায়' করে বিলাপ করতে লাগলেন। তারপর সাধুকে বললেন, ''তুমি আমাকেও খাও।'' এই বলে সুন্দ্রান সাধুর সামনে রাখা জ্বলন্ত আগুনের উপর ঝাঁপ দিলেন।

তৃতীয় পর্যায়

হস্তিনাপুর ছেড়ে রসালু এগিয়ে চললেন। রাজা হরিশচন্দ্রের রাজ্যে যখন তিনি এলেন, রাজসৈন্যরা রসালুকে হত্যা করতে এগিয়ে এল। রসালু একাই তাদের মোকাবিলা করলেন। বীরের মতো যুদ্ধ জয় করে হরিশচন্দ্রের সিংহাসন কেড়ে নিলেন। একবছর রসালু এই নতুন রাজ্য শাসন করার পর, প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা শারকাপ

রসালুকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ করলেন। হস্তিনাপুর থেকে পাশের রাজ্যে যাবার পথে রসালু পড়লেন ভয়ঙ্কর ঝড়ের মুখে। কাছাকাছি ছিল শুধু একটা কবরখানা। বাজ, বিজলি আর বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার অন্য কোনো উপায় না পেয়ে রসালু সেখানেই আশ্রয় নিলেন।

ঘন আঁধার। চারদিকে বাজ আর শিলাবৃষ্টি। তারই মধ্যে কবরখানার অন্ধকার ফুঁড়ে রসালুর সামনে এসে দাঁড়াল এক কবন্ধ— একটা মুণ্ডহীন ধড়। রসালু মনে মনে বলে উঠলেন, 'এই নির্জন অন্ধকার রাত্রিতে শুধু এই মুণ্ডকাটা মানুষের দেহটা সামনে না এসে, যদি তার ভূতটাও আসত, অন্তত একটু কথা বলা যেত তার সঙ্গে।'

সঙ্গে সঙ্গেই রসালুর সামনে নেমে এল একটা ভূত। রসালু একটু চমকে গেলেন বটে, কিন্তু মোটেই ভয় পেলেন না। তিনি ভূতকে বললেন, 'ঝড় জলের রাত্রি; হাওয়া আর বিজলির খেলা চলছে আকাশে। এমন সময় মাটির নীচে নিজের কবরে শুয়ে থাকাই ভালো ছিল না কি?'

ভূত উত্তর দেয়, 'একদিন তো তোমার মতোই মাটির উপরের জীব ছিলাম। আমারও ছিল রাজমুকুট, দাস-দাসী, কর্মচারী অমাত্য আর সুন্দরী রানির দল। কিন্তু রাজা যখন ছিলাম, তখন কত পাপকর্ম করেছি। সেই দোষে আজ আমি ভূত হয়ে ঘুরছি।''

সারারাত রাজা রসালু আর রাজার ভূত গল্প করে কাটায়। ভোর হলে, আলো ফুটলে রসালু খাবার উদ্যোগ নেয়। ভূত যখন জানতে পারে রসালু রাজা শরকাপের সঙ্গে পাশা খেলতে চলেছে, সে রসালুকে ডেকে বলে, 'শোনো রাজা রসালু, এই শরকাপ অত্যন্ত খারাপ লোক। প্রতিদিন শুধু মজা করার জন্যই শরকাপ দু-তিনটে লোকের মাথা নেয়। একদিন ওইভাবে সে আমাকেও মুণ্ডহীন করেছিল। ওর সঙ্গে পাশা খেলার ব্যাপারে সাবধান!' কিন্তু রাজা রসালুকে রাজার ভূত নিরস্ত করতে পারল না। তখন সে বলল, 'এই নাও, এই করবখানার কিছু হাড়। এই দিয়ে বানিয়ে নাও তোমার পাশা। রাজা শরকাপ এই জাদু-পাশার দান হারাতে পারবে না।'

শরকাপের রাজ্যে যাবার পথে রসালুর চোখে পড়ল একটা জ্বলন্ত বন। সেই বনের মধ্যে থেকে ক্ষীণ গলার চিৎকার ভেসে এল তাঁর কানে ঃ 'দয়া করো, রাজা, আমাকে এই আগুনের হাত থেকে বাঁচাও।' রাজা রসালু তাকিয়ে দেখেন একটা ছোট্ট ঝিঁঝিঁপোকা জ্বলন্ত গাছের ডাল থেকে তাঁকে ডাকছে। এগিয়ে গিয়ে তিনি পোকাটিকে তুলে নেন। কৃতজ্ঞ ঝিঁঝিঁপোকা তাঁকে নিজের শরীর থেকে খুলে দেয় একটা গাঁট। বলে, 'যদি কখনও বিপদে পড়ো, রাজা, এটা আগুনে ফেলে দিও। আমি ঠিক তোমাকে সাহায্য করতে ফিরে আসব।'

রাসুল মনে মনে হাসলেন। এতটুকু ঝিঁঝিঁ তার কী কাজে লাগবে! তবু তিনি ঝিঁঝির দেওয়া সেই দেহ-গ্রন্থি রেখে দিলেন নিজের কাছে।

শরকাপের প্রাসাদে প্রবেশ করবার আগেই মনোরম এক বাগান। সেই বাগানে দুলছে একটা দোলা। বাগানে অজস্র ফুল। সেই ফুলের মেলায় রাজা রসালুর পথ আটকে দাঁড়াল উনসত্তরটি সুন্দরী মেয়ে। তারা সবাই রাজাকে বলে, ''এই দোলায় আমাদের একটু দোল দিয়ে যাও। দেখি তুমি কেমন দোলাতে পার?'' রসালু তাদের বললেন, ''এ আর এমনকী কঠিন কাজ। একজন ভৃত্যের যা কাজ, তাই তোমরা রাজাকে করে দিতে বলছ। ঠিক আছে, মেয়েদের কথা আমি ফেলি না। তোমরা সবাই মিলে দোলনায় চাপো— আমি টান দিয়ে দেব।'' রাজা রসালুর কথা শুনে মেয়েরা সবাই একসঙ্গে চাপল দোলায়। দোলার দড়ির সঙ্গে রসালু তখন শক্ত করে বাঁধলেন তাঁর ধনুক; তারপর ছিলায় দিলেন পুরো টান। ছিলা ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েগুলো সবাই জ্যা-মুক্ত তিরের মতো ছড়িয়ে

গেল আকাশে, আর রসালু কেটে দিলেন ধনুকের সঙ্গে দোলার বাঁধনের দড়ি। উপর থেকে নীচে পড়ে সবকটি সুন্দরীর মৃত্যু হল— বেঁচে রইল শুধু সবচেয়ে ছোট্ট যে মেয়েটি, সে-ই।

সেই মেয়েটি রাজা শরকাপের সত্তরতম কন্যা— বাকি কটি সবাই তার দিদি। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে রসালুকে বাবার সঙ্গে পাশা খেলতে নিষেধ করে। কিন্তু রাজা রসালুর ভীষণ জেদ। তখন শরকাপের মেয়েটি রসালুকে বলে দেয় যে, তাঁকে সত্তরবার জোরে জোরে বাজাতে হবে দামামা— তবে তাঁর পাশা খেলার ইচ্ছার কথা শরকাপ শুনবেন। রাজা শরকাপের রাজ্যের এইসব অদ্ভুত নিয়ম ভেঙে দিতেই না রাজা রসালু এসেছেন। তাই তিনি এমন জোরে বাজাতে লাগলেন দামামা যে, দামামাগুলো সব ফেটে চৌচির হয়ে গেল। রাজা রসালু তখন নিয়মমাফিক ঘণ্টা বাজাতে গেলেন। ঘণ্টায় এমন জোরে টান দিতে লাগলেন যে নগরীর সব লোক ভয়ে উঠল কেঁপে। আর অনেকেই ভাবল ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। রসালুর ভীষণ শক্তির পরিচয় পেয়ে রাজা শরকাপের ছোটো মেয়েটি ততক্ষণে বিস্মিত। সে ছিল তার বাবার কাছে। বাবাকে সব কথা মেয়েটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "রাজা রসালু বলেছেন তোমাকে পাশার দানে হারিয়ে উনি আমাকে বিয়ে করে দেশে ফিরে যাবেন।"



রাজা শরকাপ মেয়ের কথা শুনে মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, "বোকা মেয়ে, ঘাবড়াবার কোনো কারণই নেই। পাশাখেলায় লোকটাকে আমি হারিয়ে দিয়ে ওর মুণ্ডটা কেটে ফেলব। তারপর তোমার বিয়ে দেব অন্য এক রাজপুত্রের সঙ্গে।"

মেয়ের কাছে এসব কথা বললেও শরকাপ মনে মনে খুব ভয় পেয়েছেন বোঝা গেল। তিনি মতলব আঁটলেন—রসালুকে মেরে ফেলার। তাঁর কাছে ভৃত্যের হাত দিয়ে পাঠালেন সুগন্ধী বিষ মেশানো শরবত। রসালু সে পানীয় ছুঁলেন না। শরবত দিয়ে দিলেন রাজবাড়ির পোষা কুকুরগুলিকে। মুখে ছোঁয়াবার সঙ্গে সঙ্গেই কুকুরগুলি মরে গেল। তখন গম্ভীর গলায় রাজভৃত্যকে ডেকে রাজা রসালু বললেন, "তোমার প্রভুকে বলো ঠকিয়ে, জালিয়াতি করে আমার মতো শত্রুকে তিনি বধ করতে পারবেন না।"

বাগানের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় একটা বেড়াল মিউ মিউ করতে করতে রসালুর সামনে এসে দাঁড়াল। রসালুর প্রশ্নের উত্তরে বেড়াল তাঁকে বলে, তার সব বাচ্চাগুলো একটা কুমোরের তৈরি কাঁচা মাটির হাঁড়িতে পড়ে আছে।

কুমোর এখুনি ভাঁটায় চাপাবে সব হাঁড়িগুলো। রসালু তখন জাদুবলে সেই কাঁচা মাটির হাঁড়িটা বের করে আনলেন কুমোরের ভাঁটা থেকে। বেড়াল খুশি হয়ে রসালুকে দিল ছোট্ট একটা বেড়ালছানা। বলল, "এটাকে সঙ্গে রেখো কাজে লাগবে।" রসালু খুশিমনে বেড়ালটি কুর্তার মধ্যে রেখে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকলেন।

রাজা শরকাপ ততক্ষণে দরবারে পাশা খেলার সব ব্যবস্থা করে বসে আছেন। শরকাপের প্রথম বাজি— তাঁর রাজ্যপাট, দ্বিতীয় বাজি— তাঁর যত ধনরত্ন; আর তৃতীয় বাজি— তাঁর নিজের মাথা।

রাজা রসালু প্রথম চাল দিলেন। রাজা ভূতের সাবধানবাণী ভুলে গিয়ে তিনি রাজা শরকাপের পাশা নিয়েই খেলা শুরু করে দিলেন। শরকাপের পোষা দুষ্টু ইঁদুরটা খেলার মধ্যে হঠাৎ এসে পাশার দান উলটে দিয়ে চলে গেল। রসালু প্রথম খেলায় হারলেন আর খোয়ালেন তাঁর উজ্জ্বল মন্ত্রপূত বর্ম। দ্বিতীয় খেলাতেও রসালু একইভাবে হারলেন। এবার তাঁকে দিয়ে দিতে হল তাঁর প্রিয় সাদা ঘোড়াটিকে। ঘোড়াটিকে যখন সভাঘর থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ঘোড়া চেঁচিয়ে উঠল আর রাজা রসালুকে ডেকে বলল : 'রাজা, সমুদ্রফেনায় আমার জন্ম ভগবানের ইচ্ছায় আমি তোমার সেবা করতে এসেছি। আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ কেন? এসো আমার পিঠে — পাখির মতো আমি তোমায় উড়িয়ে নিয়ে যাব এই দুষ্ট লোকেদের আসর থেকে। আর যদি একলাই থাকো, জোব্বার পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাখো।"

ঘোড়াটিকে বিদায় দিতে রাজা রসালুর খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তার শেষ অনুরোধ মনে করে যেই রাজা রসালু জামার পকেটে হাত ঢোকালেন, অমনি তাঁর মনে পড়ে গেল বিড়ালছানা আর হাড়ের পাশার কথা।

শরকাপকে রসালু বললেন, "খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার বর্ম আর ঘোড়া আপনি এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবেন না।" রাজা রসালুর গম্ভীর স্বর শুনে রাজা শরকাপ বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি তখন অতিথির মন চঞ্চল করে তোলবার জন্য তাঁর রানিদের দরবার চত্বরের অলিন্দে নিয়ে এসে বসালেন রসালু কিন্তু সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। একমনে খেলতে লাগলেন তিনি। শরকাপকে রসালু বললেন, "রাজা, আপনার পাশা নিয়ে দুবার খেলা হয়েছে, এবার আমার পাশায় খেলা।" এই কথা বলেই রসালু তাঁর জোব্বার ভেতর থেকে বের করলেন সেই হাড়ের পাশা। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল সেই বিড়ালছানাটিও, আর চুপটি করে গিয়ে বসল সেই গর্তের পাশে – যেখান থেকে খেলার সময় বেরিয়ে এসেছিল রাজা শরকাপের পোষা ইঁদুরটা। খেলা চলতে লাগল; রাজা শরকাপ বুঝতে পারলেন তিনি হারতে চলেছেন। দান উলটে দেওয়ার জন্য শিস দিয়ে ইঁদুরটাকে ডাকলেন তিনি। কিন্তু রাজা রসালুর বেড়ালের ভয়ে ইঁদুর গর্তের ভেতর থেকে বেরোল না। পরপর দুদানে জিতে রসালু উদ্ধার করলেন তার খোয়ানো বর্ম আর ঘোড়া।

রাজা শরকাপ তখন উপায় না দেখে দরবারে এসেই খেলা চলার সময় দানোদের কাছে সাহায্যের জন্য আকুল ডাক পাঠালেন। কিন্তু কবরখানার হাড়ে তৈরি ভূতের দেওয়া জাদুপাশা; দানোরা এগোয় না, কাছেও ঘেঁষে না সে পাশার। শরকাপ তখন পাশাকে ডেকে কাতরভাবে বলতে লাগলেন :

জাদুই-পাশা, জাদুই-পাশা, আমার কথা শোন;
অতি চালাক রসালু রাজ, ছাড়বে নাকো পণ।
জীবন আমার পাশার দানে বাঁধা,
জিতিয়ে দিলে তবেই বাঁচে মাথা।।

রাজা রসালু শরকাপের কাণ্ড দেখে অবাক! খেলার সময় খেলার নিয়ম ভেঙে তিনি পোষা ইঁদুর ছেড়ে দিয়ে পাশার দান উলটে দিয়েছিলেন। এখন আবার ভূত-প্রেত-পাশা সবাইকে দলে টানতে চাইছেন। তিনিও তখন শরকাপের অন্যায় আর চালাকির জবাবে পড়তে লাগলেন মন্ত্র :

হাড়ের পাশা, হাড়ের পাশা, কোনখানে তুই ছিলি?
কবরখানার রাজার ভূতের শপথ ভুলে গেলি?
দুষ্ট লোকের হাতের পুতুল নয়কো তুমি পাশা,
জড়িয়ে আছে তোমার দানে মরণ-বাঁচন আশা।।

রাজা রসালু মন্ত্র পড়েন, আর চাল দেন। ওদিকে অলিন্দে ভিড় করা রানিরা তাঁর চাল নষ্ট করে দেবার জন্য হাসির হুল্লোড় তোলে। কিন্তু রসালু আর ভুল করেন না। তিনি সুন্দরীদের দিকে চোখ তুলেও তাকান না। একমনে খেলতে থাকেন। রাজা শরকাপের ইঁদুরটা বিড়ালছানার ভয়ে গর্তের বাইরে আসে না, দান ওলটায় না; খেলা চলে ঠিকমতো। রাজা শরকাপ একটার পর একটা বাজি হারেন। প্রথমে হারালেন তাঁর রাজ্যপাট, তারপর ধনরত্ন আর শেষ বাজিতে তাঁর নিজের মাথা।



শরকাপ বাজি হারছেন রাজা রসালুর কাছে। দরবারের সবাই তটস্থ আর উদ্বিগ্ন। ঠিক সেই সময় প্রাসাদের ভেতরমহল থেকে ছুটে এল এক ভৃত্য। সে রাজা শরকাপকে কুর্নিশ করে জানাল— "ছোটোরানি এইমাত্র এক কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছেন।" পরাজিত শরকাপ ক্রুদ্ধ চিৎকারে বলে উঠলেন, "যাও, মেয়েটাকে এখনি বধ করো। ও মেয়ে তার বাপের জন্য দুর্ভাগ্য নিয়ে এসেছে।"

রসালু রাজা শরকাপের এই আদেশ শুনে খুব দুঃখিত হলেন। তিনিও চিৎকার করে বললেন : "রাজা, আমার এই মেয়ে ও এর আগের মেয়েটি — খুবই ভালো। ওদের কোনো দোষই নেই, মিছামিছি ওদের প্রাণদণ্ড দিচ্ছেন কেন? আমি ওদের মরতে দেব না; সঙ্গে করে নিয়ে যাব আমার রাজ্যে। আর, আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করেন, জীবনে আর কখনও শত্রুমিত্র কারুর মাথা নেবার জন্য অন্যায়ভাবে পাশা খেলবেন না, আমার শেষ জেতা বাজি, আপনার মাথাটি, আমি কেটে ফেলব না।"



রাজা শরকাপ তখন তাঁর পরম শত্রু অতিথি রাজা রসালুর কাছে কাতরভাবে প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলেন। তিনি দরবারঘরে সভাসদদের সামনে প্রতিজ্ঞা করলেন— আর কখনও অন্যায় ভাবে পাশা খেলবেন না, আর মানুষের মাথা- শিকারের দুষ্টু খেয়ালে মাতবেন না। রাজা রসালু শরকাপের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে প্রাণে মারলেন না। শরকাপের সপ্তরতম কন্যা, সেই সবচেয়ে ছোটো সুন্দরী মেয়েটি— যে দিদিদের সঙ্গে দোলায় চেপেছিল কিন্তু প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল, রাজা রসালু তাকে বিয়ে করে ফিরে চলে গেলেন নিজের রাজ্যে। আর সেখানে পরম সুখে একজন গুণী দয়ালু আর ন্যায়পরায়ণ রাজার মতো প্রজাদের প্রতিপালন করতে করতে একদিন স্বর্গারোহণ করলেন।



কেরল

সত্যবাদী চাকর



জব, এক বালক ভৃত্য।

আগের মনিববাড়ির চাকরি গেছে। তাই চাকরির খোঁজে এসেছে এক ধনী পরিবারের বাড়ি। ওঁদের ওর মতো একজন ছোকরা চাকরের ভীষণ প্রয়োজন পড়েছিল। সুতরাং সহজেই চাকরি হয়ে গেল জবের।

'তোমার আগের মনিব তোমাকে ছাড়িয়ে দিলেন কেন?'

—মনিবগিন্নি জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা বেশ হৃষ্টপুষ্ট, রাশভারি। এবং এক চোখে টেরা।



'ও, আমার মনিব খুব ভালোমানুষ ছিলেন এবং আমাকে বেশ ভালোই বাসতেন।' ছোকরা জবাবে বলল : 'কিন্তু আমার মনিবগিন্নি আমাকে একদম পছন্দ করতেন না। কারণ, আমি সব সময় সত্যিকথা বলে থাকি।'

'কী! আজকাল সচরাচর সত্যবাদী চাকর তো খুঁজেই পাওয়া যায় না! সত্যবাদিতা তো একটা মহৎ গুণ। তাহলে তুমি কি এই কথাই বলতে চাও যে, যেহেতু তুমি সত্যকথা বল, সেইজন্যেই তাঁরা তোমাকে ছাড়িয়ে দিলেন?' নতুন মনিবপত্নী জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ। ওই জন্যেই।' ছোকরা জবাব দিল।

'আচ্ছা! তা, এখানে তুমি ঠিক ওর উলটোটাই দেখতে পাবে।' নতুন মনিবগিন্নি বললেন, 'আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, তোমাকে আমার খুব পছন্দ হবে। এর আগে আমি যাদের পেয়েছি,— সবাই মিথ্যাবাদী,— ভুলেও কখনো সত্যকথা বলে না! কিন্তু আমি সত্যবাদীকে ভীষণ শ্রদ্ধা করি।'

সুতরাং জব ওই ধনী-পরিবারে কাজ পেয়ে গেল।

বেশ কিছুদিন সুখেই কাটল।

জব সত্যিই মহা সুখী।

কিন্তু একদিন হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল।

একদিন জব বাজার থেকে ফিরে এসে বলল, 'ও টেরা-চোখি মনিবঠাকরুণ, আমার খুব খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে দিন।'

মনিবগিন্নি জবের সম্বোধন শুনে তাকে রাগে এই মারেন তো সেই মারেন। তিনি তেড়ে এসে বললেন 'তুই আমাকে কী বলে ডাকলি রে হারামজাদা?'

'কেন, আপনি এরকম রেগে উঠলেন কেন?'

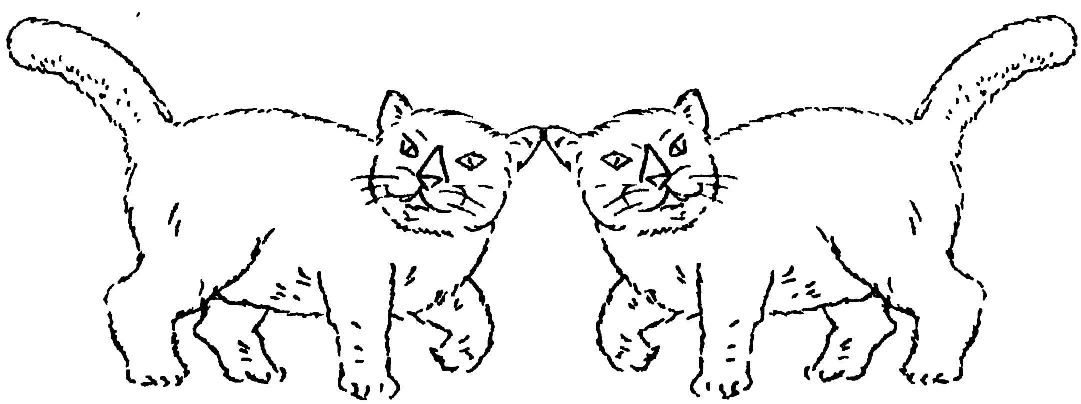
জব অবাক মুখে সরলভাবে বলল : 'আপনি তো জানেন, আমি কখনো মিথ্যা কথা বলি না। আপনি তো টেরাই, — কী, নন?'

টেরা তিনি ঠিকই। কিন্তু বাড়ির চাকর মনিবগিন্নিকে টেরা বলবে, আর তিনি মুখ বুঁজে তা হজম করে যাবেন?

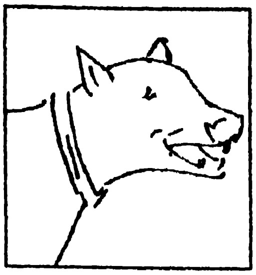
মনিবগিন্নি রাগে খেঁকিয়ে উঠে বললেন, 'শুয়োর, —নচ্ছার, —পাজি! বেরো, এখনই তুই বেরো আমার বাড়ি থেকে।'

দরজার পাশে একটা কোঁতকা পড়েছিল। সেই স্থূলাঙ্গী রাগি মহিলা সেটা হাতে তুলে নিয়ে জবকে তাড়া করলেন।

জব যত ছোটে তিনিও তত ছোটেন। ছুটতে ছুটতে—



এক বিখ্যাত কথাকলি অভিনেতা



কেরালার কথাকলি নাচের খ্যাতি শুধু আমাদের দেশে নয়, বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে আজকাল। কথাকলি নাচে নাটকের মতো সংলাপ থাকে না। শুধু অঙ্গ-ভঙ্গি বা মুদ্রা এবং মূকাভিনয়ের মাধ্যমে কোনো পৌরাণিক কাহিনী বা ওই রকম কোনো বিষয় উপস্থাপনা করে দেখানো হয়।

ইংরেজ শাসনের যুগে কেরালায় একজন অতি সুদক্ষ ও সুনিপুণ কথাকলি অভিনেতা ছিলেন। তিনি আম্মানুরের চাকিয়ার নামে সর্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান আম্মানুর, আর তাঁর নাম পরমেশ্বরন্। তাঁর নাচ ও অভিনয়ের কলকৌশল সম্পর্কে কেরালার সর্বত্র অনেক গালগল্প প্রচলিত আছে।

চাকিয়ার মহারাজের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন বলে তাঁকে প্রায়শই ত্রিবান্দ্রামে যেতে হত। একবার তিনি ত্রিবান্দ্রামে গেছেন। বিকেলের দিকে কী খেয়াল হল— তিনি সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলেন।

সেই সময় ত্রিবান্দ্রামে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি এবং তাঁর স্ত্রীও সমুদ্রতীরে বেড়াতে এলেন। তাঁদের সঙ্গে পোষা কুকুরটিও ছিল।

চাকিয়ারকে দেখে কুকুরটা হঠাৎ-ই তাঁর দিকে ছুটে গেল,— যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে এক্ষুনি তাঁকে কামড়ে দেবে— এমনি তার হাবভাব। অবিশ্যি রাজপ্রতিনিধি খুবই নিশ্চিত ছিলেন যে সে ওই রকম কোনো দুষ্কর্ম করবে না। অনেকদিনের পোষা শিক্ষাপ্রাপ্ত কুকুর। প্রভুর আদেশ ব্যতীত যাকে-তাকে কামড়ায় না কখনোই।

কিন্তু চাকিয়ার ভীষণ ভয় পেয়েছেন। হতভাগা কুকুরটা বুঝি তাঁকে খেয়েই ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়ের আশ্রয় নিলেন। করলেন কী— এমন একটা ভঙ্গি করলেন যেন একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সেটা ছুঁড়ে সজোরে কুকুরের মাথায় আঘাত করেছেন। কুকুরটা তাঁর অভিনয়ে ভয় পেয়ে ঘেউ-ঘেউ করতে করতে সরে গেল।

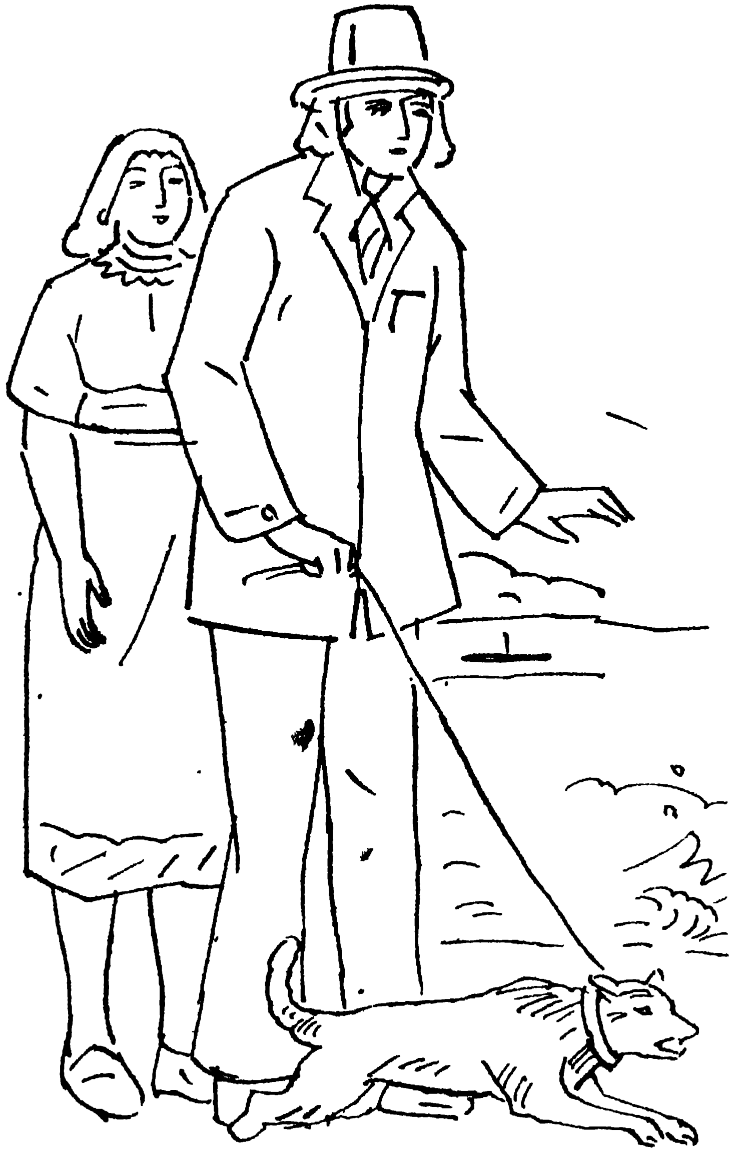
রাজপ্রতিনিধি চাকিয়ারের উপর মহাখাপ্পা হয়ে উঠলেন। তিনিও ধরে নিয়েছেন চাকিয়ার বুঝি পাথর ছুঁড়ে তাঁর কুকুরের মাথায় আঘাত করেছেন। চাকিয়ার তাঁকে সবিনয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তিনি কুকুরের গায়ে আদৌ আঘাত করেন নি, একটা মুদ্রার সাহায্যে তাকে আঘাত করার অভিনয় করেছেন মাত্র। আদপেই তিনি পাথর ছোঁড়েন নি।

কিন্তু ইংরেজ ভদ্রলোক যুক্তি দেখিয়ে বললেন, 'তাহলে কুকুরটা অমনভাবে ঘেউ-ঘেউ করল কেন?'

'মশায়, কুকুরটা ভেবেছে তাকে সত্যিসত্যিই আঘাত করা হয়েছে,'— আমাদের নায়ক জবাবে বললেন।

'নির্বোধ!' রাজপ্রতিনিধি রাগের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'কুকুর কখনো ভাবতে পারে যে তাকে আঘাত করা হয়েছে। কুকুরের বুঝি মানুষের মতো বুদ্ধি আছে! আমাকে বোকা বানাতে চাও, তাই না?'

যাই হোক, রাজপ্রতিনিধি চাকিয়ারের কথা বিশ্বাস করলেন না। তিনি মহারাজের কাছে গিয়ে চাকিয়ারের নামে তাঁর কাছে নালিশ করলেন।



ব্রিটিশ শাসনের যুগে একজন ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধিকে খ্যাপানো একটা যেমন তেমন ব্যাপার ছিল না। মহারাজ চাকিয়ারকে ডেকে পাঠালেন এবং সত্যিসত্যিই কী হয়েছে, তাঁর কাছে তা জানতে চাইলেন।

চাকিয়ার মহারাজকে বললেন যে, তিনি রাজপ্রতিনিধির কুকুরকে আদৌ আঘাত করেন নি। কেবল পাথর ছুঁড়ে তাকে আঘাত করার মুদ্রা করেছেন মাত্র

মহারাজ বললেন ঃ 'কিন্তু সাহেব তো একথা বিশ্বাসই করতে চান না!'

'ঠিক আছে, আমি তাঁকে বিশ্বাস করাচ্ছি।' অভিনেতা উত্তর দিলেন।

এই কথা বলে তিনি একটা বড়ো আকারের পাথর হাতে নিলেন এবং হাতের ও চোখের বিভিন্ন মুদ্রার সাহায্যে এমন অভিনয় করলেন যেন তিনি হঠাৎ সেই পাথরটা ওই রাজপ্রতিনিধির মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মেরেছেন। এই অভিনয় শেষ হতেই দেখা গেল, রাজপ্রতিনিধি মেঝের উপর পড়ে গেছেন— যেন ওই পাথরটার আঘাতে তিনি ভীষণভাবে আহত হয়েছেন। তাঁর জ্ঞান ফিরে আসতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগে গেল।

যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, দেখতে পেলেন যে তিনি আদৌ আহত হননি। এই আশ্চর্য অভিনেতার অভিনয়ে তিনি অতিশয় বিস্মিত হলেন এবং পঞ্চমুখে তাঁর অভিনয় ক্ষমতার প্রশংসা করতে লাগলেন। বললেন ঃ 'আমার নিজের দেশে আমি অনেক অভিনেতা দেখেছি, কিন্তু তোমার মতো অভিনেতা আমি দ্বিতীয় দেখিনি।'

ভারিক্কি জামাই



এক দরিদ্র যুবকের সৌভাগ্যক্রমে একটি ধনিকন্যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল।

কেরালার সামাজিক রীতি এই যে : বিয়ের এক বা দুদিন পরে জামাইকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়। এই যুবকটিও শ্বশুরবাড়ি যাবে বলে প্রস্তুত হচ্ছিল। যুবকের মায়ের খুব দুশ্চিন্তা : শ্বশুর বাড়ি গিয়ে তার গেঁয়ো ছেলে না-জানি কীসব কাণ্ড করে বসে, কেমন উলটো পালটা কথা বলে বসে। এইজন্যে তার মা তাকে আগেভাগে কিছুটা শিখিয়ে পড়িয়ে নিচ্ছিলেন, নানারকম প্রয়োজনীয় উপদেশ-নির্দেশও দিচ্ছিলেন।

ওদের বাড়িতে চেয়ার নেই। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে চেয়ার, অন্ততপক্ষে টুল ও বেঞ্চি কিছু একটা থাকতেই পারে। এই ভেবে মা ছেলেকে বললেন : 'শ্বশুরবাড়ি তুমি কখনো মেঝের উপর বসবে না। সবসময় উঁচু জায়গায় বসবে।'



'আচ্ছা, তোমার আদেশ আমার মনে থাকবে, মা।'— ছেলে বলল।

ছেলে ন্যালা-খ্যাপা। বোকার মতো উলটো পালটা কথা বলে বসে কারো কথার মাঝখানে— এই ভেবে মা ছেলেকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন : 'যখন তুমি ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে— বেশ বুঝে-সুঝে ওজন করে বলবে।'



ছেলে মাথা নেড়ে জবাব দিল : 'সে তোমাকে কিচ্ছুটি ভাবতে হবে না। আমি খুব সাবধানে কথা বলব, তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।'

শ্বশুরবাড়ি গিয়ে পৌঁছোতে শ্বশুর শাশুড়ি শুরুতেই খুব খাতির আর আদর যত্ন করতে লাগল এবং তাকে বসার জন্য একটা মাদুর পেতে দিল। কিন্তু সে তো মেঝের ওপর বসবে না— মা বলে দিয়েছে। অথচ আশেপাশে চেয়ার বা বেঞ্চি কিছুই নেই। সে বসে কোথায়? সামনেই একটা খড়ের গাদা ছিল। সে হঠাৎ উঠে গিয়ে তার উপরেই বসে পড়ল।

'বাবা, নেমে এসো', শাশুড়ি জামাইকে ডেকে বললেন, 'তুমি ওখানে গিয়ে বসলে কেন?'

শাশুড়ি ভাবল, নিশ্চয় তাঁদের কোনো ত্রুটি ঘটে গেছে। নতুবা জামাই এরকম অদ্ভুত কাণ্ডই বা করবে কেন?

'একটা হাতুড়ি,' জামাই জবাবে বলল। কেননা, সে মাকে কথা দিয়ে এসেছে— ওজন করে ভারি ভারি কথা বলবে।

'অ, তা হাতুড়ি দিয়ে কী হবে?' হতভম্ব শাশুড়ির জিজ্ঞাসা।

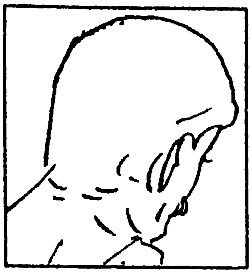
'একটা কুড়ুলের মাথা', জামাই জবাব দিল।

'কুড়ুলের মাথা?' শাশুড়ি যৎপরোনাস্তি ঘাবড়ে গেল।

'একটা গমভাঙা চাকি'— জামাই আবার বলে বসল।

গল্পে বলা হয়নি— এরপর কী হয়েছিল? তবে বুদ্ধিমান পাঠকদের বোধহয় তা বলে দেওয়ার দরকার হবে না, কী বল?

নাপিতের বুদ্ধি



এক সময় প্রতাপবর্মা নামে এক রাজা কেরালায় একটি ছোট্ট রাজ্য শাসন করতেন। তাঁর এক নাপিত ছিল। তার নাম আয়াপ্পেন। রাজা তাকে খুবই ভালোবাসতেন। সেই নাপিত প্রায় রোজই রাজপ্রাসাদে আসত এবং তাঁর সঙ্গে বেশ খানিকটা সময় গল্পগুজব করে ভালোমন্দ খেয়ে পেট ভরিয়ে তবে বাড়ি ফিরত।

একদিন রাজা আয়াপ্পেনকে বললেন ঃ

'আজ তুমি যা চাইবে, তা-ই দেব।— বলো তুমি কী চাও?'

নাপিত বলল ঃ 'মহারাজ, আমি চাই আপনি আমাকে আপনার প্রধানমন্ত্রী করুন।'

রাজা নাপিতকে প্রধানমন্ত্রীর পদ দিলেন।



রাজ্যের নিরাপত্তা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য রাজাকে একটা বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রতিপালন করতে হত। নতুন প্রধানমন্ত্রী রাজাকে বোঝাল, এত বড়ো একটা সৈন্যবাহিনী পরিপোষণের জন্য

রাজাকে বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়; অথচ সৈন্যেরা প্রায় সারাটা বছরই অকম্মার মতো বসে বসে খায় আর তাস, পাশা, দাবা খেলে সময় নষ্ট করে। কাজেই রাজকোষের অর্থ বাঁচাতে হলে রাজার উচিত ওইসব হতভাগাদের এখনই ছুটি করে দেওয়া। যুদ্ধ-টুদ্ধ বাধলে বরং তখন আবার তাদের পুনর্নিয়োগ করা যেতে পারে।

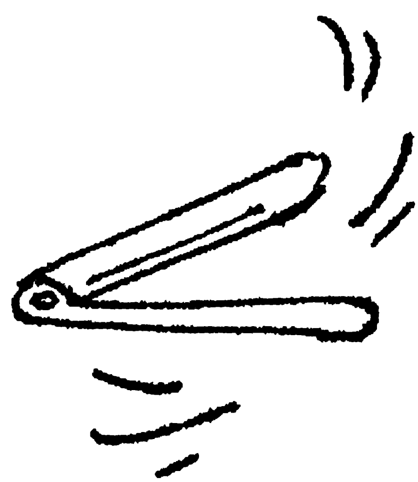
'শত্রুদের হাত থেকে রাজ্য রক্ষার জন্য বরং আমরা কয়েকশো ভালো ভালো কুকুর জোগাড় করি—তাতেই কাজ হবে।' মন্ত্রী রাজাকে বলল, তিনিও মন্ত্রীর কথায় সম্মত হলেন।

প্রতিবেশী রাজ্যের রাজার কানে এই খবরটা গিয়ে পৌঁছতে খুব একটা দেরি হল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার সৈন্য সংগ্রহ করলেন, এবং কয়েক দিনের মধ্যেই প্রতাপবর্মার রাজ্য আক্রমণ করলেন।

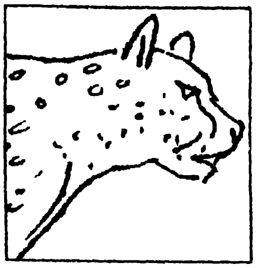
প্রধানমন্ত্রী শত্রুদের সঙ্গে লড়বার জন্য কুকুরগুলোকে লেলিয়ে দিল। কিন্তু ফল হল উলটো। কুকুরগুলো নিজেদেরই মধ্যে শুরু করল খেয়োখেয়ি। এইভাবে নিজেরাই ধ্বংস হল নিজেদের হাতে। একটা ঢিল না ছুঁড়েও প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা যুদ্ধে জিতে গেলেন। প্রতাপবর্মার রাজ্য কেড়ে নিয়ে তাকে দূর করে দিলেন রাজ্য থেকে।

কিন্তু মন্ত্রী আয়াপ্পেন তাতে কিছুমাত্র বিচলিত হল না।

'প্রভু', সে প্রতাপবর্মাকে বলল, 'ভেঙে পড়বেন না। আমরা একটা না একটা কাজ পেয়ে যাবই। আমার সঙ্গে আমার পুরনো ক্ষুরটা আছে। আর মহারাজ, আমি আমার বাবার হাতের ক্ষুরটা আপনাকে উপহার দিতে পারি। খুবই ধারালো ক্ষুরটা। টাকা বলুন, ভালোবাসা বলুন- কোনো কিছুর বিনিময়েই আজকাল অমন সুন্দর একটা ক্ষুর আপনি কোথাও পাবেন না।'



সেই লোক যে চিতাবাঘের লেজ ধরেছিল



মালয়ালম ভাষায় 'চিতাবাঘের লেজধরা' বলে একটা প্রবাদ খুব চালু আছে। যখন কেউ কোনো একটা ঝামেলায় জড়িয়ে যায়, এবং তার থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পায় না, তখন বলা হয় লোকটা চিতাবাঘের লেজ ধরে বসে আছে।

নীচের গল্পটাই এই প্রবাদের উৎস।

এক সময় কেরালার গাঁয়ে এক অতিশয় চালাক ব্যবসায়ী ছিল। সে রোজই দূর দূরান্তের বাজারে জিনিসপত্র বিক্রি করতে যেত আবার ঠিক সন্ধের মুখেমুখে বাড়ি ফিরে আসত।

এইরকম একদিন বাজারে বেচাকেনা সেরে সেই ব্যবসায়ী নিজের গাঁয়ে ফিরছে পথে পড়ে একটা ঘন জঙ্গল। হঠাৎ একটা চিতাবাঘ সেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে থাবা তুলে তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। চিতাবাঘটা মনে মনে ভাবতে লাগল এই ধূর্ত ব্যবসায়ীকে দিয়ে আজ একটা তোফা ভোজ হবে।

ব্যবসায়ী যে খুব ধূর্ত ছিল সেকথা আগেই বলেছি। চিতাবাঘটাকে দেখে সে ভয় পেলেও ঘাবড়ে গেল না। হঠাৎ ই তার মাথায় একটা বুদ্ধি গজাল। সে চিতাবাঘের লেজটা ধরে বসল খপ করে। ধরেই তাকে বনবন করে পাক দিতে লাগল। এই অবস্থায় বাঘটা তাকে কিছুতেই আক্রমণ করতে পারল না। ঘুরুনির চোটে তার আইঢাই অবস্থা। মাথা ঘুরতে লাগল। সারাটা শরীর গুলিয়ে উঠল

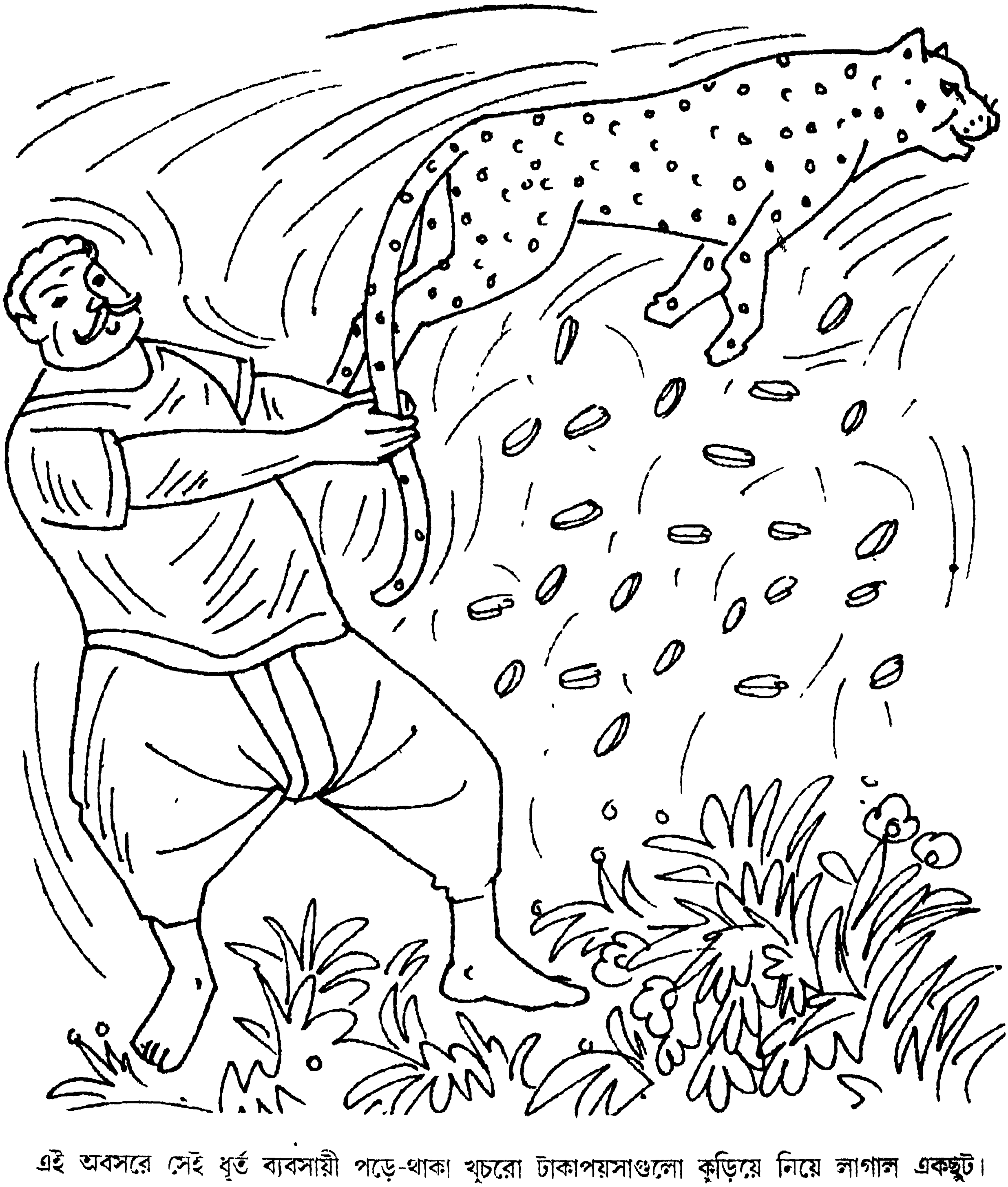
বেশ কিছুক্ষণ ধরে পাক দিয়ে চলল ব্যবসায়ী। তার কোমরে বাঁধা ছিল একটা থলি, আর, সেই থলিতে ছিল অনেক খুচরো টাকা-পয়সা। কিন্তু বাঘের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে সেই থলিটা খুলে গেল এবং সেই খুচরো টাকা পয়সাগুলো ছড়িয়ে পড়ল চার ধারে।

ঠিক সেই সময় সেখানে এসে উপস্থিত হল সেই গাঁয়েরই একজন লোক। সে দেখল— ব্যবসায়ী লেজ ধরে একটা চিতাবাঘকে ঘুরিয়েই চলেছে। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ভাই, ব্যাপার কী? বাঘটাকে এভাবে ঘুরিয়ে তোমার লাভ কী হচ্ছে?'

'ও, তুমি দেখতে পাচ্ছ না?' সেই ধূর্ত ব্যবসায়ী বলল : 'এটা একটা অদ্ভুত চিতাবাঘ। যদি তুমি এর লেজ ধরে একে ঘুরাতে থাকো, তাহলে দেখবে রাশ রাশ টাকা-পয়সা ওর দেহ থেকে ঝরে পড়ছে। আমি অনেক পেয়েছি। যদি ইচ্ছে হয় তুমিও একবার চেষ্টা করে দেখতে পার। কিন্তু আমি যেগুলো পেয়েছি, সেগুলো তোমাকে দিচ্ছি না।'

দ্বিতীয় লোকটা ছিল এক নম্বরের হাঁদা-গঙ্গারাম। সে ভাবল : তা-ই হবে বুঝি! নইলে এত টাকা-পয়সা চারধারে ছড়িয়ে পড়ে আছে কেন!

সুতরাং, আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে সে চিতাবাঘের লেজটা ধরে বসল এবং ব্যবসায়ীকে অনেক ধন্যবাদ দিতে লাগল।



এই অবসরে সেই ধূর্ত ব্যবসায়ী পড়ে-থাকা খুচরো টাকাপয়সাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে লাগাল একছুট। দ্বিতীয় লোকটা তখন চিতার লেজটা কষে ধরে প্রাণপণে কেবল তাকে ঘুরিয়েই চলেছে।

ভুলো জামাই



এক নতুন জামাই বউকে রেখে কী-একটা কাজে একাই শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল। শ্বশুর বাড়িতে ছিল না। শাশুড়ি ছিল। জামাইকে পেয়ে শাশুড়ি তো মহাখুশি! কোথায় রাখবে জামাইকে, তা যেন ভেবেই পায় না। আদর-যত্ন, খাতির আর খানাপিনার বহর ও আড়ম্বরে গাঁ-সুদ্ধ লোকের চোখ একেবারে ছানাবড়া হয়ে গেল। সববাই একবাক্যে বলতে লাগল : হ্যাঁ, একেই না বলে জামাই আদর!

যে-সব ভালোমন্দ খাবার খাওয়ানো হল জামাইকে, সেগুলোর মধ্যে জামাইয়ের সবচেয়ে জিবে ধরেছিল 'কোঝুক্কাট্টা'। নামটা বিদঘুটে হলে কী হয়, — খাবার মতো জিনিস একটা। বারবার খেয়েও তৃপ্তি হয় না।



কোঝুক্কাট্টা এক জাতের মালয়ালি পিঠে। আকারে গোল বলের মতো, এক থেকে দু-ইঞ্চি পুরু। চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি, ভেতরে নারকেল ও চিনির পুর দেওয়া।

কোঝুক্কাট্টার স্বাদ, জামাইয়ের মনে হয়েছিল— যেন অমৃতকেও হার মানায়। ইতিপূর্বে এই দুর্লভ বস্তুটার সঙ্গে কোনো পরিচয় ছিল না তার। শাশুড়িকে জিনিসটার নাম জিজ্ঞেস করলে, তিনিই জানালেন— ওর নাম কোঝুক্কাট্টা।

'তোমার ভালো লেগেছে?' শাশুড়ি আহ্লাদে গলে গিয়ে বললে কথাগুলো।

'হ্যাঁ', জামাই জবজবে খুশি-খুশি গলায় জবাব দিলে : 'ভারি চমৎকার জিনিসটা!'

শাশুড়ি আবার একগাল হেসে বললে : বাড়ি গিয়ে মেয়েকে বোলো। সে-ই তৈরি করে খাওয়াবে তোমাকে। কীভাবে তৈরি করতে হয়, আমিই তাকে শিখিয়েছি কিনা!

তাই বুঝি! জামাই অবাক হল। কই, তার বউ তো কখনো কোঝুক্কাট্টা তৈরি করে খাওয়ায় নি তাকে!

বাড়ি ফেরার পথে সারাক্ষণ জামাইবাব্যক্তি মনে মনে আওড়াতে লাগল— 'কোঝুক্কাট্টা' 'কোঝুক্কাট্টা' — পাছে কখন ভুলে বসে!

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ফেরার পথে লাফ মেরে একটা ছোট্ট নদী ডিঙোবার সময় জামাই মালয়ালি ভাষায় 'থিট্টি' 'থিট্টি' বলে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভুলে মেরে দেয় এতক্ষণ ধরে মুখস্থ করা শব্দটা। সে 'কোঝুক্কাট্টা' শব্দটার পরিবর্তে 'থিট্টি' 'থিট্টি' করতে করতে বাড়ি পৌঁছয়।

বউ হাসিমুখে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতেই সে বলে ওঠে : 'জানো, তোমার মা আমাকে থিট্টি খেতে দিয়েছিল। চমৎকার জিনিসটা। তা আজ —এক্ষুনি আমাকে বানিয়ে দাও-না খানকতক। আমার ভারি খেতে ইচ্ছে করছে।'

থিট্টি! থিট্টি আবার কী! বউ কপালে চোখ তুলে স্বামীর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। এরকম কোনো খাবারের নাম সে তো কানেও শোনে নি কখনো। 'থিট্টি' তো তাদের ভাষায় একটা অব্যয় শব্দ মাত্র।



অবাক হয়ে সে স্বামীকে জিজ্ঞেস করে : 'থিট্টি আবার কী জিনিস! অমন বস্তু বাপের জন্মে আমি যে চোখেও দেখি নি।'

জামাই বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল, বলল : 'আরে বাবা, থিট্টি থিট্টি তোমার মা যে বললে, আমার মেয়ে থিট্টি বানাতে জানে।'

বউ এক অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। একটু রাগের স্বরে জামাই বলে : 'দেখো, আমার সঙ্গে বেশি চালাকি কোরো না। যাও -- আমার হুকুম, থিট্টি বানিয়ে আনো।'

কিন্তু তখনো বউটি বোকা প্যাঁচের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবলই ঘামাচ্ছে। বউয়ের এইরকম ন্যাকামি আর অগ্রাহ্যির ভাবখানা দেখে জামাইবাবাজি রেগে টং হয়ে ওঠে। রাগ না চণ্ডাল। রাগে ওর কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে যায়।

'ও, আমার সঙ্গে মশকরা করছ, তাই না? ঠিক আছে, দু ঘা পিঠে পড়লেই তখন বাপ বাপ বলে তুমি থিট্টি বানাতে বসবে।' — এই বলে সেই বদরাগী জামাইটা বউয়ের পিঠে গুমগুম করে বসিয়ে দিলে ঘা কতক।

বেচারা বউটা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলে, কাঁদতে কাঁদতে পিঠটা দেখিয়ে বলতে লাগলে : 'তুমি একটা জন্তু — একটা ষাঁড়। প্রাণে একটুও দয়ামায়া নেই তোমার। দ্যাখো, -- মেরে আমার পিঠটা কেমন কোঝুক্কাট্টার মতো ফুলিয়ে দিলে! হেই মা-গো--হেই বাবা গো-'

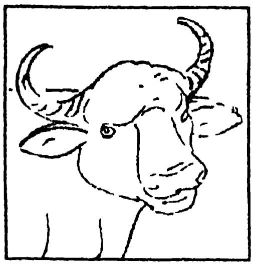
বউয়ের কথা শোনামাত্র 'এই তো—পেয়ে গেছি। কোঝুক্কাট্টা! কোঝুক্কাট্টা! থিট্টি নয় — কোঝুক্কাট্টা!' বলে জামাইটা আনন্দে লাফাতে লাগল। তারপর লজ্জা পেয়ে বউয়ের মাথায় পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে মিষ্টি গলায় বললে : 'বউ, কিছু মনে কোরো না, বেশ? আমি জিনিসটার নামটাই ভুলে গেসলাম! —কোঝুক্কাট্টা!... সোনা, এখন যাও; আমার জন্যে খানকতক কোঝুক্কাট্টা বানিয়ে আনো।'

কিছুক্ষণ পরে বউ ডজন খানেক কোঝুক্কাট্টা বানিয়ে এনে স্বামীকে দিতে সে গপাগপ্-গপাগপ — নোলার মধ্যে চালান করে দিলে।



বিহার

এক তাঁতি এবং একটি অদৃশ্য মোষ



কোনো এক গ্রামে একজন তাঁতি বাস করত। সুতো কেটে কাপড় বোনায় তার ছিল খুব সুনাম। কিন্তু টাকা পয়সা তেমন হত না। কিছুকাল আগেই তাঁতি বিয়ে করেছে। খরচ-খরচা বেড়েছে। সংসার চালাতে হিমসিম খেয়ে যেত তাঁতি। বউয়েরও ছিল নানারকম বায়নাক্কা। তাঁতি তাই মনে মনে কেবলই ভাবত, কী করলে আরো বেশি পয়সা করা যায়।

হঠাৎ একদিন তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সে বউকে বললে, ভাবছি একটা মোষ কিনব। মোষ থেকে আজকাল ভালোই আয় হয়।



বউ বললে, সে তো ভালো কথা। মোষ কেনার খরচা জোগাতে পারলেই হবে। খাওয়ানোর জন্যে তেমন চিন্তা নেই।

তাঁতি বললে, জমানো টাকা থেকে একটা মোষ ঠিকই কিনতে পারব। মোষের দুধ বেচব। দই, খোয়া ক্ষীর বেচব। টাকা দিব্যি উঠে আসবে।

বউ শুনে আহ্লাদে বললে, বাপের বাড়িতে আজ পর্যন্ত কিছুই পাঠাতে পারি না। মোষটা এলে, একটু দুধ-কী-দই পাঠাতেও পারব।

কথা শুনে রেগে উঠল তাঁতি, বলল - বাঃ, আমি কিনা গাঁটের কড়ি খরচা করে মোষ কিনব, আর উনি বাপ-ভাইকে দুধ দই খাওয়াবেন। একী আবদার নাকি?

বউ এ কথায় রেগে গেল; বললে, মেয়ের বিয়ে দিয়েছে বলে কি মেয়ে একেবারে পর হয়ে গেছে নাকি? বেশ করব। আমার বাপ-ভাইকে আমি খাওয়াব — নাতো কি ভুতো-গোয়ালা খাওয়াবে?

তাঁতি বললে, বাহারে মজা! আমার টাকা, আমার মোষ, এতে তোমার অধিকার আসছে কোত্থেকে? আর যদি আসেও, তাতে তোমার বাপ-ভাইয়ের বখরা নেয়ার কি আছে?



বউ বললে, মুখ সামলে কথা বল। আমার বাপ-ভাই অমন লোক নয় যে, তাদের নামে অমন করে খোঁটা দেবে।

তাঁতি বললে, কী! অত বড়ো কথা? আমি কিনা মুখ সামলে কথা বলব? দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি এবার। – বলে তাঁতি ভয়ানক মার মারতে লাগল বউকে। বউ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। তার কান্না থামাতে তাঁতি আরো ঘা কতক দিলে।

কাঁদতে কাঁদতে বউ বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। তাঁতিও ছুটল পেছন পেছন। এক সময় বউ গিয়ে ঠিক বাপের বাড়িতেই উঠল। তাঁতি ভাবল বউ একা থাকলে, সব কথা বাপ ভাইকে বলে দেবে। তার চেয়ে সেও যদি সঙ্গে থাকে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। ভাববে বেড়াতে এসেছে। এই ভেবে সেও গিয়ে উঠল শ্বশুরবাড়ি। বড়ো শ্যালক দাঁড়িয়েই ছিল দরজার কাছে। বললে, এসো-এসো। খবর সব ভালো তো? কতদিন পরে এলে তোমরা!

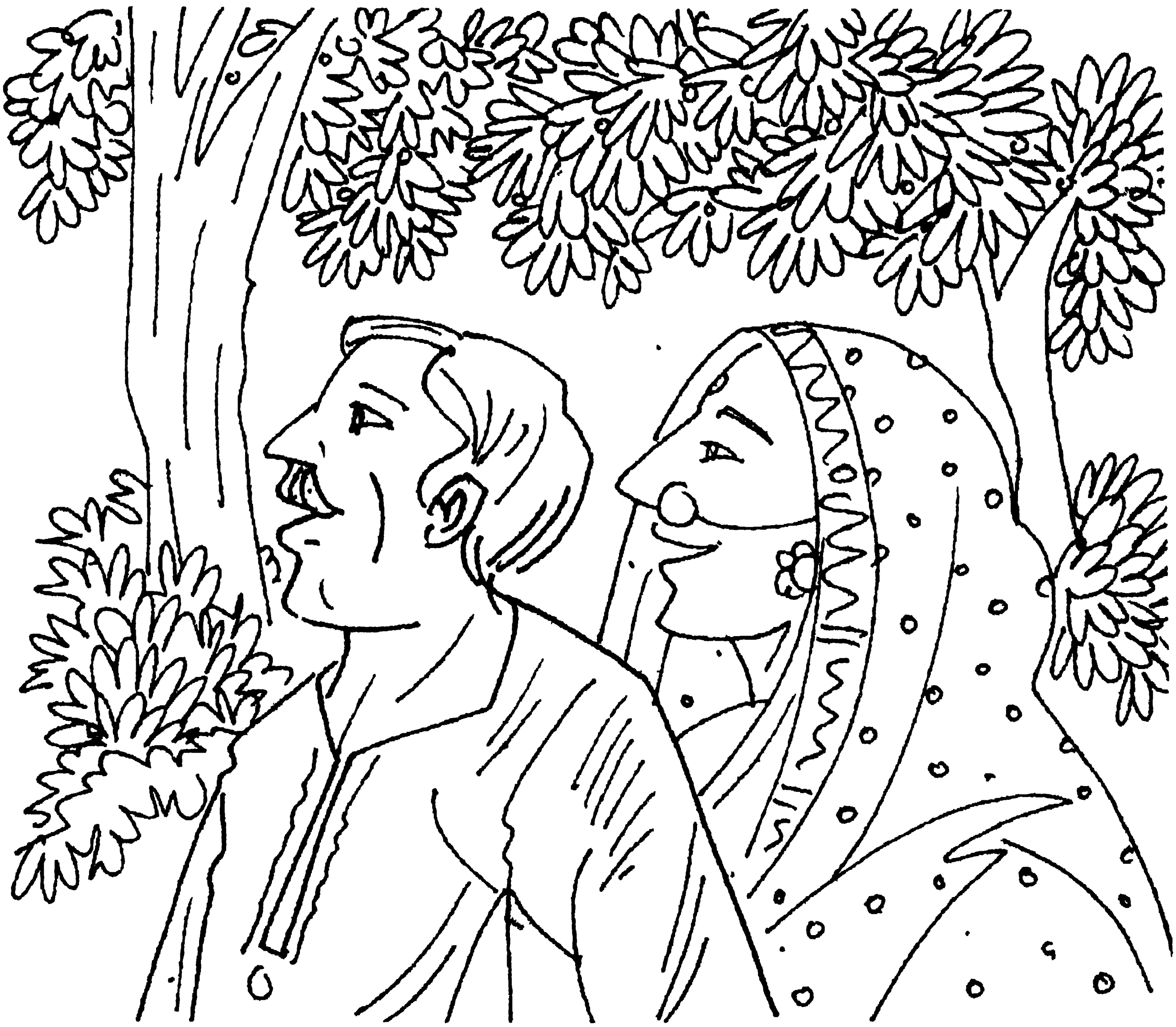
তাঁতি খুব লজ্জা পেয়ে গেল মনে মনে। আসলে দিন দশেক আগেই তারা দুজনে ঘুরে গেছে এখান থেকে। বড়ো শ্যালক এমন ঠোঁটকাটা, তা আর সে কী করে জানবে! এমন জানলে সে আর ঢুকতোই না এ বাড়ি। তাঁতি বললে, আপনার বোন তো পারলে রোজই আসত। কী করা যাবে, আমার সময় তো আর হয়ে ওঠে না সব সময়।

বড়ো শ্যালক বললে, তাতো বটেই। তবে কিনা, এই যে হপ্তায় হপ্তায় একবার ক'রে ঘুরে যাচ্ছো, এই-বা কটা জামাই পারে? উত্তরে তাঁতি আর একটি কথাও বার করতে পারল না মুখ থেকে।

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁতি বসেছিল দাওয়ায়। বড়ো শ্যালক এসে বললে, সব্বোনাশ,

হয়ে গেছে আমার। তাঁতি অবাক হয়ে বললে, কী হয়েছে? বড়ো শ্যালক বললে, তোমার মোষ আমার বাগানের বেড়া ভেঙে ফুলগাছ, সবজিগাছ— সব একেবারে তছনছ করে দিয়েছে। এইমাত্র শুনলুম।

তাঁতি বললে, একদম বাজে কথা। এ হতেই পারে না। আমার কোনো মোষই নেই। কেনাই হয়নি। সে কী করে বাগান নষ্ট করবে?

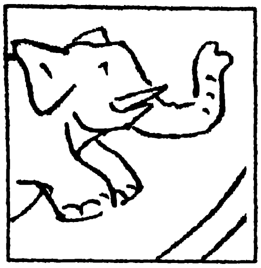


বড়ো শ্যালক বললে, তা কী হয়? আমার বোন যে সেই মোষেরই দুধ দই পাঠাতে চেয়ে মার খেয়েছে!

কথা শুনে লজ্জায় মাথা হেঁট করে ফেললে তাঁতি। বললে, আমি ভুল করে ফেলেছি। আমায় মাফ করে দিন।

বউকে সঙ্গে নিয়ে পরদিনই বাড়ি ফিরল তাঁতি। মনে মনে ঠিক করল, জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখার অভ্যেসটা ছাড়তে হবে। আব অকারণে ঝগড়া ঝাঁটিও আর করব না।

স্বর্গের হাতি ও মর্তের মানুষ



সে এক জায়গা ছিল বটে।

সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ। নধর গাছপালায় ভরা বনাঞ্চল। লতা-পাতা, ফলমূলে একেবারে ভর-ভরন্ত। লোভে পড়ে স্বর্গের হাতি নেমে আসত সেখানে। সকাল থেকে সন্ধে প্রাণভরে এটা-ওটা যা প্রাণ চাইত, তা-ই খেত। তারপর এক সময় ঠিক ফিরে যেত স্বর্গে। রোজ-রোজ সে এভাবেই আসত, খেত আর চলে যেত। কেউ কিন্তু জানত না তার আসা-যাওয়ার কথা।

এদিকে কাছেই এক গ্রামে বাস করত এক বুড়ো। বয়েস হয়েছে বলে খাটতে-খুটতে তেমন পারত না। সংসার চালাতে হিমসিম খেয়ে যেত তার বউ। সময়-সুযোগ পেলেই সে বুড়োকে বলত, বনে গিয়ে কাঠ কেটে আনো। কাঠ বেচলে পয়সা হবে। বাড়ি বসে থাকলে কি খাবার জুটবে?

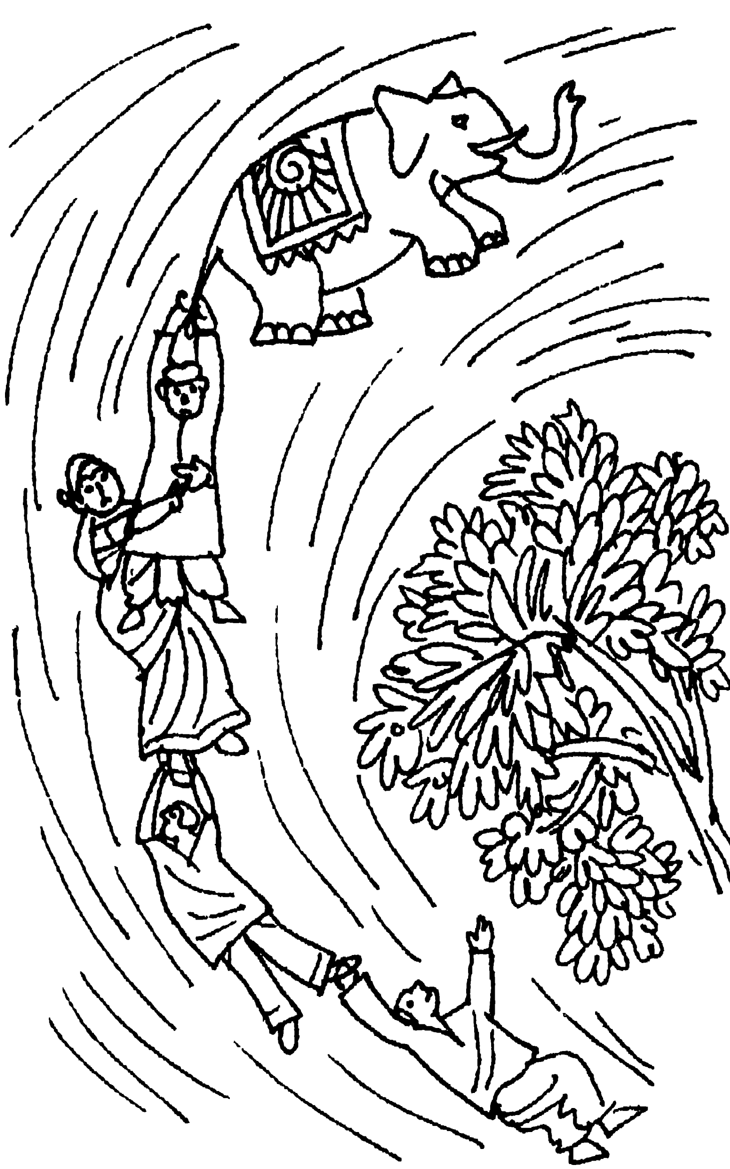
রোজ রোজ এমন কথা শুনতে শুনতে বুড়ো একদিন রেগে-মেগে সত্যি-সত্যিই বেরিয়ে পড়ল। ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হল সেই জায়গায়, যেখানে স্বর্গের হাতি নেমে আসে। স্বর্গের হাতিকে ঘাস খেতে দেখে অবাক হয়ে গেল বুড়ো। হাতিটা কিন্তু তার দিকে ফিরেও তাকাল না। সারাদিন ধরে সে ঘাস আর গাছপালার কচি ডাল খেল। তারপর এক সময় স্বর্গে উড়ে যাবার জন্য তৈরি হল। বুড়ো এতক্ষণ লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখছিল। যেই সে দেখল, হাতিটা উড়তে যাচ্ছে, সে কোনো রকমে ছুটে এসে হাতির লেজটা ধরে ফেলল। হাতি কিন্তু তাতে কিছুই মনে করল না। বুড়োকে ঝুলিয়ে নিয়ে উড়ে চলল স্বর্গের দিকে। এক সময় বুড়ো পৌঁছে গেল স্বর্গে। স্বর্গে অফুরন্ত কাজ। বুড়োদের জন্যে কত হালকা কাজ, কিন্তু কত বেশি মজুরি! বুড়ো খুব সামান্য কাজ করেই অনেক অর্থ পেয়ে গেল। পরদিন হাতি যখন মর্তে নামবে, সে এসে আবার চেপে ধরল হাতির লেজটা। ফলে যেখান থেকে গিয়েছিল, সেখানেই ফিরে এল। তাড়াতাড়ি সে রওনা হয়ে গেল বাড়ির পথে। বাড়ি ফিরে দেখল, বউ কান্নাকাটি করছে। সারাদিন-রাত সে কিছুই খায়নি। বুড়ো তাকে অবাক করে দিতে আস্তে আস্তে সব কথা খুলে বলল। তারপর স্বর্গ থেকে কিনে-আনা সেরা আর সরেস সব খাবার-দাবার খেল দুজনে মিলে।

বুড়োর বউ খুব খুশি। বলল, তুমি রোজ ঠিক সন্ধের সময় হাজির হবে। হাতি যেই উড়বে, তুমিও তার লেজ চেপে ধরবে। আমাদের আর কোনো দুঃখ থাকবে না।

কথামতো বুড়ো তাই করতে লাগল। ফলে তার পেল্লায় বাড়ি হয়ে গেল। দাস-দাসী হল। অঢেল অর্থ আর বিপুল সম্পত্তি নিয়ে সে মহাসুখে বাস করতে লাগল।

একদিন বুড়োকে তার বউ বলল, বড়ো একঘেয়ে লাগছে। একটু স্বর্গ থেকে বেড়িয়ে এলে হয়। ফেরার সময় আমিও কিছু রোজগার করে ফিরব। আমায় তুমি সঙ্গে নিয়ে চল।

বুড়ো তার কথা শুনে একদিন তাকে নিয়েও চলে গেল স্বর্গে। স্বর্গে খুব খাওয়া-দাওয়া হল। ঘুরে-ফিরে



জায়গা দেখা হল। কিন্তু রোজগারের কথা মনে পড়ল না। ফলে আবার একদিন দুজনে গেল তারা। এভাবে বেশ কিছুদিন দুজনের রোজগারে তাদেব সম্পদ দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

বুড়োর হঠাৎ মনে হল শুধু নিজেদের হলেই হবে না। তার আত্মীয়-স্বজনেরও টাকা-পয়সা হলে ভালো হয়। গ্রামের লোকের কাছে, তার আত্মীয়রাও যাতে তারই মতন কদর পায়, তার জন্য সে তার আত্মীয়দের একদিন ডেকে পাঠিয়ে বলল তার মনের কথা।

সে কথা শুনে আত্মীয়রা তো স্বর্গে যাবার জন্যে এক পায়ে খাড়া। সবাই বুড়োব তোষামোদ করতে লাগল। তোষামোদের কথা শুনে বুড়ো, বুড়োর বউ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। মুখে তাদেব কেবলই স্বর্গের কথা। সবাই বড়ো-বড়ো হাঁ করে সে-সব কথা গিলতে লাগল। আর মনে মনে বলতে লাগল — দাঁড়াও, আগে একবার স্বর্গে গিয়ে পৌঁছাই। তারপর তোমাদের থেকে দ্বিগুণ বড়োলোক না হয়েছি তো আমাদের নামে কুকুর পুষো।

অনেকদিন এভাবে কাটিয়ে বুড়ো একদিন বড়োমানুষি দেখাতে সত্যি-সত্যিই নিয়ে চলল তাদের। হাতি উড়ল আকাশে। লেজ ধরে আছে বুড়ো। তার কোমর ধরে ঝুলে আছে তার বউ। তারপর এভাবেই একে একে বিবাট একটা দল।

উড়তে উড়তে যাচ্ছে আর খুব 'বক-বক কবছে বুড়ো। আত্মীয়রা অবাক হয়ে কেবলই জানতে চাইছে, স্বর্গে গেলে একজন মানুষ কত বড়োলোক হতে পারে? বুড়ো কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারছে না। এক সময় বুড়ো বলল. না:, তোমাদের বাপু বুঝিয়ে ওঠা যাবে না। স্বর্গে একটা একসেরি বাটখারা কতবড়ো জানো?

সবাই একসঙ্গে বলল.— কত বড়ো? কত বড়ো? বুড়ো তখন দুটো হাত দুদিকে ছড়িয়ে বলল, এই— এ্যাত্তো বড়ো। আর যেই বলা, সঙ্গে সঙ্গে সকলে ছিটকে পড়ল মাটিতে। সবারই ভবলীলা হল সাঙ্গ।

অতিলোভের এরকমই ফল।

শিশু বর যুবতি কনে



একদিন এক সাধু হঠাৎ রাজবাড়িতে এসে হাজির। বল্লেন, রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাই। প্রহরী ছাড়বার পাত্র নয়; বলে, রাজামশাই অনুমতি দিলে আপনি প্রবেশ করবেন। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি খবর পাঠাচ্ছি।

প্রহরীর কথা শুনে সাধু একটু হাসলেন মাত্র। কিছু বললেন না। প্রহরী খবর পাঠাল রাজার কাছে। কিন্তু যে লোকটি খবর নিয়ে গেল, সে রাজামশাইকে কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই অবাক হয়ে গেল। সে দেখল, সাধু বসে বসে রাজার সঙ্গে কথা বলছেন। লোকটিকে দেখে রাজামশাই খবর জানতে চাইলেন। লোকটি ভয়ে ভয়ে তার আশ্চর্যের কথা কটি বলল কথা শুনে রাজামশাই একটু হাসলেন। তারপর তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

লোকটি ফিরে গেলে, রাজামশাই সাধুকে বললেন, এতদিন সন্তান কামনায় মনে মনে পাগল হয়ে ছিলাম। বড়ো কষ্ট ছিল মনে। সুখ-অর্থ-খ্যাতিতে মন ভরত না। আজ আপনার আশীর্বাদে আমি একটি পুত্রসন্তান লাভ করেছি। আপনি আশীর্বাদ করুন, সে যেন দীর্ঘজীবী হয়।

রাজার কথা শেষ হতে সাধু বললেন, দীর্ঘায়ু সে হতে পারে। তবে, তার ছয়মাস মাত্র বয়সেই যদি বিবাহ দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই। নচেৎ নয়।

সাধুর কথা শুনে রাজা বললেন, আমার একমাত্র পুত্রকে বাঁচাতে আপনি যেমন বললেন, আমি তেমনই করব। আপনার আশীর্বাদ পেলে আমার কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলাও যে খুব একটা সহজ কাজ নয়, এটা রাজা বুঝলেন অনেক পরে। তখন রাজপুত্রের বয়স ঠিক ছয় মাস। অনেক ভাবনা-চিন্তা করেও রাজা ঠিক করতে পারলেন না কীভাবে কী করবেন। শেষমেশ মন্ত্রীকে ডেকে বললেন ঘটনাটা। মন্ত্রী খানিকটা চিন্তা করে বললেন, মহারাজ, কাজটা একটু কঠিন বটে, কিন্তু অসম্ভব নয়।

রাজা বললেন, মহামন্ত্রী! আপনি কি কোনো কৌশল উদ্ভাবন করতে পেরেছেন?

মন্ত্রী বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ। তবে সে কৌশলের কথা একমাত্র আপনাকেই জানাতে চাই; এবং তা অতি গোপনে।

মন্ত্রীর গোপন পরামর্শে খুশি হলেন রাজা। কন্যা নির্বাচন করা হল শুভদিন দেখে। শুরু হয়ে গেল বিবাহের আয়োজন। বিবাহের দিন যথাসময়েই বর উপস্থিত হল রাজকন্যার প্রাসাদে। সকলে দেখল— সুপুরুষ বর নামছে শ্বেতহস্তীর পিঠে বসানো সোনার হাওদা থেকে। সকলেই মহাখুশি। জাঁকজমক আর মহা-ধুমধামে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল।

চেলি কাপড়ে ঢাকা মুখ, গায়ে চাদর জড়ানো রাজপুত্র। ভারি সুপুরুষ চেহারা। রাজকুমারী খুব খুশি। গভীর রাতে রাজকুমারীর চোখে ঘুম নেমে আসছে দেখে রাজপুত্র বললেন, একটা পান খেতে পারলে ভালো হত।



রাজকুমারীর তন্দ্রা কেটে গেল। রাজপুত্রের হাতে একটি পানের খিলি তুলে দিয়ে রাজকুমারী বললেন, এত রাতে পান খাচ্ছেন কেন? রাজপুত্র জবাবে হাসলেন। বললেন, আজ হঠাৎ ইচ্ছে হল। তাই।

রাজকুমারী বললেন, আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে। রাজপুত্র বললেন, ঘুম পেলে ঘুমোনোটাই তো নিয়ম। কথা শুনে রাজকুমারী হাসলেন। তারপর ঘুমের টানে ধীরে ধীরে শুয়েই পড়লেন সোনার পালঙ্কে।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল রাজকুমারীর। ঘুম ভাঙার পর চোখ মেলতেই চমকে উঠলেন তিনি। তাকিয়ে দেখলেন, সোনার পালঙ্কে শুয়ে রয়েছে একটি শিশু। তিনি কিছুতেই ভেবে উঠতে পারলেন না— সুপুরুষ যুবক রাজপুত্র কীভাবে ছোট্ট শিশুতে পরিণত হয়ে গেলেন!

রাজকুমারী পালঙ্ক থেকে নেমে শাড়ির আঁচল গায়ে তুললেন। কিন্তু তোলার পরই হঠাৎ তাঁর মনে হল, শাড়ির আঁচলে যেন লাল কালিতে কী-সব লেখা রয়েছে। তিনি আঁচলটিকে সামনে মেলে ধরলেন, আর অবাক হয়ে গেলেন দেখে। লালকালি নয়, পানের লাল রস দিয়ে লেখা কার যেন চিঠি!

রাজকুমারী মনকে বশে রেখে ধীরে ধীরে চিঠিটি পড়লেন। তারপর নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। চিঠি থেকে তিনি সবকথাই জানতে পেরেছেন। জানতে পেরেছেন যে, ওই শিশুটিই তাঁর স্বামী। যাকে তিনি

স্বামী বলে ভেবেছিলেন, তিনি আসলে মন্ত্রীপুত্র। শিশু রাজপুত্রের বিবাহদান এই ধরনের ছল ছাড়া কিছুতেই নাকি সম্ভব ছিল না। মন্ত্রীপুত্র নাকি রাজপুত্রকে কোলে নিয়ে চাদর ঢাকা দিয়ে রেখেছিলেন। সিঁদুর পরানোর সময় রাজকুমারীর সিঁথিতে শিশু রাজপুত্রের ছোট্ট একটি আঙুলের সিঁদুরই নাকি স্পর্শ করেছিল। অতি সাবধানে মন্ত্রীপুত্র এসব কাজ করেন। তারপর মাঝরাতে রাজকুমারীর ঘুমের সুযোগ নিয়ে তিনি চিবোনো পানের রস দিয়ে ওই চিঠি লেখেন।



সব কথা জানতে পেরে শিশু রাজপুত্রকে বাঁচানোর কথা ভাবলেন রাজকুমারী। ভেবে দেখলেন, সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। দেরি হলে সকলেই জানতে পারবে। তাঁর বাবা অপমানের শোধ তুলতে শিশুটিকে নিশ্চয়ই হত্যা করবেন।

এসব কথা ভেবেই রাজকুমারী অন্ধকার থাকতে থাকতেই প্রাসাদ ত্যাগ করলেন। তারপর রাজপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বনপথ ধরলেন। বনের পথে এগোতে এগোতেই তাঁর কেটে গেল দিন-মাস-বছর। গাছের কাছে ফল চেয়ে ক্ষুধা মেটান। নদীর কাছে চান তৃষ্ণা নিবারণের জল। শিশুস্বামীকে কোলে নিয়ে মোষের পিঠে চেপে পার হয়ে যান বহু ক্রোশ পথ। রুইমাছ তার পিঠে করে তাঁদের নদী পার করে দেয়। এভাবেই কেটে গেল বেশ কয়েকটা বছর।

একদিন রাজকুমার যৌবনে উপনীত হলেন। তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে যাওয়ার কামনা জাগল রাজকুমারীর মনে। বনপথে চলতে চলতে তিনি একটি কুটির দেখতে পেলেন। কুটিরে ছিলেন এক সাধু। অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ সবকিছুই বর্তমানের মতো পরিষ্কার দেখতে পেতেন তিনি। রাজকুমারী তাঁর কাছে স্বামীগৃহের ঠিকানা জানতে চাইলেন। সাধু ঠিকানা বলে দিলেন অনায়াসে। কিন্তু রাজকুমার ও রাজকুমারীকে ঠিকানা অনুযায়ী চলতে গিয়ে বহু বন, বহু নদী পার হতে হল।

একদিন দুজনে মিলে শেষমেশ প্রাসাদের দ্বারে এসে পৌঁছোলেন। রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা হল এক পরিচারিকার। পরিচারিকা খবর নিয়ে ছুটে গেল রানিমায়ের কাছে। রানিমা-র সঙ্গে যখন দেখা হল, দুজনের, রানিমা ভীষণ খুশি হলেন। ছেলেকে নিজের ছেলে বলে চিনতে পেরে তাঁর আনন্দের অবধি রইল না। দু-ফোঁটা আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।

পুজো পাচ্ছেন ব্রহ্মদৈত্য



পুরাকালের রাজা ছিলেন শালিবাহন। চৈনপুরে ছিল তাঁর রাজত্ব। রাজার ছিল হরেকরকম সমস্যা। একা-একা মাথা খাটিয়ে সব সমস্যার সমাধান করতে পারতেন না। তখন তিনি অন্যের পরামর্শ নিতেন। পরামর্শ যাঁরা দিতেন, তাঁদের মধ্যে হর্ষ পাঁড়ে ছিলেন প্রধান। বেদ পুরাণে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল হর্ষর। বুদ্ধি ছিল প্রখর। কনৌজের ব্রাহ্মণ হর্ষ অনায়াসেই রাজপুরোহিত হতে পেরেছিলেন।

পরামর্শদাতা হিসেবে হর্ষর প্রতিপত্তি যত বাড়ছিল, ততই ঈর্ষায় জ্বলে মরছিলেন রাজার ছোটোরানি। ছোটোরানি ছিলেন রাজার খুব প্রিয়। পরামর্শ তিনিও দিতেন রাজাকে মাঝে মাঝে। রাজা কিন্তু হর্ষর উপরই নির্ভর করতেন বেশি। ছোটোরানি তা জানতেন। তাই সব সময়ই চেষ্টা করতেন হর্ষর গর্ব খর্ব করতে। কিন্তু রাজার কারণেই পেরে উঠতেন না।

তবে ছোটোরানি কিন্তু জানতেন যে, রাজা খুব কান-পাতলা মানুষ। মোটামুটি গুছিয়ে কোনো মিথ্যা বললেও তিনি বিশ্বাস করে নেন। না, হর্ষ কখনও মিথ্যা বলতেন না। কিন্তু সুযোগ পেলেই মিথ্যার আশ্রয় নিতেন ছোটোরানি। রাজা বুঝতেন না।

হর্ষকে সম্মান জানাতে রাজা হঠাৎ প্রাসাদের কাছাকাছি একটি বাড়ি হর্ষকে দান করলেন। এই ঘটনায় ছোটোরানি ভয়ঙ্কর রেগে উঠলেন মনে মনে।

একদিন গভীর রাতে ছোটোরানি প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়েছিলেন। পাশে ছিলেন রাজা শালিবাহন। ছোটোরানি বললেন, দেখুন মহারাজ, হর্ষ পণ্ডিতের ঘরে এখনও আলো জ্বলছে। রাজা বললেন, দেখতে পাচ্ছি, একটি আলোক-রশ্মি বেরিয়ে এসেছে জানালা দিয়ে। রানি বললেন, আপনি কি জানেন মহারাজ হর্ষ এখন কোন্ কাজে ব্যস্ত? রাজা বললেন, অনুমান হয় তিনি এখন শাস্ত্রপাঠে মগ্ন।

ছোটোরানি অদ্ভুত শব্দ করে হাসলেন। রাজা বিস্মিত হলেন। আমি কি ভুল বললাম কিছু? সুযোগ বুঝে ছোটোরানি বললেন, মহারাজ, হর্ষ পাঁড়ে অমন সরল মানুষ নয়। আমার কাছে খবর আছে, আজ রাতে হর্ষ একটি যজ্ঞ করছেন। যজ্ঞের উদ্দেশ্য হল আপনাকে ক্ষমতাচ্যুত ক'রে, আপনার সিংহাসন দখল। আমি কতদিন বলেছি মহারাজ, হর্ষকে বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু আপনি আমার কথা শোনেননি। মনে হচ্ছে, এখন আর কিছু করার নেই। যা হবার তা হয়েই যাবে।

কথা শুনে রক্ত হিম হয়ে গেল রাজা শালিবাহনের। পরদিনই তাঁর আদেশে হর্ষ আর তার পরিবারের মানুষজনকে বাড়ি থেকে উৎখাত করা হল। কেড়ে নেওয়া হল দান-করা জমি। ভেঙে ফেলা হল দান-করা বাড়ি। আশ্রয়হীন হর্ষ রাজদ্বারে অনশন করে চললেন দিনের পর দিন। তিনি এই অন্যায়ের প্রতিকার চেয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু রাজা কিছুতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করেন না।

রাজার বড়োরানি ছিলেন খুব ভালো। প্রাণে বড়ো দয়া-মায়া তাঁর। তিনি হর্ষর স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের

আশ্রয় দিয়েছেন। আহার্যের ব্যবস্থা করেছেন। রাজাকে কাছে পেলেই বলেছেন ঃ মহারাজ, আপনি নিশ্চয়ই কোনো ভুল সংবাদ পেয়ে এমন করেছেন। অনুগ্রহ করে খোঁজ-খবর নিন। এমনভাবে একজন মানুষের সর্বনাশ করবেন না।



কিন্তু রাজা তখন চলছেন ছোটোরানীর কথায়। বড়োরানির কথায় কর্ণপাত করলেন না। রাজদ্বারেই অবশেষে প্রাণত্যাগ করলেন হর্ষ। হর্ষের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে রাজা মনে মনে কষ্ট পেলেন একটু। আদেশ করলেন, রাজপুরোহিতের শেষকৃত্য যেন তাঁর সম্মান অনুযায়ী করা হয়।

তা-ই করা হল। হাতির দাঁতের পালঙ্কে রাখা হল হর্ষের দেহ। সর্বাঙ্গে চন্দন মাখানো হল। ধবধবে সাদা পোশাক পরানো হল। ফুলে ফুলে ঢেকে দেয়া হল দেহখানি। তারপর তা বয়ে আনা হল বারাণসীর মহাশ্মশানে। কয়েক মণ চন্দনকাঠ আর অঢেল ঘি-এর ব্যবস্থা রাখা ছিল। চিতা সাজানো হল। শোয়ানো হল হর্ষের দেহ। আগুন ধরানো হল।

এই পর্যন্ত সবই ঠিক-ঠাক ছিল। কিন্তু তারপরই এক মস্ত চমক। সকলে হতবাক হয়ে দেখল, বিশাল আকার, ভয়ঙ্কর শক্তিশালী, অসম্ভব লম্বা হয়ে হর্ষ দাঁড়িয়ে পড়েছেন চিতার উপর। তাঁর ধবধবে সাদা পৈতে হাওয়ায় উড়ছে। কাঁধে উত্তরীয়। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সোজা। তাকিয়ে আছেন স্থির দৃষ্টিতে। ধীরে ধীরে কথা বলতে শুরু করলেন হর্ষ। বললেন, রাজা! তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ। আমি এখন ব্রহ্মদৈত্য হয়েছি। আমি তোমার পরিবারকে ধ্বংস করে দেব। বাঁচিয়ে রাখব শুধু তোমার বড়োরানিকে। তিনি ধর্মপ্রাণা, দয়াবতী মহিলা। বাকি সব নিষ্ঠুর। তোমার প্রাণে দয়া-মায়া থাকলেও তুমি বোকা। রাজকার্যের অনুপযুক্ত। তোমাকে এর জন্য মরণযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

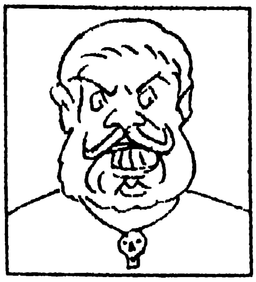
কথাগুলো বলা শেষ হতেই শরীরটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কথা অনুযায়ী ফলও ফলতে লাগল একে একে। প্রথমেই মারা পড়ল ছোটোরানি। রোগ আর দুর্ঘটনা এসে গ্রাস করল রাজপুরীকে। শুধু বেঁচে রইলেন বড়োরানি আর তাঁর ছেলেমেয়েরা।

শেরশাহের আমল থেকে চৈনপুরে একটা দুর্গ আছে। সেই দুর্গে আছে একটি হিন্দু-মন্দির। মন্দিরে ছোট্ট একটি পাথর হর্ষ ব্রহ্ম নামে আজও পুজো পায়। ভক্তেরা মিষ্টি আর পৈতে নিয়ে পুজো দিতে যান। শোনা যায়, পুজো দিলে, যার যা মনস্কামনা, তা নাকি পূরণ হয়।



মধ্যপ্রদেশ

রাজার রাজা



দেশে এ কী অনাসৃষ্টি!

বৃক্ষে ফল নেই। আকাশে মেঘ নেই। নদীতে জল নেই।

ফসলের মাঠ শূন্য। দেশ জুড়ে খরা।

শিশুর মুখে হাসি নেই। মানুষের মনে সুখ নেই।

আছে শুধু হাহাকার আর ঘরে ঘরে কান্নার রোল।

অনাহারে মানুষ মারা যাচ্ছে একের পর এক।

কেন এমন হল? একী ঈশ্বরের অভিশাপ?

না। অভিশাপ একজন মানুষের। আর তার ফলেই এত অনাসৃষ্টি। মানুষের এত দুর্ভোগ।

সে এক সাধারণ মানুষ। অসাধারণ তার ক্ষমতা। নাম মেঘিরানা। সে মানুষকে বাঁচাতে পারে। মারতে পারে। হাসাতে পারে। কাঁদাতে পারে। আকাশে আনতে পারে মেঘ, নদীতে জল। ফুলে গন্ধ। সব। কী যে সে পারে না, সেটাই চিন্তার। কিন্তু কীভাবে?

তার ছিল একটা চিরুনি। সেটা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া। আশ্চর্য এই চিরুনি! মাথার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মেঘিরানা যা কামনা করবে, তাই হবে।

সে চেয়েছিল, মানুষের ক্ষতি হোক। তাই হচ্ছে।

লোকটার চেহারা কদাকারই বটে। যেমন মোটা, তেমন বেঁটে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল যেন শকুনের বাসা। ইয়া বড়ো গোঁফ জোড়া— যেন মুড়ো ঝাঁটা।

এই চেহারার অঙ্গভঙ্গিতে সে লোক হাসিয়ে বেড়াত। কিন্তু কী কুক্ষণেই যে রাজবাড়িতে গিয়েছিল! সেই নিয়েই যত কাণ্ড। হয়েছে কী তাই বলি।

নদীর ধারে গভীর বন। এখানে থাকেন এক রাজা। নাম তাঁর গিলি। তিনি প্রজাদের বড়ো প্রিয়। তাঁর কথায় প্রজারা ওঠে, বসে। খায়-দায়। এমন কী কাউকে যদি ঘুমুতে বারণ করেন রাজা, সারা রাত্তির সে জেগে বসে থাকবে।

গিলি রাজা যুদ্ধ করেন কম। প্রজাদের শাসন করেন কম। শাস্তি দেন কম। ভালোবাসেন বেশি।

একদিন মেঘিরানা বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে গেল রাজপ্রাসাদে। তাকে পেয়ে রাজাও খুশি। এমন আমুদে লোককে পেলে তো খুশি হবেনই।

মজা করতে করতে মেঘিরানা একটা কাঁচি দিয়ে রাজার গোঁফ জোড়া কাটতে যাবে কি— অমনি রাজা গেলেন খেপে।

'এই কে আছিস? একে বেঁধে রাখ— আমার সঙ্গে ঠাট্টা!' চিৎকার করে উঠলেন রাজা।

ছুটে এল সাত-সাতটা প্রহরী। তাকে ধরতে যাবে কী, ফুড়ুৎ করে উড়ে বেরিয়ে গেল।



আকাশে মেঘের গা-ঘেঁসে মেঘের মতো ভাসতে ভাসতে চলে গেল কোন দূর দেশে।

পরের দিন আবার হাজির।

একা ঘরে রাজকন্যা। খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে রূপবতী ভাবছিল কী। একরাশ ঘন কালো চুল পিঠময় ছড়ানো।

চুপি চুপি ঘরে ঢুকল মেঘিরানা। রাজকন্যার একগোছা চুল কেটে নিল বেমালুম।

ওই না দেখে রাজকন্যার সে কী কান্না।

ছুটে আসে সখির দল। খবর যায় রাজার কানে। কিন্তু মেঘিবানাকে ধরবে কি, তার আগেই জানলা দিয়ে একটা ছোট্ট পাখির মতো সে পালিয়ে গেছে।

রাগে তারা রেগে গেলেন। রাজ্যের সর্বত্র ঢেরা পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল যে যেখান থেকে যেমন করে পার মেঘিবানাকে ধরে আনো।

তারপর পাহাড়ের গুহায়, নদীর জলে, গাছের ডালে ডালে লোক পাঠানো হল চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব। নির্দেশমতো সৈন্যরাও প্রস্তুত। অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শয়তানটাকে ধরে আনতে।

তা শেষ পর্যন্ত খোঁজ মিলল। আকাশ-ছোঁয়া এক পাহাড়ের চুড়ো থেকে নামানো হল তাকে।

আচ্ছা করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাজার সামনে দাঁড় করাল সৈন্যরা।

'মহারাজ হুকুম করুন— কী শাস্তি দেব—'

রাগে ফুঁসছেন রাজা। দরদর করে ঘামছেন। থরথর করে কাঁপছেন।

'নিয়ে যা, শয়তানটাকে আমার চোখের সামনে থেকে।'

'কোথায় হুজুর?'

'লবণঘরে', গম্ভীর গলায় রাজা বললেন, 'দেখি শয়তানটা জব্দ হয় কিনা।'

রাজবাড়ির অন্দরমহলে আছে এক লবণঘর। সেখানে সওদাগররা দেশ-বিদেশ থেকে বস্তা বস্তা লবণ এনে জমা করে রাখে। ঘরটা বন্ধ। অন্ধকার। মানুষ একদণ্ড থাকতে পারে না সেখানে কেউ খুব বেশি অন্যায় করলে এই ঘরে আটকে রাখা হত। মেঘিরানাকে সেই ঘরে ঢোকাতেই সব লবণ গলে জল হয়ে গেল। জলে জলময় সেই ঘরটা। জল গড়িয়ে এল ঘরের বাইরে। প্রাসাদের আনাচে কানাচে যেন দেশে বন্যা বয়ে গেছে, এ তারই জল।

রাজার তখন বিশ্রামের সময়। মন্ত্রী এসে বলল, 'যা হোক একটা ব্যবস্থা করুন, মহারাজ! আমরা আর পারছি না— যে-সে মানুষ নয় এ।'

রাজা বললেন, 'আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তোমরা বিন্‌ঝাকে গিয়ে বল— সে যা পারে করুক।'

বিন্‌ঝা হল কুম্ভকার। রাজার বড়ো প্রিয়পাত্র। তার যেমন সাহস, তেমন শক্তি।

বিন্‌ঝা এসে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করল তাকে। নিমেষের মধ্যে শুকনো আকাশ থেকে বৃষ্টি এসে নিভিয়ে দিল দাউদাউ আগুন।

ব্যর্থ হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল বিন্‌ঝা।

রাজা হাল ছেড়ে দিয়েছেন। মন্ত্রী হতাশ।

সৈন্যদের সাধ্যের বাইরে মেঘিরানা।

তাহলে উপায়?

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল মেঘিরানাকে নিয়ে যাওয়া হবে রাম-লক্ষ্মণের কাছে।

তাঁরা থাকেন বনের মধ্যে। এক কুটিরে।

সব শুনে লক্ষ্মণ তো রেগে আগুন। শুরু হল প্রচণ্ড প্রহার

রামের দয়ার শরীর। বললেন, 'খুব হয়েছে। আর মেরো না'

দাদার আদেশে লক্ষ্মণ প্রহার থামালেন।

রাম বললেন, 'একটা বুনো মোষের পিঠে চাপিয়ে শিঙের সঙ্গে ওর দেহটা বেঁধে দাও কষে। এতেই জব্দ হবে।'

তাই করা হল সঙ্গে সঙ্গে।

সেই খেপা মোষ মেঘিরানাকে পিঠে নিয়ে চার পায়ে লাফাতে লাফাতে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল।

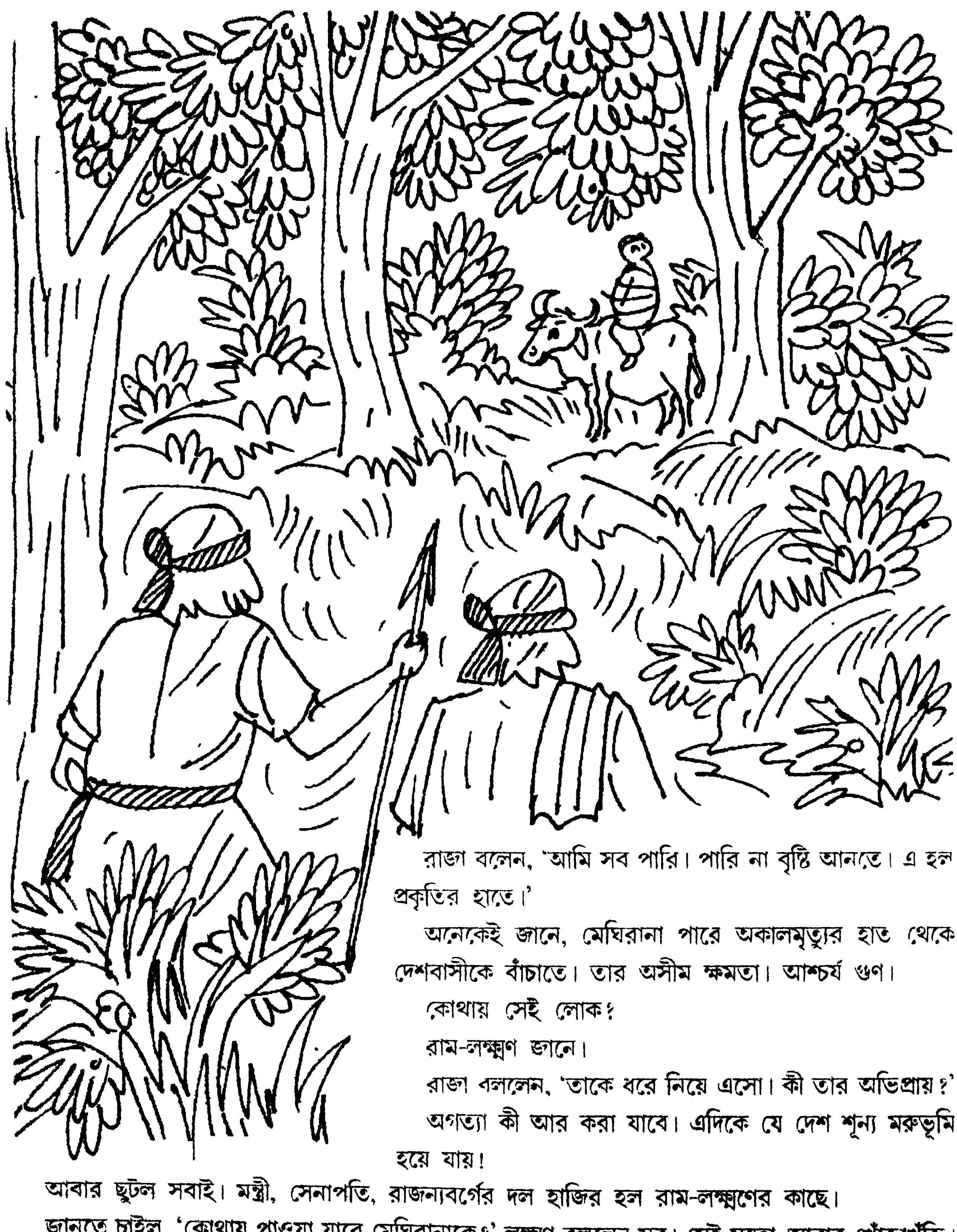
মন্ত্রী শ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন।

রাজা খুশি মনে বললেন, 'যথার্থ শাস্তি।'

মুচকি হাসল রাজকন্যা: 'ঠিক-ঠিক হয়েছে এবার।' পরিশ্রান্ত সৈন্যরা দুরাত্রি জাগার পর দিল লম্বা ঘুম। সবাই আশ্বস্ত : মেঘিরানা এবার জব্দ হয়েছে। তাকে দেখা গেল না বেশ কদিন।

কিন্তু তারপর থেকেই প্রকৃতি বিমুখ হল। বৃষ্টির অভাবে রাজ্যময় খরা। ফসলের মাঠ শুকনো, খটখটে। ঘরে ঘরে অনাহার। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

রাজা মহা চিন্তিত। শান্তির দেশের এ কী দুঃসময়! ঘনঘন মৃত্যু সংবাদ। দেশময় শোকের ছায়া। প্রত্যহ প্রজারা দুঃখের কথা জানিয়ে যায় রাজাকে : আমাদের বাঁচান হুজুর— রক্ষা করুন।



রাজা বলেন, 'আমি সব পারি। পারি না বৃষ্টি আনতে। এ হল প্রকৃতির হাতে।'

অনেকেই জানে, মেঘিরানা পারে অকালমৃত্যুর হাত থেকে দেশবাসীকে বাঁচাতে। তার অসীম ক্ষমতা। আশ্চর্য গুণ।

কোথায় সেই লোক?

রাম-লক্ষ্মণ জানে।

রাজা বললেন, 'তাকে ধরে নিয়ে এসো। কী তার অভিপ্রায়?'

অগত্যা কী আর করা যাবে। এদিকে যে দেশ শূন্য মরুভূমি হয়ে যায়!

আবার ছুটল সবাই। মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজন্যবর্গের দল হাজির হল রাম-লক্ষ্মণের কাছে। জানতে চাইল, 'কোথায় পাওয়া যাবে মেঘিরানাকে?' লক্ষ্মণ বললেন সব। সেই মতো আবার খোঁজাখুঁজি। সৈন্যের দল বন-জঙ্গল-ঝোপ-ঝাড় তছনচ করে ফেলল।

অবশেষে একটা গাছের নীচে সন্ধান মিলল।

কঠিন দড়ির বাঁধন খোলা হল। মোষের পিঠে নিশ্চুপ বসে মেঘিরানা।

মন্ত্রী বলল, 'চল মেঘিরানা, আমরা তোমায় নিতে এসেছি।'

মেঘিরানা চুপ।

'তুমি যাবে না?'

'না, আমি এখান থেকে যেতে চাই না।'

'তুমি কি দুঃখ পেয়েছ?'

'হতে পারে।'

পরস্পরের মুখ চেয়ে মন্ত্রী বলল, 'কী চাও বল?'

'আমি রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চাই।'

হো হো করে হেসে উঠল মন্ত্রী। চোখ বড়ো বড়ো করল সেনাপতি।

'বেশ। তাই হবে।'

মোষের পিঠ থেকে নামল মেঘিরানা। একদল লোকের সঙ্গে হাঁটা দিল রাজবাড়ির দিকে।

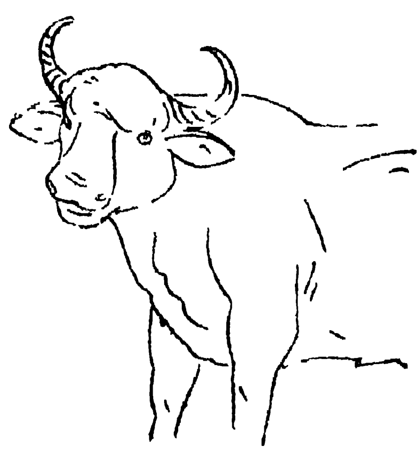
সঙ্গে সঙ্গে আকাশে ঘনিয়ে এল ঘন মেঘ। বিদ্যুতের ঝিলিক মেঘের গর্জন। ঝমঝম্ করে বৃষ্টি নামল। যেন দুনিয়া ভেসে যায়।

কুল কুল শব্দে নদীর জল প্রবাহিত হতে লাগল। গাছের পাতা উঠল নড়ে।

সকলের মুখে আবার হাসি।

মেঘিরানার এই জাদুকরি ক্ষমতায় রাজা নিজেও খুশি। প্রস্তাব মেনে নিলেন তিনি।

বললেন, 'আমি রাজি। রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। আমি তো নামমাত্র রাজা। আসল রাজার সন্ধান এত দিনে পেয়েছি। তোমার কোনো তুলনা হয় না।'



গান কেনা



এক গ্রামে এক নির্বোধ স্ত্রীলোক ছিল। ঝগড়ায় তার সঙ্গে কেউ পেরে উঠত না। কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই সে আয়ত্ত করতে পারত না, তা হল সঙ্গীত—না কণ্ঠসঙ্গীত, না যন্ত্রসঙ্গীত।

রোজই পাড়ার মেয়েরা জাঁতা ঘুরিয়ে গম ভাঙতে ভাঙতে গান করে। এই স্ত্রীলোকটি গান গাইতে পারত না, তাই হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরত। ভাবল, পড়শির কাছ থেকে জেনে নেবে কী করে গান করতে হয়।

তাই একদিন সে পড়শির বাড়িতে গেল। খুব মোলায়েম ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা ভাই, তোমরা গান কোথায় পাও?'

পড়শিটি ছিল খুব সুরসিকা। সে জানত ওই স্ত্রীলোকটি একটি নিরেট বোকা। তাই সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ওমা, তুমি তাও জান না? গান তো বাজারে বিক্রি হয়। একদিন গেলেই তো পার, কিনে আনবে।'

এই কথা শুনে সেই নির্বোধ ঝগড়াটে হিংসুটে স্ত্রীলোকটি গান কেনার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠল। বাড়িতে ফিরে কেবলই ছটফট করছে, কখন তার স্বামী ফিরবে। যেই-না মানুষটা এসেছে, অমনি সে ছুটে গিয়ে বললে, 'আগে বাজারে যাও, আমার জন্যে কিছু গান কিনে আনো।'

স্বামী বেচারা জানে না যে গান বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সে মনে মনে ভাবল, কী অদ্ভুত জিনিস চাইছে তার স্ত্রী। কিছুক্ষণ সে তাই নিয়ে ভাবল। কেননা সে জানত স্ত্রী যা চাইছে তা দিতে না পারলে তার রেহাই নেই। স্ত্রী যখন বলছে, তার মনে হল, হয়তো বাজারে গান বিক্রি হয়, সে জানে না। সুতরাং স্ত্রীর কাছ থেকে পাঁচটি টাকা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

বাজারে গিয়ে একটা দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, 'গান কিনব—পাওয়া যাবে?'

শুনে দোকানি তো অবাক! গান কিনতে এসেছে দোকানে! এমন তাজ্জব খরিদ্দার আগে সে কখনো দেখেনি। দোকানি লোকটি ছিল বেশ ধূর্ত প্রকৃতির। সে একগাল হেসে বলল, 'আপনি অন্য দোকানে দেখুন, পেতে পারেন।'

গ্রামবাসীটি এক এক করে ঘুরল অনেক দোকান। সব দোকানদারই তার অদ্ভুত কথা শুনে ভাবে, লোকটা একদম নিরেট বোকা। সকলে তার সঙ্গে মজা করে। সবাই বলে অন্য দোকানে দেখুন।

এইভাবে খোঁজ করতে করতে সন্ধে গড়িয়ে এল। বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বলবে কী? কিন্তু গান মিলল না কোনো দোকানেই। শেষ পর্যন্ত হতাশ মনে সে বাড়ির পথ ধরল। পথে হাঁটতে হাঁটতে সে রাস্তায় হঠাৎই একটা ধেড়ে ইঁদুর দেখতে পেয়ে গেল। চোখের নিমেষে মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে ইঁদুরটা ঢুকে গেল গর্তে। কৌতূহলী হয়ে লোকটা ইঁদুরের গর্তের কাছে গেল, এবং গর্তের মধ্যে থেকে যে মৃদু শব্দ আসছে, তা শোনবার চেষ্টা করল। ইঁদুর মাটি কেটে গর্ত করছে। সেই শব্দেই তার মনের মধ্যে গানের প্রথম চরণ তৈরি হয়ে গেল :

ইঁদুর খোঁড়ে খরর্ খরর্

অনেকবার লাইনটা সে আওড়াল যাতে ভুলে না যায়।

আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে চোখে পড়ল একটা সাপ। সাপটা চলে যাচ্ছে— সেই শব্দে মনে এল গানের দ্বিতীয় চরণ ঃ

সাপ সরে সরর্ সরর্

এবার দুটো লাইন মিলিয়ে মনে মনে আওড়াল ঃ

ইঁদুর খোঁড়ে খরর্ খরর্।
সাপ সরে সরর্ সরর্।।



দুটি সুন্দর লাইন পেয়ে গেছে, তার আনন্দ আর ধরে না। এবার আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই দেখল ঝোপের মধ্যে একটা খরগোশ। চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। খরগোশটাকে ধরবে বলে সে তড়িঘড়ি একটা ফাঁদ বানাল। বেচারা খরগোশ আর পালাতে পারল না। সে সেই ফাঁদে আটকা পড়ে গেল। খরগোশের এহেন দুরবস্থা দেখে সে গানের তৃতীয় চরণটা পেয়ে গেল খুব সহজেই—

খরগোশ দেখে টগরমগর।

এই লাইনটাও মনে মনে বার কতক আওড়ে নিল সে। হঠাৎ সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। এই সুযোগে সুড়ুৎ করে পালিয়ে গেল খরগোশটা। লোকটির তিনটি লাইন এখন আয়ত্তে।

আরও খানিকটা এগোতেই সে দেখতে পেল একপাল হরিণ। মনের আনন্দে ছুটছে আর লাফাচ্ছে। এই দেখেই সে বানিয়ে ফেলল চতুর্থ চরণটা ঃ

হরিণ লাফায় আলং ফালং

মনে আনন্দ আর ধরে না। চার চরণের গান তার ঠোঁটস্থ হয়ে যায়।

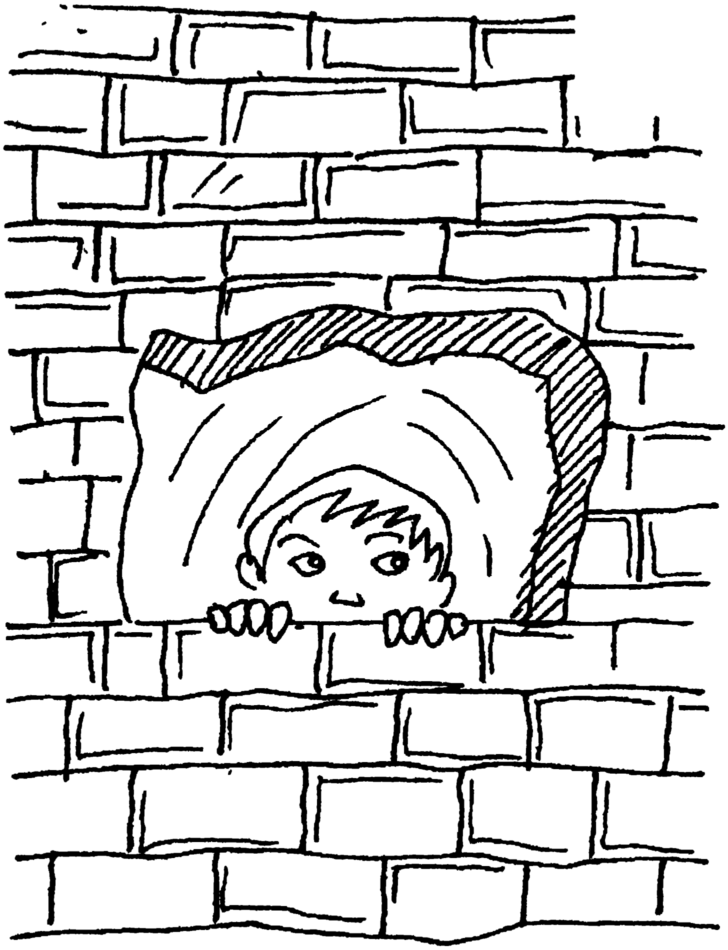
ইঁদুর খোঁড়ে খরর্ খরর্
সাপ সরে সরর সরর
খরগোশ দেখে টগর'মগর
হরিণ লাফায় আলং ফালং।

এই গানটা নিয়ে সে মনের আনন্দে বাড়ি ফিরল। বাড়ি ঢুকতেই স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, 'আমার জন্যে গান এনেছ?'

লোকটি বলল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও— বলছি।'

স্ত্রীর আর ধৈর্য ধরে না। উতলা হয়ে সে বললে 'আগে আমার গান বল।'

তখন লোকটি ওই চারটে লাইন গেয়ে শোনাল স্ত্রীকে। তারপর খুব গম্ভীর হয়ে বলল, 'একটা কথা মনে রেখো, এটা কিন্তু খুব দামি গান। আমার কাছে টাকা-পয়সা যা ছিল, সবই দিয়ে এসেছি এই গানটার জন্যে। নাও, মুখস্থ করে নাও। দেখো, একটা লাইনও যেন হারিয়ে না যায়।'



স্ত্রীলোকটি বেজায় খুশি। অল্প সময়ের মধ্যেই সে গানটা নিজের গলায় তুলে নিলে এবং মনে মনে স্থির করল, ভোরবেলা জাঁতা ঘোরানোর সময় গানটা আচমকা গেয়ে পড়শিদের সবাইকে সে একেবারে চমকে দেবে।

খুশির তোড়ে তার সময়ের জ্ঞান লোপ পেয়ে গেল। মাঝ রাত্তিরে উঠেই সে শুরু করে দিল জাঁত' ঘোরাতে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। চারটে চোর এসেছে বাড়িতে। দেয়ালে সিঁধ কাটছিল তারা। আর ঠিক তক্ষুনি স্ত্রীলোকটি গানের প্রথম চরণটা গেয়ে উঠল— 'ইঁদুর খোঁড়ে খরর খরর।' বেশ কয়েকবার ফিরে ফিরে লাইনটা গাইল। স্বভাবতই চোরেরা ভাবল স্ত্রীলোকটি তাদেরকে দেখে ফেলেছে। তবুও নিশ্চিত হল না তারা। ব্যাপারটা তো কাকতালীয়ও হতে পারে। তাই সিঁধের ভেতর দিয়ে বুকে হেঁটে তারা এগুতে লাগল। তখনই স্ত্রীলোকটি গানের দ্বিতীয় চরণটা গেয়ে বলল—

'সাপ সরে সরর্ সরর্।'

চোরদের আরও সন্দেহ হল। দেখতে হবে সত্যিই স্ত্রীলোকটি তাদের দেখে ফেলেছে কিনা। তাই ঘরের অন্ধকারের মধ্যে তারা ইতিউতি তাকাতে লাগল। আর ঠিক তখনই স্ত্রীলোকটি গেয়ে উঠল— 'খরগোশ দেখে টগর মগর।' গানের তৃতীয় চরণ শুনে চোরেদের মনে আর সন্দেহ রইল না স্ত্রীলোকটি তাদের দেখে ফেলেছে। ঝামেলা এড়াবার জন্যে তার তক্ষুনি পালাবে বলে মনস্থির করে ফেলল। খুব সন্তর্পণে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পাঁচিল টপকে লাগাল ভোঁ-দৌড়। তখন স্ত্রীলোকটি গাইছে চতুর্থ চরণ— 'হরিণ লাফায় আলং ফালং।'

ইতিমধ্যে রাত শেষ হয়েছে। অন্ধকারের আস্তরণ ভেদ করে সূর্য উঠেছে। ততক্ষণে স্ত্রীলোকটির জাঁতা পেশাইও শেষ হয়েছে। স্বামী সবে ঘুম থেকে উঠেছে। ঘুম ভেঙে চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসতেই

দেখে— ঘরের দেয়ালে সিঁধ দিয়ে গেছে চোরে। দেখেই ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল তার। চিৎকার করে উঠল লোকটি; বউকে উদ্দেশ্য করে বলল— 'আরে, কোথায় গেলে? এসে দেখ কী সর্বনাশই হয়ে গেছে!'

স্ত্রীলোকটি স্বামীর চেঁচামেচি শুনে তড়িঘড়ি ছুটে এসে ঘরের দেয়ালে সিঁধ-কাটা দেখে একেবারে হতভম্ব। তখন স্বামী-স্ত্রী ছুটোছুটি করে দেখতে লাগল চোরে কিছু নিয়েছে কিনা। না, ভগবানের আশীর্বাদে যেখানকার জিনিস সেখানেই আছে। সব দেখেশুনে তাদের দুজনের ধড়ে প্রাণ এল।

কিছুক্ষণ পর লোকটি তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, 'সারারাত তুমি কী করছিলে?'

স্ত্রীলোকটি বলল, 'আমি গান গাইছিলাম।'

শুনে লোকটি বলল, 'ও!' তারপর গর্বের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে বলল, 'আমার গানের কেমন জাদু দেখেছ? গান শুনে চোরটা কোনো জিনিসে হাত দিতে পর্যন্ত সাহস পায়নি।'

স্বামীর মুখের দিকে বোকার মতন খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে স্ত্রীলোকটি বলল, 'সত্যি সব সেরা গানেব একটা গান তুমি আমাকে কিনে এনে দিয়েছ।'



কথা বলা পুতুলেরা



এক ছিল চাষি। তার গুণের শেষ নেই।

যেমন সৎ, তেমনি পরিশ্রমী। সূর্য উঠতে না উঠতেই চলে যায় মাঠে। সারটা দিন কী খাটুনি যে খাটতে পারে, কী আর বলব।

কিন্তু তার যে বউ, একেবারে অকর্মের ঢেঁকি। খালি খায়-দায় আর ঘুমোয়। না করে ঘরের কাজকর্ম, না স্বামীকে একটু যত্ন-আত্তি। কিচ্ছু না। রান্না-বান্না করে স্বামীকে যে খেতে দেবে, তাও না। কী, না শরীর খারাপ!

বেচারা চাষি সন্ধেবেলা মাঠ থেকে ফিরে রোজ দেখে, তার বউ বিছানায় শুয়ে। কী আর করে! নিজেই তখন রান্না করতে বসে যায়।

দিন যায়। একদিন চাষি তার বোনকে সব বলল গিয়ে।

'এতো ভালো কথা নয়, মতলব একটা আছে নিশ্চয়ই',— বোন ভাবল। সে বলল, —'দু একদিন লক্ষ করতে হবে তোমার বউ একা ঘরে কী করে।'

পরের দিন চাষি কাজের ফাঁকে লুকিয়ে-চুরিয়ে এসে দেখে গেল।

কী দেখল সে?

দেখল, ফাঁকা বাড়িতে বউ রকমারি সব খাবার তৈরি করছে। তার মানে এগুলো নিজেই খাবে।

অথচ চাষি সন্ধেবেলা ফিরে এসে দেখে, বউ বিছানায়। এপাশ-ওপাশ করছে। শরীরে বড়ো কষ্ট।

সব শুনে বোন তো রেগে আগুন। বললে, 'দাঁড়াও আমি মজাটি দেখাচ্ছি—'

পরের দিন বোন দোকান থেকে চারটে কথাবলা পুতুল কিনে আনল।

সে এক আশ্চর্য পুতুল। একদম অন্যায় সহ্য করতে পারে না। কারোর কোনো দোষ দেখলেই কথা বলে উঠবে।

তারপর দাদার হাতে পুতুলগুলো দিয়ে বোন বলল, 'ঘরের চারকোণে এদের লুকিয়ে রাখবে।'

যেই কথা, সেই কাজ।

চারটে পুতুল ঘরের চার কোণে লুকিয়ে রেখে চাষি কাজে বেরিয়ে গেল।

দুপুর বেলা। কেউ কোথাও নেই। এই হল ঠিকসময়। চাষির বউ বসল রান্না করতে।

সুস্বাদু খাবার বানাতে লাগল। আর কী মিষ্টি গন্ধ!

হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, 'বাঃ বাঃ! কী সুন্দর খাবার বানাচ্ছে আমাদের মা-ঠাকরুণ—'

অমনি আর একজন বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই তো। রোজই বানায়।'

তারপর চুপচাপ। চাষি বউ তো থ। এদিক-সেদিক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। যেমন ফাঁকা বাড়ি, তেমনই! মনের ভুল নয় তো! হতেই পারে না। স্পষ্ট কানে যেন বাজছে কথাগুলো।

সাত-পাঁচ ভেবে আবার সে কাজে বসতে যাবে কী, অমনি কানে এল, 'খুবই সত্যি কথা! তবে সে যদি শোনে আমাদের কথা, নির্ঘাৎ ভয় পেয়ে যাবে।' কথা শেষ হয় না, অন্যজন সায় দেয়, 'তাই যদি হবে তাহলে রোজ রোজ এমন কাজ করে কেন?' ব্যাস্। আর কোনো কথা শোনা যায় না।

চাষি-বউ কিন্তু সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। পাবেই তো। ভরদুপুর বেলা। ফাঁকা বাড়িতে তো আর বাতাস কথা বলতে পারে না।

খানিক হাত গুটিয়ে বসে থেকে ফের যেই রান্না করতে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে একই কথা। এ তাহলে ভূতের কাজ। কোনো সন্দেহ নেই, বাড়িতে ভূত আছে।

এসব ভেবে সে দৌড় দিল মাঠের দিকে।

চাষি সব শুনল। যেন কিছু জানে না।



অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'বেশ, তা নয় হল। কিন্তু কী বললে তারা?'

চাষিবউ পড়ল ফ্যাসাদে। যা শুনেছে, তা কী আর না বলে থাকা যায়! তাহলে তো বিশ্বাসই করবে না। গড় গড় করে বলে দিল সব। তার মানে সত্যি কথাটা নিজের মুখ দিয়ে বেরুল।

চাষি বলল, 'এটা কি ঠিক? তুমি একা একা সব রান্না করে খাও?'

বউ আর কী বলে!

সে ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ। সব সত্যি।

'তাহলে এমন কাজ আর করো না তুমি, দেখবে ভূতেরাও সব পালিয়ে গেছে।'

'মাথা খারাপ! বাব্বাঃ, আর করে অমন কাজ!' চাষিবউ নাক মুলল, কান মুলল।

সেদিনই চাষি চুপিচুপি পুতুলগুলো সরিয়ে নিল। তারপর বউ একদম ভালোমানুষ।

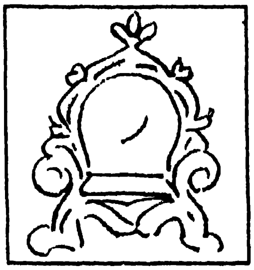
চাষি যায় মাঠের কাজে। বউ করে ঘরের কাজ। রান্নাবান্না করে। দুজনে মিলে-মিশে খায়-দায়, থাকে।





কাশ্মীর

প্রধান রানি



এক কাঠুরের মেয়ে। ছোট্ট এই টুকুন, কিন্তু তাহলে কী হয়, রূপের যেন ডালি। হাসলে পরে মনে হয় ফুটফুটে চাঁদ উঠেছে আকাশে; কাদলে পরে পৃথিবী হয়ে যায় মরুভূমি। আধো-আধো কথা যেন পাখির গান। আর শুধু চুপচাপ যখন বসে আছে, তখন মনে হয় গাছের সবুজ ডালে ফুটন্ত লাল ফুল। আহা, কী সুন্দরই না দেখতে! একবার দেখলে আর চোখ ফেরানো যায় না। সেই মেয়ের নাম রানি। তারা নদীর কিনারে, বনের ভেতর, পাতার কুটিরে থাকে। মা তাকে কাছছাড়া করে না। বাবা তাকে চোখের আড়াল করে না। কিন্তু একদিন হল কী, রানি বড়ো হয়েছে ভেবে, ঘরের দুয়ারে তাকে রেখে দিয়ে কাঠুরে আর কাঠুরে-বউ বাজার গেল। রানি ঘরের দুয়ারে গাছের ছায়ায় খেলতে খেলতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। পড়বি তো পড় চোখে পড়ল সেই কাকের। কাকটা ছিল পাইন গাছের ঘন সবুজ পাতার আড়ালে। তার ছেলে ছিল না। মেয়ে ছিল না। ভারী মন-গুমড়ে ছিল সে। সেই সময় কাকটা দেখতে পেল। ফুলের মতো, চাঁদের মতো, পরির মতো এক মেয়ে পাতার ঘরে মাটির মেঝের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আশে-পাশে কেউ কোথাও নেই। এই সুযোগ।

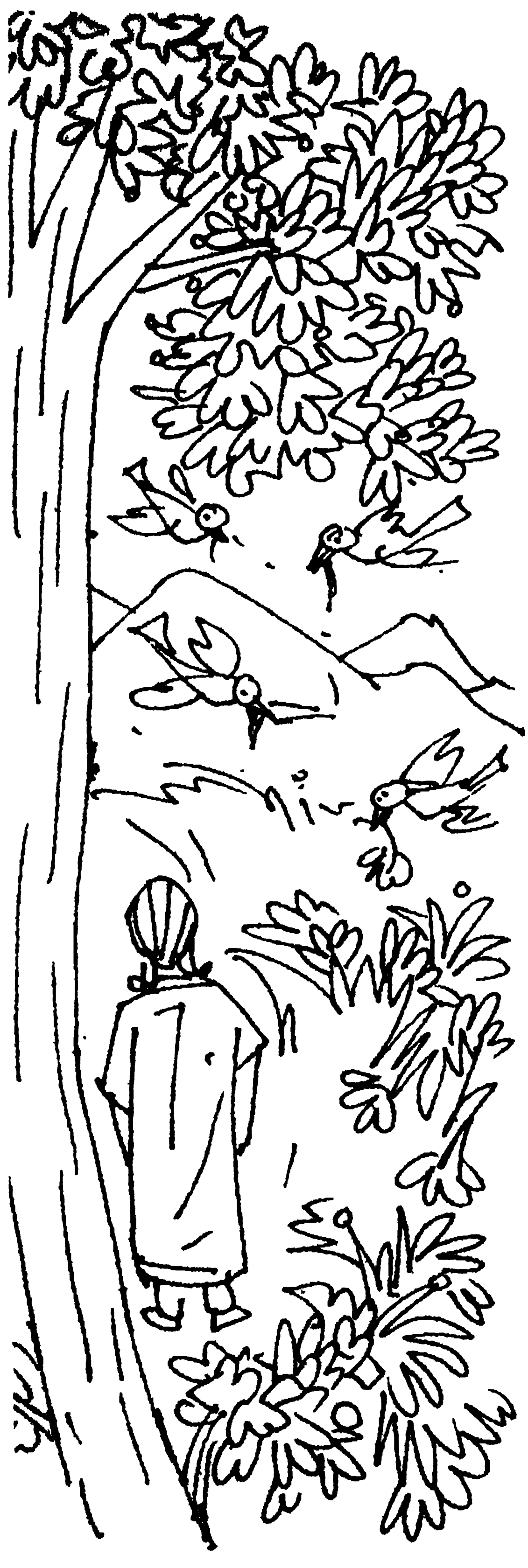
ভাবতেই কাকটা সোঁ করে নীচে নেমে এল। তারপর ঠোঁটে করে রানিকে আলতো তুলে নিয়ে ফুড়ুত করে হাওয়ায় উড়ল কাক। উড়ল তো উড়লই। নীল নদী পেরুল। লাল নদী পেরুল। সাদা মেঘ পেরুল। তারপর একটা সুন্দর সবুজ বন। সেই বনের ভেতর নীল আকাশের নীচে, নদীর কলকল স্রোতের পাশে চিনার গাছ। বড়ো সুন্দর নরম আর মিষ্টি দেখতে চিনার গাছ। সেই গাছেই কাকের বাসা। কাক পিঠে করে রানিকে নিয়ে সেই বাসায় উঠল। তারপর কী আদর যত্ন!

রানিকে কোথায় রাখবে। কী খেতে দেবে। কী পরতে দেবে। —এসব ভেবেই কাক অস্থির। বনের ভেতর সবচাইতে সুন্দর ফল সে এনে দিল রানিকে। বাজার থেকে ভালো ভালো জামা-কাপড় এনে দিল রানির জন্যে। দেখতে দেখতে কাককে ভালো লেগে গেল রানির। সে এত ভালো ফল কোনোদিন খায় নি। এত ভালো পোশাকও কোনোদিন পরে নি। আর এত এত ভালোবাসা। কে না ভালোবাসে তাকে!

কোনোদিন রঙিন ফুলেরা এসে বলে— রানিদি, আমাদের নিয়ে আজ মালা গাঁথো একটা। কোনোদিন পাখিরা এসে বলে, রানিদি! —আজ আমাদের সঙ্গে গান করতে হবে কিন্তু। আবার কোনোদিন আসে হরিণেরা। তারা অবাক হয়ে চায়। বলে— বারে, আজ আমাদের সঙ্গে খেলবে না রানিদি?

এইভাবে পাখিদের গান শুনতে শুনতে, হরিণের সঙ্গে খেলা করতে করতে, ফুলের বনে মালা গাঁথতে গাঁথতে, হঠাৎ রানিও কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে একদিন। বন আলো হয়ে যায়। পাখিরা সবাই গান গেয়ে ওঠে। হাজার হাজার ফুলের গন্ধে বন মেতে যায়। আর রাজা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে।

হ্যাঁ, রাজা এসেছিল বনে। শিকার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে রাজা সেই গাছের নীচে বিশ্রাম করতে বসেছে, ঠিক সেই সময়ে চোখে পড়ল রাজার। রানিকে দেখে আর চোখ ফেরাতে পারেন না রাজা। নদী সাক্ষী রেখে,



বন সাক্ষী রেখে আর আকাশ সাক্ষী রেখে রাজা শেষে বিয়ে করেন রানিকে। তারপর তাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে চলে যান।

এদিকে রাজার আরও দুটি রানি ছিল। তারাও খুব সুন্দরী। তাই রাজা বুঝতে পারেন না কাকে প্রধান রানি করবেন। ভেবে ভেবে আর কিছুতেই ঠিক করতে পারেন না তিনি। শেষে মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শে একটি পথ বের হয়। তিন রানিকে রাজা ডেকে পাঠান। বলেন—'তোমাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে আমি প্রধান রানি করব। কিন্তু আমি কিছুতেই স্থির করতে পারছি না কে হবে আমার প্রধান রানি। তাই ঠিক করেছি, তোমরা প্রত্যেকে একটি করে সিংহাসন তৈরি করবে। যার সিংহাসন সব চাইতে ভালো হবে, সে-ই হবে আমার প্রধান রানি।

একথা শুনেই বড়ো রানি আর ছোটো রানি নিজের নিজের ঘরে ফিরল। সবচেয়ে ভালো কাঠের মিস্ত্রিকে আনাল তারা; সবচেয়ে সেরা স্যাকরাকে আসতে আদেশ করল। তারা অনেকদিন রাজবাড়িতে আছে; তাই জানত কীভাবে কত সুন্দর করে সিংহাসন তৈরি করা যায়। বড়ো রানি দামি কাঠ খোদাই করে তাতে হিরে বসাল। হিরের ফুল, হিরের লতাপাতা। দ্বিতীয় রানি পান্না আর রুবি দিয়ে সিংহাসনে লতা-পাতা আঁকল। দুজনের সিংহাসন হল দেখবার মতো।

আর ওদিকে ছোটো রানি, সে তো কিছুই জানে না। সে জঙ্গলে মানুষ। জানে না কী দিয়ে তৈরি হয় সিংহাসন। সে দেখেনি, কী করলে সব চাইতে সুন্দর করে সাজাতে পারা যায়। তার খুব কান্না পাচ্ছে, আর নিরুপায় হয়ে ডাকছে কাককে। খানিক পরেই কাক এসে হাজির। বলল— 'কী হয়েছে রানি?'

রানি এখন সব কথা খুলে বলল। কাক শুনে বলল— 'এই কথা। বেশ আমি সবাইকে খবর দিচ্ছি।'

সবায়ের কাছে খবর যেতেই কেউ বাকি রইল না আর। হই হই করে সমস্ত কাক এসে পড়ল। গান গাইতে গাইতে এল আর সব পাখিরা। কেউ আনল বনের লতাপাতা; কেউ আনল বনের তাজা সুন্দর সুন্দর ফুল; কেউ আনল মখমল। আর কাক এক থলি আতপ চাল এনে দিল রানিকে। বলল— এই চাল বেটে আলপনা দাও রানি।

শেষে রাজা পরীক্ষা করতে এলেন। বড়ো রানির সিংহাসন দেখে খুব খুশি হলেন রাজা। হিরের লতাপাতা থেকে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। ঝলমল করছে চারদিক। ঘর আলোয় আলো। মেজো রানির সিংহাসনও কী সুন্দর। পান্না আর চুনিতে কী ভালোই না দেখতে হয়েছে। শেষে রাজা এলেন ছোটোরানীর ঘরে। এসে মুখে আর কথা সরে না রাজার। এত ভালো সিংহাসন জীবনে দেখেন নি রাজা। হিরের নয়। পান্না কিংবা চুনিরও নয়। বনের জীবন্ত সবুজ লতাপাতা, পাতায় পাতায় ফুল, ফুলে ফুলে ভ্রমর আর প্রজাপতি। সিংহাসন যেন ঝলমল করছে। ঘরে ম-ম করছে ফুলের গন্ধ; থই-থই করছে পাখির মিষ্টি গান। আর সব চাইতে সুন্দর সিংহাসনের চারদিকে রানির দেওয়া দুধ সাদা আলপনা। সিংহাসন তো নয় যেন এক ময়ূরপঙ্খী! দিঘির টলটলে জলে ভাসছে, দুলছে। জলে শ্বেতপদ্ম আর রাজহংস। একবার দেখলে আর চোখ ফেরানো যায় না। রাজাও তেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর একসময় বললেন— হ্যাঁ, এই সিংহাসনটাই সব চাইতে ভালো। সব চাইতে সুন্দর। তারপর রানির দিকে ফিরলেন রাজামশাই। রানির চাঁপার কলির মতো আঙুল হাতে নিয়ে বললেন— আজ থেকে তুমিই আমার প্রধান রানি হলে।

একথা শুনে হিংসেয় কুটি-কুটি হল অপর দু-রানি। বনের মেয়ে কিনা প্রধান রানি হবে! রাগে গনগন করে উঠল তারা। ঘেন্নায় রি-রি করে উঠল মন।

কানে কানে কানাকানি করল দু-রানি; গোপন পরামর্শ হল; তারপর একদিন গিয়ে ছোটোরানিকে বলল— ছোটো ছোটো, চল আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।



ছোটো রানির মধ্যে কোনো সাত-পাঁচ নেই। কু-ভাবনা নেই। সে হাসিমুখে বলল— বেশ তো দিদি, চলুন।

তখন তিন রানি মিলে হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে। নদী দিয়ে কল-কল করে জল বয়ে যাচ্ছে। ফুরফুর করে হাওয়া বইছে। হাঁটতে হাঁটতে রাজবাড়ি থেকে যখন বেশ কিছুটা দূরে চলে এসেছে, ঠিক সেই সময় দু-রানি ধাক্কা দিয়ে ছোটোকে দিল জলে ফেলে।

—বাঁচাও, বাঁচাও! চিৎকার করে উঠল ছোটোরানি।

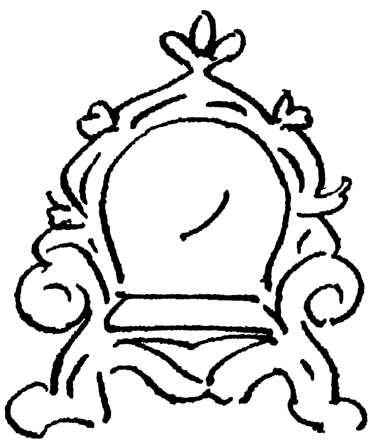
কিন্তু কে আছে বাঁচাবে! নদীর স্রোতের টানে হু-হু করে উলোটি-পালোটি খেতে খেতে ভেসে যাচ্ছে রানি। একবার ডোবে একবার ভাসে। বোধহয় আর বাঁচবে না সে। কিছুতেই আর ভেসে থাকতে পারছে না। নদী ক্রমশ টেনে নিচ্ছে ভেতরে। আর হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে প্রধান রানি বলে চলেছে, বাঁচাও বাঁচাও!

দেখে কী খুশি অপর দু-রানি। তারা হেসে কুটিকুটি। বেশ হয়েছে। ঠিক হয়েছে। বন থেকে এসে কিনা

প্রধান রানি হয়ে বসা। এবার বোঝ। হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। ওদিকে প্রধান রানি ভেসে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। যেতে যেতে একসময় নদীর বাঁকে হারিয়ে গেল। তাকে আর যখন দেখা যাচ্ছে না, তখন বড়ো রানি বলল— যাক্, আপদ গেছে।

মেজো রানি বলল— আপদ বলে আপদ। এবার আমরা রাজার ঘর আলো করে থাকব। দেখি কে কী করতে পারে।

এদিকে জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে ছোটোরানি আর আকুল হয়ে ডাকছে সেই কাককে। সে তাকে ছোটো থেকে বড়ো করেছে। সব বিপদে-আপদে এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। সেই ডাক নদী পেরিয়ে, নগর পেরিয়ে. এক সময় বনের ভেতর গাছের ডালে বসে থাকা কাকের কানে পৌঁছয়। কাক বুঝতে পারে বিপদ হয়েছে রানির। জনে জনে খবর দেয় সে। তারপর রওনা হয় ডাক লক্ষ করে। এক-আধটা কাক নয়; শয়ে-শয়ে হাজারে-হাজারে। ছুটতে-ছুটতে উড়তে-উড়তে কাকেরা এক সময় দেখতে পায়— ওই যে তাদের রানি হু-হু করে ভেসে যাচ্ছে নদীর স্রোতে। তারা সবাই মিলে তিরের মতো নেমে আসে নদীর জলের কাছাকাছি। তারপর রানির পরনের আঁচল ঠোঁটে করে তাকে তুলে আনে নদীর জল থেকে।



লোকালয়হীন নির্জন নদীর ধার। রাজার বাড়ি এখান থেকে সে অনেক দূর। তাই কাকেরা সবাই মিলে নদীর ধারে পাতার কুটির তৈরি করে দেয়। সেখানে রানি থাকে। বন থেকে ফল এনে দেয় কাকেরা। খিদে পেলে সেই ফল খায় রানি। তেষ্টা পেলে খায় নদীর মিষ্টি জল। দিন যায়।

এদিকে প্রধান রানিকে দেখতে না পেয়ে বড়ো রানি আর মেজো রানিকে রাজা জিজ্ঞেস করেন। বড়ো রানি কাঁদে। আঁচলে চোখ মোছে। মেজো রানিও কেঁদে ফেলে। টপ-টপ করে জল পড়ে চোখ থেকে। রাজা অবাক হয়ে বলে ওঠেন— কী হয়েছে আমার প্রধান রানির।

সে নদীর জলে পড়ে গেছে। বড়ো রানি কাঁদতে কাঁদতে বলে।

সে জলে ডুবে মরে গেছে। মেজো রানি চোখ মুছতে মুছতে বলে।

শোকে পাথর হয়ে যান রাজা। খাওয়া ভুলে যান। শোয়া ভুলে যান। শেষে এক বস্ত্রে বেরিয়ে আসেন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে। প্রধান রানিকে আমায় খুঁজে আনতেই হবে। —বলে রাজা হাঁটতে শুরু করেন নদীর কিনার ধরে।

একদিন যায়। দুদিন যায়। এমন করতে করতে অনেক দিন চলে যায়। শেষে নদীর ধারে এক লোকালয়হীন প্রান্তরে রাজা দেখতে পান এক পাতার কুটির। সেখান থেকে ভেসে আসছে গান। বনের গান। ফুলের গান। পাখির গান। সুর যেন চেনা-চেনা লাগে রাজার। গলাটাও যেন চেনা মনে হয় রাজার। তিনি এগিয়ে যান। আর তখনই সেই কুঁড়ের দাওয়ায় মলিন বস্ত্রে আলুথালু প্রধান রানিকে দেখতে পান রাজা। রাজা রানিকে চিনতে পারেন। রানি রাজাকে চিনতে পারেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নেন রাজা। তারপর ফিরে আসেন রাজপ্রাসাদে।

কাড়া-নাকাড়া বেজে ওঠে প্রাসাদে। জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে প্রজারা। মৃত পুরী প্রাণ ফিরে পায় রাজা-রানির আসায়। রানিকে অবার নতুন করে বরণ করে নেন রাজা। সেই সঙ্গে বড়ো রানি আর মেজোরানিকে বনবাসে পাঠিয়ে দেন। তারপর প্রধান রানিকে নিয়ে সুখে রাজত্ব করতে থাকেন রাজা।

গল্পের দানো



শীতকাল এলেই কাশ্মীরের সবুজ সুন্দর উপত্যকা তুষারে ঢেকে যায়। চারদিকে শুধু সাদা আর সাদা! চাষবাস শেষ। দোকান-পাট বন্ধ। রাস্তায় লোকজনও নেই। চারদিক শুধু খাঁ খাঁ করছে। লোকেরা যার যার নিজের নিজের ঘরে মাটির পাত্রে আগুন জ্বেলে পোশাকের ভেতর সেই আগুন নিয়ে বসে আছে। জবুথবু হয়ে বসে থাকা। বসে বসে গল্প করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

সেইরকমই বসেছিল মিনমিনে গাঁয়ের লোকজন। এক আগুনকে ঘিরে গোল হয়ে বসে গপ্পো-সপ্পো করছিল। হুঁকো খাচ্ছিল। খক খক করে কাশছিল। খুক খুক করে হাসছিল। আর মিনমিন করে কথা বলছিল। কথা কইতে কইতে কথা শেষ। সারাদিন কত আর কথা খুঁজে পাওয়া যায়। গপ্পোই বা তৈরি হয় কত! তাই যখন কথাও নেই গপ্পোও নেই, তখন চুপচাপ শুধু এ ওর মুখ দেখছে, ও এর মুখ দেখছে।

ঠিক সেই সময় বাজখাঁই গাঁ থেকে ফিরল একজন। সবাই হই হই করে উঠল। তাকে হুঁকো খেতে দিল। বসতে জায়গা দিল। শীত তাড়াবার জন্যে আগুন দিল। তারপর একজন বলল— বাজখাঁই গাঁয়ের খবর কী ভাই?

—নতুন কোনো জম্পেস খবর আছে নাকি!— আর একজন বলল।

নতুন-আসা লোকটা সবায়ের দিকে তাকিয়ে নিয়ে অবাক গলায় বলল— তোমরা এখনও শোন নি খবরটা!

-কী খবর! কী খবর!—সবাই হামলে পড়ল এ-কথায়।

—বাজখাঁই গাঁয়ে এক দানো এসেছে! ফিসফিস করে বলল লোকটা।

—তাই নাকি!

—তাহলে আর বলছি কী। লোকটা গুছিয়ে আবার শুরু করল। কেউ অবশ্য এখনও তাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে দানোটাকে।

—কী করে বোঝা যাচ্ছে! সবাই আরও ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে বসতে বলল।

—এই হয়তো দিস্তে দিস্তে রুটি সেঁকে রাখা হয়েছে, খানিক পরে দেখা গেল আর একটাও রুটি নেই। রাতে হয়তো মানুষ ঘুমোচ্ছে বিছানায়, গুম গুম করে পিঠে কিল মেরে গেল তার। অন্ধকারে কেউ হয়তো বসে আছে, দুম করে পাশে এসে পড়ল একটা পাথরের চাঁই। এ এক অদৃশ্য দানো। খুব সাবধান। —বলে লোকটা চলে গেল।

লোকটা চলে গেল বটে। কিন্তু রেখে গেল ভয়টা। ভয়ে বুক ধড়ফড় করল। কানাকানি করল সবাই। এ কথাটা বলল ওকে। ও বলল তাকে। তার ফলে কথাটা ছড়াতে ছড়াতে গাঁ থেকে গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

পাশের গাঁ-এর নাম ভ্যাবাচাকা। ভ্যাবাচাকা গাঁয়েও কথাটা গিয়ে পৌঁছল। তারাও বসে ছিল একদল।

সামনে আগুন জ্বালিয়ে হুঁকো খেতে খেতে গপ্পো করছিল। হুড়মুড় করে সেখানে একজন ঢুকল, বলল—খবর শুনেছ সব!

—কী খবর। কী খবর।

—মিনমিনে গাঁয়ে এক দানো বেরিয়েছে।

—তাই নাকি! তাই নাকি!



—হ্যাঁ। লোকটা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল। আমি এই মাত্তর শুনে আসছি। যদিও দানোটাকে কেউ দেখতে পায়নি। তবু—

—তবু কী, তবু কী?

লোকটা গলা নামাল। তারপর ফিসফিস করে বলল— সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। রাতের বেলা দানো যাকে হাতের সামনে পাচ্ছে, তারই হাত-পা মটাং মটাং করে ছিঁড়ে মুখে পুরছে। পাথর দিয়ে নাক ঘষে দিচ্ছে। নখ দিয়ে চোখ উপড়ে নিচ্ছে।

—সব্বোনাশ, আমাদের কী হবে তাহলে!—সবাই ভয়ে ভয়ে বলল কথাটা।

—কী আবার হবে। একজন উত্তর দিল। আমাদের গাঁয়ে তো দানো আসে নি। সে এলে দেখা যাবে।

—আচ্ছা তাকে দেখতে কেমন?—একজন বলল কথাটা।

—কেউ তাকে দেখলে তো। উত্তরে দিল প্রথম লোকটা। দানোটা কখন যে আসে আর কখন যে লণ্ডভণ্ড করে চলে যায়, কেউ বুঝতেই পারে না। সে যা হোক আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে কিন্তু।

এদিকে সেই বাজখাঁই গাঁয়েও তেমনি জটলা। তেমনি হই হই কাণ্ড। হাটতলায় গোল হয়ে বসেছিল সবাই। আর ভয়ে ভয়ে হচ্ছিল দানোটার কথাই।

—শেষে ওই ভ্যাবাচাকা গাঁয়েতে দানোর উৎপাত। একজন বলল।

—ভ্যাবাচাকা গাঁয়ের লোকেরা সাতে থাকে না, পাঁচে থাকে না। আর ও গাঁয়েতেই কী না—

—ভালোমানুষ গাঁ বলে তো দানোটাও পেয়ে বসেছে। —আর একজন উত্তরে বলল। সে আর কী বলব ভাই। মায়েদের কোল থেকে ছোটো ছোটো ছেলেদের ছিনিয়ে নিয়ে টুকটাক মুখে ফেলছে আর গুপগাপ গিলে নিচ্ছে। বড়ো মানুষদের মটমট করে ঘাড় ভেঙে চোঁ চোঁ করে রক্ত খাচ্ছে।

শুনতে শুনতে ভয়ে সবায়ের চোখ বন্ধ হল। নিশ্বাস ফেলা থামল। বুক করল ঢিব-ঢিব। তার মধ্যেই একজন কাঁপা গলায় বলল— আচ্ছা দানোটাকে দেখতে কেমন?

—তাকে দেখতে কে যাবে শুনি।— চোখ পাকিয়ে বলল একজন। যে দেখে আসতে যাবে সে কি আস্ত থাকবে ভেবেছ?

—তবে যাদের দানোটা মারছে, ধরছে, হাত-পা ছিঁড়ে নিচ্ছে, তারা দানোটাকে দেখেছে নিশ্চয়ই? একজন তখনও প্রশ্ন করল।

এ-কথায় রেগে গেল প্রথম জন— অতশত জানি না বাপু, তোমার যদি দানো দেখার অত শখ হয়, তুমি গিয়ে দেখে এসো।

—না না, কী দরকার! সবাই বলে উঠল। যা হচ্ছে, হচ্ছে, ওই ভ্যাবাচাকা গাঁয়ে হচ্ছে। আমাদের কি। বাজখাঁই গাঁয়ে তো আর দানো আসেনি।

বেশ কথা। ভালো কথা। তবে দানো না এলেও ভয়ে ভয়ে রইল লোকজন। মিনমিনে গাঁয়ের লোক রাত হতে-না-হতেই শুয়ে পড়ল। ভ্যাবাচাকা গাঁয়ের লোক ঘরের ভেতর প্রদীপ জ্বেলে রেখে শুতে গেল। আর বাজখাঁই গাঁয়ের লোক কতগুলো ষণ্ডাগুণ্ডাকে পাহারায় রেখে ঘুমোতে গেল।

রাত বাড়তে বাড়তে যখন খুব বেশি রাত, কেউ কোত্থাও জেগে নেই, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, ঠিক সেই সময় মিনমিনে গাঁয়ের থেকে হই চই শব্দ উঠল। আঁ আঁ করে ভয়ে কেঁদে উঠল যেন কেউ। ঘুম ভেঙে গেল সবাইকার। লাঠি বল্লম সড়কি নিয়ে হই হই করে বেরিয়ে পড়ল সবাই।

নিশ্চয়ই দানোটা। হয়তো কাউকে খেতে এসেছিল রাতে। শব্দ লক্ষ করে এগিয়ে গেল সবাই। গিয়ে যা দেখল তাতে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যায় আর কী।

মেয়েটা হাউ হাউ করে কাঁদছে। কান দিয়ে রক্ত ঝরছে টুপ-টুপ করে। সবাই ভয়ে হিম হয়ে গেল। তাহলে দানোটা তো ঠিক এসেছিল। নিশ্চয়ই কানটা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে মেয়েটার। খবরটা ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।



দানো এসে কান ছিঁড়ে নিয়ে গেছে একটা মেয়ের। খবর শুনে রাজার চৌকিদার এসে উপস্থিত। বলল— কী, ব্যাপার কী!

মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে বলল— তখন অনেক রাত। বিছানায় শুয়ে শুয়ে পাশ ফিরতে গিয়ে দেখি কানটা আমার কে ধরে আছে, সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সেই দানোর কাজ। নিশ্চয়ই কান ধরে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ঝটকা দিয়েছি কানে। সেই ঝটকায় দেখি কি— কান ছেড়ে দিয়ে পালাচ্ছে দানোটা। কানটা ছাড়ল বটে, তবে হাতে করে নিয়ে গেল কানের দুলটা।

চৌকিদার শুনতে শুনতে দুবার হুঁকো খেল। তিনবার হাঁচল। বার চারেক হাই তুলল। তারপর বলল— দানো না ছাই। চল কোথায় শুয়েছিলে দেখি।

বিছানার কাছে আসতেই চৌকিদার হাত বাড়াল। চাদর উল্টে-পাল্টে দিতে গিয়েই দেখা গেল কানের দুলটা। চাদরের বেরিয়ে আসা একটা সুতোয় আটকে রয়েছে তখনও।

চৌকিদার হাসল। বলল— দেখলে তো এবার। চোখ চেয়ে না দেখলে চাদরের সুতোকেই দানোর হাত বলে মনে হয়।

—তাহলে গাঁয়ে গাঁয়ে যে দানো এসেছে শুনছি!

— তা তো আসবেই। হা হা করে হাসল চৌকিদার। হাতে কাজকম্ম না থাকলে দানো তো আসবেই। তবে কথাটা হল চোখ কান খোলা রাখতে হবে সব সময়। তা না হলে জানলার গরাদকে মনে হবে দানোর দাঁত। বিছানার চাদরের সুতোকে মনে হবে দানোর হাত। আর তখন গপ্পোগাছার দানোকে মনে হবে সত্যিকারের দানো। বলে আর এক চোট হো হো করে হেসে নিল চৌকিদার।

পেতলের বাসন



জম্মুর কাছে খতরা গাঁয়ে এক চাষি বাস করত। তার নাম ভূতন। তার বয়স কুড়িও পেরোয় নি। কিন্তু তাহলে কী হয়, কূটবুদ্ধিতে তাকে হারাবে এমন লোক ছিল না গাঁয়ে। রোজ ফন্দি ফিকির আঁটত কী করে মজা করবে। কী করে অসুবিধেয় ফেলবে লোককে। এমন করতে করতে এটা ভূতনের অভ্যেস হয়ে দাঁড়াল। শুধু মজাই নয়, লোককে বোকা বানিয়ে পয়সা-কড়িও বেশ আয় করা যায়। তাহলে আর হাল বলদ নিয়ে মাঠে যেতে হয় না; মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষ-আবাদ করতে হয় না। তেমন তেমন ঠকাতে পারলে পায়ের উপর পা দিয়ে থাকা যায়। যা ইচ্ছে হবে খাওয়া যায়। যেমন ইচ্ছে থাকা যায়।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। নিজের গাঁ ছেড়ে অন্য গাঁয়ের দিকে পা বাড়াল ভূতন। একেবারে অনেক দূরের একটা গ্রাম। সেখানে কেউ ভূতনকে চেনে না। জানে না। কিন্তু তাতে কী, যেচে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল সে। একদিন কারো এমনি এমনি লাঙ্গল চষে দিল। কারো জমিতে নিড়েন দিয়ে দিল। কারো বা চালে খড় ছেয়ে দিল। বিনা পয়সায় না বলতেই কাজ করে দেয়। লোকেরা খুশি হবেই। দেখতে দেখতে সবায়ের বন্ধু হয়ে গেল ভূতন। সব কাজেই এখন ডাক পড়ে তার। বাড়িতে কাজ হবে। ডাকো ভূতনকে। গোরুর বাছুর হবে,— ভূতনকে চাই। এমন করতে করতে সে একেবারে ঘরের লোক। এমনটাই চাইছিল সে। যখন দেখল সবাই তাকে বেশ ভালো রকম বিশ্বাস করছে, তখন একদিন ভূতন কয়েকজনকে ডেকে বলল, — আমাকে পেতলের কটা বাসন-কোসন দিতে হবে যে।

এদিকে গ্রামে যার বাড়িতেই যখন কোনো উৎসবের কাজকর্ম হয়, তখনই আশপাশের বাড়ি থেকে পেতলের বাসন-কোসন চেয়ে আনে। গ্রামে এমন চাওয়া-চাওয়ি আছেই। কেউ কিছু এতে মনেও করে না। তাই অন্য সবাই ভাবল ভূতনের বাড়িতেও বুঝি কোনো উৎসব হবে। তারা সরল মনে পেতলের ভালো-ভালো বাসন-পত্র এনে ভূতনের ঘর বোঝাই করে দিয়ে গেল। আর তাছাড়া ভূতন তাদের অনেক উপকার করে, তাই ওই ছেলেটার জন্যে এটুকু করতে পেরে বেশ ভালোই লাগল তাদের। কয়েকদিন বাদে আবার বাসনগুলো হাতে হাতে ফিরিয়ে দিল ভূতন। বলল—কাজ মিটে গেছে। এবার এগুলো নিয়ে যাও।

নেবার সময় প্রত্যেকেই খুব অবাক হয়ে গেল। সবায়ের হাতেই একটা করে বাসন বেশি রয়েছে, যেটা তারা দেয়নি। তারা নিজেদের মধ্যে গুজগুজ করে, ফিসফিস করে। কিন্তু আর জিজ্ঞেস করতে পারে না।

শেষে ভূতন আর থাকতে না পেরে বলে ওঠে— কী ব্যাপার!

একজন বলে— ভূতন, আমাদের সকলের বাসনের মধ্যেই একটা করে নতুন বাসন রয়েছে। এটা তো আমরা দিইনি তোমাকে।

—ঠিকই। হাসে ভূতন। তবে ওটা তোমাদেরই দেওয়া বাসনগুলোরই বাচ্চা। তাই ওটা তোমাদেরই।



এ কথায় কী খুশি যে হয় গ্রামের লোক। ভূতনের উপর বিশ্বাসও বেড়ে যায়। ছেলেটার একটুও লোভ নেই, সবাই বলে। ইচ্ছে হলেই ও বাচ্চা বাসনগুলো নিয়ে নিতে পারত।

আবার কিছুদিন বাদে আর কয়েকখানি বাসনের দরকার হল ভূতনের। তাকে মুখ ফুটে আর কিছু বলতে হল না। ততদিনে বেশ ভালোরকম জানাজানি হয়ে গেছে। ভূতনের কাছে বাসন দিলে সে বাসন নতুন বাচ্চা সমেত ফিরে আসে। তাই এবার দলে দলে লোক বাসন নিয়ে এল। এ বলল— ভূতন আমার বাসনটা নাও। ও এসে বলল— আমারটাও নাও। আগের চাইতে এবার অনেক বাসন জমল। কিছুদিন বাদে কাজ মিটে গেলে যার যার বাসন তার তার কাছে ফেরত গেল আবার।

সবাই দেখল, প্রত্যেকে একটা করে নতুন বাসন বাড়তি পেয়েছে।

কথাটা ছড়িয়ে পড়ল গাঁ থেকে গাঁয়ে। এমন কথা তারা জীবনে শোনেনি— বাসন আবার বাচ্চা পাড়ে। ভূতনের উপর লোকের বিশ্বাসও গেল বেড়ে। সবাই বলতে লাগল— হ্যাঁ, ছেলে বটে একটা। কোনো লোভই নেই। আর খুব পরোপকারী। এমন ছেলে লাখে একটা মেলে।

এসব কথা কানে এল ভূতনের। মনে মনে সে খুশি হল খুব। আসলে সে এমনটাই তো চাইছিল। সকলের বিশ্বাস অর্জন করা। সেটা ঠিক ঠিক হয়েছে। এবাব আসল কাজ শুরু কবতে হবে। কাজের আগে ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন টের না পায়।

টের অবশ্য কেউ পেল না। ভূতন যখন বলল— এবাব আমার বাড়িতে আরও বড়ো একটা পুজো-আর্চা হবে, তখন সবাই আগের মতো বিশ্বাস করল। খুশিও হল খুব। আবার নিশ্চয়ই ভূতনের বাসনের দরকাব হবে। আর তারা বাসন দেবার জন্যে পা বাড়িয়ে তো বসেই আছে।

ভূতন বলল— এবার আমার অনেক পেতলের বাসন দরকার।

—তাতে কী! সবাই যেন অবাক হয়ে বলল। দরকাব হলে আমাদের সব বাসন তোমার কাজে দিয়ে দোব।

কথাটা আবার ছড়িয়ে পড়ল। এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে। দলেদলে লোক এল বাসন হাতে নিয়ে। এসে বলল— ভূতন, তোমার বাড়িতে কাজ জেনে একটু সাহায্য করতে এলুম ভাই।

ভূতন হেসে বলল— বাসন এনেছ তো। আমার এবার অনেক বাসন চাই।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো বাসন। —বলে সবাই নিজের নিজের বাসন দিয়ে গেল। দেখতে দেখতে ঘর ভর্তি। দাওয়া ভর্তি। আর বাসন রাখার জায়গা নেই। লোকেরা নিজের-নিজের বাড়িতে ফিরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল, এবার বাসনের বাচ্চাটা কেমন হবে। রোগা-সোগা, না মোটা-সোটা বাচ্চা হবে একটা।

এদিকে দিন যায়। একদিন যায়। লোকেরা বসে-বসে ভাবে। দুদিন যায়। তিন দিন যায়। ভূতন তবু গাঁয়ের লোককে ডেকে বলে না— ওগো, তোমাদের বাসন ফিরিয়ে নিয়ে যাও, কাজ মিটে গেছে আমার।

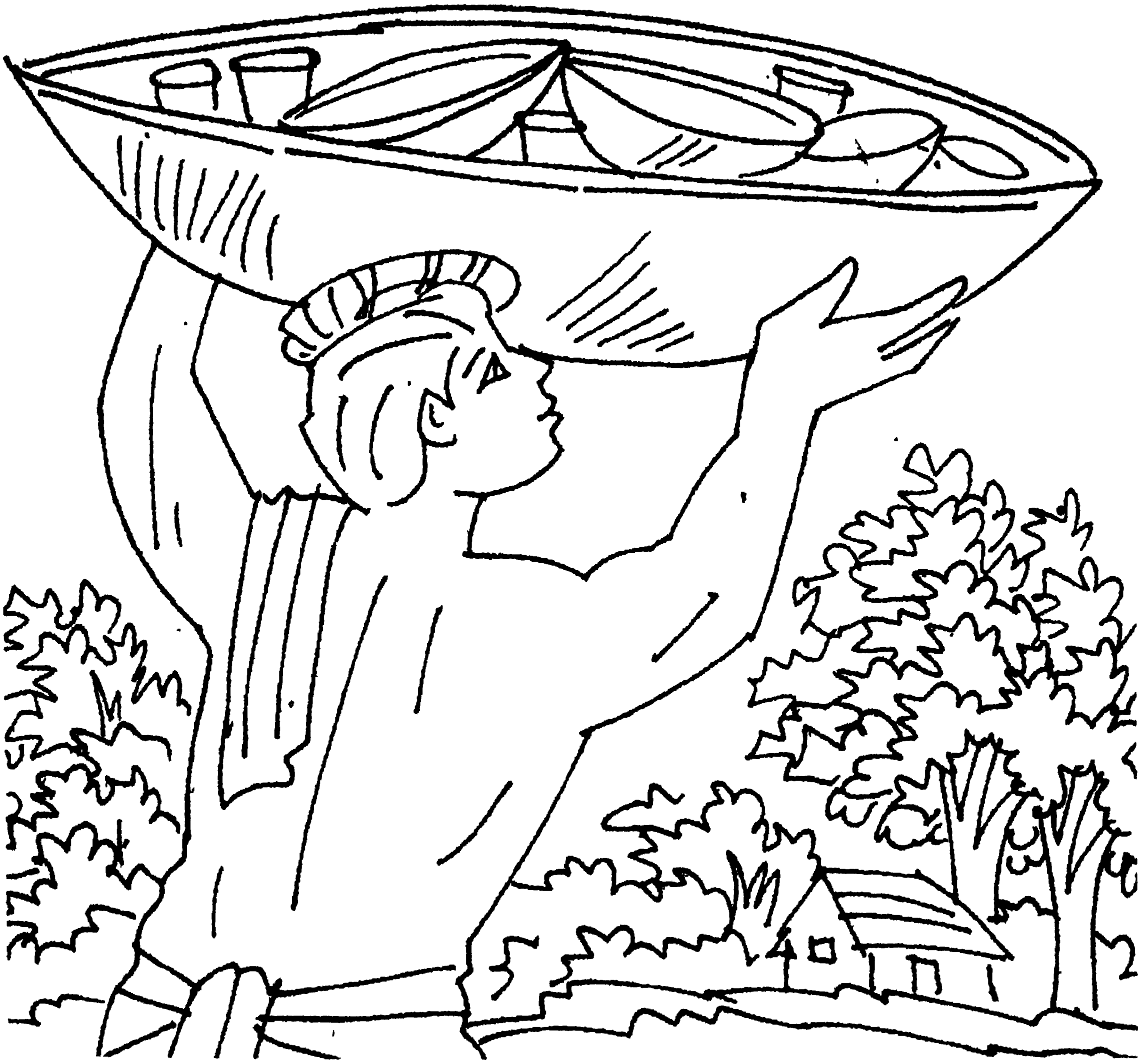
—কী ব্যাপার! সবাই খুব চিন্তায় পড়ে। কী হল! ফেরত দিতে এত দেরি তো করে না ভূতন।

এমন করতে করতে আরও একটা দিন কেটে যায়। তবু ভূতনের ঘরের দরজা খোলে না। কাউকে ডেকেও পাঠায় না সে। তখন তিনখানা গাঁয়ের লোক মিলে আলোচনা হয়— কী ব্যাপার, ভূতন এত চুপচাপ কেন!

—সেটা ওকে গিয়েই জিজ্ঞেস করা যাক। একজন বলে।

সবাই একথা মেনে নেয়। ভূতন যখন কিছু বলছেই না, তখন গিয়ে জেনে আসাই ভালো। তখন সবাই মিলে তার ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করে।

এদিকে জানলা দিয়ে দলে দলে লোক আসতে দেখেই ভূতন ঘরের মেঝেয় পা ছড়িয়ে ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে শুরু করে। দেখে সবাই বোঝে ছেলেটা নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছে।



দলের নেতা এগিয়ে এসে বলে— কী ব্যাপার ভূতন! কী হয়েছে তোমার, এমন করে মাথা চাপড়াচ্ছ কেন!

—এক বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে গেছে। মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বলে ভূতন। শুধু আমার কিছু হলে এত ভাবনার ছিল না। কিন্তু ঘটনায় গাঁয়ের সবাই জড়িয়ে পড়েছে।

—সে আবার কী ঘটনা হে, যাতে আমরাও জড়িয়ে পড়েছি। একজন অবাক গলায় বলে।

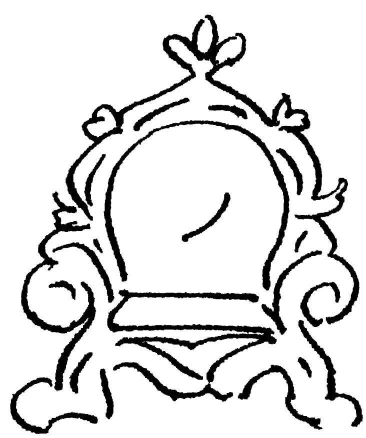
একথায় হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল ভূতন। তারপর কান্না একটু সামলে বলল— কী আর বলব, এবার সব বাসনগুলো মারা গেছে।

—মারা গেছে! অবাক গলায় চমকে উঠল সবাই। এ আবার কী কথা! পেতলের তৈরি বাসন আবার মরে নাকি! রাগই হয়ে গেল গাঁয়ের লোকের। গলাভারি করে তারা ভূতনকে বলল— কে কবে এমন কথা শুনেছে হে!

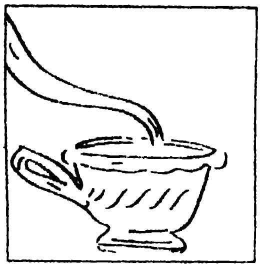
— কেন আপনারাই শোনেন নি! চোখের জল মুছে ভূতন এবার বলল। আমিই তো একটা করে নতুন বাসন দিয়ে বলেছিলুম, পুরনো বাসন এই বাচ্চাটা পেড়েছে। আপনারা বিশ্বাসও করেছিলেন সে কথা, তাই যদি হয়, তাহলে যার জন্ম আছে তার মৃত্যু হবে না কেন?

উত্তরে লোকেরা আর কোনো কথা বলতে পারল না। তারা বুঝল ভূতন তাদের ভালো রকম ঠকিয়েছে। তবু তাদের কিছু করার নেই। বড়ো লোভ হয়েছিল তাদের। লোভে পড়ে খুব বেশি রকম বিশ্বাস করে ফেলেছে ওই ছেলেটার উপর। তাই কথা না বলে মাথা নিচু করে ফিরে গেল তারা।

আর ওদিকে ভূতন এক রাতে চুপি চুপি সব বাসন বস্তায় নিয়ে চলে এল নিজের গাঁয়ে। অত বাসন বিক্রি করে অনেক টাকা হল তার।



জাদু পেয়ালা



কৈলাশ নামে এক গরিব কাশ্মীরি ছিল। প্রায় দিনই তাকে অভুক্ত থাকতে হত। রোজগারপাতি ভালো ছিল না বলে গৃহে তার সব সময় খাদ্যশস্য মজুত থাকত না। তার স্ত্রীকেও স্বামীর সঙ্গে অভুক্ত হয়ে থাকতে হত। বলতে নেই, এ ছিল প্রায় তাদের একরকম নিত্যকার ঘটনা।

তবে, কৈলাশের স্ত্রী ছিল যেমন ভালো, সরল-সাদাসিধে, তেমনি খুব ধৈর্যশীল মহিলা। মুখে রা-টি নেই। দিনের পর দিন অভুক্ত থাকার জন্য তার শরীরও বেশ ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু তবু মনটাকে শক্ত করে রাখত সে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, একদিন না একদিন ভগবান তাদের দিকে ঠিক মুখ তুলে চাইবেন। তখন তাদের আর কোনো খাওয়া-পরার অভাব থাকবে না।

দিনের পর দিন অভুক্ত থেকেও স্ত্রীকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে দেখে কৈলাশ কিন্তু স্থির থাকতে পারল না। একদিন সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। শুধু ধৈর্যই হারাল না, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল। যে করেই হোক তাকে দু-বেলার অন্নসংস্থানের একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতেই হবে, এ প্রতিজ্ঞা নিয়ে স্ত্রীকে না বলে একাই একদিন পথে বেরিয়ে পড়ল।

খাবারের খোঁজে পথে ঘুরে বেড়িয়েও যখন কৈলাশ খাবারের কোনো ব্যবস্থা করতে পারল না, তখন সে মনের দুঃখে গ্রামের শেষপ্রান্তের উত্তর দিকের জঙ্গলের ভেতরে ঢুকল। জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়িয়েও সেখানেও যখন সে কোনো ফলমূলের খোঁজ পেল না, তখন ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ল। চোখ ফেটে জল এসে গেল। একেই সে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত ছিল। এবার ফলমূল না পেয়ে সে রীতিমতন ভেঙে পড়ল। চোখভরা জল নিয়ে সে জঙ্গলের ভেতরেই একটা বড়ো গাছের তলায় বসে পড়ল।

গাছের তলায় ক্ষুধার্ত ক্লান্ত শরীরটাকে তারপর একটু এলিয়ে দিতেই কৈলাশের দু-চোখে শীর্ণকায় স্ত্রীর করুণ পাংশুটে মুখখানা ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কৈলাশের বুকের ভেতর থেকে একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। পরমুহূর্তে কৈলাশ জলভরা চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। দু-হাত জোড় করে ভগবানকে উদ্দেশ করে বলল, 'হে ভগবান, তুমি কেন আমাকে এত গরিব করলে? আমি এতই গরিব যে, আমি আমার স্ত্রীর মুখে দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন পর্যন্ত তুলে দিতে পারছি না। এভাবে আর কতদিন আমার স্ত্রী অভুক্ত হয়ে দিন কাটাবে বলতে পার! সে তো প্রতিদিনই তোমার কাছে প্রার্থনা জানায়। বড়ো ভক্তি করে তোমার আরাধনা করে। অথচ কী আশ্চর্য দ্যাখো— ভুলেও কোনোদিন সে তোমাকে তার নিষ্ঠুর ভাগ্যের কথা জানায় না। তোমার কি ওর প্রতি একটুও দয়ামায়া নেই? হে ভগবান— তুমি কি আমাদের এই দুঃখ-কষ্ট দূর করতে পার না!'

ভগবানের উদ্দেশে কৈলাশের কথা বলা শেষ হতেই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। কৈলাশের সামনে আবির্ভূত হলেন এক জটাধারী সন্ন্যাসী। তাকে দেখেই কৈলাশ কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে গেল।



কৈলাশের ভাবগতিক দেখে সন্ন্যাসীটি হাসি-হাসি মুখে কৈলাশকে বললে, 'বৎস, তোমাকে এত বিমর্ষ দেখছি কেন? বলো, কী তোমার কষ্ট?'

কৈলাশ বিমর্ষভাবেই বলল, 'মহাশয়, আমার যে কষ্ট— তা আপনি লাঘব করতে পারবেন না।'

কৈলাশের কথা শুনে সন্ন্যাসীটি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তোমার কী এমন কষ্ট যা আমি লাঘব করতে পারব না! বলো, তোমার কীসের কষ্ট?'

কৈলাশ এবার একটু সহজ হল। বলল, 'জানেন সাধুজি— আমি এমনই গরিব যে, আমি আমার স্ত্রীকে পর্যন্ত একবেলা ভালো করে পেট পুরে খেতে দিতে পারি না। দিনের পর দিন আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে অভুক্ত থাকি। এমনই হতভাগ্য আমি। এই ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তাই খাবারের খোঁজে আমি পথে বেরিয়ে পড়েছি। সকালবেলায় পথে বেরিয়েও এখনো পর্যন্ত কোনো খাবার জোগাড় করতে পারিনি। তাই এখন— কী করব বুঝে উঠতে না পেরে, এখানে গাছের তলায় হতাশ হয়ে বসে আছি।'

কৈলাশের চোখে জল। সন্ন্যাসী তার পাংশুটে মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন, সত্যিই মনে হচ্ছে মানুষটা খুব গরিব। চোখমুখে শঠতার চিহ্নমাত্র নেই। সন্ন্যাসী এবার তার কাঁধের ঝোলাটার ভেতরে হাত ঢোকালেন। তারপর ঝোলাটার ভেতর থেকে বার করে নিয়ে এলেন একটা পেতলের পেয়ালা। সে পেয়ালাখানা বের করেই কৈলাশের হাতে দিয়ে, তাকে বললেন, 'এই পেয়ালাখানা আমি তোমাকে দিলাম। এই পেয়ালাখানা হল একটা জাদু পেয়ালা। তুমি এর কাছে যখন যা খাবার চাইবে তখন সেই খাবার পাবে।'

সন্ন্যাসীর মুখ থেকে এমন আশ্চর্য কথা শুনে শৈলাশ হতবাক হল। কিছুতেই কিন্তু সে সন্ন্যাসীর কথা বিশ্বাস করতে চাইল না। তার মনে এই ধারণা জন্মাল, সন্ন্যাসী তাকে একখানা পেতলের পেয়ালা দিয়ে ছেলেভুলোনোর মতো তাকে ভোলাতে চাইছে।

কিন্তু তবু সে পেয়ালাখানা সন্ন্যাসীর হাত থেকে নিল। তারপর কী মনে হতে পরখ করার জন্য সন্ন্যাসীর সামনেই পেয়ালাখানার কাছ থেকে কৈলাশ পছন্দমাফিক খাবার মাংস-গোস্তবার চাইল। আর তার সঙ্গে কিছুটা ফুরফুরে ভাত।

কী আশ্চর্য— পেয়ালাখানার কাছে খাবার চাইতেই কৈলাশের সামনে এগিয়ে এল তার পছন্দমাফিক একথালা ভর্তি সুস্বাদু খাবার।

কৈলাশ তো খাবার পেয়ে মহাখুশি। আনন্দে তার চোখ চিকচিক করে উঠল। তৎক্ষণাৎ সে সন্ন্যাসীকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাল।

সন্ন্যাসী কিন্তু স্থান ত্যাগ করার আগে কৈলাশকে বার বার এই বলে সতর্ক করে দিলেন, 'দ্যাখো বাপু, পেয়ালাখানা তুমি খুব সাবধানে রেখ। পেয়ালাখানা যেন হারিয়ে না যায়।'

কৈলাশ মাথা নেড়ে আনন্দে বিগলিত হয়ে 'যে আজ্ঞে' বলল। তারপর তার সামনে থেকে সন্ন্যাসী অন্তর্ধান করতেই সেও আর গাছের তলায় বসে রইল না। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পথে নামল। সোজা বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

তখন সন্ধে হয় হয়। খানিকটা হাঁটার পর হঠাৎ সে রাস্তার ধারে একটা ভাঙা কুটিরের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কুটিরের সামনে দাঁড়াতেই তার কানে এল কয়েকজন বালক-বালিকার মিলিত কান্নার শব্দ। কান্নার শব্দ শুনে ভালো করে কান পাততেই কৈলাশ বুঝতে পারল, তারা সকলে খিদের জ্বালায় কাঁদছে। তাদের মা তাদের সকলকে যতই বোঝাবার চেষ্টা করছে কান্না থামানোর জন্য এই বলে, 'আজ বাছা তোরা

সব ঘুমিয়ে পড়,— কাল ঠিক দেখিস যেখান থেকে পারি ঠিক তোদের কিছু খাবার জোগাড় করে এনে দেব।' তবু কান্না থামছে না।

পেটের জ্বালা যে বড়ো জ্বালা। তারা শুনবে কেন? সকলে সমানে কেঁদে চলেছে এই বলে, 'মা, তুমি আমাদের এক্ষুনি কিছু খেতে দাও।'

রাস্তার ধার থেকে আড়ালে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব শুনে কৈলাশের বড়ো মায়া হল। সে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে কুটিরের ভেতরে ঢুকল। ঢুকেই সে ক্রন্দনরত বালক-বালিকাদের দিকে চেয়ে বলল, 'বাছারা, তোমরা সকলে আমার কাছে এসো। আমি তোমাদের খাবার দেব।'



এ কথা শুনে বালক-বালিকারা কান্না বন্ধ করে আনন্দে লাফিয়ে উঠল আনন্দে লাফিয়ে উঠে দৌড়ে তারা কৈলাশের কাছে গেল। সকলেরই চোখেমুখে ঝলমল করছে আনন্দ।

কৈলাশ পেয়ালাখানা হাতে নিয়ে সকলের সামনে চার থালা ভাতের প্রার্থনা জানাল। প্রার্থনা জানানোমাত্রই মুহূর্তের মধ্যে চার থালা গরম ভাত এসে হাজির হল।

ক্ষুধার্ত বালক-বালিকারা চার থালা গরম ভাত পেয়ে হাপুসহুপুস করে খেল

ফাঁক বুঝে তারপর হঠাৎই বালক-বালিকাগুলোর মা চট করে চকিতে এক নিমেষের মধ্যে কৈলাশের জাদু পেয়ালাখানা সরিয়ে ফেলল। পরিবর্তে কৈলাশের পেয়ালাখানার মতোন দেখতে একটা অন্য পেয়ালা কৈলাশের কাছে রেখে দিল।

বালক-বালিকাগুলোর খাওয়াদাওয়া শেষ হলে কৈলাশ কুটির ছেড়ে বেরিয়ে এল। সঙ্গে তার নকল পেয়ালা। সন্ন্যাসীর দেওয়া পেয়ালাখানা যে তার অসাবধানতা বশতঃ বদলে গেছে তা সে একবর্ণও টের পায়নি। মনের স্ফূর্তিতে সে নকল পেয়ালাখানা নিয়েই বাড়ির পথে হাঁটা দিল। মনে তার কত স্বপ্ন, কত আনন্দ— আজ সে তার স্ত্রীকে একেবারে জাদু পেয়ালার কাছে প্রার্থনা করে খাবার এনে তাক লাগিয়ে দেবে।

বাড়ির কাছে পৌঁছেই কৈলাশ চিৎকার করে তার স্ত্রীকে ডাকল, 'কই কোথায় গেলে গো— শিগগির আমার কাছে এসো একবার। দেখে যাও আমি তোমার জন্য কী এনেছি!'

উঠোনে তখন শুকনো ডালপালা গোছ করে রাখছিল কৈলাশের স্ত্রী। কৈলাশের কণ্ঠস্বর শুনে তৎক্ষণাৎ সে ছুটে গেল, 'কই, আমার জন্যে কী এনেছ দেখি?'

কিন্তু কৈলাশ পেয়ালাখানা দেখাতে ভীষণ হতাশ হল কৈলাশের স্ত্রী। বিষণ্ণ গলায় বলল, 'সামান্য এই পেয়ালাখানা দেখানোর জন্য আমাকে ডাকলে!'

কৈলাশ বলল, 'এটা সামান্য একটা পেয়ালা নয়। এই পেয়ালাটার কাছে তুমি যা খাবার চাইবে তাই পাবে।'

কৈলাশ এ কথা বলা মাত্রই তার স্ত্রীর চোখ দুটো খুশিতে চিকচিক করে উঠল। তৎক্ষণাৎসে কৈলাশের হাত থেকে পেয়ালাখানা নিয়ে নিল। তারপর ঘরের মেঝেয় উপুড় হয়ে বসে এক থালা খাবারের প্রার্থনা জানাল। কিন্তু কোনো খাবারই এল না।

খাবার না পেয়ে কৈলাশের স্ত্রী রেগে গেল। কৈলাশকে বলল, 'তুমি আমাব সঙ্গে ঠাট্টা করছ?'

কৈলাশ চুপ করে রইল। কোনো জবাব দিল না। অসহায় অবস্থায় সে খানিকক্ষণ স্ত্রীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর সম্বিত ফিরে আসতে কিছুক্ষণ পর সে ফের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে দীর্ঘ পথ হেঁটে ফের কৈলাশ জঙ্গলের ভেতরে সেই গাছের তলায় এল, যেখানে সন্ন্যাসীটি তাকে জাদু পেয়ালা দিয়েছিল। এসেই সে গাছের তলায় বসে পড়ল।

কিন্তু গাছের তলায় বহুক্ষণ ধরে বসে থাকার পরও সন্ন্যাসীর আর দেখা পেল না কৈলাশ। তবু সে গাছতলা ছেড়ে উঠল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, না খেয়ে গাছতলায় সে শুকিয়ে মরবে তবু ভালো, কিন্তু কিছুতেই সে শূন্যহাতে আর বাড়ি ফিরে যাবে না।

তারপর যথারীতি সূর্যের আলো কমে আসতে কৈলাশের গা ছম ছম করতে লাগল। ভয় পেয়ে গেল সে। ভয় পেয়ে যাওয়াতে সে পুনরায় বাড়ি ফিরে এল। মনে মনে সে ঠিক করল, আগামীকালও সে ফের এখানে আসবে। সন্ন্যাসীর খোঁজ করবে। যে করেই হোক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার দেখা করতেই হবে!

পরের দিন খুব ভোর ভোর বিছানা থেকে উঠে সে পথে বেরিয়ে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের কাছে এল। তারপর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে নির্দিষ্ট গাছের তলাটিতে চুপ করে বসে রইল।

খানিকবাদে সন্ন্যাসীর সঙ্গে কৈলাশের দেখা হল। সন্ন্যাসী কৈলাশকে দেখে খুব অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'বৎস—তুমি আবার এখানে এসেছ কেন?'

কৈলাশ বলল, 'প্রভু, আপনি যে পেয়ালাখানা আমাকে দিয়েছেন সে আর খাবার দিচ্ছে না।'

কৈলাশের মুখ থেকে একথা শুনে সন্ন্যাসী খুব অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, 'এ অসম্ভব। হতেই পারে না। দেখি পেয়ালাখানা।'

কৈলাশ সন্ন্যাসীকে পেয়ালাখানা ফেরত দিতেই সেই পেয়ালাখানা হাতে নিয়ে সন্ন্যাসী বললেন, 'এ পেয়ালাখানা আমার দেওয়া পেয়ালা নয়। এটা একটা নকল পেয়ালা।'

কথাগুলি বলে সন্ন্যাসী এবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন কৈলাশের দিকে। বললেন, 'তুমি কি আমাকে ঠকাবার জন্য নকল পেয়ালা নিয়ে এসেছ?'

কৈলাশ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল, 'আপনাকে ঠকিয়ে আবার একটা জাদু পেয়ালা নেব এরকম অভিসন্ধি আমার নেই। এ পেয়ালাখানা আপনারই দেওয়া পেয়ালা।'

কৈলাশের মনের দৃঢ়তা দেখে সন্ন্যাসী এবার কৈলাশের কাছ থেকে পেয়ালাখানা নিয়ে যাবার সময় কখন বাড়িতে পৌঁছেছিল, বাড়ি ফেরার আগে কারুর বাড়িতে গিয়েছিল কিনা, এসব সবিস্তারে জানতে চাইলেন।

কৈলাশ কোনো কিছুই সন্ন্যাসীর কাছে গোপন করল না। অকপটে সেদিনের সব কথা খুলে বলল। বালক-বালিকাদের খিদের জ্বালায় কান্নার কথা, তাদের মায়ের কথা, তারপর তার কুটিরের ভেতরে প্রবেশ করা থেকে পেয়ালার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে চার থালা সুস্বাদু খাবার লাভের কথা কোনোকিছুই বাদ দিল না। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব কথাই সন্ন্যাসীকে খুলে বলল কৈলাশ।

কৈলাশের মুখ থেকে বিস্তারিতভাবে সব কথা শোনার পর সন্ন্যাসীর আর বুঝতে বাকি রইল না আসল বদমায়েশিটা কে করেছে। সন্ন্যাসী কৈলাশকে বললেন, 'এবার আমি বুঝতে পেরেছি আসল ব্যাপারটা কী ঘটেছে। তুমি যে কুটিরে প্রবেশ করেছিলে, সে বাড়ির কর্ত্রীই তোমার অসাক্ষাতে চালাকি করে আমার দেওয়া জাদু পেয়ালাখানা সরিয়ে ফেলে তার বদলে ওইরূপ একটা নকল পেয়ালা রেখে দিয়েছে।'

কথাগুলি এক নিশ্বাসে বলে সন্ন্যাসী চুপ করে গেলেন। তারপর একটু চিন্তা করে নিয়ে ফের নিজের ঝোলা থেকে আর একখানা পেয়ালা বার করে কৈলাশের হাতে দিয়ে বললেন, 'যাও--- এই পেয়ালাখানা তুমি ওই কুটিরের গৃহকর্ত্রীকে গিয়ে দাওগে।'

কৈলাশ আর কোনো কথা না বলে সন্ন্যাসীর আদেশ পালন করল। ফের সে সেই কুটিরে গেল। কৈলাশ যেতেই গৃহকর্ত্রীটি বেশ ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবল, নিশ্চয় আসল পেয়ালাখানা ফেরত নিতে এসেছে।

কৈলাশ কিন্তু উলটো কাজই করল। আসল পেয়ালাখানা ফেরত না চেয়ে সে খুশি খুশি ভাব নিয়ে মহিলাটিকে সন্ন্যাসীর দেওয়া দ্বিতীয় পেয়ালাখানা দিয়ে বলল, 'আপনি এই পেয়ালাটা রাখুন।'

গৃহকর্ত্রী মহিলাটি খুশি হয়ে কৈলাশের হাত থেকে পেয়ালাখানা নিল। সে ভাবল, এটাও নিশ্চয় আগের মতনই একটা জাদু পেয়ালা। যখন যা খুশি খাবার চাইলেই পাওয়া যাবে।

পেয়ালাখানা নিয়েই সে তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে গোল করে বসল। তারপর ভক্তিভরে পেয়ালাখানার কাছে ভালো ভালো খাবার দেবার অনুরোধ করল।

কী আশ্চর্য--- খাবার চাইবামাত্রই খাবারের পরিবর্তে ওই পেয়ালাখানা থেকে বেরিয়ে এল দুটো লাঠি। লাঠি দুটো বেরিয়ে এসেই বাড়ির কর্ত্রী মহিলাটিকে প্রচণ্ড পেটাতে লাগল।

যতই মহিলাটি দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করে, ততই লাঠি দুটো তাকে তাড়া করে প্রচণ্ড আক্রোশে পেটাতে থাকে।

অবশেষে, প্রচণ্ডভাবে দুটো লাঠির পিটুনি খেয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে ভয়ে চিৎকার করে কৈলাশকে বলল, 'আপনার এ পেয়ালাখানায় আমার প্রয়োজন নেই। আমি পূর্বে আপনার যে পেয়ালাখানা চুরি করেছি সেখানাও আপনাকে আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। দয়া করে আপনি এখন আমাকে পিটুনির হাত থেকে রক্ষা করুন।'

মহিলাটির কথা শুনে কৈলাশ খুব অবাক হয়ে গেল। সে স্বপ্নেও ভাবেনি, মহিলাটি তার আগের পেয়ালাখানা চুরি করে নিয়েছে। কোনো কথা না বলে সে চুপচাপ মহিলাটির কাছ থেকে পেয়ালাখানা নিয়ে নিল। পেয়ালাখানা হাতে নিয়েই সে তৎক্ষণাৎ হাতের চেটো দিয়ে তার মুখ বন্ধ করল। মুখ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে লাঠি উধাও।

লাঠি উধাও হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটিও কৈলাশের জাদু পেয়ালাখানা, যেটা সে চুরি করেছিল, সেটা ফেরত দিয়ে দিল।

জাদু পেয়ালাখানা ফেরত পাওয়াতে কৈলাশ খুব খুশি হল। পেয়ালাখানা নিয়েই সে মহিলাটির সব ছেলেমেয়েদের বলল, 'তোমাদের কোনো ভয় নেই। তোমরা রোজ খেতে পাবে। আমিই প্রতিদিন এসে তোমাদের খাবার দিয়ে যাব।'

কথাগুলি বলেই কৈলাশ কুটির ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। সোজা বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

ইতিমধ্যে বেশ বেলা হয়েছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। তাড়াতাড়ি তাই হন হন করে পা চালাতে লাগল কৈলাশ। যে করেই হোক সন্ধের আগেই তাকে বাড়ি পৌঁছতে হবে। রাতের দিকে চোর-ডাকাতের উপদ্রব যে! জঙ্গল-ঘেঁষা পথ— ভালো না।

বাড়ি ফিরে কৈলাশ প্রথমে লাঠি-বেরনোর পেয়ালাখানা এক জায়গায় পৃথক করে রাখল। তারপর জাদু পেয়ালাখানা নিয়ে স্ত্রীকে ডাকবার মুহূর্তে সুস্বাদু খাবারের প্রার্থনা জানাল।

থালাভর্তি সুস্বাদু খাবার দেখে কৈলাশের স্ত্রী-তো থ! মুখে 'রা' সরে না।

সুস্বাদু খাবার দেখিয়ে কৈলাশ স্ত্রীকে বলল, 'নাও — চটপট এই খাবারগুলো খেয়ে নাও দিকি।'

এত সুস্বাদু খাবার কৈলাশ কোথা থেকে পেল! কোনো কথাই জিজ্ঞেস করল না কৈলাশের স্ত্রী। খাবার পেয়ে সে আহ্লাদে আটখানা। বহুকাল সে অভুক্ত। তার ওপর এমন সুস্বাদু খাবার সে কতকাল চোখেই দেখেনি। আনন্দে-উত্তেজনায় সে রাশি রাশি থালাভর্তি সুস্বাদু খাবার পেয়ে গপাগপ খেতে লাগল।

বহুকাল বাদে নিজের স্ত্রীর মুখে সুস্বাদু পেটভর্তি খাবার তুলে দিতে পেরে মহাখুশি হল কৈলাশ। মনে মনে সে সন্ন্যাসীর উদ্দেশে শত শত প্রণাম জানাল।

বার বার কৈলাশের কেবল একটি কথাই মনে হল, সন্ন্যাসী দয়া করে তাকে জাদু পেয়ালাখানা না দিলে কি কৈলাশ পারত নিজের স্ত্রীকে এমন সুস্বাদু খাবার পেটপুরে খাওয়াতে?

তাই সন্ন্যাসীর প্রতি পরম কৃতজ্ঞতায় কৈলাশের চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা আনন্দ-অশ্রু!



এক চোর সর্দারের কীর্তি



এক কাশ্মীরি পণ্ডিত ছিল। সন্তান বলতে তাব ছিল এক মেয়ে। মেয়েটি দেখতে শুনতে ছিল ভারি সুন্দর। যাকে বলে একেবারে ডানাকাটা পরী। পাকা সোনার মতন যেমন তার গায়ের রঙ, তেমনি শরীর-স্বাস্থ্য তার লাবণ্যে ভরা। এক পলক দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। চোখ দুটিও ছিল হরিণের চোখের মতন। যেমন মায়াবী, তেমনি প্রাণবন্ত।

এমন নজরকাড়া সুন্দরী মেয়েকে কিছুতেই একটা সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারছিল না পণ্ডিত। এজন্য সে সবসময় মরমে মরে থাকত। অথচ মেয়ের বিয়ে দিতে না পারার কারণ সে কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারত না। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কাউকে না। পাছে এ নিয়ে তাকে সবাই হাসি-ঠাট্টা করে।

দেশে উপযুক্ত পাত্রের অভাব নেই। তার বউ এ কথা বার কয়েক বলেছিল তাকে। তবু গা করেনি পণ্ডিত। যতবারই বউ কথাটা তাকে বলেছে, ততবারই কৌশল করে এড়িয়ে গেছে সে। মেয়েব বিয়ে দিতে গেলে প্রচুব অর্থ লাগবে যে! তার সে সামর্থ্য কোথায়? ভাঁড়ে তো মা ভবানী! বংশের আভিজাত্য বজায় রাখতে গিয়ে যেটুকু সামান্য ধনদৌলত তার ছিল তাও নিঃশেষ হয়ে গেছে।

পণ্ডিত যে সম্পূর্ণ গরিব হয়ে গেছে এ কথা সে তার বউ মেয়েকে একবারও বলেনি। এমনকি ঘুণাক্ষরে জানতেও দেয়নি। পাছে তারা তাকে দরিদ্র ভেবে তাচ্ছিল্য করে!

একদা কিন্তু এই পণ্ডিতের বংশ ছিল ডাকসাইটে ধনী বংশ। লোকে বলত, সূর্য কোনোদিন নিভে গেলেও পণ্ডিতের বংশের ধনভাণ্ডার কোনোদিন নিঃশেষ হবে না।

এ কথা লোকে বলবেই না বা কেন! একসময় ছিল অঢেল জমিজমা। আর ছিল হিরে-জহরতের উপছানো ভাণ্ডার। যাকে বলে কুবেরের ধন! সেসময় পণ্ডিত বংশে কত ধুমধামই না হত। নিত্য লেগে থাকত উৎসব। শিবরাত্রির উৎসব, নববর্ষ, কত কী! কতলোক সে সময় নিমন্ত্রিত হত। সে এক দিন ছিল! উৎসব উপলক্ষে কদিন ধরে গৃহে চলত নাচগান। খরচ হত মুঠি মুঠি টাকা।

আজ আর সেদিন নেই। পণ্ডিতের পূর্বপুরুষরা যথেচ্ছভাবে টাকাপয়সা ওড়ানোর জন্য অনেক ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেছে। কথায় আছে না, গড়াতে গড়াতে কলসির জলও একদিন নিঃশেষ হয়ে যায়।

উচ্চ ধনীবংশের সন্তান বলে কাশ্মীরি পণ্ডিত কিন্তু তার আর্থিক অবস্থা ভালো নয় জেনেও আপ্রাণ চেষ্টা করত পারিবারিক আভিজাত্য বজায় রাখতে। পোশাক-পরিচ্ছদে, চলনে-বলনে তা সবসময় ফুটে উঠত। ফলে, তার আয় অপেক্ষা ব্যয় ছিল বেশি।

পরিণতি যা হবার তাই হল। উত্তরাধিকারসূত্রে পণ্ডিত যে যৎসামান্য ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিল, তা সে নিজেই পারিবারিক আভিজাত্য বজায় রাখতে গিয়ে নিঃশেষ করে ফেলল। হিসেব করে চলা তো তার চরিত্রে ছিল না!

একমাত্র সুন্দরী মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে পণ্ডিত কিন্তু ক্রমশ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। কী করবে ভেবে পায় না। সব চিন্তাভাবনাই যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়।



হঠাৎ একদিন পণ্ডিতের বাড়িতে বন্ধু সুন্দর আসতেই খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল পণ্ডিত। ভাবল, সুন্দর নিশ্চয় তার মেয়ের জন্য কোনো ভালো পাত্রের খোঁজ এনেছে। তারপর পরমুহূর্তে নিজের আর্থিক দুরবস্থার কথা মনে হতেই সে বেলুনের মতো চুপসে গেল। খুশি খুশি ভাব মিলিয়ে গেল। সারামুখে নেমে এল বিষণ্ণতা। দুঃখী দুঃখী মুখ নিয়ে সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বন্ধু সুন্দরের দিকে।



সুন্দর কিছুক্ষণ ইতস্তত করে, যে জন্য তার পণ্ডিতের কাছে ছুটে আসা, সে কথাটা বলে ফেলল, 'আমাকে তুমি কিছু টাকা ধার দিতে পারো পণ্ডিত? বড়ো বিপদে পড়েছি।'

টাকা। শুনেই ক্ষেপে উঠল পণ্ডিত। মুহূর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ বদলে গেল পণ্ডিত। চোখদুটো তার ইটভাটার মতোন জ্বলতে লাগল। সারা শরীর তার উত্তেজনায় ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। মুখে যা এল তাই ছাইপাঁশ বলে সে সুন্দরকে গালাগালি করল।

বড়ো আশা নিয়ে পণ্ডিতের কাছে টাকা ধার চাইতে এসেছিল সুন্দর। তাব বিশ্বাস ছিল পণ্ডিত তাকে শূন্যহাতে ফেবাবে না। টাকা ধার চাইতে এসে বন্ধুব কাছ থেকে গালমন্দ শুনতে হবে -এ একবারও স্বপ্নেও ভাবেনি সুন্দর। বন্ধুব কাছ থেকে চূড়ান্ত অপমানিত হওয়াব জন্য ভেতবে ভেতরে বেশ রেগে গেল সে। বন্ধুত্বও গেল ঘুচে।

সুন্দর মনে মনে প্রতিজ্ঞা কবল, যে করেই হোক সে কাশ্মীরি পণ্ডিতকে একদম সর্বস্বান্ত করে ছাড়বে, যাতে পণ্ডিতকে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বেরতে হয়! সেদিনের ঘটনার পর থেকেই সুন্দর নানাভাবে পণ্ডিতেব সঙ্গে শত্রুতা আবস্ত করল।

বেশ কিছুদিন পর একদিন সুন্দরের এক ভৃত্য তাকে বলল, 'ওক, আমি তোমায় একজনের সঙ্গে পরিচয় কবিয়ে দেব। সে হচ্ছে এ গ্রামের চোরদের সর্দার। চৌর্যবৃত্তিতে সে তুখোড়। তাকে তুমি পণ্ডিতের বাড়ি দেখিয়ে দিও। সে সব চুরি করে পণ্ডিতকে একদম রাস্তার ভিখাবি করে দেবে। তখন দেখবে ওর কী দশা হয়! কেঁদে একেবারে কূল পাবে না।'

কথাটা মনে ধরল সুন্দরের। তৎক্ষণাৎ সে ভৃত্যাকে দিয়ে চোরের সর্দারকে ডেকে পাঠাল। বিরাট মূল্যের বিনিময়ে সে পণ্ডিতকে সর্বস্বান্ত করার আবেদন জানাল সর্দারকে।

সর্দার সুন্দরের সে টোপ গলাধঃকরণ করল। চোরের সর্দারের নাম ধীমান বাটু। বাটুর নাম গ্রামের প্রায় সকলেই জানে। মায়েরা শিশুদের ওর নাম করে ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াত।

সুন্দরের এতসব চক্রান্তের কথা কিছুই জানত না পণ্ডিত। একদিন রাতে সে সবে ঘুমিয়েছে। এমন সময় তার বউ তাকে ঠেলা দিয়ে বলল, 'কি গো, মেয়েটার বিয়ে-টিয়ে কি দেবে না? মেঘে মেঘে বেলা যে অনেক হয়ে গেল!'

পণ্ডিত চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল, 'দেখ গিন্নি, হাতে কিছুই নেই। কী দিয়ে আমি মেয়ের বিয়ে দেব?'

কথাটা বলে একটা হাই তুলে ফের বলল পণ্ডিত, 'বুঝতে পারছি এক্ষুনি মেয়ের বিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু আমার হাতে যা টাকাপয়সা অবশিষ্ট ছিল--- সেসব আমি পূর্বপুরুষদের গৌরব আর আভিজাত্য রক্ষা করতে গিয়ে সব খরচ করে ফেলেছি। এখন আমার এমনই অবস্থা, সংসার চালানোই আমার পক্ষে খুব কষ্টকর হয়ে পড়েছে।'

স্বামীর কথা শুনে পণ্ডিতের বউ এতই নিরাশ হয়ে পড়ল যে, কোনো চিন্তাই আর তার মাথায় এল না। তবে মেয়ের কী হবে— এই ভাবতে ভাবতে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। তার কান্না দেখে পণ্ডিতেরও চোখে দু-এক ফোঁটা জল গড়াল।

নিঝুম সে রাতে চোরসর্দার বাটু সিঁদ কেটে ওই বাড়িতে ঢুকেছিল পণ্ডিতকে সর্বস্বান্ত করতে। সে তখন সুযোগের অপেক্ষায় ঘরের এককোণে লুকিয়ে ছিল। সব কথাই সে শুনেছিল। পণ্ডিতের বউয়ের কান্না দেখে সে খুব মনে ব্যথা পেল। তার সব রাগ গিয়ে পড়ল সুন্দরের ওপর।

সুন্দর বাটুর কাছে পণ্ডিতের পূর্বপুরুষদের ধনদৌলতের এমন সুন্দর বর্ণনা দিয়েছিল যেন ঘরের ভিতর ঘড়া ঘড়া সোনার মোহর আছে। কিন্তু বাস্তবে যে পণ্ডিত চরম দারিদ্র্যের শিকার তা বুঝতে দেরি হল না তার। মনের ব্যথা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে লুকিয়ে থাকার পর যখন পণ্ডিত ও তার বউ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, তখন সে পণ্ডিতের ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

পরের দিন সুন্দর বাটুর জন্য সারাক্ষণ অপেক্ষা করল। এদিক সেদিক পায়চারি করল। কখন বাটু আসে, আর কী কী চুরি করে আনে। কিন্তু হায়! বাটু তো এলই না। উলটে একমুখ কান্না নিয়ে সুন্দরের কাছে ছুটে এল তার বউ। কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে সে বলল সুন্দরকে, 'ও গো, আমাদের কী সব্বনাশ হয়ে গেছে গো। আমার সব সোনার গহনা চুরি হয়ে গেছে।'

সুন্দর স্তব্ধ হয়ে থপ করে ঘরের মেঝেয় বসে পড়ল। বউকে কী সান্ত্বনা দেবে ভেবে পেল না! পরের ক্ষতি করতে গিয়ে যে নিজের ক্ষতি হয়ে গেল— একথা ভাবতেই তার দু-চোখ ঝাপসা হয়ে উঠল।

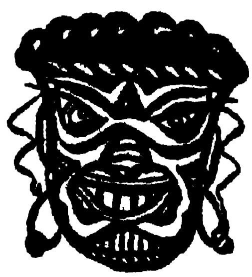
ওদিকে সকালবেলায় ঘুম ভাঙতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পণ্ডিতের স্ত্রী হতবাক। বালিশের কাছে কাঁচা সোনা ভর্তি একটি থলে পড়ে রয়েছে।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই পণ্ডিতের বউ তাড়াতাড়ি পণ্ডিতকে ডেকে তুলল। তারপর দুজনে মিলে থলেটা খালি করল। দেখল অজস্র সোনা। কিছু হিরে-মুক্তোও রয়েছে। সঙ্গে একটি চিঠি।

তাতে লেখা--- মেয়ের বিয়ের জন্য যৎসামান্য উপহার!

পণ্ডিতের বউ বলল, 'দ্যাখো— আমাদের কষ্টের কথা জেনে নিশ্চয়ই কোনো মহাপুরুষ এসব রেখে গেছে।'

পণ্ডিত এ কথার কোনো জবাব দিল না। বিস্ময়ে, খুশিতে সে কেবল সোনা-হিরে-জহরত ভরা থলেটার দিকে পলকহীনভাবে চেয়ে রইল। বাকশক্তি যেন তার রহিত হয়ে গেছে।



ঝাড়খণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম, মেঘালয়, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা, খাসিয়া

লালুর আংটি

(ঝা ড় খ ণ্ড)



এক সাঁওতাল সর্দারের ছিল তিন ছেলে। তিন ছেলেকে নিয়ে সর্দার আর তার বউ-এর মহা আনন্দে দিন কাটত। সারাদিন বাপ আর তিন ছেলে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করত, আর সন্ধেবেলা ভরপেট খেয়ে নাচ-গানের আসর বসাত। বড়ো ছেলে যেমন ভালো বাঁশি বাজাত, মেজো ছেলে তেমনই গাইতে পারত গান, আর ছোটো ছেলে মাদলের তালে তালে অপূর্ব সুন্দর নাচত।

এই সুখের সংসারে বিয়ে দেবার জন্য অনেক মেয়ের বাবা-মারই আগ্রহ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্দাব তাব বড়ো ছেলেব জন্য ধনুবুড়োর মেয়ে সীতাকে পছন্দ করল। সীতার ছিল অঢেল চুল আর তার স্বাস্থ্যও ছিল খুব ভালো। সর্দারের বাড়িতে প্রাচুর্য যেমন ছিল, তেমনি খাটুনিও কম ছিল না। সর্দারের বউ-এর বয়স হয়ে যাওয়ায়, তার পক্ষে সবদিক ঠিকমতো দেখাশোনা করা সম্ভব হত না। তাই স্বাস্থ্যবতী সীতার সাহায্যে আবার সংসারের সব কাজ ভালোভাবে চলতে পারবে, একথা ভেবে সকলেই এই বিয়েতে মত দিল।



নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর বেশ কিছুদিন সুখে দিন কাটতে লাগল। হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলায় মেজো ছেলে বলল যে, সে একটি মেয়েকে ভালোবাসে, আর তাকেই বিয়ে করবে।

কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, মেজো ছেলের ভাবী স্ত্রী ডাকসাইটে কুঁদুলি। তবুও বিয়ে ঠেকান গেল না; এবং খুব অল্প দিনের মধ্যেই মেজোভাই সেই মেয়েকে বিয়ে করে আনল।

বড়ো বউ-এর মিষ্টি স্বভাব আর আন্তরিক পরিশ্রমের জন্য সংসারের সবাই তাকে খুব ভালোবাসত। মেজো-বউ শ্বশুরবাড়িতে এসে বড়ো বউ-এর প্রতিপত্তি দেখে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হল। আরাব যেহেতু সে ছিল প্রচণ্ড ঝগড়াটে, তাই নানা ছুতো করে ঝগড়া বাধাতে তাকে বেগ পেতে হল না। ফলে অল্প কদিনের মধ্যেই সর্দারের বাড়িতে শুরু হয়ে গেল চিৎকার আর চেঁচামিচি।

ক্রমশ এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, একটা দিনও চিৎকার ও অশান্তি ছাড়া ঘরের কোনো কাজ হত না। দিনের পর দিন এই অশান্তি দেখতে দেখতে ছোটো ছেলে লালু একদিন বাবা-মাকে বলল যে, সে আর এই অসহ্য পরিবেশে থাকতে চায় না। বাইরে গিয়ে কাজের সন্ধান করবে। কিন্তু বাবা-মা তাকে কিছুতেই যেতে দিতে



চাইল না। লালু কোনো কথা না মেনে বাড়ি ছাড়তে দৃঢ়সংকল্প হয়ে বাবার কাছে কিছু টাকা চাইল। শেষকালে বাবার কাছ থেকে ষাটটা টাকা নিয়ে সে ভাগ্যের অন্বেষণে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

হাঁটতে হাঁটতে লালু এক অচেনা গ্রামে এসে পৌঁছাল। অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে সে দেখল যে, গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই এক মোটাসোটা বেড়ালের পেছনে ছুটছে; আর বেড়ালটা প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে। লালু উত্তেজিত জনতার কাছ থেকে অনেক কষ্টে জানতে পারল, যে এই বেড়ালটা প্রতিদিন ওই রাজ্যের রাজপুত্রের খাবার দুধ খেয়ে ফেলে। তাই রাজামশাই ঘোষণা করেছেন যে বেড়ালটাকে মেরে ফেলতে পারবে, সে কুড়ি টাকা পুরস্কার পাবে। লালু গ্রামাবাসীদের বলল যে, তার একটা এইরকম বেড়াল দরকার। বেড়ালটাকে নিয়ে সে এই মুহূর্তে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। বেড়ালটা তাকে দিলে সে কুড়ি টাকা দিতে রাজি আছে। লালুর প্রস্তাবে গ্রামের মোড়ল কিছুক্ষণ চিন্তা করে অন্যান্যদের একথায় রাজি হতে বলল। এতে তাদের লাভ ছাড়া লোকসান হবে না। কারণ এই অপরিচিত লোকটি বেড়ালটার জন্য কুড়িটা টাকা দেবে; আবার রাজাকে বেড়ালটার মৃত্যুসংবাদ দিলে তিনিও কুড়িটা টাকা দেবেন। ফলে, দু-গুণ টাকায় তাদের 'ভোজ' জমবে খুব ভালোভাবে।

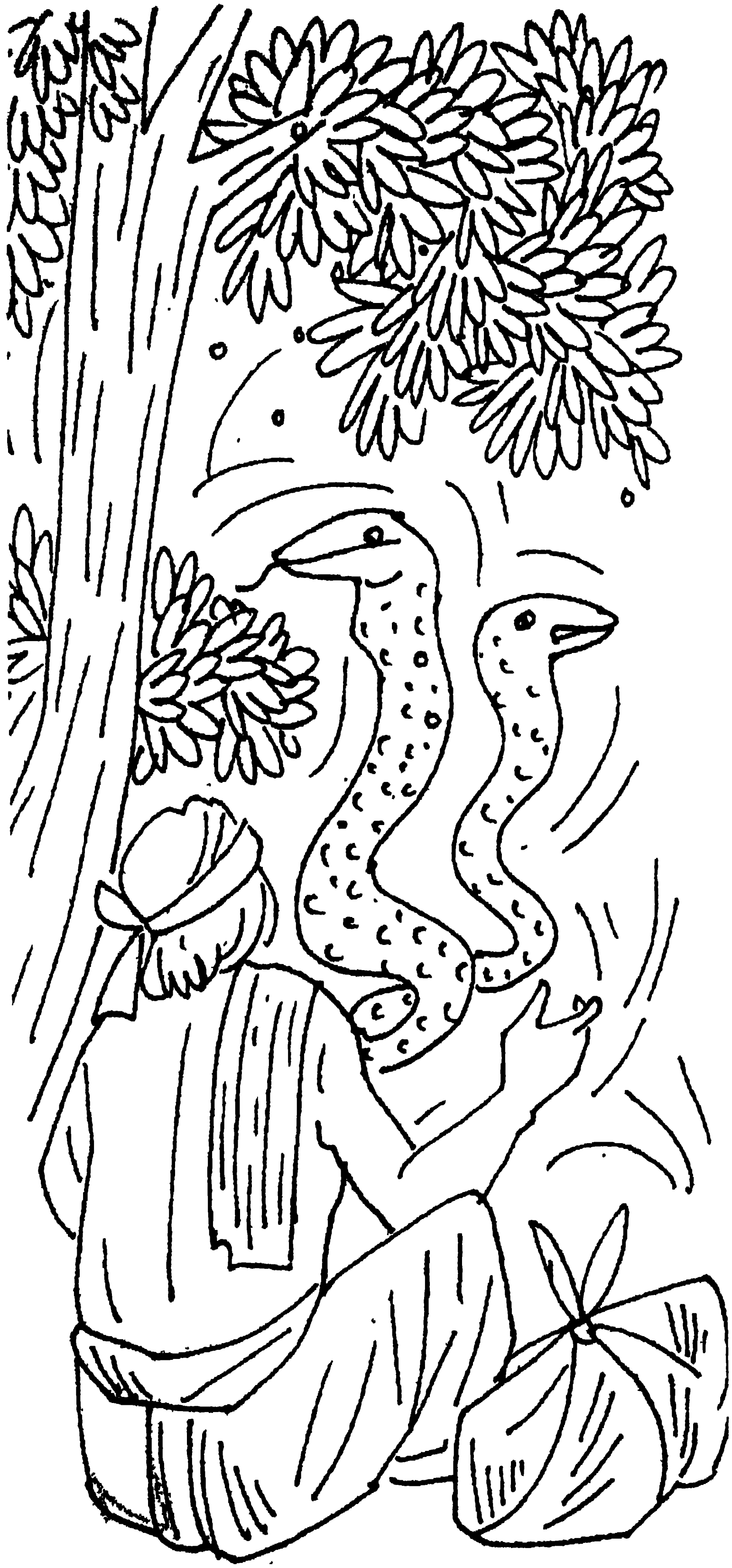
লালু কুড়ি টাকার বিনিময়ে বেড়ালটাকে থলিতে ভরে আবার চলতে লাগল। চলতে চলতে এক গ্রামে সে দেখতে পেল যে, গ্রামের জোয়ান ছেলেরা একটা মস্ত বড়ো পুকুরের ধারে তির-ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লালু কৌতূহলী হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল যে, একটা ভোঁদড়কে শিকার করার জন্য তারা এখানে জমায়েত হয়েছে। এই ভোঁদড়টা সেই দেশের রাজার পুকুরের সমস্ত মাছ সাবাড় করেছে। রাজামশাই ভোঁদড়টাকে মেরে ফেলতে বলেছেন। এই পুকুরের জলেই ওটা লুকিয়ে আছে। লালু এবারেও ভোঁদড়টাকে জ্যান্ত অবস্থায় কুড়ি টাকা দিয়ে কিনল; আর তার সঙ্গের লম্বা থলিতে বেড়ালের সঙ্গে রেখে দিল।

বেড়াল আর ভোঁদড়কে সঙ্গে নিয়ে লালু আবার হাঁটতে আরম্ভ করল। হাঁটতে হাঁটতে সে আর একটা নতুন গ্রামে পৌঁছাল। এই গ্রামেও একটা আশ্চর্য জিনিস সে দেখল। একটা ধেড়ে ইঁদুরের পেছনে অনেক ছেলে দৌড়চ্ছে। এই ইঁদুরটা মূল্যবান কাগজপত্র কেটে দেওয়ায়, প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে সেদেশের রাজা একে মেরে ফেলতে হুকুম দিয়েছেন। লালু কুড়ি টাকার বদলে এই ইঁদুরটাকেও কিনল এবং তার থলিতে বেড়াল ও ভোঁদড়ের সঙ্গে রেখে দিল।

এবারে লালু বেড়াল, ভোঁদড় ও ইঁদুরকে সঙ্গে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে সে একটা বর্ধিষ্ণু গ্রামে এসে পৌঁছাল। কিন্তু সে বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল যে, গ্রামবাসীদের সকলের মুখে অত্যন্ত ভীতি ও আতঙ্কের ছায়া। লালু এর কারণ জানতে চাইল। গ্রামবাসীরা লালুকে বলল যে, তাদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লালুর জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে যেন এই গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু লালু প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তার আগ্রহের আতিশয্যে শেষ পর্যন্ত একজন বলল যে, এই গ্রামে প্রতিদিন সন্ধেবেলা দূরের জঙ্গল থেকে এক বিষধর সাপ বেরিয়ে আসে, আর অন্তত তিন চার জনকে দংশন করে। এইভাবে আর কিছুদিন চললে গ্রামে আর কোনো জীবিত মানুষ থাকবে না। তাই আজকে সকলে মিলে ওই সাপটিকে মেরে ফেলবার প্রতিজ্ঞা করেছে।

এদিকে সন্ধের অন্ধকার নেমে আসতেই দূর থেকে সাপের ফোঁস ফোঁস আওয়াজ ভেসে এল। গ্রামবাসীরা তেড়ে যেতেই লালু তাদের বাধা দিয়ে বলল যে, সে সাপ ধরার মন্ত্র জানে। অতি সহজেই সাপটিকে সে ধরতে পারবে এবং সেটাকে সঙ্গে নিয়ে সে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে।

কিছুক্ষণ পরে প্রচণ্ড আওয়াজ করতে করতে সাপটি লালুর সামনে এসে পড়লে, বাবার কাছে শেখা সাপ ধরার মন্ত্রটি সে জোরে জোরে বলতে লাগল। কয়েকবার মন্ত্রটি বলার পরই সাপটি নিস্তেজ হয়ে গেল এবং ফণা গুটিয়ে পোষা জানোয়ারের মতো লালুর দিকে এগিয়ে এল। লালু সাপটিকে ধরে তার থলির মধ্যে রেখে আবার চলতে শুরু করল।

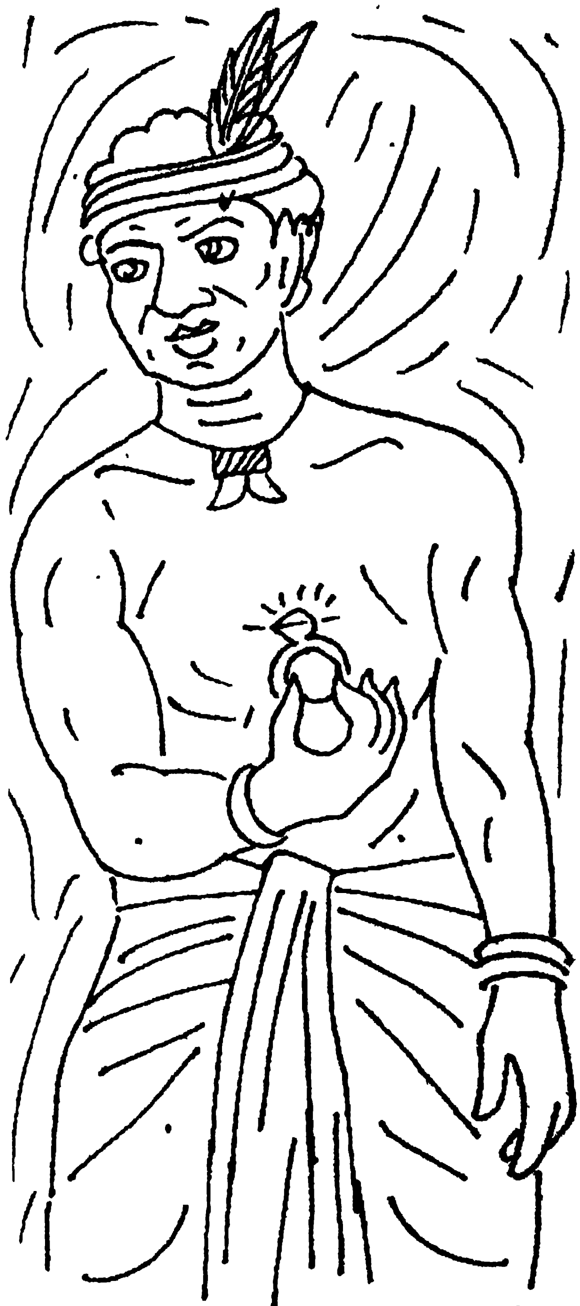


লালুর থলিতে বেড়াল, ভোঁদড় ও ইঁদুর মহানন্দে থাকলেও সাপটি ক্রমশই তার গর্তে ফিরে যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু যেহেতু তার প্রাণ বাঁচিয়েছে, তাই কৃতজ্ঞতাবশত সে লালুর উপকার করতে চাইল। সাপটি লালুকে বলল, —"বন্ধু, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তুমি না থাকলে গ্রামবাসীরা নিশ্চয়ই আমাকে মেরে ফেলত। তাই আমি তোমার একটা উপকার করতে চাই। আমার বাবা-মা খুব বড়োলোক। তুমি আমাকে আমার বাড়িতো পৌঁছে দাও, আমার বাবা তোমাকে একটা দামি জিনিস পুরস্কার দেবেন।"

প্রথমদিকে লালু সাপটির কথা বিশ্বাস করতে পারল না। কিন্তু সাপটি তাকে বার বার আশ্বাস দেওয়ায় সে সাপের সঙ্গে তার বাড়ি গেল। ছেলের কাছে সব কথা শুনে সাপের বাবা মা লালুর সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করল এবং অনেক সুন্দর সুন্দর খাবার খেতে দিল। শেষে যাবার সময় হলে সাপের বাবা তাকে আড়ালে ডেকে একটা চকচকে পাথর বসানো আংটি দিয়ে বলল, "এই আংটি নাও। এর গুণে তোমার কোনো অভাব থাকবে না। এক গ্লাস কাঁচা দুধের মধ্যে আংটিটি ডুবিয়ে মনে মনে তুমি যা চাইবে, মুহূর্তের মধ্যে তাই পাবে। তবে সাবধান, এই আংটির কথা কাউকে বোলো না। অন্য কেউ এই আংটি পেলে সে তোমার ক্ষতি করতে পারে।" বুড়ো সাপের কাছে সব শুনে লালু খুশি মনে তার কেনা জন্তু ও আংটি নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

লালুকে ফিরে পেয়ে তার বাবা-মা এত খুশি হল যে, সে কীভাবে টাকা খরচ করেছে, সে সম্পর্কে কিছু জানতেই চাইল না। কিন্তু মেজবউ-এর প্ররোচনায় মেজো ভাই অত

টাকার বদলে মাত্র তিনটে জন্তু কেনার জন্য লালুকে নানাভাবে বিদ্রুপ করতে লাগল। ব্যঙ্গের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে লালু বলল,— "আমার সঙ্গে রাজার ধন আছে। দরকার হলেই তা দেখতে পাবে।" এই কথা শুনে আপাতত সবাই চুপ করে গেল।



এদিকে বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর লালুর বাবা-মা তার জন্য উপযুক্ত পাত্রীর খোঁজ করতে লাগল। অবশেষে এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে তারা লালুর জন্য পছন্দ করল। মেয়েটির বাইরের রূপ খুব সুন্দর হলেও, সে মোটেই ভালো মেয়ে ছিল না। ওই গ্রামেরই অন্য একটি ছেলেকে সে ভালোবাসত। কিন্তু তাব বাবাকে সাহস করে একথা বলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই নানা বায়নাক্কা করে সে প্রত্যেকটা সম্বন্ধে বাগড়া দিত। লালুর সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ায় সে বলল যে, তাদের বাড়ি থেকে বরের বাড়ি পর্যন্ত মাটির নীচে একটা লম্বা সুড়ঙ্গ করে দিত পারলে তবে সে এখানে বিয়ে করবে। এই অসম্ভব চাহিদার কথা শুনে লালুর বাবা-মা বাড়ি চলে এল। কিন্তু লালু তাদের অভয় দিয়ে বলল যে পাত্রীর কথামতো সবকিছুই হবে। সুতরাং বিয়ের কথাবার্তা এগিয়ে চলুক।

লালুর কথা শুনে তার বাবা-মা আবার নতুন উদ্যমে বিয়ের কথাবার্তা চালাতে লাগল। ক্রমে বিয়ের দিন এগিয়ে এল। শেষকালে বিয়ের আগের দিন বাবা-মা লালুকে ডেকে বলল যে, আগামীকাল তাদের জীবনের চরম অসম্মান হবে। একমাত্র লালুর আশ্বাসেই তারা বিয়ের কথা পাকা করেছে: কিন্তু লালু এখন পর্যন্ত কনের দাবি মতো কিছুই করেনি। লালু বাবা-মার শুকনো মুখ দেখে বলল যে, বিয়ের লগ্নের আগেই সব কিছু হয়ে যাবে। তারা যেন কোনোরকম দুশ্চিন্তা না করে। এই বলে বড়ো বউদির কাছ থেকে এক গেলাস কাঁচা দুধ নিয়ে সে নিজের ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিল।

পরদিন ভোরবেলা গ্রামের সবাই অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করল যে, কনের বাড়ি থেকে লালুর বাড়ি পর্যন্ত মাটির নীচে একটা সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছে। সুতরাং বিয়ে হতে আর কোনো বাধা থাকল না।

বিয়ের পর নতুন বউ, কী করে লালু এই অসাধ্য সাধন করল, তা জানতে প্রচণ্ড কৌতূহলী হয়ে উঠল। সে প্রথমে বাড়ির অপর দুই-বউকে নানাভাবে তোয়াজ করে আসল কথা জানতে চাইল। কিন্তু দুই বউ-ই বলল যে, তারা কিছু জানে না। শাশুড়িও অনুরূপ কথা বলল। অবশেষে সে লালুকে নানাভাবে ভোলাতে



লাগল। লালু প্রথমে বউয়ের কাছে কোনো কথা না বললেও, শেষকালে একদিন বউয়ের ছলনায় বলতে বাধ্য হল।

বউ পরদিনই তার পূর্ব প্রেমিকের সঙ্গে গোপনে দেখা করল এবং লালুর আংটির কথা তাকে জানাল। সব শুনে, ছেলেটি উল্লসিত হয়ে উঠল। তার হাতে একটি শেকড় দিয়ে সে বলল যে, এটি বেঁটে রাত্রিবেলা জলের সঙ্গে মিশিয়ে লালুকে খাইয়ে দিতে হবে। তাহলে পরদিন দুপুরের আগে তার ঘুম ভাঙবে না। তারপর ছেলেটি ছাগলের রক্তে ভর্তি একটি মাটির হাঁড়িও তাকে দিল। শেষকালে নতুন বউকে পরামর্শ দিয়ে বলল যে, লালু শেকড়ের গুণে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লে সে যেন হাঁড়িটি তার খাটের নীচে রেখে দিয়ে গোপনে আংটি নিয়ে পালিয়ে আসে।

সকাল হলে সবাই দেখল যে নতুন বউ নেই; আর লালুর খাটের নীচে এক হাঁড়ি ভর্তি রক্ত রয়েছে। তখন তারা ভাবল যে, নিশ্চয়ই লালু নতুন বউকে খুন করে হাঁড়ি করে তার রক্ত রেখে দিয়েছে। চেঁচামেচিতে লালুর ঘুম ভেঙে গেল। সে লক্ষ করল যে তার হাতে আংটিটি নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তা পাওয়া গেল না।

বউ-এর বাবা-মা মেয়ের শোকে কাঁদতে কাঁদতে গ্রামের মোড়ল আর চৌকিদারের কাছে তাদের সন্দেহের কথা বলল। তারা তখন বিচারককে সব কথা জানাল। বিচারক সব শুনে পুলিশ দিয়ে লালুকে ধরে এনে জেলে রাখার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সন্দেহের বশে কাউকে ফাঁসি দেওয়া যায় না। তাই বিচারক সবকিছু আরও ভালো করে তদন্ত করতে চৌকিদার ও মোড়লকে আদেশ দিলেন।

এদিকে নতুন বউ-এর সঙ্গে একই দিনে সেই ছেলেটিরও গ্রাম ছাড়ার কথা সবাই বলাবলি করতে লাগল।

লালু তার বন্ধু জন্তুদের কাছে মনের দুঃখ জানিয়ে বলল যে, যেমন করে হোক, তার বউ ও আংটি খুঁজে বার করতে হবে। লালুর কথা শুনে তারা বিভিন্ন দিকে নতুন বউকে খুঁজতে লাগল — কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। তখন বেড়াল আর ভোঁদড় বলল যে, ইঁদুর যদি তার সমস্ত জাতভাইদের সাহায্যে খুঁজতে শুরু করে, তবেই একমাত্র পাওয়া সম্ভব। তখন ইঁদুর তার সমস্ত জাতভাইদের নিয়ে— মেঠো ইঁদুর, গেছো ইঁদুর, বুনো ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর,— যত রকম ইঁদুর আছে সবাইকে নিয়ে লালুর বউ ও আংটি খুঁজতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

নতুন-বউ লালুর আংটির সাহায্যে তার প্রেমিকের সঙ্গে এক মস্ত বড়ো বটগাছের উপরে খুব সুন্দর বাড়ি তৈরি করে বাস করছিল। ইঁদুরেরা সেই বাড়ির সমস্ত দরজা-জানালা ও দেয়াল ফুটো করে গভীর রাতে কাতারে কাতারে ঢুকে পড়ল। লেপতোশক, বাক্স-প্যাটরা, হাঁড়ি-কুড়ি, বাসন-কোসন, জামা-কাপড়— যা-কিছু সে বাড়িতে ছিল, তছনছ করে তারা আংটি খুঁজতে লাগল। একটা চালাক নেংটি ভাবল যে, নিশ্চয়ই নতুন-বউ তার মুখের মধ্যে আংটিটা লুকিয়ে রেখেছে।

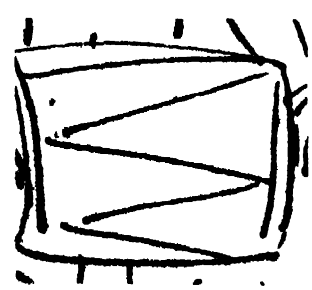
পরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন নতুন-বউয়ের বিছানায় অত্যন্ত সন্তর্পণে নেংটিটি উঠল এবং খুব কৌশলে তার সরু লেজটি বউ-এর নাকের মধ্যে ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। সুড়সুড়ির ফলে বউ হেঁচে ফেলতেই, আংটিটি তার মুখ থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। অমনি আংটিটি মুখে নিয়ে সেই ইঁদুরটি এক ছুটে জেলখানায় লালুর কাছে পৌঁছে দিল।

আংটি ফিরে পেয়ে লালু জেলখানাতেই এক গ্লাস দুধ চাইল। তারপরে দুধের মধ্যে আংটি ডুবিয়ে সে মনে মনে বলল যে, তার বউ যেন এখুনি এখানে চলে আসে। মুহূর্তের মধ্যে আংটি পুরো গাছ সমেত সেই জেলখানায় হাজির করল।

গাছ-বাড়ির ভেতরে নতুন-বউয়ের সঙ্গে তার প্রেমিকও ধরা পড়ল। মেয়ের বাপ-মা সমস্ত ঘটনা বুঝতে পেরে নীরবে স্থান ত্যাগ করল।

ক্রমে সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেলে বিচারপতি লালুকে মুক্তি দিলেন। অপর দুই অপরাধীকে বিচার করার জন্য তিনি তাদের জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দিলেন।

মুক্তি পেয়ে লালু তার পোষা জন্তুদের নিয়ে বাড়ি চলে এল। অল্পদিন পরে অনেক দেখেশুনে একটি সত্যিকারের ভালো মেয়ের সঙ্গে লালুর বিয়ে হল। লালুর বিয়ের পর তার পোষা জন্তুরা স্বাধীনভাবে থাকতে চাইল। লালু একটা মস্ত বড়ো মাছে-ভরা-দীঘিতে ভোঁদড়কে ছেড়ে দিল। বেড়াল ও ইঁদুরকে গঞ্জের বড়ো বাজারে ছেড়ে দিল— সেখানে মনের আনন্দে তারা তাদের পছন্দ মতো খাবার খেতে লাগল।



লক্ষ্মণ ও বুনো মোষদের কাহিনী



লক্ষ্মণ নামে এক যুবক সাঁওতাল ও তার বিধবা মা একটা গ্রামে থাকত। খুব সাধারণভাবে তারা দুজনে জীবনযাপন করত। কেননা, তাদের অবস্থা ভালো ছিল না। খুব অল্প জমি ছিল। তার ওপর তাদের নিজস্ব কোনো গাই-বাছুর ছিল না। লক্ষ্মণ তো কোনোক্রমে পাহাড়ের উঁচুতে নিজের চেষ্টায় জমি চাষ করেছিল। আর সেটা সে করেছিল প্রতিবেশীদের সাহায্য পেয়ে। জমি চাষের জন্য সে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে একটা লাঙল আর একজোড়া বলদ ধার করে। বলদের সাহায্যে লাঙল চষে সে যে জমি আবাদের জন্য তৈরি করেছিল, সেই জমিতে সে গাঁজার বীজ রোপণ করে।

ফসল তার ভালোই হয়েছিল। কিন্তু একদল বুনো মোষ একরাতে এসে সবকিছু খেয়ে ফেলল। লক্ষ্মণ এতে খুব রেগে গেল। লক্ষ্মণ এর একটা বদলা নেবে স্থির করল। কিন্তু বদলা নিতে গেলে যত অস্ত্র দরকার তা তার ছিল না। মাত্র ছ-ছটা তির নিয়ে তো আর বুনো মোষদের মোকাবিলা করা যায় না!

তবু লক্ষ্মণের মন থেকে বদলা নেবার ইচ্ছেটা মরে গেল না। সে একদিন মনস্থির করে গাঁয়ের কামারের কাছে গেল। বুনো মোষদের মারবার জন্য সে কামারের কাছ থেকে একটা লোহার ধনুক ধার করল। কামারকে দিয়ে সে বারোটা লোহার ফলাযুক্ত তীক্ষ্ণ ধারওলা বারোটা তির তৈরি করিয়ে নিল।

কিন্তু লক্ষ্মণ সমস্ত বুনো মোষগুলোকে মেরে ফেলবে— এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শুনে লক্ষ্মণের ওপর তার বিধবা মা খুব অসন্তুষ্ট হল। এ নৃশংস কাজ করতে তাকে নিষেধ করল। বলল, 'লক্ষ্মণ, খবরদার তুই এ কাজ করিস না। এতে সংসারে অমঙ্গল হবে।'

লক্ষ্মণ মায়ের কোনো কথাই শুনল না। রাগে উত্তেজিত হয়ে সে মাকে প্রণাম না করে, মায়ের আশীর্বাদ না নিয়েই নিকটবর্তী জঙ্গলে ঢুকে গেল। তার দৃঢ় বিশ্বাস, জঙ্গলের গভীরে কোথাও নিশ্চয় মোষগুলো লুকিয়ে আছে।

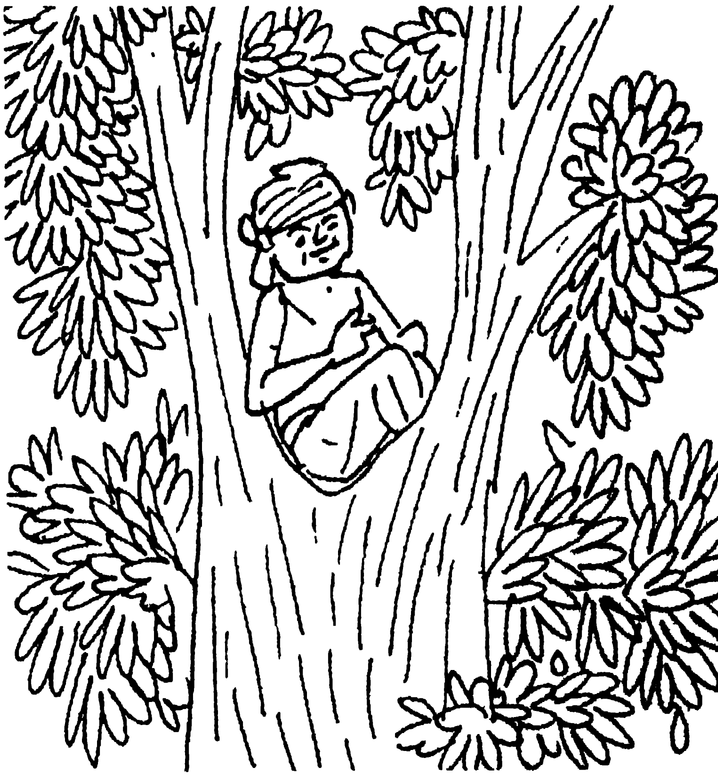
জঙ্গলের মধ্যে মোষগুলোকে খুঁজতে খুঁজতে বেলা বয়ে গেল। তারপর যথারীতি রাত নেমে আসতেই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল লক্ষ্মণ। কী করবে বুঝতে পারছিল না। তারপর হঠাৎই তার জঙ্গলের মধ্যে একটা ছোটো কুটির চোখে পড়ল। কুটিরটা দেখতে পাওয়ামাত্রই লক্ষ্মণ সেদিকে এগিয়ে গেল। এগিয়ে যেতেই দেখল সেই ছোটো কুটিরে রয়েছে একজন নুয়েপড়া বুড়ি। বুড়িটাকে দেখেই লক্ষ্মণ বুঝতে পারল, এ বুড়ি— যে সে বুড়ি না। এ হল ডাইনি বুড়ি। বুকটা তার ভয়ে ধকধক করে উঠল। তবু ফেরবার তার পথ নেই। রাতের জঙ্গলে পথ খুঁজে বাড়ি ফেরা তার পক্ষে দুঃসাধ্য। তাই সে ভেবেচিন্তে ডাইনি বুড়ির দিকে এগিয়ে গেল। তাকে নমস্কার করে বলল, 'খুড়িমা, আমি আজ রাতে তোমার সঙ্গে এখানে থাকব। আমি আমার সঙ্গে করে যে ভাত-ডাল-তরকারি এনেছি তা আমরা আজ রাতে দুজনে ভাগ করে খাব।'

লক্ষ্মণের বিনীতভাব দেখে বুড়িটি খুব খুশি হল। শুধু খুশিই হল না, লক্ষ্মণকে খুব ভালোবেসে ফেলল। মহা আনন্দে সে লক্ষ্মণকে বলল, 'রাতবিরেতে আর কোথায় যাবে বাছা। আজকের রাতটা তুমি খুশিমতো আমার কাছে থাক। আমি বেঁচে থাকতে কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

রাতটা কোনোরকমে ডাইনি বুড়ির সঙ্গে একই কুটিরে কাটিয়ে দেবার পর সকাল হতেই লক্ষ্মণ বুড়িকে বুনো মোষগুলো কোথায় থাকতে পারে তা জিজ্ঞেস করল।

বুনো মোষের কথাশুনে বুড়ি ডাইনিটা প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর বলল, 'কেন বাছা—হঠাৎ মোষেদের খোঁজ করছ! ওদেরকে আবার তোমার দরকার কী?'

লক্ষ্মণ এবার সব কথাই খুলে বলল বুড়িকে। মোষগুলো যে তার ক্ষেতের ফসল নষ্ট করেছে একথা যেমন বলল, তেমনি বলল তার হঠাৎ এই জঙ্গলে আসার উদ্দেশ্য। কোনোকিছুই সে ডাইনি বুড়ির কাছে গোপন করল না।



লক্ষ্মণের মুখ থেকে সব কথা শুনে ডাইনি বুড়ি বলল, 'এখান থেকে পশ্চিমদিক বরাবর তিনমাইল গেলে তুমি বুনো মোষগুলোর দেখা পাবে। তবে, সব সময় তুমি সতর্ক থেকো। ওরা খুব হিংস্র। তোমাকে দেখতে পেলে ছেড়ে কথা বলবে না। ওদেরকে তির ছোঁড়ার আগে তুমি কোনো উঁচু গাছে আশ্রয় নিও।'

এ কথা বলে বুড়ি লক্ষ্মণকে আশীর্বাদ করল।

পরের দিন সকালে লক্ষ্মণ যথারীতি ডাইনি বুড়ির কুটির ছেড়ে বুড়ির নির্দেশমতন সেই জায়গায় এসে উপস্থিত হল, যেখানে বুনো মোষগুলো বিশ্রাম নেয়। উপস্থিত হয়েই লক্ষ্মণ সেই জায়গাটা পরিষ্কার করে নিয়ে একটা গাছের ওপরে উঠে বসল।

সন্ধের দিকে বহু মোষ বিশ্রাম নেবার জন্য সেখানে এল। তাদের সকলকে দেখে লক্ষ্মণ বেশ ধাঁধায় পড়ে গেল। কোন বদমাশ মোষগুলোকে সে মারবে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

যথারীতি রাত হল, রাত কেটেও গেল। সকালে আবার যথারীতি বুনো মোষের দল স্থান ত্যাগ করল। মোষেরা চলে যেতেই লক্ষ্মণ গাছ থেকে নামল। তারপর কাছের একটা জলাশয় থেকে জল এনে সেই জায়গাটাকে পরিষ্কার করে ফেলল।

গতকাল রাতে পেটে কিছু পড়েনি। ভীষণ খিদে পেল লক্ষ্মণের। খিদের জ্বালায় সে বনের কিছু ফল সংগ্রহ করল। তা খেয়েই সে তার খিদে মেটাল।

সন্ধে হতেই আবার সে জায়গাটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে যথারীতি আগের দিনের মতন গাছের ওপরে উঠে বসল।

ওদিকে বুনো মোষের দল ফিরে এসে যখন দেখল, দ্বিতীয় দিনেও তাদের বিশ্রামের জায়গাটা পরিষ্কার ঝকঝক তকতক করছে, তখন তারা সকলে ভীষণ অবাক হয়ে গেল। ওরা কেউই বুঝে উঠতে পারল না— রোজ রোজ কে এভাবে তাদের বিশ্রামের জায়গাটা ধুয়ে-মুছে [illegible] রাখছে।

মোষেদের মধ্যে একটা বুনো মোষ খুব অসুস্থ ছিল। অসুস্থতার জন্য সে ভালো করে চলাফেরা করতে পারত না। কে তাদের বিশ্রামের জায়গাটা পরিষ্কার করে রাখে তা জানবার জন্য অন্যসব মোষেরা নিজেদের মধ্যে যুক্তি-পরামর্শ করে, সেই অসুস্থ মোষটাকে সাক্ষী হিসেবে রেখে গেল। তাকে বলেও গেল গোয়েন্দাগিরি করার জন্য।

মোষের দল পরের দিন সকালে যথারীতি চলে যেতেই লক্ষ্মণও গাছ থেকে নামল। গাছ থেকে নেমেই সে অসুস্থ মোষটাকে দেখে প্রথমে একটু অবাক হল। তারপর সাহসের সঙ্গে সেই জায়গায় এগিয়ে গেল। মোষেদের বিশ্রামের জায়গাটি ফের প্রতিদিনের মতন পরিষ্কার করল। জায়গাটি পরিষ্কার করে নিয়েই লক্ষ্মণ বন থেকে ফলমূল সংগ্রহ করে যথারীতি রোজকার মতন গাছের ওপরে গিয়ে বসল।

যথারীতি বুনো মোষগুলো ফিরে আসার পর বুড়ো মোষটা তাদেরকে বলল, 'আজ আমি সব নিজের চোখে দেখেছি। একটা মানুষ আমাদের বিশ্রাম নেবার জায়গাটা জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে।'

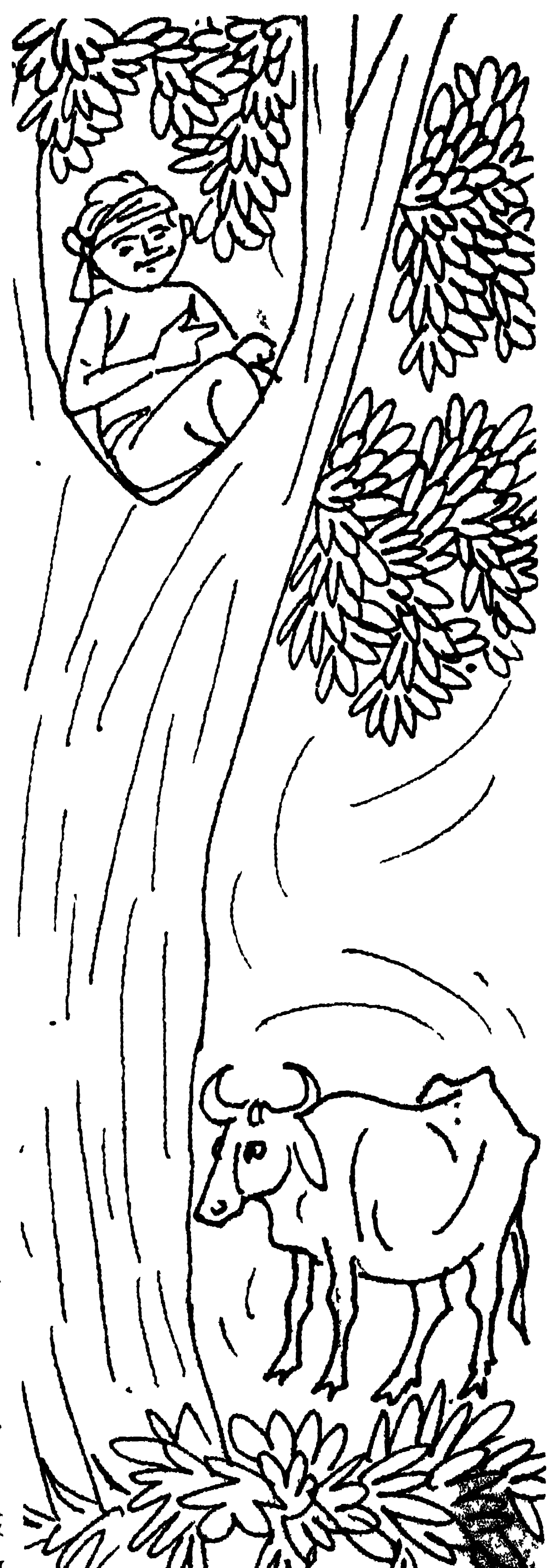
অসুস্থ বুড়ো মোষটার কথা শুনে সবাই বিস্মিত হল। প্রথমে বুনো মোষগুলো পরস্পরের দিকে চাইল। তারপর তারা বুড়ো মোষটাকে জিজ্ঞেস করল, 'সে এখন কোথায়?'

বুড়ে মোষ বলল, 'খুব কাছেই সে একটা গাছের ওপরে আশ্রয় নিয়েছে।'

পরের দিন সকালে বুনো মোষগুলো লক্ষ্মণকে খুঁজে বার করল। তাকে অনুরোধ জানাল নির্ভয়ে গাছের ওপর থেকে নেমে আসার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে তারা সকলে লক্ষ্মণের কাছে প্রতিজ্ঞা করল, তারা তাকে যেকোনোভাবে সাহায্য করতে চায়।

লক্ষ্মণ এ কথা শুনে নীচে নেমে এল। তারপর দুপক্ষের কথাবার্তায় এই সিদ্ধান্ত হল— লক্ষ্মণ তার শোযার জায়গাতেই থাকবে। কিন্তু যখনই তার দুধের প্রয়োজন হবে, তখনই সে একটা বাঁশি বাজাবে। সেই বাঁশির শব্দ পেলেই সব মোষেরা ছুটে আসবে তাকে দুধ দিতে।

এই ব্যবস্থা কদিন চলল। প্রতিদিন দুপুরবেলায় যেই লক্ষ্মণ বাঁশি বাজাত, সব মোষেরা দৌড়ে আসত। লক্ষ্মণের



প্রয়োজন মাফিক দুধ তারা তাকে দিত। বলতে নেই— লক্ষ্মণকে তারা এত দুধ দিত, সে দুধে লক্ষ্মণ স্নান পর্যন্ত করতে পারত। লক্ষ্মণ স্নানও করত। এইভাবে রোজ স্নান করার ফলে তার চুল খুব বড়ো ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এদিকে সে অঞ্চলের রাজার একটা পোষা টিয়াপাখি একদিন লক্ষ্মণকে রোদে তার চুল শুকতে দেখল। দেখামাত্রই সেই টিয়াপাখিটা উড়ে রাজার কাছে ফিরে গেল। গিয়েই সে রাজাকে বলল; 'রাজামশাই, আমি আপনার মেয়ের একটা উপযুক্ত পাত্রের খোঁজ এনেছি। কিন্তু তার কাছে যাওয়াই মুশকিল, সে বুনো মোষেদের সঙ্গে বসবাস করে।'



রাজকুমারীর জন্য অনেক খোঁজ করেও রাজা ঠিক একটা উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাচ্ছিলেন না। টিয়াপাখি তার কেবল পোষাপাখিই না, সত্যবাদীও। সদা-সর্বদা সে সত্য কথা বলে। তাছাড়া সে খুব উপকারীও। বহুবার রাজার অনেক জটিল-সমস্যা দূর করে দিয়েছে। কাজেই টিয়াপাখির মুখ থেকে সুপাত্রের সন্ধান পেয়ে রাজা খুব খুশি হলেন। আহ্লাদিত হয়ে তাই তিনি টিয়াপাখিটাকে বললেন, 'যে করেই হোক তুমি লোকটার সঙ্গে দেখা কর। তারপর আলাপ জমিয়ে তাকে যেভাবেই হোক তুমি আমার কাছে নিয়ে এস।'

টিয়াপাখি রাজার কথায় রাজি হল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার পরিচিত একটা কাকের কাছে গেল। তাকে তার কাজের ব্যাপারে সাহায্য করতে বলল।

কাক রাজি হল। সে টিয়াপাখির সঙ্গে লক্ষ্মণের সামনে এল। লক্ষ্মণ সেসময় যখন সবে দুধে স্নান করতে নেমেছে, ঠিক তখনই কাকটি টুক করে ঠোঁটে করে লক্ষ্মণের বাঁশিটা তুলে নিল।

বুনো মোষগুলো চলে যাবার পর হঠাৎ লক্ষ্মণের খেয়াল হল তার বাঁশিটা নেই। তারপর বাঁশিটির খোঁজে এদিক-ওদিক নজর করতেই সে দেখতে পেল তার বাঁশিটা রয়েছে একটি কাকের মুখে।

লক্ষ্মণ দেখামাত্রই কাকটার দিকে পাথর ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু কাকটি ছিল খুব চালাক। বুদ্ধিও ছিল তার অসম্ভব। বাঁশিটা এই ফেলে দিচ্ছি, এই ফেলে দিচ্ছি করে উড়ে উড়ে চলল। লক্ষ্মণ ছাড়বার পাত্র নয়। সে পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে সমানে কাকটার পেছু নিল।

তারপর কাকটাকে তাড়া করতে করতে লক্ষ্মণ রাজপ্রাসাদের কাছে চলে এল। চলে আসাতো আসা একেবারে রাজপ্রাসাদের ভেতরে। লক্ষ্মণ রাজপ্রাসাদের ভেতরে ঢোকা মাত্রই টিয়াপাখিটার ইশারায় রাজকর্মচারিরা রাজপ্রাসাদের দরজা বন্ধ করে দিল। যেই রাজপ্রাসাদের দরজা বন্ধ করে দিল অমনি কাজ হাসিল হয়েছে দেখে কাকটা বাঁশিটা ফেলেই ধাঁ।

রাজার অনুরোধে তারপর লক্ষ্মণ রাজকন্যাকে বিয়ে করতে একরকম বাধ্য হল। বিয়ের পর রাজপ্রাসাদের ভেতরেই রাজকন্যার সঙ্গে লক্ষ্মণ মহাসুখে জীবন কাটাতে লাগল। কিন্তু তবু তার মন পড়ে রইল জঙ্গলের দিকে বুনো মোষগুলোর জন্য।



লক্ষ্মণের এ মনোভাবের কথা চাপা থাকল না। একদিন লক্ষ্মণ তা প্রকাশ করতেই এ-ওর মুখে মুখে কথাটা রাজপ্রাসাদের ভেতরে সবার মধ্যে চাউর হয়ে গেল। কথাটা শোনামাত্রই লক্ষ্মণের শ্যালকরা কর্কশকণ্ঠে বলাবলি শুরু করে দিল, 'এই লোকটার না আছে টাকা, না আছে ভালো আত্মীয়স্বজন। কেন যে বোনটার সঙ্গে বাবা এই লোকটার বিয়ে দিল! বলিহারি বাবা, বিয়ের পরও শ্বশুরবাড়ির অন্ন ধ্বংস করছে। এমন নির্লজ্জ লোক বাবা জীবনে দেখিনি। বিয়ের পর সবাই বউকে নিয়ে নিজের বাড়িতে বসবাস করে। এ যে কেন যাচ্ছে না বুঝি না।'

শ্যালকরা ছিল একটু বেশি রকমের হিংসুটে স্বভাবের। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কেননা, তাদের চেয়ে বোনকেই তাদের বাবা বেশি ভালোবাসত। এ কারণে তারা ভাবল, সম্পত্তির বেশিটাই বাবা হয়তো [illegible] জামাইকে দান করে দেবে। তাই তারা আজেবাজে কথা বলে বেড়াতে লাগল।

লক্ষ্মণ এমনিতে ছিল খুব বুদ্ধিমান। লক্ষ্মণ শ্যালকদের আজেবাজে কথা শুনে খুব রেগে গেল। মনে মনে স্থির করল, এদেরকে একটা উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। ভাবা মাত্রই সে বাঁশিটা হাতে তুলে নিল। বাজাতে শুরু করল।

বাঁশি বাজানো মাত্রই— সে বাঁশির শব্দ শুনতে পেয়ে জঙ্গলের শত শত বুনো মোষেরা রাজপ্রাসাদের দিকে ছুটে এল। লক্ষ্মণ সঙ্গে সঙ্গে শালাদের সামনে রাজাকে ভয় দেখিয়ে বলল, 'আপনি যদি এই মুহূর্তে আমাকে আপনার রাজ্যের রাজা করে না দেন— তাহলে আমি আপনাকে আর রানিকে ছাড়া সকলকে মেরে ফেলব।'

বাঁশির শব্দে ইতিমধ্যে বুনো মোষেরা সব রাজপ্রাসাদের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। প্রাণহানি যে কোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে। কোন বাপ আর চায় তার সন্তানের মৃত্যু? তার ওপর শুধু তো তার নিজের সন্তানরা নয়— রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কত রাজকর্মচারি, দাসদাসী। সকলেরই তো মৃত্যু ঘটবে!

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল রাজার। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণকে তার রাজত্ব ছেড়ে দিতে রাজি হলেন রাজা। লক্ষ্মণের শ্যালকেরাও প্রাণভয়ে চুপ করে রইল। কোনো প্রতিবাদ করার তাদের আর সাহস হল না।

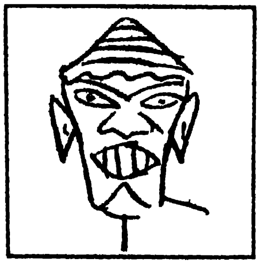
লক্ষ্মণ বুনো মোষদের থামাল। তাদেরকে জঙ্গলে চলে যেতে বলল। কী আশ্চর্য! লক্ষ্মণ বলামাত্রই শত শত বুনো মোষ জঙ্গলে ফের ফিরে গেল। একেবারে নিজেদের আস্তানায়।

রাজা হয়েই লক্ষ্মণ পরের দিনই লোকলশকর নিয়ে নিজের বৃদ্ধা মাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এল। তারপর পরম সুখে সে জীবন কাটাতে লাগল।



এক দুষ্টু ভূতের গল্প

(হি মা চ ল)



ভূত আছে কী নেই— এ তর্কের মধ্যে গিয়ে কোনো লাভ নেই। বরং আছে— একথা মেনে নিলেই গোল মেটে। মানুষের মধ্যে যেমন, ভূতেদের মধ্যেও তেমনি ভালো মন্দ দুইই আছে। ভালো ভূতেরা মানুষের কোনো ক্ষতি করে না; বরং কোনো কোনো সময় দেখা গেছে, তারা মানুষের অনেক উপকার করেছে। কিন্তু মন্দ ভূতেরা মানুষের ভালো তো করেই না, উলটে সব সময়েই তাদের চেষ্টা থাকে কী করে মানুষের ক্ষতি করা যায়। মন্দ ভূতেদের মাথায় সব সময় দুষ্টুবুদ্ধি কিলবিল করছে। ভূতেদের চেহারা কেমন তা কেউ জানে না। তারা যে-কোনো সময় ইচ্ছে করলেই মানুষ, জানোয়ার কিংবা পাখির মতো চেহারা ধরতে পারে। তবে ভূতের মাথায় যতই দুষ্টুবুদ্ধি থাকুক, আসলে তো ভূতই। তাই অনেক সময় মানুষের সঙ্গে বুদ্ধির পরীক্ষায় দুষ্টু ভূতেদেরও হার মানতে দেখা গেছে। এ গল্প এক দুষ্টু ভূতের গল্প।

অনেক...অনেক দিন আগে হিমাচলের কাংড়া অঞ্চলের চম্পাবতী গ্রামে শ্যামলাল নামে একটি লোক বাস করত। একদিন সে কিছুদূরের লক্ষ্মীনগর গ্রামে তার শ্বশুরবাড়ি যাবার জন্য সেজে-গুজে তৈরি হল। শ্যামলালের মনে খুব ফুর্তি। এবার সে তার বউকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে চলেছে। একটা লাঠির ডগায় কাপড়ের পুঁটলির মধ্যে সে তার বউ আর শ্বশুরবাড়ির লোকেদের জন্য অনেক রকম জিনিস নিল। শ্যামলালের মা তাকে বলেছিল— গাঁয়ের পণ্ডিতের কাছে গিয়ে যাত্রার শুভ সময়টা জেনে নিতে। কিন্তু শ্যামলালের আর দেরি করতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না। সময়ের শুভ অশুভ'র বিচার না করেই সে পুঁটলি-বাঁধা লাঠিটা কাঁধের উপর নিয়ে শ্বশুরবাড়ির দিকে যাত্রা করল।

শ্বশুরদের গাঁয়ের কাছাকাছি তিন রাস্তার ঠিক মোড়ের মাথায় একটা বিরাট শিমুল গাছ ছিল। সেই গাছের মগডালে ছিল একটা দুষ্টু ভূতের বাসা। সে তার বাসার মধ্যে বসে বসে সব সময় লক্ষ করত পথ দিয়ে কে কোথায় যাচ্ছে। শিমুল গাছের কাছাকাছি আসতেই শ্যামলালকে দেখতে পেল সেই দুষ্টু ভূতটা।

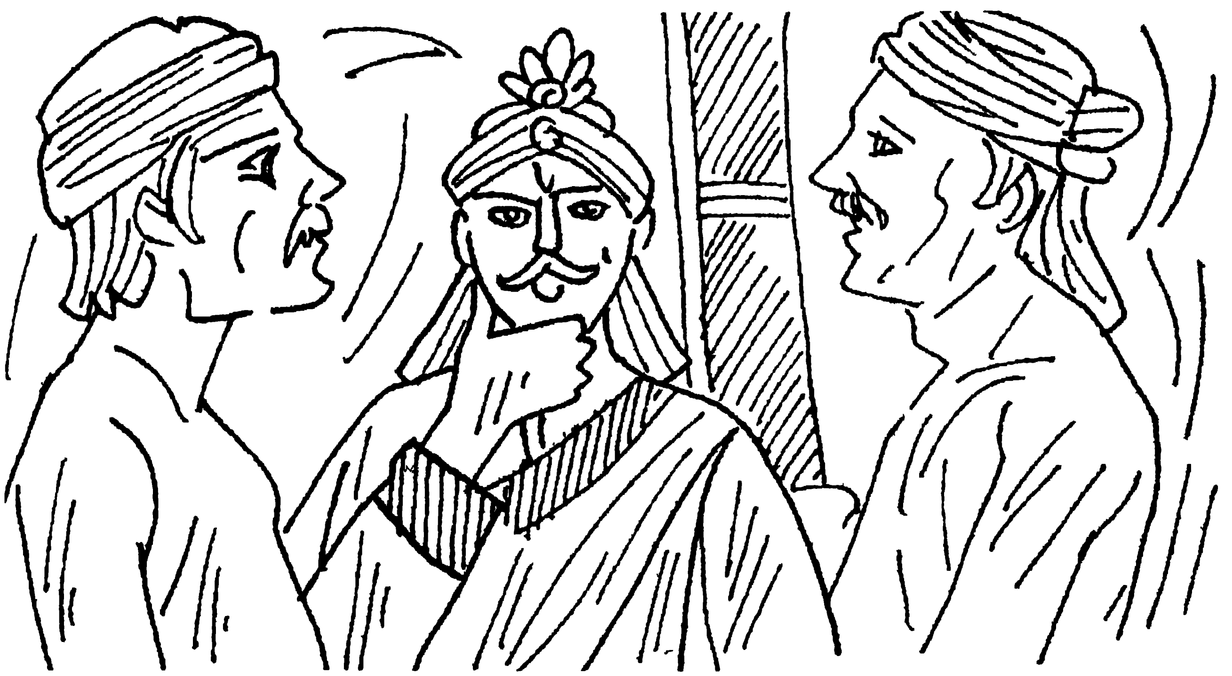
ভূতেরা যেমন তড়িঘড়ি চেহারা পালটাতে পারে, তেমনি তাদের আরও একটা ক্ষমতা আছে। মানুষের হাঁড়ির খবর তাদের একেবারে নখের ডগায়। ভূতটা তার সেই ক্ষমতার বলে জানতে পারল শ্যামলাল কোথায় যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে জানতে পারল শ্যামলাল যে সময় যাত্রা করেছিল সে সময়টা ছিল বারবেলা। বারবেলায় যাত্রা করলে মানুষদের ভূতেরা নাকি সহজেই কাবু করতে পারে। ভূতটা এমনিতে তো দুষ্টু ছিলই, তার ওপরে ছিল ভীষণ হিংসুটে। সে মনে মনে বলল— দাঁড়াও, তোমার শ্বশুর বাড়ি থেকে বউ নিয়ে আসা বার করছি। এই বলে চোখের নিমেষে ভূতটা অবিকল শ্যামলালের রূপ ধরে বসল। তারপর শিমুল গাছের বাসা থেকে নেবে এসে ছায়ার মতো সে শ্যামলালের পিছু ধরল।

শ্যামলাল প্রথমে এসব কিছু বুঝতে পারে নি। শ্বশুরবাড়ি পৌঁছানর পর তার বউয়ের চোখে পড়ল ব্যাপারটা। হুবহু তার স্বামীর মতো দেখতে আর একজন সব সময় যেন স্বামীর সঙ্গে ছায়ার মতো লেপটে রয়েছে। তার স্বামী যা করে, সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও তাই করে। কে যে তার আসল স্বামী, কিছুতেই সে তা বুঝে উঠতে পারে না। সে বলে,—

'—তোমাদের মধ্যে কে আমার স্বামী?'

আসল শ্যামলাল তার বউয়ের কথায় পেছনে ফিরে তাকিয়ে সত্যিই অবাক হয়ে গেল। সে রেগে গিয়ে ভূতটাকে প্রশ্ন করল,

'—তুমি কে?'



ভূতও সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলালের মতো রাগ দেখিয়ে বলল,

'—তুমি কে?'

শ্যামলাল বলল,

'—আমি চম্পাবতী গাঁয়ের শ্যামলাল। এটা আমার শ্বশুর বাড়ি। তুমি এখানে কেন?'

শ্যামলাল যা বলল ভূতটাও হুবহু সেই একই কথা বলল। শ্যামলাল ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে তখন তার বউকে বলল,

'—তুমি তৈরি হয়ে নাও। আমরা এখনি রওনা হব। শ্যামলাল যা যা বলল ভূতটা ঠিক তাই-তাই বলল। শ্যামলালের ভালোমানুষ বউটা পড়ল মহা সমস্যায়। যা হয় দেখা যাবে— এই ভেবে সে চম্পাবতী গাঁয়ে যাবার জন্য তৈরি হল। সেই দুষ্টু ভূতও তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল।

আগেকার সেই শিমুল গাছের কাছাকাছি এসে শ্যামলাল ডানদিকে তার নিজের গ্রামের দিকে যাবার জন্য বউয়ের হাত ধরে টানতেই, ভূতটাও বউটার আর একটা হাত ধরে বাঁদিকে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি করতে

লাগল। শ্যামলাল যত বলে '—তুমি আমার বউকে ছেড়ে দাও—', ভূতটাও সেই একই ভাবে শ্যামলালকে বলে '—তুমি আমার বউকে ছেড়ে দাও।' টানাটানির চোটে বেচারা বউটার নাজেহাল অবস্থা। তবে বউটার বুদ্ধি-সুদ্ধি ছিল। হঠাৎ তার মাথায় একটা মতলব এসে গেল। সে বলল,

'—দেখ, টানাটানি করে আমায় মিছেমিছি কষ্ট দিচ্ছ কেন? তার চেয়ে চল আমরা রাজার কাছে যাই। তিনিই বিচার করে বলে দেবেন আমি কার সঙ্গে যাব?'



আসল শ্যামলাল বলল—

'—ঠিক কথা।'

নকল শ্যামলালও তার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল,—

'—ঠিক কথা!'

রাজামশাই পাত্রমিত্রদের নিয়ে রাজসভায় বসে আছেন। এমন সময় দুই শ্যামলাল বউটাকে নিয়ে সেখানে এসে হাজির হল।। আসল শ্যামলাল বলল,—

'—রাজামশাই বিচার করুন।'

নকল শ্যামলালও সেই একই রকম ভাবে বলে উঠল,—

'—রাজামশাই বিচার করুন।'

রাজা তো অবাক। তাঁর সঙ্গে অবাক পাত্রমিত্ররাও। রাজা মন দিয়ে দুজনের কথা শুনলেন। রাজা ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান। তিনি বুঝলেন— এদের মধ্যে একজন নকল শ্যামলাল আছে। তাঁর মনে হল— নকল শ্যামলালটা নিশ্চয় ভূত। তা না হলে একেবারে হুবহু একই রকম চেহারা দুজনের হতে পারে না। তিনি মনে মনে একটা ফন্দি আঁটলেন। তাঁর এক ভৃত্যকে দিয়ে একটা মাটির কুঁজো আনালেন। ভৃত্য কুঁজো নিয়ে এলে পরে তিনি দুজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

'—দেখ বাপু, তোমাদের সমস্যাটা যেমন জটিল, তেমনই সূক্ষ্ম। তাই আমাকে বিচারটাও করতে হবে সূক্ষ্মভাবে। তোমাদের দুজনকে একটা পরীক্ষা দিতে হবে। সেই পরীক্ষায় যে জয়ী হবে, সে-ই বউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।'

রাজার কথা শুনে আসল শ্যামলাল বলল,—

'—আমি রাজি'।

নকল শ্যামলালও সেই একই কথার প্রতিধ্বনি করে বলল,—

'—আমি রাজি।'

তাদের কথা শুনে রাজা মাটির কুঁজোটাকে দেখিয়ে বললেন,

'—এই কুঁজোর মধ্যে যে ঢুকতে পারবে বউ তারই।'

রাজার কথা শুনে আসল শ্যামলালের মুখ শুকিয়ে গেল। কুঁজোর ওই সরু মুখ দিয়ে কোনো মানুষ কি গলতে পারে? ভূতটা কিন্তু রাজার কথায় আনন্দে নেচে উঠল। আসলে ভূত তো! চেহারাটাকে যেমন খুশি ছোটো-বড়ো করা তাদের কাছে জলের মতো সোজা। চোখের নিমেষে চেহারাটাকে ছোটো একটা টিকটিকির মতো করে সুড়ুৎ করে কুঁজোর মধ্যে ঢুকে গেল ভূতটা। রাজামশাইও সঙ্গে সঙ্গে কুঁজোর মুখটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন,

'—থাক ব্যাটা ভূত তুই এই কুঁজোর মধ্যে বন্দি হয়ে!'

তারপর আর কী? শ্যামলাল আনন্দে গদ্গদ হয়ে রাজামশাইকে ভক্তিভরে প্রণাম করে, তাঁর জয়গান করতে করতে বউয়ের হাত ধরে ফিরে গেল চম্পাবতী গাঁয়ে তার নিজের বাড়িতে।



মলয় উপত্যকার ভালোমানুষেরা

(সি কি ম)



লেপচারা বিশ্বাস কবে তাদের পূর্বপুরুষেরা এখনও মলয় উপত্যকায বাস কবছেন। স্বর্গেব খুব কাছাকাছি পাহাড়-ঘেবা এক জায়গা। কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো বিশাল পর্বতেব সানুদেশে শুভ্র তুষারের মাঝখানে পবিত্র সেই জাযগার নাম মলয়। কেউ যেতে পাবে না সেখানে। সেখানে যাবার রাস্তা ভযঙ্কব বিপদসঙ্কুল। বিশাল বিশাল পর্বত। তাব উপর দিযে খাড়াই রাস্তা। মাঝে মাঝে বাস্তাব উপব ঝাঁপিয়ে পড়েছে খরস্রোতা নদী তাব উপর পথের ধাবে ধাবে পাহাড়েব অজানা গুহাব মধ্যে লুকিয়ে থাকে শযতানেবা এত এত বিপদ এড়িয়ে মলয উপত্যকায় যাওযা প্রায় অসম্ভব।

অবশ্য প্রাচীনকালে যখন পৃথিবী ছিল সুন্দর, মানুষেরা ছিল ভালো, শয়তানেরা যখন পথেব ধাবে ওত পেতে থাকত না, তখন মলয়ের মানুষেরা লেপচাদেব কাছে আসত। কথা বলত। মেলামেশা করত। কিন্তু এরকম ভালো সময় বেশিদিন কখনই থাকে না পৃথিবীতে। পৃথিবীতে নেমে এল দুঃখ আর কষ্ট। দুঃখ-কষ্টেব





মধ্যে মানুষেরাও আর আগের মতো ভালো থাকতে পারল না। এই সময় মলয় উপত্যকা থেকে তারা আসা বন্ধ করল। তার বদলে লেপচাদের জন্যে তারা পাঠাতে লাগল এক রকম পাখি। পাখিগুলো যখন নীচে নামত, তখন লেপচারা জমিতে বীজ বুনছে, শস্য ফলাচ্ছে। চাষ-আবাদ করছে। একসময় লেপচারা বুঝল উপর থেকে পাখিরা নীচে নেমে এলেই বুঝতে হবে মাঠে নামার সময় হয়েছে এবার।

অনেক অনেক দিন আগে লি-বং নামে এক সাহসী লেপচা শিকার করতে করতে বনের অনেক গভীরে চলে গেছিল। সেখানে পৌঁছে ক্লান্তিতে এক খরস্রোতা ঝরনার ধারে বসে সে যখন সঙ্গে-আনা খাবার মুখে তুলতে যাবে, ঠিক সেই সময় একটা অজানা গাছের ডাল ভেসে আসতে দেখল সে। চমকে তাকাল। নীচের উপত্যকায় এই গাছ হয় না। সে শুনেছে, একমাত্র মলয় উপত্যকাতেই নাকি এই গাছ জন্মায়। লি-বং ভাবল, এই ঝরনার স্রোতের উলটো দিকে হেঁটে গেলে নিশ্চয়ই একদিন-না-একদিন সে মলয় উপত্যকায় পৌঁছবে। ভাবার সঙ্গেসঙ্গে অসীম আগ্রহে হাঁটতে শুরু করেছিল সে। একদিন গেল। দু-দিন গেল। তিন দিন গেল। লি-বং পেরিয়ে গেল গভীর বন। তুষারাচ্ছাদিত পর্বত। সু-উচ্চ পর্বতের শিখর। পথের অজানা বিপদ, কোনো কিছুই টলাতে পারল না তাকে। সাত দিনের দিন সে একটা জায়গায় পৌঁছল। একটা নির্জন উপত্যকার চারদিকে বরফের পাহাড়। কিন্তু এত পাখির পালক কেন? সে ভাবল। পালকগুলিকে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে লি-বং বুঝতে পারল, এগুলি হচ্ছে সেই পাখিদের পালক—যে পাখিরা বছরের



পর বছর ধরে বিশেষ একটা সময়ে তাদের ওখানে যাতায়াত করে। তার মনে হল, সে ঠিক পথেই এসেছে। মলয় উপত্যকা নিশ্চয়ই কাছে পিঠেই হবে।

এবপরও অবশ্য তাকে হাঁটতে হল। খানিকদূর হাঁটাব পরেই আশে-পাশে সবুজ উপত্যকা দেখতে পেল সে। উপত্যকা জুড়ে চাষ হয়েছে। ফসল পাকতে শুরু করেছে। বাতাসে ফসল পাকার গন্ধ। হ্যাঁ, এই সেই জায়গা। সে মনে মনে ভাবল— এ মলয় উপত্যকা না হয়ে যায় না। ঠিক এই সময় সূর্য অস্ত গেল। আস্তে আস্তে চারদিক অন্ধকাব হয়ে আসছে। থাকার জন্যে একটা কিছু তো দবকার। চাবদিক খুব ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সে হন্যে হয়ে একটা আস্তানা খুঁজতে লাগল। ঠিক সেই সময লি বং বাড়িটা দেখতে পেল। সেদিকে এগিয়ে গেল সে। দবজায় দাঁড়িযে ছিল এক বৃদ্ধ আর তার স্ত্রী। তাবা মৃদু হেসে বলল— এসো বাছা। ঘবে এসো।

—এটাই কি মলয় উপত্যকা? —জিজ্ঞেস কবল লি-বং।

—ঠিক জায়গাতেই তুমি এসেছ। তারা বলল। এখন তুমি বিশ্রাম নাও। কথা শেষ করে বৃদ্ধের স্ত্রী ঘর থেকে খাবার এনে দিল তাকে। এমন ভালো ভালো খাবার জীবনে খায়নি লি-বং। সে তৃপ্তি কবে সব খাবাব খেতে খেতে দেখল, আশে পাশে আর কেউ নেই, কোনো যুবক কিংবা শিশু।

লি-বং অবাক হয়ে বলল— আপনাদের ছেলেরা কোথায়?

—না, আমাদের কোনো ছেলেপুলে নেই। উত্তরে বলল বৃদ্ধ।

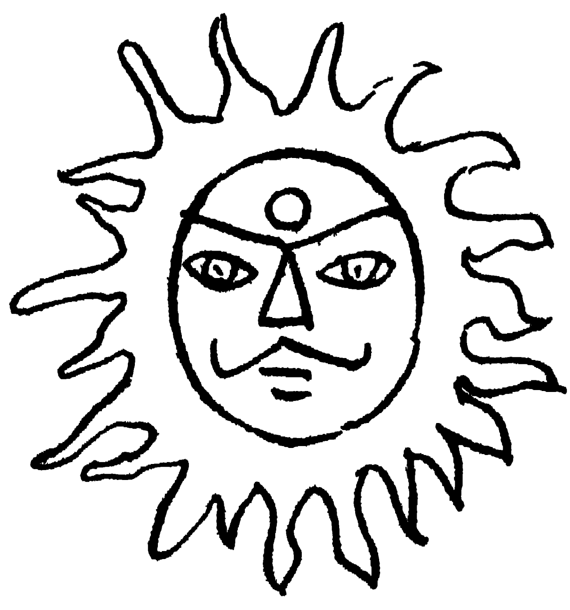
কিন্তু পরের দিন সকাল বেলাতেই ঘরে দুটি শিশুকে দেখতে পেল লি-বং। একটি সুন্দর দেখতে ছেলে। আর একটি ফুলের মতো মেয়ে। সে ভাবল— এরা বোধহয় অন্য কেউ। বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা বোধ হয় চাষ করতে খেতে গেছেন।

মুচকি হেসে শিশু দুটি বলল— তুমি যা ভাবছ তা কিন্তু নয়। আমরাই হচ্ছি কালকের সেই বৃদ্ধ মানুষ দুটি। সকালে আমরা শিশু। দুপুরে আমরা যুবক। সন্ধ্যায় বৃদ্ধ। আবার পরের দিন সকালে আমরা শিশু হয়ে যাই। এরকম ভাবেই আমরা চিরকাল বেঁচে আছি।

এরপর লি-বং সেই উপত্যকায় মোট সাতটা বাড়ি দেখতে পেল। এই সাতটি বাড়ি সাত ভায়ের। লি-বং প্রত্যেক ভায়ের বাড়িতে একদিন করে রইল। সাত দিনের শেষে মলয় উপত্যকার সেই ভালোমানুষেরা তাকে ফিরে যেতে বলল নিজের দেশে। তারা উপহার হিসেবে লি-বং-কে সাতটি বীজ দিল। সাতটি শস্যের সাতটি বীজ। শেষে তারা বলল— এবার তুমি যাও লি-বং। এই বীজ বপন করো। চাষ করো। তাহলে তোমার আব তোমাদের সব লোকজনের কোনো দুঃখ থাকবে না। প্রচুর শস্য তোমরা চাষ করে পাবে।

লি বং সেই শস্যের দানা নিয়ে ফিরে এল।

আজও লেপচারা বিশ্বাস করে, এভাবেই তাদের দেশে শস্যের প্রচলন হয়। সেই সাত ভাই এখনও মলয় উপত্যকায় আছে। লেপচারা মনে করে, ওই সাত ভাই হল শস্যেব দেবতা। তাই ভালো ফলনের জন্যে তারা আজও মলযের দেবতাদের পুজো করে।

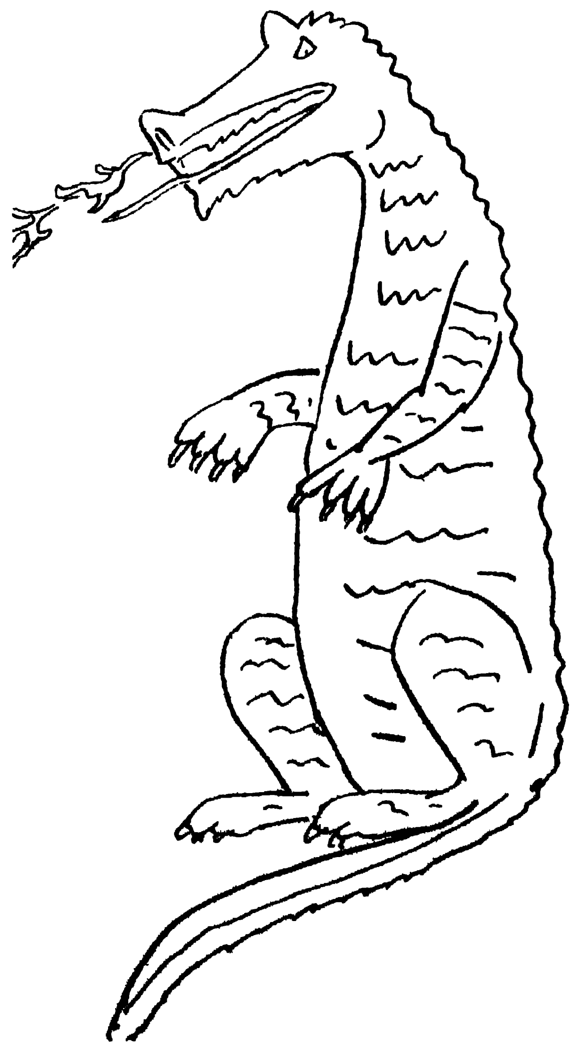


র‍্যাবডেনসির ড্রাগন

(সি কি ম)



সিকিমের এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানের নাম র‍্যাবডেনসি। সুন্দর এক নদীর ধারে এই ছোট্ট শহর। এক সময় এটাই ছিল রাজ্যের রাজধানী। কিন্তু রাজধানী হলে কী হয়, এর চারদিকে গভীর গহন অরণ্য ছিল। তাই পাহারার জন্যে অনেক লোক নিয়োগ করতে হয়েছিল। রাজপ্রাসাদ, সেই সঙ্গে রাজধানীর নাগরিকদেরও রক্ষা করাব ভার ছিল তাদের উপর। তবু সেই অজগর-বিজগর বনের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ মানুষ উধাও হয়ে যেত। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। সবাই ভাবত— লোকটা নিশ্চয়ই পথ হারিয়ে ফেলেছে।



একদিন এক প্রহরী রাতে পাহারা দিতে দিতে উধাও হয়ে গেল। সবাই তখন তাকে খুঁজতে শুরু করল। বনের মধ্যে বেশ কিছুটা গিয়েও দেখা গেল তার কোনো চিহ্নই নেই। ভয় নিয়ে ফিরে এল সবাই। দ্বিতীয় দিন আবার একই ঘটনা ঘটল। আর একজন প্রহরীকে পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিন, চতুর্থ দিন, এবং তারপর প্রতিদিন একজন করে প্রহরী নিখোঁজ হয়ে যেতে লাগল; অথচ কেউ কোনো হদিশ করতে পাবল না। যারা হাবিয়ে যাচ্ছে, তাদের কোনো চিহ্নই আর থাকছে না। ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল সবাই। তারা প্রহরা ছেড়ে পালিয়ে যেতে লাগল একে একে। এভাবে চললে এখানে যে রাজধানীর অস্তিত্বই আর থাকবে না। —ভাবল প্রহরী-সর্দার। সে ঠিক করল অপরকে সাহস দেবার জন্যে তাকেই দেখতে হবে ঘটনাটা। আর চুপচাপ থাকা যায় না। সেদিন রাতেই সে বনের এক গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

আধখানা রাত কেটে গেল কিন্তু কোনো কিছুই ঘটল না। কিন্তু তবু সে শান্ত হতে পারল না। দুচোখ খোলা

রেখে সে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ মাঝ-রাত্তিরে সে একটা শব্দ শুনল। কেউ যেন হাই তুলছে আড়মোড়া ভাঙছে। তবে কি ঘুম ভাঙছে অদৃশ্য শয়তানের? এর পরেই রক্ত-জল-করা এক গর্জন শুনতে পেল সে। বনে বাসকরা এমনি কোনো সাধারণ প্রাণীর গর্জন নয়। মেঘ ডাকার মতো গুরগুর করে উঠল পৃথিবী। মাটি কেঁপে উঠল। জলে উঠল ঢেউ। গাছপালাও ভয় পেয়ে বড়ো চুপচাপ হয়ে গেল। প্রহরীসর্দার ভাবল, এই সেই শয়তান। আমাকে দেখতেই হবে। ভাবতে ভাবতে সে খুব তাড়াতাড়ি সেই শব্দ লক্ষ করে গভীর জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে গেল। হাঁটতে হাঁটতে হোঁচট খেয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল কয়েকবার। কাঁটায় শরীর ফালা ফালা হয়ে দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগল। তবু সে থামল না। শেষে শব্দের কাছাকাছি হয়ে এক গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। প্রাণীটা গাছপালার আড়াল থেকে সামনের ফাঁকা জায়গায় আসতেই চমকে উঠল সর্দার। এ যে একটা ড্রাগন! মুখ দিয়ে যার লকলকিয়ে আগুন বেরয়। ড্রাগনটা এবার হাঁটতে শুরু করল রাজপ্রাসাদের দিকে।

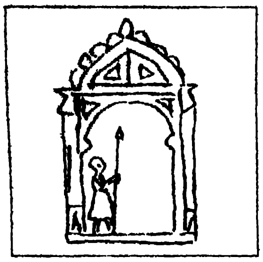
প্রহরী-সর্দার এবার বুঝতে পারল রোজ একজন প্রহরী উধাও হয়ে যাবার রহস্য। রাগে রি-রি করে উঠল সর্দারের শরীর। খাপ থেকে তলোয়ার হাতে নিয়ে ড্রাগনের পেছন পেছন এগিয়ে এল সেও।

বন থেকে বেরিয়ে এসে সেই ড্রাগনটা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে যাবে— প্রহরী সর্দার তলোয়ার দিয়ে তাকে এক কোপে দু-টুকরো করে ফেলল। মাথাটা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল আকাশে এবং তাকে আর কোনোদিন দেখা গেল না। আর দ্বিতীয় অংশটা গিয়ে পড়ল নদীতে। দেখতে দেখতে সেটা একটা পাথরের মূর্তির রূপ নিল। সেই পাথরের মূর্তি আজও দেখা যাবে র‍্যাবডেনসি-তে।



গোপন কথা মেয়েদের বলতে নেই

(মে ঘা ল য়)



এক সিংফো-বুড়োর মরবার সময় হল। মৃত্যুশয্যায় সে তার ছেলেকে ডেকে এনে বললেঃ আমার মরণ ঘনিয়ে এসেছে। পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নেবার আগে তোমায় দুটো উপদেশ দিয়ে যেতে চাই ঃ এক— মেয়েদের কাছে কোনো গোপন কথা বলবে না; দুই— বাড়ির ফটকের সামনে কাঁটাগাছ পুঁতবে না।

বাবার মৃত্যুর পরে ছেলে ভাবলে— বুড়োরা এ সংসারে কত কী বলে। অনেক তাদের মনগড়া আজগুবি কথা। সব কথা কখনই সত্যি হতে পারে না।



সে স্থির করলে তার বাবার কথা সত্যি না মিথ্যে, যাচাই করে দেখবে। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। প্রথমে সে খুঁজেপেতে একটা সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে ফেলল। তারপর বাড়ির ফটকের সামনে পুঁতে রাখল একটা কাঁটাগাছ।

নতুন সংসার পাতার পরে সিংফো যুবকটির দিন সুখেই কাটছিল। নতুন বউটা বড়ো ভালো। বাড়ির সব কাজ সে নিজেই করত। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয়েছিল ভালোই। কিন্তু সংসার ভালো চললে কী হবে? ছেলেটার মনে কিন্তু সব সময়ে তার বাবার কথাই ঘুরপাক খেত ঃ মেয়েদের কাছে গোপন কথা বলতে নেই। বউকে গোপন কথা বললে সত্যই সে সেটা ফাঁস করে দেয় কিনা— সেটা তাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

একদিন কী খেয়াল চাপল কে জানে? যুবকটা তার কোমরে একটা ছুরি গুঁজে একটা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে বনে গেল। তারপর সেই কুকুরটাকে ছুরি দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কেটে মাটিতে পুঁতে রেখে দিয়ে এল। ঘরে ফিরে এসে কুকুরের রক্তমাখা ছুরিটা দেখিয়ে সে বউকে বললেঃ দেখগো, আমি একটা মানুষকে খুন করে এলাম। কাউকে বল না কিন্তু।

এ-কথা শোনার পর ভয়ে বউটার তো দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। সে চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে বললে ঃ অ্যাঁ, কী বলছ? একটা মানুষ খুন করেছ? রাজামশাই জানতে পারলে যে তোমায় ফাঁসি দেবেন। বলি, সে-হুঁশ আছে? তুমি খুনী। আমি বাপু তোমার সংসার করতে পারব না, চল্লাম।



—এই-না বলে সেই বউটা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল রাজবাড়িতে। রাজার কাছে গিয়ে বলল ঃ রাজামশাই, রাজামশাই—আমার স্বামী একটা মানুষ খুন করছে।

রাজামশাই জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে তোমার স্বামী? নাম কী? কোথায় তোমাদের বাড়ি?

বউটা রাজামশাইকে সব কথা বলল। কয়েকজন প্রহরীকে ডেকে তিনি আদেশ দিলেন ঃ এই সিংফো-যুবককে এই মুহূর্তে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো।

সিংফোরা বাইবে কোনো সম্মানিত লোকেব সঙ্গে দেখা কবতে যাবার সময় মাথায় পাগড়ি পরে। খালি মাথায় যাওযাটা তারা বে-ইজ্জতি মনে করে।

প্রহরীরা যখন যুবককে ধবে আনছিল, তখন তার পাগড়ি ফটকের সামনে কাঁটাগাছেব ঝোপে আটকে গেল। সেই মুহূর্তে যুবকের মনে পড়ল তার বাবার কথা।... তিনি না বলেছিলেন, বাড়ির ফটকের সামনে কাঁটাগাছ পুঁতবে না। সে সে-কথা অগ্রাহ্য করেছে। সে জন্যই তো তার পাগডি কাঁটাগাছের ঝোপে আটকে গেছে। যুবক বড়ো দুঃখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

বাজাব প্রহরীরা বন্দি সিংফো-যুবককে রাজার বিচার সভায় এনে হাজির করল।

রাজা যুববকে বললেন ঃ তুমি একটা মানুষ খুন করেছ— একথা কী সত্যি? এই মুহূর্তে তার জবাব দাও।

যুবক কিন্তু অবিচলিত চিত্তে জবাব দিল ঃ না, মহারাজ। আমি কোনো মানুষই খুন করিনি।

রাজা বললেন ঃ তোমার বউ যে বলল, তুমি একটা মানুষ খুন করেছ। সে কী তাহলে মিথ্যে কথা বলছে?

আসলে কী হয়েছে, সেটা আমি আপনাকে বলছি। দয়া করে ধৈর্য ধরে শুনুন। আমার বাবা মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন যে গোপন কথা মেয়েদের কাছে কখনও বলবে না।

তারপর?— রাজা কৌতূহলী হলেন।

বাবার কথা সত্যি না মিথ্যে, আমি সেটা যাচাই করতে চেয়েছিলাম। তাই বনে গিয়ে আমার ছুরি দিয়ে একটা কুকুরকে খুন করি। তারপর [illegible]কে মাটিতে

পুঁতে রেখে বাড়ি ফিরে এসে বউকে কুকুরের রক্তমাখা ছুরিটা দেখিয়ে বলি যে আমি একটা মানুষ খুন করেছি।

—এইটুকু বলে যুবক তার বক্তব্য শেষ করল।

রাজা তাঁর অনুচরদের যুবকের কথার সত্যতা ভালো করে যাচাই করে আসার জন্য আদেশ দিলেন। ফিরে এসে সকলেই রাজাকে জানাল ঃ যুবক যা বলেছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এ-রাজ্যে কোনো মানুষই খুন হয়নি। বনে একটা কুকুরের মুণ্ডু আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনেকগুলো টুকরো মাটিতে পোঁতা অবস্থায় দেখা গেছে। সেখানে রক্তও পড়ে আছে।

রাজা যুবকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন। তিনি তাব মুক্তিব আদেশ দিলেন। পুরস্কার-স্বরূপ এক রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন বলে ঘোষণাও করলেন।

কিছুদিন বাদে ওই যুবকের সঙ্গে এক রাজকুমারীব বিয়ে হয়ে গেল। বিয়েতে যৌতুক স্বরূপ বর পেল অনেক টাকা, বাজকুমারীও পেল অনেক অলঙ্কার, মূল্যবান মণি মাণিক্য।

এদিকে বাজাব কাছে নালিশ কবতে এসেছিল যে সিংফোবউটা— তাব নাক-কান কেটে বাজ্যেব বাইবে দূর করে দেওযা হল।



নাগদের প্রাণী হত্যার কাহিনী



পুরাকালে নাগ উপজাতির অধিবাসীরা ইনসাই সিরা পাহাড়ে বসবাস করত। সেসময় অন্যান্য প্রাণীরাও মানুষের মতন কথা বলতে পারত। কিন্তু তারা মানুষের সঙ্গে বসবাস করত না। নিজেরা সব আলাদা বসবাস করত। প্রকৃতপক্ষে, তখন মানুষ আর প্রাণীদের মধ্যে কোনো প্রভেদ ছিল না।

প্রাণী বা মানুষ যে কেউ অসুস্থ হলে একই ওষুধ তারা খেত রোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্য। তখন আবার বৈদ্যদের দেওয়া সেসব ওষুধ এমনই উৎকৃষ্ট ছিল যে, সে ওষুধ খেলে সবার সব রোগ সেরে যেত। এমনকি সে ওষুধে মৃতদেহেও যে প্রাণসঞ্চারণ ঘটত। ফলে, কেউ মারা না যাওয়াতে দিন দিন প্রাণী ও মানুষের সংখ্যা প্রবলভাবে বাড়তে থাকে।

মানুষের সংখ্যা প্রবলভাবে বাড়ার ফলে হল কী— খাদ্যের জন্য কৃষিকার্য বেড়ে গেল। কৃষিকার্য বাড়তে বাড়তে শেষে এমন একটা অবস্থা এসে দাঁড়াল- প্রাণীদের চরে বেড়াবার মতন জায়গা রইল না। যেদিকেই তারা খাদ্যের জন্য চরতে যায় — দেখে সব জমিতেই চাষবাস হচ্ছে। ফলে, ঘাস-লতাপাতা না পেয়ে পেটের ক্ষুধা মেটাতে তারা আর কী করে— মানুষের তৈরি উৎপাদিত ক্ষেতের ফসল খেতে আরম্ভ করে দিল। মানুষদের কোনো নিষেধই তারা তোয়াক্কা করল না। প্রাণীদের এই যথেচ্ছাচার আচরণের জন্য অনেক ফসল নষ্ট হওয়াতে বহু মানুষ উপবাসী হয়ে দিন কাটাতে লাগল। তারপর দীর্ঘকাল ধরে প্রাণীদের এ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মানুষেরা সকলে এক এক করে প্রাণীদের বিরুদ্ধে বৈদ্যের কাছে নালিশ করল।

বৈদ্যরা প্রাণীদের এই যথেচ্ছ আচরণ মন থেকে মেনে নিতে পারল না। তারা খুব রেগে গেল। মনে মনে বলল, না-না—প্রাণীদের এ অন্যায় আচরণ কিছুতেই সহ্য করা যায় না। তারা নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করে ঠিক করল, তারা আর কেউ প্রাণীদের অসুখ করলে চিকিৎসা করবে না।

কাজেই, বৈদ্যরা চিকিৎসা না করাতে ওষুধের অভাবে প্রাণীদের কাছে নেমে আসে নিশ্চিত মৃত্যু। অসুস্থ হয়ে বিনা চিকিৎসায় একে একে অনেক প্রাণী মারা গেল। এইকারণে তাদের সংখ্যা অনেক কমে যায়। বিপরীত দিকে রোগমুক্তির ঠিক ঠিক চিকিৎসা পেয়ে মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলে। তাদের আর মৃত্যু ঘটে না। এর ফলে, প্রাণীরা ভীষণ রেগে গেল। যে করেই হোক মানুষের প্রতি একটা প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা জাগল। তারা নিজেদের মধ্যে একটা সভা করে, আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করল, বৈদ্যরা যাতে ওষুধ তৈরি করতে না পারে তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। প্রাণীরা যে কোনো লতাপাতার সম্মুখীন হলেই সেগুলি ধ্বংস করতে শুরু করে দিল। একে একে ইনসাই সিরা পাহাড়ের সব লতাপাতা ধ্বংস করে, অবশেষে তারা সেইস্থান ত্যাগ করল। অন্য একস্থানে চলে গেল। কেবল যেসব প্রাণীরা শারীরিকভাবে অক্ষম, তারাই কেবল রয়ে গেল।

এদিকে সমস্ত লতাপাতা প্রাণীরা নির্মূল করে দেবার জন্য বৈদ্যরাও আর কোনো ওষুধ তৈরি করতে পারল

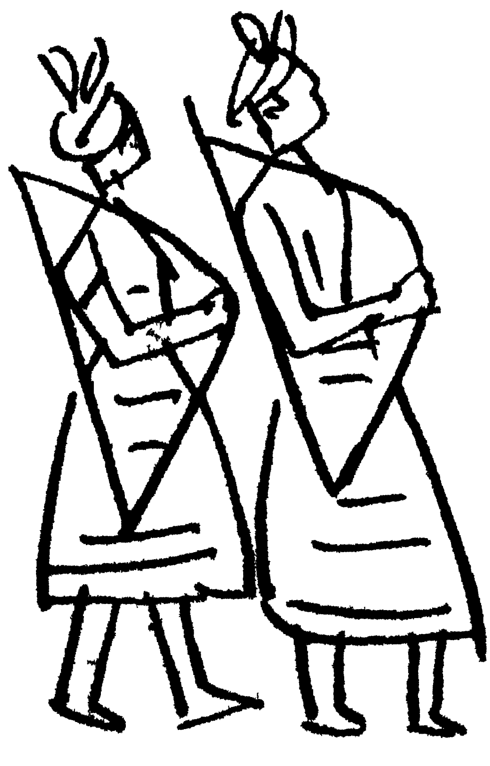


না। মানুষেরা রোগ হলে চিকিৎসা না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ে। বিনা চিকিৎসায় কারুর কারুর মৃত্যুও ঘটতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ইনসাই সিরা পর্বতাঞ্চলে থাকাটা আর নিরাপদ হবে না ভেবে নাগ অধিবাসীরা অধিকাংশই অন্যত্র চলে যায়।

এদিকে বৈদ্যরা সব মানুষকে একে একে চলে যেতে দেখে নিজেরা আর স্থির থাকতে পারল না। নিজেরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে, বৈদ্যরা তাদের নিরুপায় অবস্থার কথা, আর প্রাণীদের অসৎ আচরণের কথা সব মানুষকে বলে যায়।

বৈদ্যেরা সব আত্মহত্যা করতেই যে কজন মানুষ তখনও সেখানে বসবাস করছিল, তাদের সকলের টনক নড়ে। তারা সকলে নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করে ঠিক করে, সমস্ত ভেষজ ভক্ষণ করে প্রাণীরা যখন অমর হয়ে উঠেছে, তার একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। যে করেই হোক তাদের বংশবৃদ্ধি ঠেকাতে হবে। এইভাবে তাদের বাড়বাড়ন্ত সহ্য করা যায় না। তাই তারা ঠিক করল, তাদেরকে বলিদান করে, তাদের মাংস উৎসর্গ করা হবে সেইসব মানুষদের উদ্দেশে— যারা অসুস্থ ও মৃত্যুপথযাত্রী। মনে মনে তারা এই ধারণা পোষণ করল, প্রাণীদের বলিপ্রদত্ত মাংস উৎসর্গ করলে হয়তো অসুস্থ মানুষ ভালোও হয়ে যেতে পারে।

বলতে নেই, তাবপর থেকেই এ প্রথা নাগ অধিবাসীদেব সমাজে চালু হয়ে গেল। তাদের মধ্যে কারুর অসুখ করলেই প্রাণি[illegible] করা হয়। আর সেই বলিপ্রদত্ত প্রাণীর মাংস অসুস্থ ব্যক্তির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হতে থাকে। [illegible] আজও এ প্রথা চলে আসছে। এ কারণে অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতা কামনার জন্য তারা আজও কুকুর, শূকব. গোরু, মোষ, এমনকি মুরগিও বলিদান কবে তার মাংস উৎসর্গ করে থাকে।



এক মূর্খ বাঘ ও এক ধূর্ত মানুষের গল্প



বহু প্রাচীনকালে এক পাহাড়ে একটা বাঘ, একটা শূকর ও একটা মানুষ বসবাস করত। এদের মধ্যে বাঘটা ছিল ভীষণ বোকা। অর্থাৎ মূর্খ। বুদ্ধিশুদ্ধি বলে তার কিছু ছিল না। কিন্তু মানুষটি ছিল যেমন চালাক, তেমনি ধূর্ত। অথচ, এরকম এক ধূর্ত মানুষের সঙ্গেই ছিল বাঘটির খুব ভাব। একেবারে গলায় গলায়।

একদিন হল কী— বাঘটির মনে খুব ঝোঁক চাপল শূকরটিকে খাবার। ঝোঁক হওয়া মাত্র সে শূকরটির ওপর ঝাঁপিয়েও পড়ে। কিন্তু শূকরটি ছিল বেশ বুড়ো, তার ওপর দীর্ঘদিন ধরে কাদায়-রোদে গড়াগড়ি দেবার জন্য তার শরীরের ওপর মোটা শক্ত একটা কাদার প্রলেপ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কাজেই ঝাঁপিয়েও শূকরটিকে কিছুতেই কায়দা করতে পারল না। বধ করা তো দূরের কথা, তার শরীরে একটা দাঁত পর্যন্ত বসাতে পারল না।

কিন্তু তবু বাঘটি দমল না। যখনই তার মনের মধ্যে শূকরটিকে ভক্ষণ করার ইচ্ছে হয়— তখনই সে শূকরটিকে আক্রমণ করে। বেশ কবার শূকরটিকে আক্রমণ করেও যখন তাকে বধ করতে পারল না, তখন তার মনে কেন জানি অনুতাপ জাগল। একই পাহাড়ে বসবাসকারী শূকর তো তার বন্ধু। সে যখন তার কোনো ক্ষতি করেনি, তখন তার তাকে বধ করা উচিত নয়। নিজ কৃতকর্মের জন্য তাই সে শূকরের কাছে একদিন ক্ষমা চেয়ে নিল।

এরপর কদিন যেতেই বাঘটির মনের মধ্যে ফের ঝোঁক চাপল শূকরটিকে খাবার। সত্যি বলতে কী, প্রমাণ সাইজের নাদুসনুদুস শূকরটিকে দেখলেই তার জিভে জল এসে যায়। খাবার লোভ হয়। কী মনে হতে বাঘটি একদিন তার মনের কথাটা মানুষ বন্ধুটিকে খুলে বলল। বার কয়েক চেষ্টা করেও যে সে শূকরটিকে বধ করতে পারেনি সে কথাও বলল। কোনো কথাই সে বন্ধু মানুষটির কাছে গোপন করল না।

মানুষটি বাঘটির কথা শুনে মুচকি হাসল। বলল, শূকরটিকে যদি তুমি খুব প্রাতঃকালে কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে ওঠার পূর্বে আক্রমণ করতে পার— তাহলেই তুমি তাকে বধ করতে পারবে।

বন্ধু মানুষটির কথা বাঘের খুব মনে ধরল। মানুষটির পরামর্শ মতন বাঘটি তাই করল। প্রাতঃকালে শূকরটি কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে ওঠার পূর্বেই তাকে আক্রমণ করে বসল। বলতে নেই— এবার সত্যিই বাঘটির জয় হল। ধারালো দাঁত দিয়ে চাপ দিতেই শূকরটি ফালা-ফালা হয়ে গেল।

শূকরটিকে যে এত সহজে বাঘটি বধ করতে পারবে একবারও ভাবেনি। শূকরটিকে বধ করে সে আত্মহারা হয়ে গেল। শূকরের মাংস একটুও ভক্ষণ না করেই সে আনন্দে উদ্বেল হয়ে বন্ধু মানুষটিকে তার সাফল্যের খবর জানাতে ছুটে গেল।

বাঘের বন্ধু মানুষটি ছিল এমনিতে খুব ধূর্ত। শূকর বধের কথা শুনে সে মনে মনে বলল, কাজ তাহলে হাসিল। এখন শূকরের সব মাংস আমাকে একা ভোগ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সে একটা ফন্দি আঁটল।

একটা গাছের একটি বড়ো কাঁটাযুক্ত ডাল কাটল। তারপর ডালটার একটা দিকের কাঁটা ছাড়াল। ডালটি দিয়ে শূকরটিকে ভালো করে বেঁধে নিয়ে, ডালটির যেদিকে কাঁটা নেই সেদিকটা সে ধরল। বাঘটিকে অপর দিকটা ধরতে বলল। বাঘটিও খুশিতে রাজি হয়ে গেল।

বহন করে নিয়ে যাবার সময় মানুষটি বাঘকে বলল, দেখ বাপু— বহন করার সময় যেন কখনো আর্তনাদ করো না, তাহলে সমস্ত মাংস তেতো হয়ে যাবে।

বাঘ বলল, ঠিক আছে বন্ধু। এ ব্যাপারে তুমি কোনো চিন্তা করো না। আমি চুপচাপ শূকরটির ভার বহন করব।

কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হতেই কাঁটার জ্বালায় বাঘটি অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। মানুষটি বাঘটির অবস্থা দেখে মনে মনে খুশি হল। ফের বলল সে বাঘকে, যতই কষ্ট হোক আর্তনাদ করো না বাপু। সব মাংস তাহলে তেতো হয়ে যাবে।

বাঘ আর কী করে— বেচারা কাঁটার প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করে এগোতে থাকে। শেষপর্যন্ত আর পারে না। পারবেই বা কী করে? কাঁটার জ্বালা যে সাংঘাতিক! যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সে চিৎকার করে ওঠে— ওরে বাপ রে, মরে গেলুম।

মানুষটি এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সে বাঘকে বলল, এই তেতো মাংস খাওয়ার জন্য শূকরটিকে আর বহন করার কোনো প্রয়োজন নেই।

বাঘটিতে আর কী করে! ভেবেছিল শূকরটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বেশ কদিন ধরে জম্পেশ করে খাবে। তা আর হল না। তেতো মাংস আর কে খায়? মনের দুঃখে সে কাছেই মানুষটির বাড়ি থাকাতে সেখানেই সে শূকরটিকে পৌঁছে দিল। এ কাজটাও সে করল মানুষটির নির্দেশে।

বাড়িতে পৌঁছেই মানুষটি এবার বাঘকে বলল, যাওতো জলাশয় থেকে একটু জল তুলে নিয়ে এস। কথাটা বলেই সে বাঘের হাতে একটা বাঁক দিল।

বাঁকটিতে ছিল ছিদ্র। জলাশয়টিও ছিল সেখান থেকে বেশ দূরে। বাঘ তো কোনোকিছু না বুঝেই আনন্দে লাফাতে লাফাতে জল আনতে চলে গেল। বুঝল না মানুষটি তাকে কী ঠকান না ঠকাতে চাইছে।

বাঘটি জল আনতে চলে যেতেই মানুষটি আর সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি শূকরটির সব মাংস কাটা-ছেঁড়া করে নিল। তারপর সে মাংস অল্প কিছু নিজের জন্য রেঁধে, বাকি সব মাংস সরিয়ে ফেলে। আর একটা কাজ করল। জামজাতীয় অত্যন্ত তেতো এক ধরনের বীজ দিয়ে একটা তরকারি প্রস্তুত করল।

ওদিকে বহুপথ অতিক্রম করে বাঘটির বাঁকের দিকে নজর পড়তেই আঁতকে উঠল— এ কী! পাত্রের জল কোথায় গেল? বাঘটি ফের জলাশয়ের দিকে গেল। বাঁকে জল ভরল। যতবারই সে জল ভরে বন্ধু মানুষটির বাড়ির দিকে পাড়ি দেয়— অর্ধেক পথ হাঁটার পরই সে দেখে পাত্রের জল খালি। বার কয়েক জলাশয়ে একইভাবে বাঁকে জল ভরার জন্য ওঠা-নামা করার ফলে সে একসময় ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

অবশেষে সে হাঁফাতে হাঁফাতে জলাশয়ের পারের ওপরে বসে পড়ল। হঠাৎ এমন সময় একটা পায়রা এসে তাকে বলল, বাঘ বাবাজি— তুমি তো জল তুলতেই ব্যস্ত। ওদিকে যে তোমার মানুষ বন্ধু শূকরের সব মাংস জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছে।

পায়রার কথা শুনে বাঘটি সঙ্গে সঙ্গে তেড়েফুড়ে উঠল। জলের পাত্রটি সে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দৌড়ে চলল মানুষ বন্ধুটির বাড়ির দিকে।



বাঘ ফিরে আসতেই মানুষটি তাকে খেতে দিল। নিজেও বসল। মানুষটি খাওয়ার ব্যবস্থা করাতে বাঘের সব রাগও জল হয়ে গেল। কিন্তু মানুষটি তো ধূর্ত। সে তেতো তরকারি বাঘকে খেতে দিল। মানুষটি অবশ্য নিজের জন্য আলাদা রান্না করা কয়েক খণ্ড মাংস পশ্চাদ্দেশে লুকিয়ে রেখেছিল।

খেতে খেতে মানুষটি জানাল, শূকরের মাংস তেতো হওয়ার কারণ হল তার কথা না শোনার জন্য। বাঘ যদি বহন করার সময় আর্তনাদ না করত—তাহলে এখন আর তাকে এরকম তেতো মাংস খেতে হত না।

বাঘ তো বোকা, মূর্খ। সে আর মানুষটির চালাকি বুঝবে কী? এমনিতে তার খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিল। রান্নাকরা খাবার পেয়ে সে আনন্দে গদগদ। কিন্তু তেতো খাবার মুখে রুচবে কেন? মুখে যাই তোলে থু থু করে ফেলে দেয়।

মানুষটি সব লক্ষ করে। মনে মনে পুলকিতও হয়। বাঘটিকে বলে, বড়ো একটা ছুরি দিয়ে এসো আমরা আমাদের পশ্চাদ্দেশের মাংস কেটে খাই।

কথাটা মনে ধরে বাঘের। মানুষটি একটা ছুরি বাড়িয়ে দিতেই মানুষটির পরামর্শ মতন তাই করল বাঘটি। পশ্চাদ্দেশে ছুরি চালানো মাত্রই বাঘটি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। ক্ষতস্থান দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরতে থাকে।

ওদিকে মানুষটির কিন্তু কোনো যন্ত্রণাই হল না। হবে কী করে? সে যে তার পশ্চাদ্দেশে। রান্না-করা শূকরটির মাংস লুকিয়ে রেখেছিল!



অম্লানবদনে মানুষটিকে পশ্চাদ্দেশের মাংস খেতে দেখে বাঘটির ধারণা হল— ধূর্ত মানুষ বন্ধুটি তাকে আগাগোড়া ধোঁকা দিয়ে আসছে। রেগে গিয়ে বাঘটি তাকে তাড়া করল।

বাঘটিব তাড়া খেয়ে মানুষটি পালিয়ে গিয়ে একটা কুয়োর ভেতরে ঢুকে বসে থাকে।

বাঘটি সেখানে পৌঁছে তাকে ভয় দেখাতেই মানুষটি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে বাঘটাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, এই কুয়োর ভেতরে বেশকিছু ভক্ষণযুক্ত ভালো প্রাণী আছে।

বাঘটির সব রাগ মুহূর্তের মধ্যে জল হয়ে গেল। ভক্ষণযুক্ত ভালো প্রাণীর কথা শুনে তার জিভে জল এসে গেল। মানুষটির কথা বিশ্বাস করে সঙ্গে সঙ্গে সে কুয়োর ভেতরে নামার অনুমতি চাইল।

বাঘেব এ কথা শুনে মানুষটি কুয়োর ভেতর থেকে মুখ তুলে বলল, হে পিতঃ— আমার এই বন্ধুটি আমাদের এই কুয়োর ভেতর লুকানো সব প্রাণীদের দেখার অনুমতি চাইছে। আমি কি তাকে কুয়োর ভেতরে নামার অনুমতি দেব?

যেন তার কথার উত্তর তার বাবা দিচ্ছে এমন ভান করে মানুষটি গলার স্বর বদলে বলল, হ্যাঁ পুত্র— তোমার বন্ধু আমাদের সব প্রিয় প্রাণীগুলিকে দেখতে পারে, অবশ্য যদি সে কুয়োর তলদেশে ঝাঁপ দেয়।

এ কথা শুনে মূর্খ ও লোভী বাঘটি লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষটির ফাঁদে পা দিল। কুয়োর ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কোনো প্রাণী দেখা তো দূরের কথা— ঝাঁপ দেওয়া মাত্রই বাঘটি সেই কুয়োর ভেতরে তলিয়ে যায় আর কী! যেহেতু কুয়োতে জল কম ছিল, তাই এ যাত্রা সে কোনোরকমে বাঁচল। খানিকক্ষণ কসরত করে সে কুয়োর ভেতর থেকে উঠে এল।

বন্ধুটি ছিল কুয়োর ওপর দিকে। এবার আর বাঘ তাকে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। মিথ্যে কথা বলার জন্য খ্যেপে গিয়ে তাকে তাড়া করল।

বাঘটির তাড়া খেয়ে বন্ধু মানুষটি কুয়ো ছেড়ে একটা গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। সেই গাছে ছিল একদল মৌমাছি। গাছের একটি ডালে তারা চাক বেঁধে ছিল।

বাঘটি সেখানে উপস্থিত হতেই মানুষটি বাঘের শাসানির জবাবে খুব মিষ্টি করে বলল, তাকে যেহেতু সে বন্ধু বলে মনে করে— সেহেতু দেবরাজের অনুমতি ছাড়া সে তাকে ভক্ষণ করতে পারে না।

কথা কটি বলেই মৌমাছিদের বাসস্থান দেখিয়ে মানুষটি বাঘটিকে ফের বলল দেবরাজের আদেশ অনুযায়ী এখন সে এই জায়গাটার রক্ষণাবেক্ষণ করছে।

মূর্খ বাঘটি মানুষটির মুখ থেকে এ কথা শুনে সবকিছু তো ভুলে গেল, উলটে মৌমাছির ঝাঁকটাকে মাংসখণ্ড ভেবে সে মানুষটার সঙ্গে পুনরায় বন্ধুত্ব পাতিয়ে তাকে জিজ্ঞেস কবল, ওটা সে কীভাবে পেতে পারে!

বাঘের কথা শুনে ধূর্ত মানুষটির মগজে সঙ্গে সঙ্গে এক বদ বুদ্ধি খেলে গেল। সে উৎফুল্ল হয়ে বাঘকে বলল, সমস্ত শক্তি দিয়ে ওটাকে আঘাত করলেই তুমি পেতে পাবো।

মানুষটির মুখ থেকে কথাটা খসা মাত্র আর অপেক্ষা না করে বাঘটি সঙ্গেসঙ্গে তার সর্বশক্তি নিয়ে মৌচাকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাঘকে মৌচাকের ওপর ঝাঁপাতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে মানুষটিও দূরে সরে গেল।

মৌমাছির ঝাঁকে সজোরে বাঘটি আক্রমণ করতে মৌমাছিরাও তাকে ছেড়ে কথা বলল না। সব মৌমাছিরা মিলে বাঘকে দংশন করতে লাগল। সে দংশনের জ্বালায় বাঘ মৌমাছিদের চাক ছেড়ে পালাল।



কিন্তু মানুষটার ওপর এবার ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল বাঘটি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, না— বন্ধু মানুষটিকে সে আর ক্ষমা করবে না। বার বার মিথ্যে কথা বলার জন্য এবার তাকে সে কঠোর শাস্তি দেবে। একেবারে প্রাণে মেরে ফেলবে।

মানুষটি ওদিকে এক দূরবর্তী স্থানে পৌঁছে দুটি বড়ো কাঁটা-দেওয়া মুখ নির্মাণ করে বাঘটির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

বাঘটি খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে মানুষটির দেখা পেল। তাকে দেখামাত্র বাঘটি গজরাতে লাগল। এই বুঝি সে মানুষটির গলা মটকে দেবে।

মানুষটি কিন্তু বাঘকে দেখে এমন ভান করল, যেন সে তাকে কোনোদিন দেখেইনি। বাঘকে সে পরম অতিথির মতন আপ্যায়ন করে তার নির্মাণ করা কাঁটার মুখওলা আসনে বসতে দিল।

বাঘও সঙ্গে সঙ্গে তার আতিথেয়তায় সবকিছু ভুলে গেল। একেবারে আনন্দে গদ গদ হয়ে বসল সে আসনে। বসা মাত্রই তার শরীরের ভেতরে অনেকগুলি লোহার কাঁটা ঢুকে গেল। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে বাঘটি সেখান থেকে পালাল।

বাঘটি পালিয়ে যেতে মানুষটিও স্থান ত্যাগ করল। কিন্তু এবার তার মনের মধ্যে একটা ভয় উঁকি দিল। মৃত্যুভয়! এবার নিশ্চয়ই বাঘ তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। প্রতিশোধ নিতে ঠিক ফিরে আসবে। তাই সে মনে মনে চিন্তা করতে লাগল কী করা যায়? কথায় আছে না দুষ্ট লোকের ছলের অভাব হয় না! বুদ্ধিটাও যেন হঠাৎই মাথায় খেলে গেল।

একটা বিষাক্ত পাত্রভর্তি জল নিয়ে মানুষটা এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

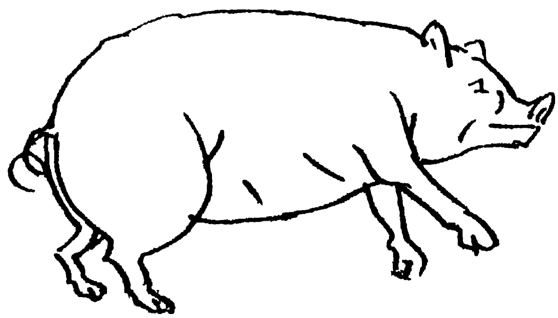
বাঘ ছাড়বে কেন? প্রতিশোধ নিতে সে ফের গজরাতে গজরাতে এল।

বাঘটিকে দেখেই মানুষটি খুশি হল। বলল, বন্ধু— আমি তোমার জন্য পাত্রভর্তি জল নিয়ে অপেক্ষা করছি। নাও-- শিগগির এটা খেয়ে নাও।

জল! বাঘটির সব রাগ পড়ে গেল। তেষ্টাও তার ভীষণ পেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তেষ্টা মেটানোর জন্য মানুষটার হাতের পাত্রভর্তি জল সে একনিশ্বাসে পান করে ফেলল।

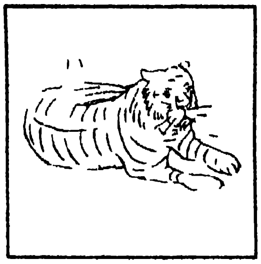
পান করা মাত্রই বাঘটির ভবলীলা সাঙ্গ হল।

বাঘটি বিষাক্ত জল পান করার পর মারা যেতেই মানুষটিও আনন্দে লাফিয়ে উঠল। তাকে আর পায় কে? গৃহে ফিরে সে মহা আনন্দে শূকরের সব মাংস খুব ভালো করে রান্না করে একাই বেশ কদিন ধরে ভোগ করতে লাগল।



বাঘ-মানুষ

(মি জো রা ম)



পৃথিবীতে বাঘ-মানুষ বলে কোনো জন্তু নেই। তবে মিজোরামে পওইস নামে একটি আদিবাসী সম্প্রদায় আছে। তাদের বিশ্বাস এক সময়ে এমন এক রকম জন্তু ছিল— যারা ঘনঘন নিজেদের রূপ পরিবর্তন করতে পারত। মানুষ হয়ে দিব্যি ভালোমানুষের মতো লোকালয়ে থাকত; আবার বাঘ হয়ে বনের পশু সাবাড় করে বেড়াত। পওইস আদিবাসীদের মধ্যে বাঘ-মানুষের একটি গল্প চালু আছে। সেটাই বলছি, শোন।

একটা মেয়ে গভীর বনে যেত। সেখান থেকে কাঠ কুড়িয়ে আনত। কখনও বা ফুল তুলে মালা গাঁথত। মেয়েটার ভয়-ডর একটু কমই ছিল।

একদিন মেয়েটা বনে আপন মনে কাঠ কুড়াচ্ছিল। এমন সময়ে সে তার সামনে একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। প্রথমটা সে অবাক হয়েছিল। পরে সে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে ওঠে।

ওই লোকটা আসলে ছিল বাঘ-মানুষ। মানুষ রূপে থাকলেও যে-কোনো মুহূর্তে সে আবার বাঘ হতে পারে। মেয়েটা সেদিনই তো তাকে প্রথম দেখল। সুতরাং তার সম্পর্কে এত-সব কথা সে জানবে কেমন করে?

লোকটাই প্রথম বললে ঃ খুকি, তুমি কী করছ? মেয়েটা উত্তর দিলে ঃ কাঠ কুড়োচ্ছি।

কাঠ কুড়োতে বনে আসতে তোমার ভয় করে না?— লোকটা বললে।

বাঃ রে, ভয় করবে কেন? আমি তো রোজই আসি। — মেয়েটা বললে।

তারপর সেই বাঘ-মানুষটা মেয়েটার সাথে ভাব জমাল। আসলে তার ছিল বদ মতলব। সে চাইছিল মেয়েটার সঙ্গে ভাব জমিয়ে লোকালয়ে যাবে; তারপর সুযোগ-সুবিধা মতো সেখান থেকে গোরু, ছাগল যখন যা পাবে ধরে এনে খাবে। তেমন সুযোগ পেলে কচি-কচি ছেলেমেয়েদেরও ছেড়ে দেবে না।

তারপর থেকে রোজ-রোজ বাঘ-মানুষটার মেয়েটার সঙ্গে বনে দেখা হত। দুজনে মিলে মনের আনন্দে গল্প-গুজব করত।

বাঘ-মানুষটা মেয়েটাকে গাছের ফল পেড়ে খেতে দিত। কোনোদিন-বা মৌচাক ভেঙে মধু নিয়ে আসত। মেয়েটা সেই মধু বাড়িতে নিয়ে যেত।

মেয়েটার মুখে তার বাবা-মা ওই লোকটার কথা শুনে একদিন তাকে দেখতে চাইল। তার বাবা বললে ঃ যেমন করেই হোক, ওকে আজকে আমাদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসবি। লোকটা সত্যিই খুব ভালো।

মেয়েটা সেইদিনই লোকটাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। তাকে দেখে তার বাবা-মা তো বেজায় খুশি। কীভাবে যে তার আপ্যায়ন করবে; সে ঠিক করে উঠতে পারল না।



কিন্তু বাঘ-মানুষটাকে লোকালয়ে এনে মেয়েটা যে খাল কেটে কুমির আনছে— সেটা তার বাবা-মা জানবে কেমন করে?

একদিন মেয়েটার বাবা তার মাকে বললে ঃ ভাবছি মেয়ের সঙ্গে ওরই বিয়ে দেব। বর খোঁজার জন্য আর বিশেষ কষ্ট পেতে হবে না।

মেয়েটার মা বললে ঃ তা ভালোই হবে। ওদের দুজনের মধ্যে ভাব-ভালোবাসাও খুব। তা ছাড়া লোকটার মনটাও ভালো।

বিয়ের কথা প্রায় পাকাপাকি। দুজন আগের চেয়ে আরো ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে। কিন্তু মেয়েটা যখনি বিয়ের কথা তোলে, বাঘ-মানুষটা বলে ওঠে ঃ সে হবে'খন। এত তাড়াহুড়োর কী আছে?

একদিন বন থেকে ফুল কুড়িয়ে এনে মেয়েটা ওই বাঘ-মানুষটার কাছে বসে বসে মালা গাঁথছিল। লোকটাও তার সঙ্গে গল্প গুজবে মেতে ছিল।

এমন সময় অল্প কিছুদূরে একটা হরিণের ডাক শোনা গেল। হরিণটা বোধ হয় নদীতে জল পান করতে এসেছিল।

তৎক্ষণাৎ ওই বাঘ-মানুষটা কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়। সেটা মেয়েটার দৃষ্টি এড়াতে পারল না'

মেয়েটাকে সে বলল ঃ তুমি মালা গাঁথো। আমি এই সামনে থেকে একটু ঘুরে আসছি।— তাকে অন্য কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল।

মেয়েটা দূর থেকে লক্ষ করতে লাগল— সে কী করে। সে দেখল লোকটা কিছু দূরে গিয়ে বাঘ হল। অতর্কিতে সে হরিণটাকে পেছন দিক থেকে কামড়ে ধরল এবং দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। তারপর হরিণের মাংস কতকটা খেল। বাকিটা এক জায়গায় লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রেখে বাঘটা আবার মানুষ হয়ে মেয়েটার কাছে ফিরে এল। তার সারাটা মুখ হরিণের রক্তে মাখা। চট্‌পট্ চলে আসার জন্য সেটা ধুয়ে আসতে পারেনি।

মেয়েটা হরিণ-মারার দৃশ্যটা দেখে প্রথমটায় বেশ হকচকিয়ে গেছল। কিন্তু সে যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি দুঃসাহসী। বুঝতে পারল ওই লোকটা আসলে বাঘ-মানুষ।

কিন্তু সে তাকে তার মনোভাব বুঝতে দিল না। বললে ঃ আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। একটা দরকারি কাজ আছে।

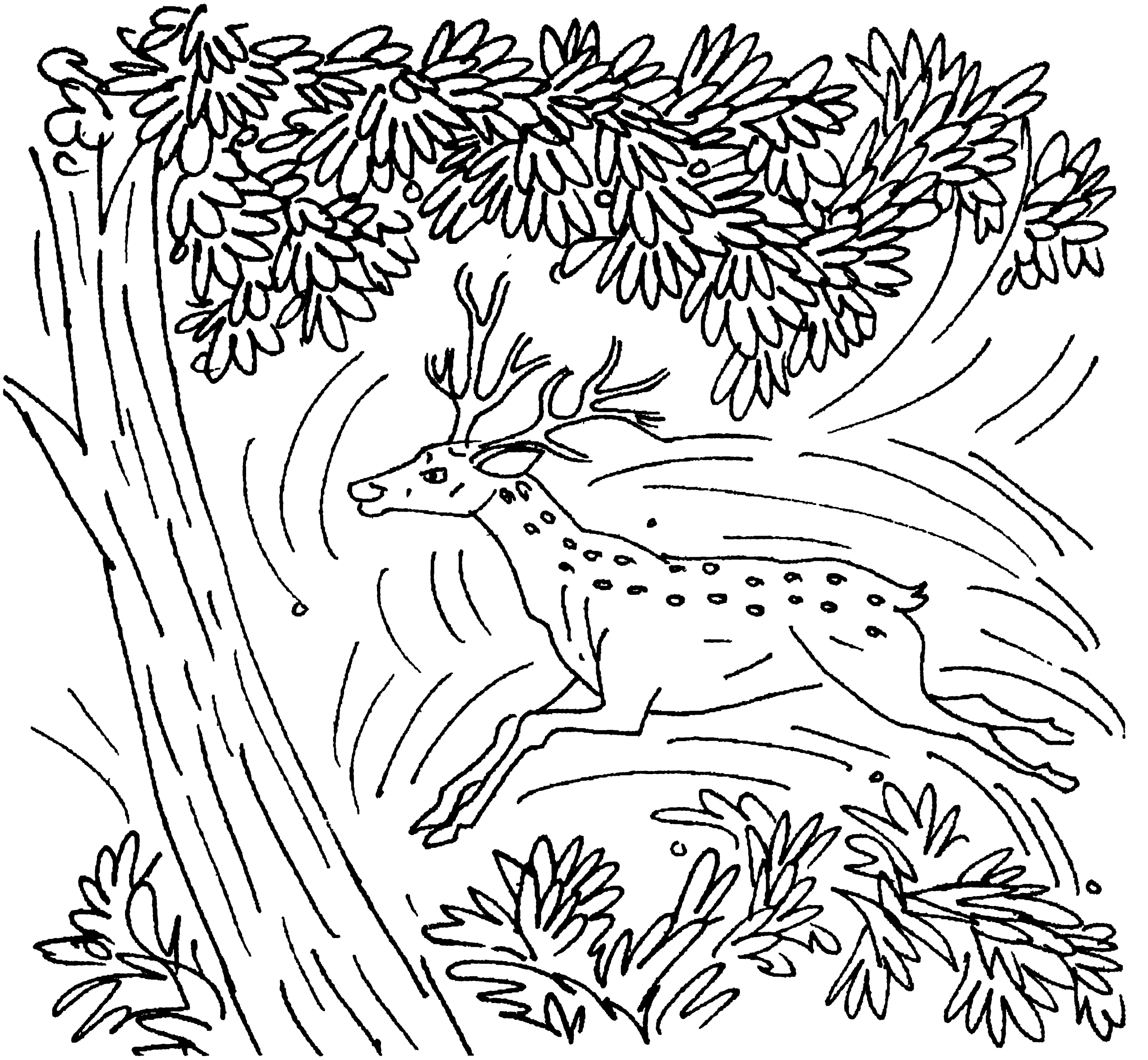
বাঘ-মানুষটা ভাবল ঃ নিশ্চয়ই সন্দেহ করার মতো কিছু ঘটেছে। নতুবা মেয়েটাতো কোনোদিনই এত সকাল-সকাল বাড়ি ফিরে যায় না। সে একটা ডোবায় জল পান করতে গেল। জলে তার প্রতিবিম্ব দেখল সে— সারা মুখে রক্তের দাগ।

মুখটা ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নিলে। গাঁয়ের লোক যাতে তাকে বাঘ-মানুষ বলে কোনোভাবে সন্দেহ করতে না পারে, সেজন্য দিব্যি ভালোমানুষের মতো গাঁয়ে ঢুকল।

মেয়েটা চিন্তা করল যে, তার ভুলের জন্যই বাঘ-মানুষটা লোকালয়ে ঢুকতে পেরেছে। এটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খতম না করতে পারলে গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে তার নিজের জীবনও বিপন্ন হতে পারে।

সে তাই গাঁয়ের সব লোককে বলল বাঘ-মানুষটার কথা। নিজে একটা ধারালো 'দা' পোশাকের নীচে লুকিয়ে রাখল।

পরের দিন সে গাঁয়ের এক প্রান্তে চুপচাপ বসে রইল। চারদিকে গা-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করল গাঁয়ের



সাহসী জোয়ানেরা। এদিকে মেয়েটা এমন একটা ভাব করে রইল যেন সে ওই লোকটার জন্যই প্রতীক্ষা করছে। তার ব্যাপার-স্যাপার বাঘ-মানুষটা কিছুই বুঝতে পারেনি।

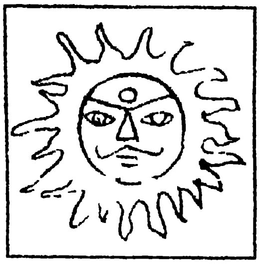
কিন্তু দূর থেকেই অনুমানে সে বুঝতে পারল মেয়েটার কাছে কোনো ধারালো অস্ত্র আছে। তাই মুহূর্তের মধ্যে বাঘ হয়ে মেয়েটা যেখানে বসেছিল এক লাফে সেখানে এসে হাজির হল।

মেয়েটাও তার পোশাকের নীচে লুকানো দা-টা বার করে বাঘটার গলাতে লাগাল এক কোপ। সঙ্গে সঙ্গে জোয়ানেরাও বেরিয়ে এল টাঙ্গি, বর্শা, তির-ধনুক, ছুরি নিয়ে। সবাই মিলে আক্রমণ চালাল। শেষ পর্যন্ত মারা পড়ল বাঘ-মানুষটা।

বাঘ-মানুষটাকে মেরে ফেলায় গাঁয়ের লোক স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। মেয়েটাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বাঘ-মানুষের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে।

সূর্যের নবজন্ম

(অ রু ণা চ ল)

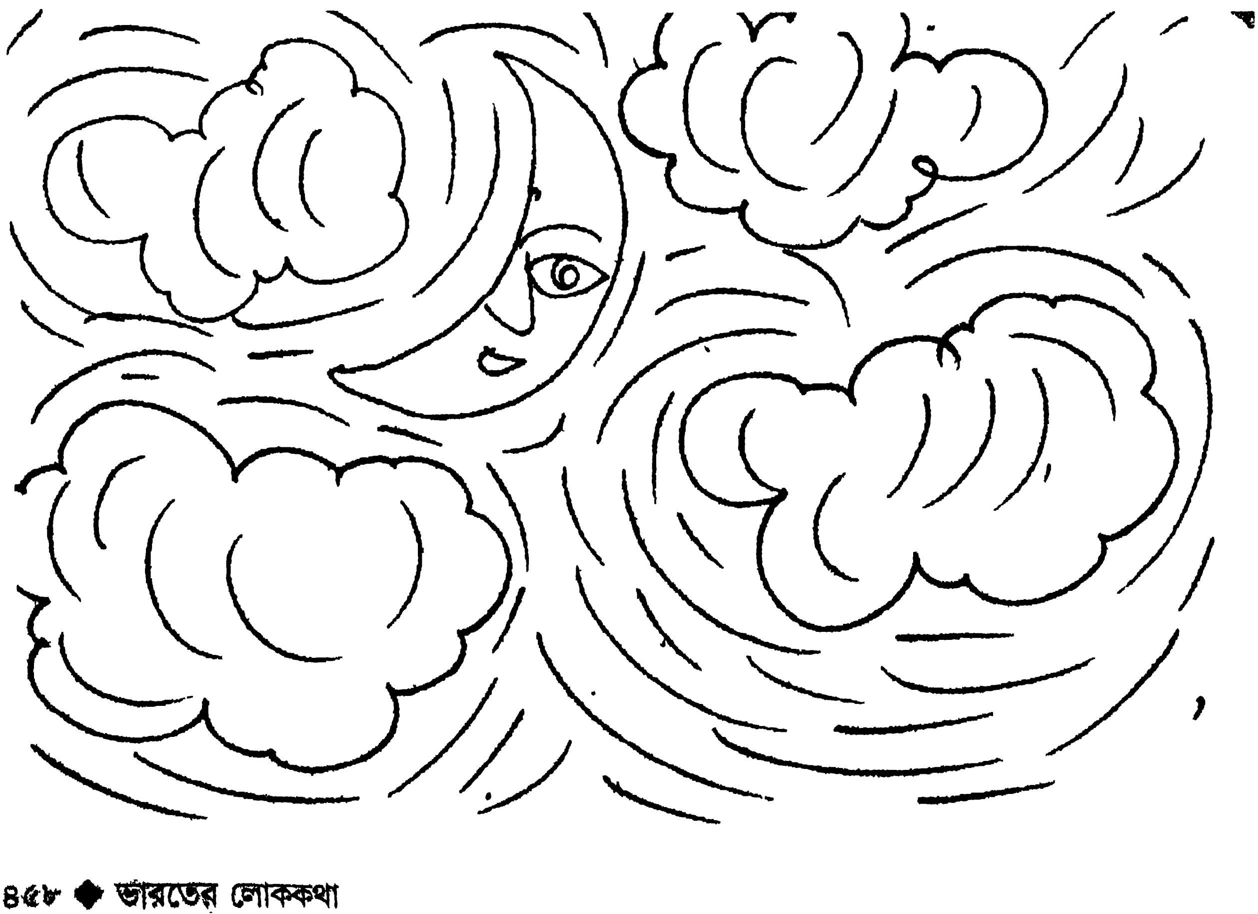


অনেক, অনেক দিন আগের কথা।

ডেইনি, ডোপু, পোডো, পেয়ু— এসব দেবতারা তখন ছেলেমানুষ। সে সময় শুধু দিনই ছিল— রাত ছিল না। সব সময় দিন থাকার জন্য ওইসব দেবতার চোখ আর হাত ছিল না। পরে অবশ্য হয়। রাত না থাকায় তখন দেবতাদের খাবার জোগাড় করাও কঠিন হত।

পেয়ু বললে : রাত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কেমন করে খাবার পাব? —অন্যান্য দেবতারা তার কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল : হ্যাঁ, রাত না হলে কিছুতেই খাবার জোটানো যাবে না।

একজন দেবতা ছিল ভীষণ রগচটা। তার নাম ইট্ টিগ-লিঙ্গ। তেমন বড়োসড়ো নয় একেবারেই ছোটো দেবতা। কথাবার্তা নেই, সে গিয়ে দেবতা ডেইনিকে (সূর্য) হত্যা করে বসল। আর তার ফলে সেই মুহূর্তে ঘনিয়ে এল নিকষ কালো অন্ধকার। কেউ কাউকে দেখতে পায় না— কেবল গলার স্বরই শুনতে পায়।



একটানা আলোর পরে এমন অন্ধকার অসহ্য। খাবার সংগ্রহ অসম্ভব। দেবতারা এবার প্রমাদ গণে জবু-থবু হয়ে বসে রইলেন।

পেড়ডংগ-ডংগ-কোনিয়ংগ এবং অছ্-ছি-গংগ-কংগ-ক্যানিয়ংগ—— এই দু-জন দেবতা ছিলেন প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ ও সুবিবেচক। তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে ডেইনিকে হত্যা করাটা খুবই অন্যায় হয়েছে। সেজন্য দেবতাদের মধ্যে যারা প্রভাবশালী ছিলেন, তিনি তাঁদের একটা সভা করে এর ফয়সালা করতে অনুরোধ জানালেন।

সব দেবতাই চাইলেন ডেইনির নবজন্ম। তাঁকে বাদ দিয়ে সমস্ত সৃষ্টি যে মহাপ্রলয়ের সম্মুখীন হবে। অন্ধকারে থাকতে থাকতে দেবতা, মানুষ ও পশু সকলেই যে দৃষ্টি শক্তিহীন হয়ে শেষে অন্ধ হয়ে যাবে।

তারপর দেবতারা ডেইনির জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য প্রার্থনা জানাতে বললেন সমস্ত মানুষ ও পশুদের।

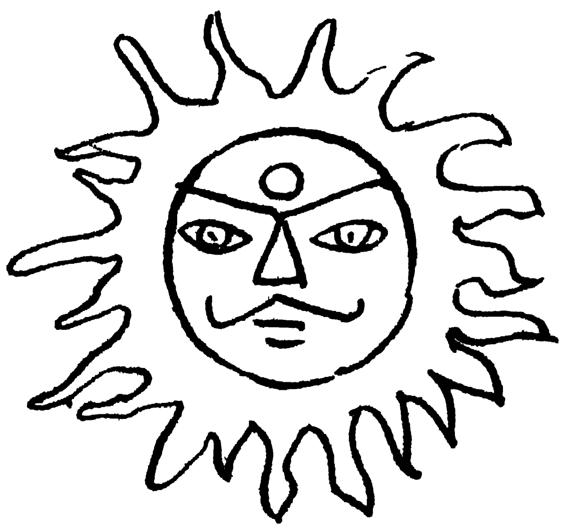
কিন্তু ডেইনি বেঁকে বসলেন। তিনি কিছুতেই নব-জীবন লাভ করতে চাইলেন না। তিনি ক্ষুব্ধস্বরে বললেন : আমি কখনও কারো অনিষ্ট করিনি। তথাপি তোমরা আমাকে হত্যা করেছ। আমি কিছুতেই আর জীবন ফিরে পেতে চাই না। তোমরা আমাকে কেন হত্যা করেছিলে?

দেবতারা নীরব রইলেন। ডেইনিকে হত্যা করেছিল ইট টিগ-লিংগ। সে মাথামোটা ও রগচটা। হালচাল খারাপ দেখে কখন সে একেবারে বেপাত্তা হয়ে গেছে।

বড়ো বড়ো দেবতারা ডেইনিকে তাঁর বেঁচে থাকার গুরুত্ব যে কতখানি তা বোঝালেন। তারপর তাকে আশ্বস্ত করে বললেন : তুমি বেঁচে জেগে ওঠো। তখন তোমার যা ইচ্ছে করে, তা করতে পারবে। তোমার যা খেতে ইচ্ছে করে তাই খেতে পারবে। ইচ্ছেমতো যত্রতত্র যেতে পারবে।

শেষ পর্যন্ত দেবতাদের পীড়াপীড়িতে ডেইনি আবার বেঁচে উঠতে রাজি হল। সারা পৃথিবী জুড়ে আবির্ভাব হল দিনের। কিন্তু সেই সঙ্গে ঘটল মৃত্যুরও আবির্ভাব।

লোকেরা আজও তাই বলাবলি করে : দিনের বেলা কেউ মারা গেলে তাকে সূর্য খায়। আর রাত্রিতে মরলে খায় চাঁদ।



চালাক শজারু ও বোকা হাতির গল্প



প্রাচীনকালে একটা ক্ষীণকায় নদীর ধারে একটা বনে এক শজারু বসবাস করত। আপন বলতে তার ছিল এক ভাইপো। সেও তার সঙ্গে থাকত। একদিন হল কী— শজারুর ভীষণ তেষ্টা পেল। তেষ্টা পাওয়া মাত্রই সে তার ভাইপোকে নদী থেকে জল নিয়ে আসতে বলল।

বাচ্চা শজারুটি তৎক্ষণাৎ জল আনতে ছুটল। নদীর কাছে পৌঁছতেই সে দেখল নদীর জল নোংরা। তাই সে জল না নিয়ে খালি হাতে ফিরে এল।

জল নিয়ে না আসায় কাকা রেগে যেতেই বাচ্চা শজারুটি বলল, নদীর জল কর্দমাক্ত।

বাচ্চা শজারুর কথা শুনে বড়ো শজারুটি নিজেই দেখতে ছুটল, ভাইপো সত্যি কথা বলছে কিনা তা যাচাই করতে। নদীর পারে উপস্থিত হয়ে শজারু যখন দেখল, নদীর জল সত্যিই নোংরা, তখন সে ভাইপোকে আদেশ দিল— 'যা চারপাশটা একটু ঘুরে দেখে আয়তো— দেখতো কেউ আছে কিনা! মনে হয় কোনো কাণ্ডজ্ঞানহীন কেউ জল ঘোলা করছে। তাকে গিয়ে বল, আমি জল খেতে এসেছি। সে যেন সরে যায়।'

কাকার আদেশ পালন করতে একটু এদিক সেদিক ঘুরে দেখতেই বাচ্চা শজারুটি দেখতে পেল, একটা বিরাট হাতি জলে নেমে মহা আনন্দে খেলা করছে।

হাতিটিকে দেখা মাত্রই বাচ্চা শজারুটি কাকার নির্দেশ মতন সব কথা খুলে বলে তাকে জল ঘোলা করতে নিষেধ করল।

বাচ্চা শজারুটির কথা শুনে হাতিটি ভীষণ রেগে গেল। নিজের শরীরের আকার অন্য পশুদের চেয়ে দীর্ঘ বলে তার এমনিতে খুব অহংকার ছিল। শুঁড় তুলে তাই সে চিৎকার করে বলল, 'তোমার কাকা কোন মহাপুরুষ হে, তার জন্য আমাকে জল থেকে উঠে যেতে হবে? যাও, পার তো আমাকে দেখানোর জন্য তাকে এখানে নিয়ে এসো। যদি আকারে সে আমার থেকে বড়ো হয়— তাহলেই একমাত্র আমি তার কথা মানতে পারি। নচেৎ নয়।'

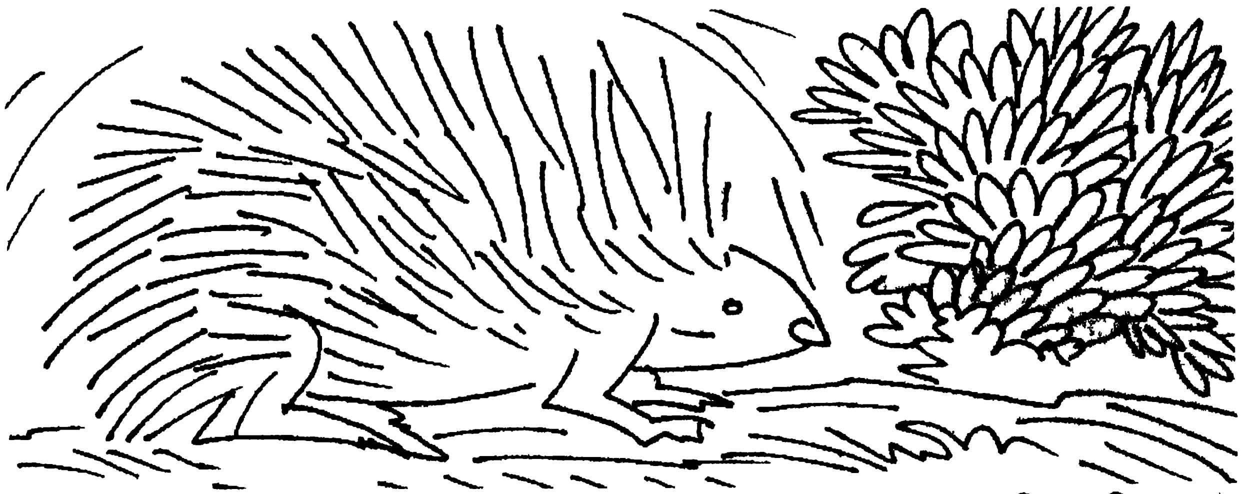
কিন্তু হাতির শক্তি যতই থাকুক না কেন, এমনিতে তারা খুব ভিতু স্বভাবের হয়। এজন্যই মানুষের মতন ছোটো প্রাণীও তাদের প্রভু হয়ে বসে।

যাই হোক— বাচ্চা শজারুটির মুখ থেকে এ কথা শুনে বড়ো শজারুটি তৎক্ষণাৎ তার নিজের শরীর থেকে সব থেকে মোটা কাঁটাটা বের করে ভাইপোর হাতে দিয়ে বলল, 'যা, এটা দেখিয়ে ওই জন্তুটাকে গিয়ে বল— আমার শরীর ভালো নেই। তবে, সত্যিই যদি সে আমাদের দুজনের দেহের তুলনা করতে চায়, তাহলে তাকে বলবি— সে আমার শরীরের এই কাঁটাটা দেখেই যেন অনুমান করে নেয়। তার শরীরের একটা চুলও যদি এই কাঁটাটার থেকে বড়ো হয়, তাহলেই আমি তার কথা শুনব। কিন্তু যদি না হয়, তাহলে তাকে এ কথা বলার জন্য আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।'

বাচ্চা শজারুটি কাকার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। সে ফের হাতিটির কাছে গেল। কাকার সব কথা জানিয়ে সে হাতিটিকে কাকার শরীরের কাঁটাখানা দিল।

হাতিটি কাঁটাটা বাচ্চা শজারুটির কাছ থেকে নেবার পর নিজের শরীরের সব চুল পরীক্ষা করল। কিন্তু সব চুল পরীক্ষার পর যখন সে দেখল, তার প্রত্যেকটি চুলের তুলনায় শজারুর চুলটি শতগুণে মোটা, স্বভাবতই ভয় পেয়ে গেল হাতিটি। ক্ষমা চেয়ে দ্রুত সে সেই স্থান ত্যাগ করল।

হাতি ক্ষমা চেয়ে সরে পড়েছে খবর পেয়েই বড়ো শজারুটি অসম্ভব গর্বিত হয়ে নদীতে এল। প্রাণভরে জল পান করল।



তারপর বেশ কিছুদিন পর হাতিটি একদিন গাছপাতা খেতে খেতে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। সেই রাস্তায় তখন একটা সরলগাছের কাছে বড়ো শজারুটা ঘোরাফেরা করছিল। চোখের সামনে নিজের দেহের চুলের তুলনায় বড়ো চুল সম্পন্ন তাকে দেখতে পেয়েই হাতিটা বিব্রত হয়ে পড়ল। নিজের শুঁড় দিয়ে শজারুটাকে সে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

শজারুটি তখন তাকে চিৎকার করে বলল, 'হে মহাশয়, আপনি এ কী করছেন? দেখছেন না গাছটি এক্ষুনি পড়ে যাবে! গাছটি পড়ে গেলে যে আপনিও আমার সঙ্গে চাপা পড়ে মারা যাবেন।'

শজারুটির কথা শুনে হাতিটা মাথা তুলে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, কথাটা মিথ্যে বলেনি। সত্যিই চাপা পড়ে যেতে পারে। গাছটি যা দীর্ঘকায়! তাই শজারুর সঙ্গে সেও গাছটিকে ঠেকিয়ে রাখার কাজে হাত দিল।

শজারুটি ছিল খুব সেয়ানা। প্রাকৃতিক কাজকর্মের নাম করে সে কেটে পড়ল।

হাতিটি কেবল একা বোকার মতন গাছটিকে ধরে রইল। একেবারে টানা চার-পাঁচ দিন। তবুও শজারুটি ফিরে এল না দেখে সব রাগ গিয়ে পড়ল তার গাছটির ওপর। সজোরে সে গাছটার মাথার ওপরে আঘাত করল। আঘাত করেই সে তার শুঁড়টা সরিয়ে নিয়ে দেখতে লাগল গাছটি কোনদিকে পড়েছে।

কিন্তু যখন সে দেখল, গাছটা পড়েনি, যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে, তখন সে ভীষণ খ্যেপে গেল। খ্যেপে গিয়ে আপন মনে গজরাতে গজরাতে শেষমেষ হাতিটা এগিয়ে চলল।

বলতে নেই— সেদিন থেকে শজারুটির প্রতি বদলা নেবার জন্য হাতিটা তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে হাতিটিকে দেখতে পেল শজারুটি। একটি বড়ো পাথরের চাঁইয়ের কাছে সে দাঁড়িয়ে আছে। শজারুটি হাতিটিকে দেখামাত্র সেই পাথরের চাঁইয়ের একপাশে সরে এল। তারপর সে চিৎকার করতে লাগল, 'আমি মরে গেলুম, আমি মরে গেলুম' বলে।

শজারুটির চিৎকার শুনে হাতিটি ভয় পেয়ে গেল। চমকে সে পাথরটার কাছে এগিয়ে গেল। এগিয়ে যেতেই শজারুটিকে দেখতে পেল।

হাতিটিকে এগিয়ে যেতেই শজারুটি মিষ্টি করে বলল, 'সখা—আমার সৌভাগ্য, আপনাকে আমি বিপদের সময় কাছে পেয়েছি। আপনাকে কাছে পেয়ে আমার কী যে আনন্দ হচ্ছে তা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না। আমি নিশ্চিত, ভগবান আমাদের একে অপরকে বিপদের দিনে সাহায্য করছেন। আপনি আমাকে এই সংকটের সময় সাহায্য করুন। আপনি শুধু আপনার শক্তি দিয়ে এই পাথরটিকে ধরুন। আমি অন্যদিকে পাথরটাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছি।'

শজারুটির মিষ্টি কথায় হাতিটি বশ হয়ে গেল। ভাবল, সত্যিই বুঝি শজারুটি পাথরের তলায় চাপা পড়েছে। সে আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি পাথরটিকে ধরতে এগিয়ে গেল।

আসলে, শজারুটি পাথরটির গায়ে লেপটে ছিল। হাতিটি পাথর ধরতে এগোতেই সে ঠিক সময়ে সেখান থেকে কেটে পড়ল।

কিছুই না জেনে একটা গোটা পাথর গোটাদিন ধরে বোকার মতন ধরে হাতিটি দাঁড়িয়ে রইল। যথারীতি সন্ধ্যা হয়ে আসতে হাতিটি খুব ক্ষুধার্তবোধ করল। তার কিন্তু ধারণা ছিল, অন্যদিক থেকে শজারুটি পাথরটা ধরে আছে। তাই সে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বলল, 'আমি খুব ক্ষুধার্ত। তুমি কিছুক্ষণের জন্য এটাকে ধরে থাকো। আমি কিছু খাবার খেয়ে এসে আবার এসে ধরব।'

কিন্তু শজারুটির দিক থেকে তার কথার কোনো জবাব না পেয়ে হাতিটি পেছন দিকে তাকাল। শজারুটিকে দেখতে পেল না। শজারুটিকে দেখতে না পেয়ে সে ভীষণ রেগে গেল। রেগে গিয়ে পাথরটাকে ছেড়ে দিয়ে হাতিটি ফোঁস ফোঁস করতে করতে গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে শজারুটির সন্ধান করতে লাগল।

অপরদিকে শজারুটি একটি খোঁদলে ঢুকে সুখে-শান্তিতে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিল। তারপর সে অন্য একটা জায়গার উদ্দেশে রওনা দিল।

পথে গরম রোদে শজারুটির চলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। এমনকি নিশ্বাস নিতেও। তাই খুব ধীরে সে চলছিল। জোরে দৌড়ে চলতে পারছিল না। হঠাৎ এমন সময় পথে একটা ভয়ঙ্কর বাঘের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

বাঘটা শজারুটিকে দেখেই মারতে উদ্যত হল। শজারুটি কিন্তু একটুও ঘাবড়াল না। সে বাঘটিকে শান্তভাবে বলল, 'আমাকে মারতে এলে তুমি খুব ঝামেলায় পড়ে যাবে। এইমুহূর্তে আমি আমার সঙ্গে একটি বিষের বস্তা রেখেছি। তুমি আমার ওপর লাফিয়ে পড়লেই তোমার দাঁত আমার চুল স্পর্শ করবে। তখন তোমার দাঁত আপনা থেকেই ঝরে যাবে। ভবিষ্যতে তোমাকে অনাহারে থাকতে হবে। না খেতে পেয়ে তখন তুমি হয়তো মরেই যাবে। অন্য প্রাণীরা তখন তোমায় উপহাস করবে, নেচেও বেড়াবে কেউ কেউ। দাঁত ঝরে গেলে অনেক অপমানই তোমাকে হজম করতে হবে।'

বাঘ শজারুটির এ কথা শুনে গর্জন করে বলল, 'তোমার ধূর্তামি আর চলবে না।'

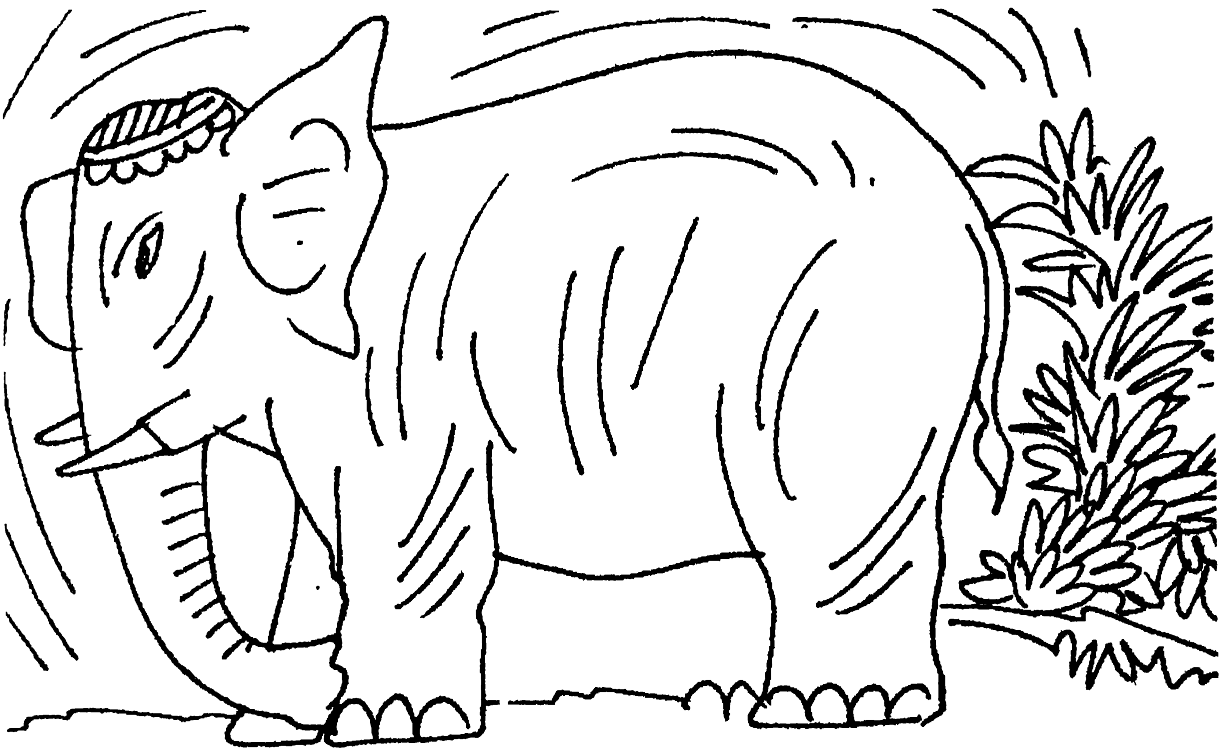
শজারুটি জবাব দিল, 'আমি আমার নিজের জীবন নিয়ে ভাবছি না। আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলছি—তুমি যত চেষ্টাই কর না কেন, কিছুতেই আমাকে মারতে পারবে না। জানবে, যতক্ষণ আমি আমার বাড়িতে বিষের

বস্তাটা না রেখে আসছি। এসময় আমাকে মারতে গেলে তুমি নিজেই মারা পড়বে। বরং তুমি যদি আমার জন্য অমাবস্যার রাত পর্যন্ত অপেক্ষা কর তাহলে ভালো হয়। আমি বস্তাটা ততক্ষণে বাড়িতে রেখে আসি।'

বাঘটি শজারুর কথায় রাজি হল। অমাবস্যার রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা শ্রেয় মনে করল।

কিন্তু বিষের বস্তার দোহাই দিয়ে সেই যে শজারুটি কেটে পড়ল, তার আর ফেরার নাম নেই। গর্ত থেকে সে আর বাঘের ভয়ে বেরলই না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেবার পর শজারুটি এল না দেখে বাঘ প্রচণ্ড রেগে গেল। এমনিতে তার খুব খিদে পেয়েছিল। তাই রাগে গর্জন করতে করতে সে সেইস্থান ত্যাগ করল।



এরপর দেখতে দেখতে বেশ কটা দিন কেটে গেল। হঠাৎ একদিন শজারুটির বন্ধু হাতির কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখতে ইচ্ছে করল খুব তার। পথে বেরিয়ে পড়ল সে। হাঁটতে হাঁটতে সে পূর্বের সেই বড়ো পাথরটার কাছে অগ্রসর হতে লাগল। হঠাৎ পথে তার সঙ্গে হাতিটির দেখা হয়ে গেল।

হাতিটা শজারুটিকে দেখতে পেয়ে রাগে ফোঁস ফোঁস করে উঠল। শজারুটি বুঝল, এবার হাতিটি তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই সে চিৎকার করে হাতিটিকে বলল, 'তুমি আমাকে মারতে এস না। আমাকে মারতে এলে তুমি নিজেই মারা পড়বে।'

শজারুটির মুখ থেকে এ কথা শুনে হাতিটি প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল। কিন্তু নিজের দুর্বলতা প্রকাশ না করে সে বলল, 'তুমি দু-বার আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। এবার আর আমি তোমাকে ছাড়ছি না।'

হাতির কথা শুনে মুচকি হেসে শজারুটি বলল, 'ভালো কথা। দেখা যাক আমাদের মধ্যে কে শক্তিশালী। আগামীকাল আমি তোমার সঙ্গে একটি প্রতিযোগিতায় নামব, তাতে যদি তুমি জিততে পারো— তবেই আমাকে হত্যা কর। আর আমি যদি তোমাকে হারাই— তখন তোমার জীবন নিয়ে আমি কী করব ভাবব।'

হাতিটি শজারুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে রাজি হয়ে গেল। বলল, 'বেশ, তাই হবে।'

পরের দিনই প্রতিযোগিতা শুরু হল। শজারুটি হাতিকে বলল, 'মাটির নীচে একটা বারো ফুট সুড়ঙ্গ খুঁড়তে হবে। আমি এদিকে শুরু করছি, তুমি উলটো দিক থেকে শুরু কর।' এ কথা বলেই সে নিজে হাতিকে কাজে লাগিয়ে সে আগেই তার আশ্রয় নেবার জন্য যে গর্তটা খুঁড়ে রেখেছিল সেখানে ঢুকে উলটোদিক দিয়ে খানিকবাদে বেরিয়ে এল।

হাতিটি সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মাত্র দু-ফুট খুঁড়তে পারল। তখন শজারুটি তাকে পরিহাস করে বলল, 'মূর্খ, তুমি আমাকে হত্যা করতে এসেছিলে। একটা ছোটো গর্ত খুঁড়তে এত সময় লাগে?'

যাইহোক— প্রথম পরীক্ষায় শজারুটির কাছে হাতিটা হেরে গেল।

দ্বিতীয় দিন ফের প্রতিযোগিতা শুরু হল। তার আগে শজারুটি তার বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনদের বনের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড় করিয়ে নানান নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল।

নির্দিষ্ট সময়ে যথারীতি দুজনের মধ্যে দৌড় শুরু হল। শজারুটি ধীরে ধীরে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। হাতিটা কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে তাকাল। শজারুটিকে আর দেখতে পেল না। শজারুটিকে দেখতে না পেয়ে সে চিৎকার করে বলল, 'এবার তোকে আমার কাছে মরতে হবে।'

হাতিটা এ কথা বলা মাত্রই সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা শজারু চিৎকার করে বলল, 'মরতে যাকে হবে, সে হচ্ছ তুমি। কেননা, আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।'

শজারুটির কাছ থেকে একথা শুনে হাতিটি খুব লজ্জা পেয়ে গেল। লজ্জা ঢাকার জন্য সে লতাপাতা কাঁটাঝোপ সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে খানিকটা দূরে এগিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ পেছন ফিরতেই তার কানে এল একটি কণ্ঠস্বর, 'তুমি যদি ভালোভাবে দৌড়তেই না পারো— তাহলে এবার দৌড়-প্রতিযোগিতায় নিজের হার স্বীকার করে নাও।'

লজ্জায় মাথা নিচু করে, একরকম জীবনের ভয়ে এবার হাতিটি সমস্ত ক্লান্তি ভুলে উন্মাদের মতন কয়েক মাইল এগিয়ে গেল। বেশ কিছুদূর যাবার পর যখন সে শজারুটিকে দেখবার জন্য পেছন ফিরে তাকাল, তখন তার সামনে থেকে ভেসে এল ফের একটি কণ্ঠস্বর, 'বাছা, মাত্র দুদিন আগে যে জন্মেছে, সেও দেখছি তোমার থেকে আগে দৌড়তে পারে।'

এ কথা শোনার পর হাতিটি বেশ ম্রিয়মান হয়ে পড়ল। তবু সে নিজের সব শক্তি দিয়ে শেষবারের মতন আর একবার দ্রুত দৌড়ল। কিন্তু তার দম শেষ হয়ে এল। খানিক পরে স্তব্ধ হয়ে গেল তার পা। চলার একটুও ক্ষমতা নেই।

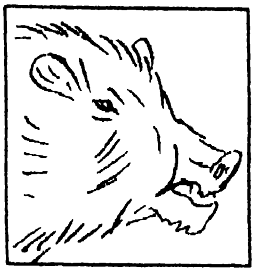
হাতিটিকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে দূর থেকে একটি শজারু তাকে হুঁশিয়ার দিয়ে বলল, 'কাল সকালে আবার আমি এখানে আসব। তুমি তৈরি থেক।'

শজারুটির এ কথা শুনে হাতিটি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ভোর হবার আগেই সে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সে তাই পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে সারারাত ধরে হেঁটে অবশেষে সমভূমিতে নেমে এল।

সমভূমিতে নেমে এসেই হাতিটা ভয়মুক্ত হল। কথিত আছে, বিশেষ করে অরুণাচল প্রদেশে— শজারুদের চালাকির জন্য আজও পর্যন্ত হাতিরা পাহাড়-পর্বতের পথ মাড়ায় না। ভয় পায়।

সেয়ানে সেয়ানে

(না গা ল্যা ণ্ড)



বাঘ কখনও জ্যান্ত বুনো শুয়োরেব মাংস খায় না। কেন যে খায় না, সেটা নিয়ে লোথা নাগাদেব মধ্যে একটা মজার কাহিনী চালু আছে। সেটাই বলছি, শোনো।

গভীর বনে থাকত একটা বাঘ আব একটা বুনো শুয়োর। বাইরে থেকে দেখে মনে হত— তাদেব দুজনেব মধ্যে দারুণ বন্ধুত্ব। কিন্তু ভেতরে অন্য রকম। তারা একজন অন্য জনকে শত্রু বলে জানত। ঈর্ষার চোখে দেখত।

বাঘ ভাবত তাব গায়ে ভীষণ জোব। বুনো শুয়োবটার সঙ্গে কুস্তি লড়লে তাকে সে একবাবেই কুপোকাত কবে ফেলবে। অন্য দিকে বুনো শুয়োবটা মনে কবত— বাঘেব চেয়ে সে-ই বেশি শক্তিশালী। তলে তলে তাবা একজন অন্য জনকে ঘায়েল কবাব ফন্দি আঁটত।

এমনিভাবে দিন কাটছিল। নিজেদেব শক্তি যাচাই কবাব জন্য তাবা অস্থিব হয়ে উঠেছিল। নিছক চক্ষুলজ্জার জন্য নিজেদেব মতলব খোলাখুলিভাবে বলতে পাবছিল না। কিন্তু বুনো জন্তু কতদিন আব রাখ রাখ ঢাক-ঢাক কবে থাকতে পারে? বাঘটার আব কিছুতেই তব সইছিল না। সে মনে মনে ভাবে ঃ বুনো শুয়োবটার শবীবে কী থলথলে চবি ভরা মাংস। ওটাকে খতম কবতে পাবলে অনেকদিন ধবে মজা কবে ওর মাংস খাওয়া যাবে।

একদিন তাই বাঘ চক্ষুলজ্জাব বালাই ঝেড়ে ফেলে বলে বসল ' বন্ধু, আমাব ভারি ইচ্ছে তোমাব সঙ্গে কুস্তি লড়ি। তাহলে আমাদেব কাব গায়ে বেশি জোব তা যাচাই কবা যাবে, আব বেশ মজাও পাওয়া যাবে। তবে তোমাব এতে আপত্তি থাকলে, অন্য কথা।

বুনো শুয়োবটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ কবে মাথা নেড়ে জানাল, সে এই প্রস্তাব গ্রহণ কবতে একপায়ে খাড়া। বাঘের মনে আনন্দ আব ধবে না। কিন্তু বাইরে সে তা প্রকাশ করল না।

বাঘ গোঁফে তা দিয়ে বাশভারি মেজাজে বললে ঃ লড়াইয়ের সময় আমরা আত্মরক্ষার জন্য কে কী হাতিয়ার নেব সেটা আগেভাগে ঠিক কবে নেওয়া দরকার। আমি ঠিক করেছি— একটা বেত নেব। তুমি কী নেবে?

বুনো শুয়োর তার থলথলে মাংসল শরীরটা দুলিয়ে উত্তর দিল ঃ আমার তেমন কোনো হাতিয়ারের দরকার নেই। তবে আমি আমার শরীরটা কাদা দিয়ে ভালো করে লেপে নেব।

ঃ ভালো কথা, এবাব লড়াই-এর দিনটি আগেভাগে ঠিক করে নেওয়া যাক।—বললে বাঘ।

ঃ আজ থেকে আরও ছটা দিন বাদে। —উত্তর দিলে শুয়োর।

বাঘ মাথা দুলিয়ে সায় দিয়ে জানাল।'— সে তাতেই রাজি।

লড়াইয়ের দিন ঠিক হয়ে যাবার পরে দুই বন্ধুর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হল। বাঘ লড়াইয়ের জন্য বন থেকে একটা মস্ত লম্বা বেত কেটে আনল। আর সেটা সে তার চারদিকে বনবন্ করে একটানা ঘুরিয়েই যেতে লাগল।



ওদিকে বুনো শুয়োবটা ঘোঁৎ-ঘোঁৎ কবতে কবতে অনেক খোঁজাখুঁজি করে পেয়ে গেল একটা পচা ডোবা। সে সেই ডোবায শবীব ডুবিযে ভালো কবে কাদা মাখিয়ে নিল সর্বাঙ্গে। পরে বোদে বেশ কবে শুকিযে নিল। তাতে কাদাব একটা পুরু আস্তবণ পড়ল তার গায়ে।

দেখতে দেখতে ছটা দিন কেটে গেল। এল বাঘ-শুযোবেব মোলাকাতের নির্দিষ্ট দিনটি। দুজনেই সমান মনোবল নিযে তৈরি হয়ে এসেছে। কেউ কাউকে সহজে ছেড়ে দেবে না।

তারপর শুরু হল বাঘ আর বুনো শুয়োরের লড়াই। বাঘ হুঙ্কার ছাড়ল। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বুনো শুয়োরটাও পালটা জবাব দিল। লড়াই-এর সময় কেউ কারো বন্ধু নয়। একজন অন্য জনের দুশমন। প্রথমে দাপট দেখাল বাঘ। তেড়ে গিয়ে বুনো শুয়োরটাকে ধাক্কা মেরে বেত ঘুরিয়ে পিটতে লাগল দমাদম। তারপর শুরু হল ধস্তাধস্তি, গুঁতোগুঁতি। বুনো শুয়োরের গায়ের শুকনো কাদায় বাঘটার মুখ গেল ভরে। সে শুধু থুঃ থুঃ করছে। চোখে-মুখেও কাদা লেগেছে। সেজন্য ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না। এই অবস্থায় কতক্ষণ আর লড়াই চালানো যায়? বাঘটা বেশ বেকায়দায় পড়ে গেল। এবার বুনো শুয়োরটার পালা। সে তার কোদালের মতো দাঁত দিয়ে বাঘটার পেটে মারলে এক কামড়। ছিনিয়ে নিল বেতটাও। এবার আর তাকে পায় কে?

বেত দিয়ে বাঘটাকে বেধড়ক পিটিয়ে যেতে লাগল সে। বাঘটা সম্পূর্ণ অসহায়। সে শুধু মার খেয়েই চলেছে। আত্মরক্ষারও কোনো উপায় নেই বেচারার। ক্রমশ মার খেয়ে খেয়ে সে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। অবশেষে মারের চোটে অসহায়ভাবে মারাই গেল বাঘটা।

বুনো শুয়োরের আনন্দ আর ধরে না। বাঘের মতো শক্তিমান জন্তুকে ভবলীলা সাঙ্গ করেছে সে। কত বড়ো বীব। অহঙ্কাবে ধবাকে সরা জ্ঞান করতে লাগল। বিকট ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজে বনস্থলী কাঁপিয়ে নাচতে লাগল সে।

তারপব দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মনের আনন্দে ছুটতে লাগল। ছুটছে তো ছুটছেই। একটা সরু বাঁশও ছুর্টছিল তাব সঙ্গে। জযেব আনন্দে সে সেটাকে একেবাবে তোযাক্কাই করেনি।

আমি একটা ইয়া-বড়ো তাগড়াই বাঘ মেরেছি। মহাবীব আমি। ওই সরু বাঁশটা আমাব কী করবে?— এই না ভেবে সে ওই সরু বাঁশটাকে কামড়ে ধরল। তাতে তার জিভটা গেল কেটে। জিভ কাটলে বুনো শুযোর সঙ্গে সঙ্গেই মাবা যায়। সেও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অক্কা পেল তৎক্ষণাৎ।

সেই সময় শিকারের খোঁজে সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল একটা বাঘ। বুনো শুযোরটার মৃতদেহ চোখে পড়ল তার। বাহ্, আজ সকালে কাব মুখ দেখে যে উঠেছি। চমৎকার ভোজের ব্যবস্থা হয়ে রয়েছে আপনা-আপনি। বলেই সে বুনো শুয়োরের ভুঁড়িতে লাগাল এক কামড়। তারপর এক হপ্তা ধরে সেই বুনো শুয়োরের মাংস খেল তারিয়ে তারিয়ে।



পেতনির মৃত্যু

(ম ণি পু র)



লাই খুট সাং বি নামে একটা পেতনি ছিল। তার মস্ত বড়ো লম্বা লম্বা দুটো হাত। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই গ্রামের লোকেদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সে উপদ্রব চালাত।

যে বাড়িতে কোনো বয়স্ক পুরুষ কিংবা জোয়ান-মরদ নেই, লাই খুট সাং বি সেই বাড়িতেই হানা দিত। সুযোগ-সুবিধা মতো লম্বা হাত দিয়ে ধরে কাউকে তুলে আনত। পরে তার ঘাড় মটকে খেয়ে নিত।

এমনিভাবে দিনের পর দিন ওই পেতনিটার অত্যাচারে গ্রামের লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ওটাকে মেরে ফেলার অনেক চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু কেউই তেমন সুবিধে করতে পারে নি। ওর ভয়ে গ্রামবাসী বয়স্ক পুরুষ ও জোয়ানেরা সূর্য অস্ত যাবার আগেই ঘরে ফিরে আসত।

একজন সাহসী যুবক ও তার বুদ্ধিমতী বউয়ের জন্য কীভাবে সাং বি পেতনির হামলা চিরতরে বন্ধ হয়েছিল— সেই কাহিনীই তোমাদের বলব।

এক যুবক তার বউ ও দুটো ছোটো বাচ্চা নিয়ে গ্রামের প্রান্তে এক কুটিরে থাকত। তার অবস্থা তেমন ভালো ছিল না; ছোটোখাটো হাতের কাজ করে সে সংসার চালাত। খুবই কষ্টে-সৃষ্টে দিন কাটত তাদের।

কাজের তাগিদে ওই যুবকটি কখনও একটানা দু-তিন দিন ঘরে ফিরতে পারত না। সেই সময় বউটাই বাচ্চাদের সামলে-সুমলে রাখত।

একবার যুবকটিকে বড়ো একটা লাভজনক কাজের দায়িত্ব নিয়ে বেশ দূরের একটা গ্রামে যেতে হয়েছিল। তার ফিরে আসতে চার-চারটে দিন কেটে গেল। সেই সুযোগে লাই খুট সাং বি সেই কুটিরে শিকার জোটানোর আশায় আনাগোনা শুরু করে দিল।

একজন দরদী বুড়ির মতো গলার স্বরটা মোলায়েম করে গভীর নিশুতি রাতে লাই খুট বলত ঃ মা, বাবা ঘরে ফিরে এসেছে?

বউটাতো ভীষণ বুদ্ধিমতী। সে ভালো করেই জানত যে এত রাতে সাং বি পেতনি ছাড়া আর কেউই আসতে পারে না। সে-ও তাই চটপট উত্তর দিত ঃ হ্যাঁগো দিদা, সন্ধ্যার আগেই ফিরেছে। ছেলেদের ঘুম পাড়িয়ে খেয়ে এইমাত্র শুয়েছে। অগত্যা সাং বি পিঠটান দিত।

পরপর চারদিন পেতনিটা ওই কুটিরে এসে হানা দেয়। বউটাও একই রকম জবাব শুনিয়ে তাকে ফিরে যেতে বাধ্য করে।

পঞ্চম দিনে বউটার বর ফিরে এল। সে সাং বি পেতনির কথা বলল। কী কৌশলে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলে ওকে সে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে— তা-ও বলল।



তারপর দু-জনে মিলে বুদ্ধি-পরামর্শ করল। ঠিক হল ঃ সাং বি পেতনি আবার এলে বউটা এবারও মিথ্যে কথাই বলবে। বরটা ঘরে থাকা সত্ত্বেও বউটা বলবে। যে সে ঘরে নেই। তারপর দেখা যাবে কী হয়।

পঞ্চম দিনেও যথারীতি সাং বি এল এবং একই প্রশ্ন করল ঃ মা, বাবা ঘরে ফিরেছে?

বউটা একটু দূরে তার বাচ্চাদের কোলে নিয়ে বেশ সতর্ক হয়েই বসেছিল। বরটা একটা ধারালো তলোয়ার হাতে নিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল।

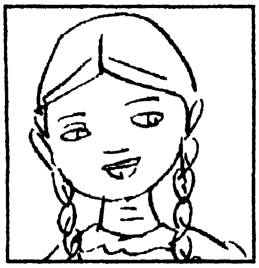
বউটা কেমন যেন ভয়-পাওয়া চাপা কণ্ঠস্বরে ফিসফিস করে বললে ঃ না গো দিদা— এত রাত হল, তবুও আমার মরদটা আজ ঘরে ফিরল না। কোথায় নেশা-ভাঙ্গ করে পড়ে আছে। সংসারের সব দায় তো একা আমারই!

সাং বি পেতনি ভাবল— এই তো মওকা। বহুদিনের চেষ্টার পর শিকারটা হাতের মুঠোয় এল। সে তো আনন্দে একেবারে দিশেহারা। ঘরের ভেতর থেকে কাউকে তুলে নেবার জন্য সে বাড়িয়ে দিল তার মস্ত লম্বা হাতটা।

যেই না সাং বি ঘরের ভেতরে হাতটা ঢুকিয়েছে— অমনি যুবকটা সমস্ত গায়ের জোর খাটিয়ে তার হাতের তলোয়ার দিয়ে পেতনির হাতে মারল এক কোপ। তক্ষুনি তার হাতটা কেটে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সাং বি বিকট স্বরে আর্তনাদ করে উঠল। সেই বিকট চিৎকারে গোটা গ্রামটাই যেন কেঁপে উঠল।

সাং বি মারা গেলে গ্রামবাসীরা সবাই পেতনির উপদ্রব থেকে রক্ষা পেল। তখন থেকে বয়স্ক পুরুষ ও জোয়ানেরা খেতের কাজ সেরে সূর্যাস্তের অনেক পরেও নির্ভয়ে ঘরে ফিরে আসতে লাগল।

এক বালিকা ও সর্প-পিতার গল্প



এক বুড়ি ছিল। সংসারে আপন বলতে এক নাতনি ছাড়া তার আর কেউ ছিল না। মা-বাবা মরা নাতনিকে নিয়ে তার বড়ো কষ্টে দিন কাটত। আয় বলতে তো কিছু ছিল না। ঝুম খেত থেকে মোটা কন্দমূল খুঁড়ে বের করে তাই খেয়ে তারা জীবনধারণ করত।

সেই ঝুম খেতের কাছেই একটা দিঘি ছিল। বহুকাল আগে বুড়ির নাতনিটি যখন নিতান্তই শিশু, তখন তার বাবা ওই দিঘির জলেই স্নান করতে গিয়ে ডুবে মারা যায়। তারপর থেকেই গাঁয়ের লোকেরা পারতপক্ষে ওই দিঘির কাছে যেত না। তাদের ধারণা ছিল, দিঘিটার আশেপাশে ভূতপ্রেত অষ্টপ্রহর ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু বুড়ি ছিল এতই গরিব, পেটের জন্য নাতনির হাত ধরে ঝুম খেতে কন্দমূলের খোঁজে না গিয়ে তার উপায় ছিল না। বুড়ি তাই গাঁয়ের লোকেদের নিষেধ কানে তুলত না। কেউ নিষেধ করলেই বুড়ি তাদেরকে রেগে গিয়ে বলত, 'না খেয়ে মরব নাকি! যদি ওখানে গেলে কোনো প্রেতাত্মা ঘাড় মটকে দেয়তো দিক। এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভালো।'

গরিব হলে কী হবে, বুড়ির ছিল খুব মুখ। তাই একবার-দুবার নিষেধ করার পর কেউ আর বুড়িকে ঝুম খেতে না যাবার জন্য জোর করল না।

তারপর একদিন হল কী ঠাকুমার সঙ্গে কন্দমূল খুঁড়ে তুলতে তুলতে বুড়ির নাতনি বালিকা মেয়েটির ভীষণ জল তেষ্টা পেল। তেষ্টা পাওয়ামাত্রই সে দিঘিতে জল খেতে গেল।

জল খেতে গিয়ে মেয়েটি আর ফিরল না। বেশ কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ বুড়ির টনক নড়ল। নাতনি ফিরে না আসাভে চিন্তিত হয়ে পড়ল। চঞ্চল হয়ে উঠল মন। শেষপর্যন্ত আর স্থির থাকতে না পেরে বুড়ি কন্দমূল খোঁড়া ছেড়ে নাতনিকে খুঁজতে ঝুম খেত ছেড়ে বেরল।

ঝুম খেত ছেড়ে বুড়ি বেড়তেই তাকে এক জোড়া হরিণ বলল, 'দিঘির কাছেই তোমার নাতনি হারিয়ে গেছে।'

এ কথা শোনামাত্রই বুড়ির বুক কেঁপে উঠল। চোখ দিয়ে তার টস টস করে জল পড়তে লাগল। সে ভাবল, মেয়েটার জন্যই তো তার এত কষ্ট করে বেঁচে থাকা! মেয়েটাই যখন হারিয়ে গেছে তখন তার আর এ জীবন রেখে লাভ কী? মরবার জন্য দিঘিটার কাছে একটা কুয়ো দেখতে পেয়ে সেই কুয়োর ভেতরে লাফিয়ে পড়ল বুড়ি।

কী আশ্চর্য কুয়োর ভেতরে লাফিয়ে পড়ামাত্রই নাতনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বুড়ির।

ঠাকুমাকে কাছে পেয়েই মেয়েটির আনন্দে দুচোখে জল এসে গেল। সে বুড়িকে বলল, 'জানো ঠাক্‌মা, বাবা এখানে সাপ হয়ে আছে। আমার সঙ্গে বাবার দেখাও হয়েছে।'

নাতনির মুখ থেকে এ কথা শুনে বুড়ির দুচোখে খুশি উপচে পড়ল। সে তার নাতনিকে বলল, 'কই, তোর বাবা কোথায়?'

মেয়েটি বলল, 'বাবা এখন আমার জন্য খাবার আনতে গেছে।'



নাতনীর মুখ থেকে এ কথা শুনে বুড়ি চুপ করে রইল।

খাবার নিয়ে সাপ ফিরে আসতেই বুড়ি আনন্দে আটখানা হয়ে গেল। হবে নাইবা কেন— বহুকাল বাদে ছেলের সঙ্গে দেখা। ছেলেকে পেয়েই বুড়ি বলল, 'এই অন্ধকার কুয়োয় তোর থেকে কাজ নেই। ঘরে ফিরে চল বাবা।'

ছেলে কিন্তু রাজি হল না। সাপের চেহারা নিয়ে সে লোকালয়ে ফিরতে রাজি নয়। সে বলল, 'তোমরা বরং আমার কাছে থাক।'

ছেলের কথায় বুড়ি রাজি হল না। এমনকি মেয়েটিও না। লতাপাতা, মাছ আর গুগলি খেয়ে কে আর থাকতে চায়? তাই সাপ বাবা জোর করাতেও মেয়েটি কুয়োর ভেতরে থাকতে রাজি হল না। সে ঠাকুমার সঙ্গে বাড়ি ফেরার জন্য গোঁ ধরল।

সাপ আর তাদেরকে বাধা দিল না। বুড়ি অগত্যা নাতনিকে নিয়ে কুয়ো থেকে বহুকষ্টে উঠে বাড়ির পথে পা বাড়াল। যাবার সময় অবশ্য মেয়েটি তার সাপ বাবাকে কথা দিল, একমাস বাদে সে আবার এই কুয়োর ভেতরে তার বাবার কাছে ফিরে আসবে।

কিন্তু তিন তিনটে মাস কেটে গেল। কেউই আর কুয়োর ভেতরে ফিরে এল না। না বুড়ি, না মেয়ে।

তারপর হঠাৎই একদিন গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন হঠাৎ কুয়ো থেকে প্রচণ্ড গতিতে জল বেরিয়ে এল। আর সেই জলের আকার প্রবল বন্যার রূপ নেওয়াতে বুড়ির কুঁড়ে ঘর গেল ভেসে। শুধু কী কুঁড়ে ঘর! বুড়ি আর মেয়েটিও গেল জলের প্রবল স্রোতের টানে ভেসে।

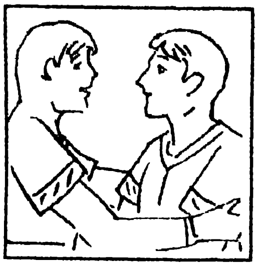
প্রবল জলের টানে বুড়ি মা আর নিজের একমাত্র মেয়েকে কাছে টেনে নিল সাপ। মা ও মেয়েকে কাছে পেয়ে তার যেন আহ্লাদ ধরে না।

কী অদ্ভুত ব্যাপার— মা ও মেয়েকে সাপটা কাছে টেনে নেবার পরই কিন্তু আস্তে আস্তে নেমে যেতে লাগল সব জল। পুনরায় থই থই জল সরে জেগে উঠল সবুজ খেতভরা গ্রামখানা!

এ ঘটনা ঘটার পর থেকেই ভুলেও ওই গ্রামের কেউ আর দিঘির বা কুয়োর কাছে যেত না। গ্রামশুদ্ধ সকলে বিশ্বাস করতে লাগল, শুধু ভূতপ্রেতই না— অনেক অপদেবতাও আছে ওই দিঘি আর কুয়োতে।

দুই যমজ ভাইয়ের গল্প

(ত্রি পু রা)



দুই যমজ ভাই— বড়ো কংসো এবং ছোটো বংসো। তাদের চেহারা, আচার আচরণ— সব কিছুতেই আশ্চর্য মিল। দুজনে একই রকম জামা-কাপড় পরে বসে থাকলে— কোন্‌টা যে কে, ঠাহর করে বলা কঠিন। প্রায় অধিকাংশ গাঁয়ের লোকই এ ব্যাপারে ভুল করে।

একবার একটা বেশ মজার ঘটনা ঘটে। কংসোর সঙ্গে একটা মেয়ের ভাব-ভালোবাসা ছিল। সে বংসোকে কংসো ভেবে তাদের বিয়ের দিন পাকাপাকি কবতে বলল। আর বংসো তো মেয়েটার কথা শুনে রেগে-মেগে অস্থির।

বংসো মেয়েটাকে বলল ঃ তোমাকে তো আমি চিনি না। কবে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হল। তুমি আচ্ছা তালকানা তো! কী বলতে হয় সেটা জান না।

মেয়েটা বংসোর মুখে ওইসব কথা শুনে মনে বড়ো আঘাত পেল। রাগে তার চোখমুখ লাল হয়ে গেল। লজ্জা ও অপমানের গ্লানি নিয়ে সে সেখান থেকে চলে এল।

পরের দিন কংসো এল তার কাছে। মেয়েটা মুখ ভার করে রইল। আগে থেকেই সে মনে মনে ঠিক করেছিল কংসোর সঙ্গে কথা বলবে না।

কংসো সেদিন বাড়িতে ছিল না। সে গেছল গঞ্জের হাটে। মেয়েটার অভিমান করার মতো সে কিছুই করে নি। অথচ সে মুখভার করে রেগেমেগে বলে উঠলঃ তুমি গতকাল আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছ। বলেছ আমায় চেন না। তবে আজ আবার এসেছ কেন? এই মুহূর্তে তুমি আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। আমি তোমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না।

মেয়েটার মুখে এসব কথা শুনে কংসো তো অবাক। সে বললে ঃ গতকাল আমি বাড়িতেই ছিলাম না। কেন আমায় ও-সব বলছ? আমার ভাই বংসো তোমায় কিছু বলে থাকতে পারে।

মেয়েটা এবার তার ভুল বুঝতে পারল। তারপর দুজনে মিলে প্রাণ খুলে হো-হো করে হাসতে লাগল।

কংসো আর বংসো দুই ভাই একেবারে হরিহর-আত্মা। অবসর পেলেই তারা দুজনে পাশা খেলত। কেউ তাদের সঙ্গে পারত না।

একদিন দৈত্যেরা এসে বংসোকে বললে ঃ কী হে, শুনেছি তুমি ভালো পাশা খেলতে জান? আমাদের সাথে খেলে পারবে?

বংসো উত্তর দিলে ঃ আলবৎ পারব।

দৈত্যেরা দাপটে শুরু করলেও শেষমেশ বংসোর কাছে হেরেই গেল। এরপর তারা অনর্থক ঝুট-ঝামেলা



বাধিয়ে দিল। বংসোও পালটা কথা কাটাকাটি করল। দলে ভারি ছিল বলে দৈত্যরা বংসোকে বন্দী করে নিয়ে গেল। তারপর তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

কংসোর একটা জাদু-আংটি ছিল। সেটার রং ফিকে হলে সে বুঝতে পারত তার ভাই কোনো বিপদে পড়েছে। একদিন ঘুম থেকে উঠে কংসো দেখল— তার আংটিটার রং সম্পূর্ণ পালটে গেছে। সে ভাবল ঃ আমার ভাই নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছে। এই মুহূর্তে তাকে খোঁজার জন্য বের হওয়া উচিত।

কংসো তার আংটিটার উপর লক্ষ রেখে হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে সে এসে পৌঁছল একটা নদীর তীরে। দৈত্যেরা সেখানে বংসোর শরীরের টুকরো টুকরো অংশগুলো ফেলে রেখেছিল। কংসো সেগুলো কুড়িয়ে নিল। তারপর বংসোর নাড়িভুঁড়ি ধুয়ে আংটিটা ছুঁইয়ে মন্ত্র পড়ল। দেখতে দেখতে বংসো নতুন করে বেঁচে উঠল।

এরপর দৈত্যেরা আর কখনো কংসো বংসোর সাথে লাগতে আসেনি। বরং তারা হয়ে পড়ল তাদের দাসানুদাস। আর দুই ভাই তাদের সাহায্যে জয় করল একটা রাজ্য।

কংসো হল রাজা। বংসো তার মন্ত্রী। দৈত্যেদের নিয়ে গড়ে উঠল তাদের সৈন্যবাহিনী। তাই অন্য রাজ্যের রাজারা কংসোর রাজ্যে অভিযান চালাতে সাহসই পেত না।

কংসো সেই মেয়েটাকে বিয়ে করল। সে হল রাজ্যের রানি। বংসো বিয়ে করল দৈত্যরাজ্যের রাজকুমারীকে। এরপর তারা সকলেই সুখে দিন কাটাতে লাগল।



এক অনাথ বালক ও দৈত্যের গল্প



ত্রিপুরার এক গ্রামে এক অনাথ বালক ছিল। গ্রামের শেষে একটা জীর্ণ কুটিরে সে বসবাস করত। সারা দিনভর খেটে কোনোরকমে সে পেট চালাত। খুব গরিব ছিল সে।

সেই গ্রামে ভয়ানক এক দুষ্টু দৈত্য ছিল। তার কাজই ছিল সে গ্রামের সব বাড়ির গাইবাছুর চুরি করে খাওয়া। কখনো-সখনো সে এ কাজ প্রকাশ্যেও করত। এটা সে করত রাতের দিকে।

কিন্তু একদিন রাতে গ্রামবাসীরা মিলিত হয়ে দৈত্যটাকে ধরবার জন্য ওত পেতে থাকল। প্রত্যেকদিনের মতন সেদিন দৈত্যটা এক গৃহস্থবাড়িতে গাইবাছুর খাবার জন্য ঢুকতেই তাকে গ্রামবাসীরা ধরে ফেলল। কিন্তু সকলে মিলিত হয়েও তাকে শেষপর্যন্ত ধরে রাখতে পারল না। পারবে কী করে? দৈত্যের গায়ে যে অসম্ভব শক্তি! সে তো আর মানুষ না, দৈত্য বলে কথা।

দিনকয়েক বাদে আবার একটা ঘটনা ঘটল। ঘটনাটা যে হঠাৎই এমন ঘটবে একবারও ভাবেনি দৈত্যটা। সে তখন এক গৃহস্থবাড়িতে ঢুকে একটা বাছুরকে বধ করে মহা আনন্দে তৃপ্তিভরে খাচ্ছিল। এমন সময় কয়েকজন গ্রামবাসী একসঙ্গে লাঠি আর ছুরি নিয়ে আক্রমণ করল।

তাজ্জব ব্যাপার ঘটল— যতই দৈত্যটা মার খেতে লাগল ততই দৈত্যটার দেহ লম্বা ও বিশালকায় হতে থাকে। প্রায় ষোলো ফুট মতন লম্বা হয়ে গেল। এতে গ্রামের লোকেরা ভয় পেয়ে তাকে ছেড়ে দিল।

দৈত্যটা ছাড়া পেতেই দৌড় লাগল। দৌড় লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যভাবে দৈত্যটার শরীরের উচ্চতাও ক্রমশ কমতে থাকে। যাইহোক— প্রাণভয়ে দৈত্যটা দৌড়তে দৌড়তে অনাথ বালকটার কাছে এল। এসেই সে অনাথ বালককে কাকুতিমিনতি করে বলল, 'বাছা, তুমি আমাকে আশ্রয় দাও। আমি একটা ছোটো মাছি হয়ে যাচ্ছি। দয়া করে তুমি মুখ খোলো, আমি ফুরুত করে তোমার মুখের মধ্য দিয়ে ঢুকে যাই।'

দৈত্যটার এ কথা শুনে বালকটা বেশ ভয় পেয়ে গেল। কিছুতেই সে রাজি হতে চাইল না।

দৈত্যও ছাড়বার পাত্র নয়। সে সমানে কাকুতিমিনতি করতে লাগল একটা মাছি হয়ে অনাথ বালকটার শরীরে ঢোকবার জন্য।

দৈত্যর কাকুতিমিনতিতে বালকটার হৃদয় গলল। সে শেষপর্যন্ত হাঁ করল। হাঁ করা মাত্রই দৈত্যটা টুক করে একটা মাছি হয়ে বালকটার শরীরের ভেতরে প্রবেশ করল। ফলে, গ্রামবাসীরা আর কেউ দৈত্যটাকে দেখতে পেল না।

ক-দিন কাটতেই বালকটা বার বার অনুরোধ করল দৈত্যটাকে তার পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। দৈত্যটা এতই ভয় পেয়েছিল যে, সে বাইরে আসতে রাজি হল না।



বালকটা বলল, ‘দেখ, চিরকাল আমার পেটের ভেতরে তোমার থাকা উচিত না। তোমার অবশ্যই বেরিয়ে আসা উচিত। এভাবে আমার পেটের ভেতরে লুকিয়ে থাকা তোমার মতন দৈত্যের সাজে না।’

এ কথা শুনে দৈত্যটা পেটের ভেতর থেকেই হাসতে হাসতে বলল, ‘এখানে আমি বেশ মজাতেই আছি। তুমি খেলে আমারও খাওয়া হয়। তুমি পারতো ভালো ভালো খাবার খুব করে খাও।’

আচ্ছা জ্বালাতনে পড়া গেল তো! বিরক্ত হয়ে অনাথ বালকটা এক ওঝার স্মরণাপন্ন হল। সে ওঝাকে গিয়ে সব কথা খুলে বলল।

ওঝা সব শুনে আঁতকে উঠল, ‘সর্বনাশ! পেটের ভেতরের দৈত্যটাকে তো এখনই খতম করা দরকার। তা নাহলে তুমিতো মারা পড়বে। প্রত্যেকদিন তুমি যা আহার করো, তার কোনো কিছুইতো তোমার গায়ে লাগবে না।’

ওঝার কথা শুনে বালকটা ভীষণ ঘাবড়ে গেল। সে কাঁদ-কাঁদ স্বরে ওঝার পায়ে লুটিয়ে পড়ল— ‘আমাকে আপনি বাঁচান।’

‘আমার কাছে যখন এসে পড়েছ, তখন ভয় নেই।’ বালকটাকে আশ্বস্ত করে একশিশি তরল ওষুধ তার হাতে দিয়ে ওঝা বলল, ‘নাও, আর দেরি না করে এই পুরো ওষুধটা শিগগির খেয়ে নাও দিকি।’

অনাথ বালক আর দেরি করে! ওঝা বলা মাত্রই সে শিশিটা উপুড় করে ঢক ঢক করে জল খাওয়ার মতন খেয়ে ফেলল সব তরল ওষুধ। এক নিমেষের মধ্যে।

ওষুধ খাওয়া মাত্রই দৈত্যটা মারা গেল। বালকটার মল দিয়ে বেরিয়ে এল মাছিরূপ দৈত্যটার মরা শরীর!



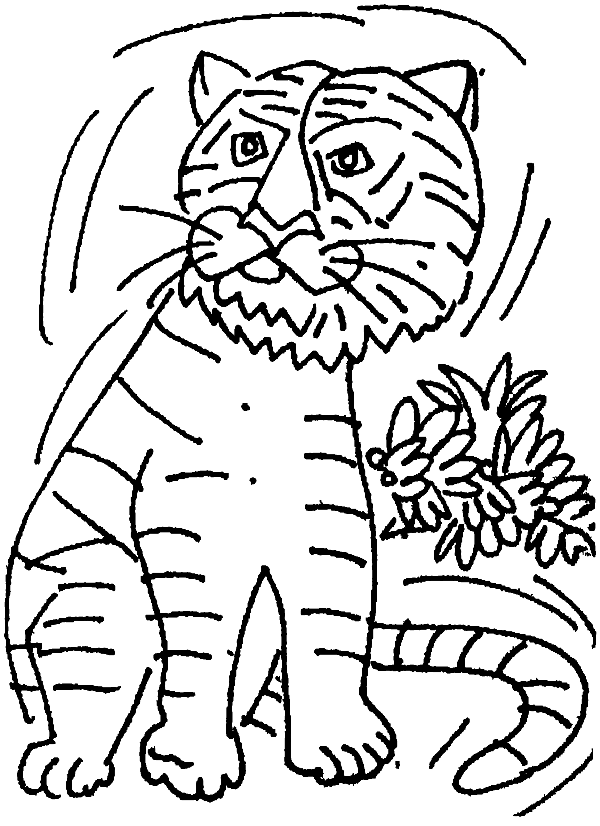
কা-নম

(খা সি য়া)



অনেক অনেক দিন আগে খাসি রাজ্যে এক গ্রাম ছিল। গ্রামটি ছিল বনের ধারে, নদীর কিনারায়। সেখানে এক মাটির ঘরে ফুটফুটে এক মেয়ে ছিল। তার নাম ছিল কা-নম। বাবা মার একমাত্র সন্তান সেই মেয়েটি। তাই মা তাকে নজর- ছাড়া করত না। একটু চোখের আড়াল হলেই কোথায় গেল, কোথায় গেল ভাব। আস্তে আস্তে বড়ো হতে লাগল সে। বড়ো হল। আরও সুন্দর হল। মাথায় এক ঢাল চুল হল। চোখ দুটো কালো ভ্রমর হল। গায়ের রঙ হল চাঁদের আলো। তখন মেয়েকে আরও চোখে চোখে রাখল তার মা। কী জানি কখন কী হয়ে যায়। তবু তো বসিয়ে রাখলে চলে না। তারা গরিব। কুয়ো থেকে এক বালতি জল না আনলেই নয়। কিংবা মায়ের জন্যে বন থেকে পুজোর ফুল। আর মায়ের হাতে এটা-সেটা এগিয়ে দেওয়া। তেমনই একদিন জল আনতে গেছে কা-নম।

বালতিটা ভরেছে কী ভরেনি, হঠাৎ এক বাঘ সেখানে বিশাল লম্বা চওড়া বাঘ। তার নাম ইউ খলা। কা নমকে দেখে জিবে জল ভরে এল বাঘটার। খেতে কী ভালোই না লাগবে! ব্যস্, যেমন ভাবা তেমন কাজ। বাঘটা কা নমকে কাঁধে নিয়ে একেবারে বনের ভেতরে। তার গুহার সামনে এনে নামাল। কা নম ঠক-ঠক করে কাঁপছে। গলগল করে ঘামছে ওদিকে ইউ খলা তাকিয়ে তাকিয়ে জিব দিয়ে ঠোঁট চাটছে। আর ভাবছে। ভাবতে ভাবতে তার মনে হল, —বড্ড ছোট্ট মেয়েটা। পুরোটা খেলেও পেট ভরবে না তার। তার চেয়ে বরং খাইয়ে-দাইয়ে একটু বড়োসড়ো মোটাসোটা করি মেয়েটাকে।

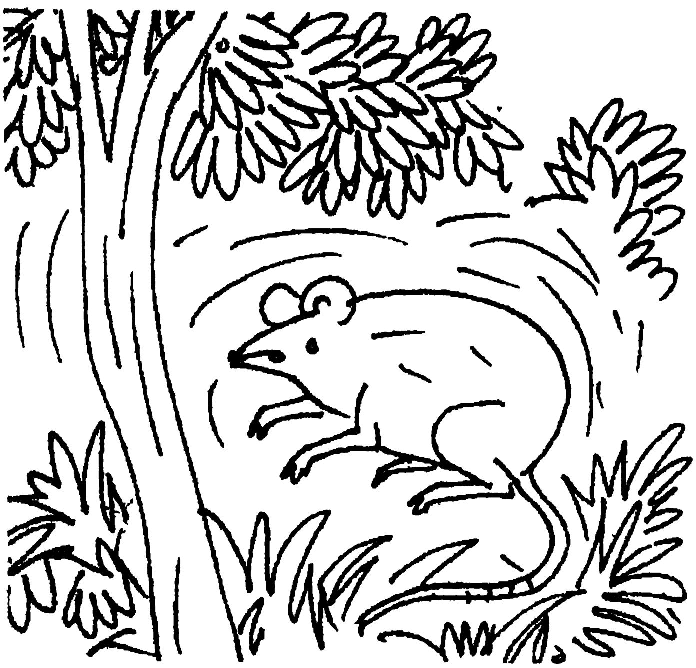


তাই কা-নমকে ছুঁলই না ইউ খলা। তার বদলে যত্ন-আত্তি করতে লাগল তার। কা-নমের জন্যে এল ভালো ভালো খাবার। ভালো ভালো পোশাক। নরম গদির বিছানা। আর খেলার জন্যে ভালো ভালো খেলনা। কা-নমের আনন্দ আর ধরে না। সে বাড়িতে থাকতেও এত সব পায়নি কোনোদিন। এতসব খায়নি জীবনে। তাই ভালো খেয়ে ভালো পরে দেখতে দেখতে

আরও সুন্দর হয়ে উঠল সে। একদিন চোখ পড়ল ইউ-খলার। তাইতো, মেয়েটা তো বেশ ডাগর-ডোগর হয়েছে। এবার তো একে খেতে হয়। মনে মনে ভাবল বাঘটা। তারপর আর আর বাঘেদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে এল— আজ রাতে তোমাদের সক্কলের নেমন্ত˜। কা-নমকে আজ খাওয়া হবে। যাবে কিন্তু।

যে শুনল সে-ই বলল— নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। যাকে অমন সুন্দর দেখতে তাকে খেতেও না জানি কী ভালোই না লাগবে।

আশেপাশে ছিল ছোট্ট ইঁদুরটা। সব কানে গেল তার। মনটা হু হু করে উঠল। সে কা-নমকে দেখেছে বাঘ ইউ-খলার গুহায়। বাঘের গুহায় মানুষের মেয়ে। পরীর মতো। চাঁদের মতো। পাতায় পাতার ফুলে ফুলে নেচে বেড়ায় ওই মেয়ে। বড়ো ভালো লাগে ইঁদুরের। চোখ ভরে দেখেও আশা মেটে না। আহা! সেই মেয়েকে কিনা ওই বাঘটা খাবে। না তা হতে দেওয়া যায় না।



কথাটা ভেবেই ছুটে আসে ইঁদুরটা। কা-নমেব কাছে গিয়ে বলে— মেযে, ও মেযে, শিগগির পালিয়ে চল এখান থেকে। ওই বাঘ আজ রাতে তোমায় খাবে।

কথা শুনে কা-নমের বুক শুকিয়ে যায়। মুখ শুকিয়ে যায়। ভয়ে থরথর করে কাঁপে সে। বলে, কী হবে তাহলে ইঁদুর ভাই।

—কোনো ভয় নেই। তুমি আমার সঙ্গে এসো।— বলে ইঁদুর কা-নমকে নিয়ে যায় ইউ হানরো'র কাছে। ইউ-হানরো এক বিশাল দৈত্য। না পাবে হেন কাজ নেই। জাদুবিদ্যাও জানে সে। আর খুব নিষ্ঠুর। তবু বাঘের হাত থেকে বাঁচতে দৈত্যের কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। সব শুনে ইউ-হানরো একটা ব্যাঙের খোলস দিযে ঢেকে দেয কা-নমকে। দেখতে দেখতে সেই সুন্দর মেয়েটা হয়ে যায় এক কদাকার কুৎসিত ব্যাঙ।

এবার হা-হা করে বিকট হেসে ওঠে দৈত্য ইউ-হানরো। তারপর গমগমে গলায় বলে ওঠে— এবার থেকে আমার কাছে থাকো। সারা জীবন-ভর ব্যাঙ হয়ে আমার সেবা করবে তুমি। কথাটা শেষ করে ইউ হানরো চলে যায়।

হায় হায় করে ওঠে ইঁদুর। একী হল! এক বিপদ থেকে বাঁচাতে গিয়ে আর এক বিপদে ফেলে দিল কা-নমকে! এর হাত থেকেও বাঁচাতে হবে ওই মেয়েকে। —মনে মনে ভাবল ওই ইঁদুরটা। তারপর কা-নমকে বলল— যদি দৈত্যের হাত থেকে বাঁচতে চাও তাহলে এই গাছটায় চড়ো।

কা-নম আর কী করে। ইঁদুরের কথা শুনে গাছে চড়ল। গাছে উঠতেই ইঁদুর গাছের গোড়ায় হাঁটু গেড়ে বসে বলল— ভাই গাছ, তুমি বড়ো হয়ে যাও। আরও আরও বড়ো হও। যদি তুমি আকাশে গিয়ে ঠেকতে পারো, তবেই ওই কা-নম বাঁচবে।

গাছ কথা শুনল। তারপর কা-নমকে নিয়ে লম্বা হতে লাগল গাছ। লম্বা হচ্ছে তো হচ্ছেই। এক সময় মেঘ ছাড়িয়ে গেল। তার পরও উঠছে তো উঠছেই। উঠতে উঠতে একসময় নীল আকাশও ছাড়িয়ে গেল। তার পরেই দেখা গেল এক ভারি সুন্দর দেশ



রঙিন ফুলে ভরে আছে চারদিক। ফুলে ফুলে প্রজাপতি। ফলে ফলে পাখি। পাখিরা গান গাইছে। খেলা করছে। তকতকে ঝকঝকে রাস্তা। রাস্তার দুধারে সোনার পাড় তার ওধারে মণি-মাণিক্যের সারি সারি রাজপ্রাসাদ।

কা-নম ব্যাঙ হয়ে একবার এর দুয়ারে গেল। একবার ওর দুয়ারে গেল। কিন্তু খারাপ আর বিচ্ছিরি দেখতে ব্যাঙকে কে আর জায়গা দেবে। শেষে দয়া হল কা-নাগির। সব কথা শুনে সূর্যদেবী কা-নাগি রাজপ্রাসাদের বার-দুয়ারে একটা ঘর দিল কা-নমকে।

থাকে। থাকে। থাকে। এখানে আর কোনো ভয় নেই। কিন্তু একদিন হল কী। কা-নম ব্যাঙের খোলস ছেড়ে যেই চান করতে যাবে, তখন সূর্যদেবীর ছেলে হঠাৎ দেখে ফেলল।

এত রূপ সে জীবনে দেখে নি। রঙ নয় তো যেন দুধে আলতা। চুল নয় তো যেন কাজল কা মেঘ। মুখ নয় তো যেন ফুটন্ত এক পদ্ম। রাজকুমার একা দেখবে কী। সে তাড়াতাড়ি মা সূর্যদেবীকেও ডাক সূর্যদেবী কা-নাগিও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সেও এমন রূপ জীবনে দেখেনি।

রাজকুমার বলল —মা, আমি ওকে বিয়ে করব।

কা-নাগি হাসল। তারপর চুপি-চুপি এগিয়ে গিয়ে কা-নমের ছেড়ে রাখা ব্যাঙের খোলসটা দিল পুড়ি কা-নম ফিরে এসে দেখল খোলসটা নেই। ভয়ে আঁতকে উঠল সে। এখন কী হবে! যদি দৈত্য ইউ-হান খবর পেয়ে চলে আসে।

—কী আবার হবে। সূর্যদেবী কা-নমের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল— সে এলে আমরা তাকে তাড়িয়ে দে

এদিকে ইউ-হানরো জানতে পারল তার দেওয়া ব্যাঙের খোলস পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। রাগে আগু হয়ে ছুটে এল সে। হু-হু করে ছুটে আসছে। হঠাৎ ঝড় উঠল। মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাল। কড়-কড় শব্দে বাজ পড়ল। শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। তেমন যুদ্ধ কেউ কখনও দেখে নি। যুদ্ধে আকাশের দেবতারা যোগ দিল। মর্তের মানুষেরাও যোগ দিল। ইউ-হানরোর অনেক ক্ষমতা। তাকে মারতে পারে না কেউ। মারলেও সে আবার বেঁচে ওঠে। কিন্তু এত লোকজন আর এত এত অস্ত্র দেখে ভয় পেল সে। যুদ্ধ ছেড়ে পালাল ইউ-হানরো। শুধু বলে গেল আবার সে আসবে।

এরপর ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল কা-নম -এর সঙ্গে রাজকুমারের। তারা সুখে-শান্তিতে ঘর করতে লাগ

এদিকে ইউ-হানরো তার কথা ভোলেনি। সে এখনও আসে। আজও এসে সূর্যদেবীর উপর চড়াও পৃথিবী থেকে মানুষেরা দেখে সূর্য আস্তে আস্তে ছোটো হয়ে যাচ্ছে। আসামের খাসি প্রদেশের মানুষেরা ইউ হানরো গিলছে সূর্যদেবীকে। এর নাম সূর্যগ্রহণ। এমন হলেই তারা চিৎকার করে। ঢাক বাজায়। বাজায়। সূর্যকে পুরো গিলতে পারে না তাই ইউ-হানরো। ভয়ে পালিয়ে যায় সে। কিন্তু আবার আ

